বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

খুতুবাতে যুলফিকার



খুতুবাতে যুলফিকার

[নবম ও দশম খণ্ড]

মূল

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

মাওলানা আলমগীর হুসাইন যশোরী

ফারেগ : দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত)

ইফতা : মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া-ঢাকা

মুহাদ্দিস ও শিক্ষাসচিব : যশোর জামেয়া ইসলামিয়া

ইসলামনগর (রামনগর), রাজারহাট, যশোর ।

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)

মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা

প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দারুল উলূম লাইব্রেরী

[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রথম প্রকাশ	জানুয়ারী : ২০১৬
প্রকাশক	মাওলানা শহীদুল ইসলাম দারুল উলূম লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল	০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭
স্বত্ব	প্রকাশককর্তৃক সংরক্ষিত
বর্ণবিন্যাস	পরশ কম্পিউটার, রায়েরবাগ, ঢাকা
প্রচ্ছদ	দি ব্রাইট, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : 500 এ

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-৯

- দুনিয়া বর্জনের স্বরূপ /২৬
- শয়তানের ধোঁকা /৬৮
- মাখলুকের মহব্বত /১২২
- আত্মশুদ্ধি /১৬৮
- মাহে রমজানের ফযিলত /২২০

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-১০

- আল্লাহর মহব্বতের তাৎপর্য /২৪৪
- উপকারী ইল্‌মের বরকত /২৭৬
- কুরআনের বরকত /৩২৪
- শান্তির ঠিকানা /৩৪৪
- গুনাহের কুফল /৩৭৪
- রাগ ও তার চিকিৎসা /৪২৪
- দু'আ কবুলের রাতসমূহ /৪৬২

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-৯

দুনিয়া বর্জনের স্বরূপ /২৬
দুনিয়াদারদের জন্য 'জনাব' শব্দের উপহার /২৬
'দুশমন' শব্দের গঠন /২৭
ইমাম গাযযালির মতে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত /২৮
উম্মতে মুহাম্মদীর গরীবদের মর্যাদা /২৯
দুনিয়া ও আখেরাতে আরাম-আয়েশ /৩০
মদীনার গরীবদের পেরেশানি /৩০
সমস্ত পাপের মূল /৩১
দুনিয়া বর্জনের অর্থ ও উদ্দেশ্য /৩২
এক বাচ্চার আমলি নসিহত /৩৩
ভয়ঙ্কর জাদুকর /৩৪
একটি শিক্ষণীয় উপদেশ /৩৫
ইহকালীন ও পরকালীন বিবেক /৩৫
ভালো সংস্রবের পুরস্কার /৩৭
সাপের মন্ত্র /৩৭
দুনিয়ার মন্ত্র /৩৮
হযরত উমর (রাযি.)-এর অন্তরে আখেরাতের ফিকির /৩৯
হযরত উমর (রাযি.)-এর দুনিয়াবিমুখতা /৩৯
হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর দুনিয়াবিমুখতা /৪০
হযরত উসমান (রাযি.)-এর দানশীলতা /৪১
নবীজির কথায় হাজার গাছের কুরবানি /৪৩
মালদার নাকি মালের চৌকিদার /৪৬
দুনিয়া পানির মতো /৪৬
প্রথম তুলনা ও সম্পর্ক /৪৬
এক বুযুর্গের ঘটনা /৪৭

একটি ইল্‌মি তত্ত্ব /৪৮
দুনিয়া খেল-তামাশা /৪৮
দুনিয়া মৃত প্রাণীর মতো /৫০
বর্তমান সময় সবচেয়ে বড় ফেতনা /৫২
দুনিয়া কী? /৫৩
দুই লোকের হৃদয়গত অবস্থা /৫৩
মারেফাতের নূর অর্জনের অমোঘ নীতি /৫৪
বাতেনি সফরে সহজতা /৫৫
মনের চাহিদা পূরণের জায়গা /৫৫
খাজা আবুল হাসান খিরকানী (রহ.)-এর অমুখাপেক্ষিতা /৫৬
সোমনাথ বিজয় /৫৭
খানকার মাটির আদব /৫৯
হযরত সালেম (রহ.)-এর অমুখাপেক্ষিতার শান /৫৯
আল্লাহপাক কী চান? /৬০
ভারসাম্যপূর্ণ পথ /৬১
সম্পদ ঈমানের জন্য ঢাল /৬১
মাছরাঙ্গার মতো হোন /৬২
ভালো খাদেম ও মন্দ মনিব /৬২
নিরুত্তরকারী প্রশ্ন /৬৩
লাভজনক ব্যবসা /৬৩
দুটি বস্তু স্থিতিশীলতার কারণ /৬৪

শয়তানের ধোঁকা /৬৮
দ্বিতীয় বড় দুশমন /৬৮
শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা বোঝার প্রয়োজনীয়তা /৬৮
কুরআনের ভাষায় শয়তান প্রসঙ্গ /৬৯
হযরত আদম ও মা হাওয়ার সাক্ষাত /৭৩
মহিলাদের দুর্বলতা /৭৩
শয়তানের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টির এক বিরল তরিকা /৭৩
ব্যক্তিগত দুশমনের জন্য ব্যক্তিগত নাম ব্যবহার /৭৬
শয়তান সৃষ্টির রহস্য /৭৭
শয়তানের উপর অভিযোগ আরোপ /৭৮
শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার নির্দেশ /৭৯

রহমান ও শয়তানের আলাপ /৭৯
ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ হতে হেফাযত /৮০
শয়তানের প্রাথমিক চেষ্টা /৮০
শয়তানের সবচেয়ে বিধ্বংসী অস্ত্র /৮১
ফরেস্ট ডিফেন্স লাইনের হেফাযত /৮১
অধিক যিকিরের সংজ্ঞা /৮২
এক অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই /৮৩
শয়তান ও নফসের কুমন্ত্রণা বোঝার উপায় /৮৪
তাহাজ্জুদের মধ্যে শয়তানের জাগিয়ে দেওয়া /৮৫
শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা /৮৬
দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরাতে শয়তানের কারসাজি /৮৬
শয়তানের এক আঙুলের অনিষ্টতা /৮৭
ইল্‌ম থেকে বিরত রাখা শয়তানের কাছে বড়ই প্রিয় /৮৭
নবীজির শয়তানের মুসলিম হওয়া /৮৮
বান্দার প্রতি আল্লাহর অভিযোগ /৮৮
দিল সাফ করার জিম্মাদার কে? /৮৯
সালেকদের বিভ্রান্ত করার দুটি পথ /৮৯
মুমিন ও ফাসিকের গুনাহের অবস্থা /৯০
সালেকদের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনা /৯০
তরীকতের নামাযগুলোর দুর্দশা /৯০
শয়তানের সঙ্গ /৯১
ঈমানের ডাকাত /৯১
হঠকারী দুশমন ৯১
দুটা মারাত্মক আত্মিক রোগ /৯২
শয়তানের অভিজ্ঞতার নির্যাস /৯৩
শয়তানের রশি /৯৩
বারসীসা পাদ্রীর ভ্রষ্টতা ও তার করুণ পরিণতি /৯৪
হযরত উমর (রাযি.)-এর সতর্কতা /১০৪
শয়তানের বাহন /১০৪
ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুর ফিকির /১০৬
বেদীন বানানোর শেষ চেষ্টা /১০৬
তাকবীরে উলা ও নিয়মিত মেসওয়াক করার খোদায়ী পুরস্কার /১০৬
ইমাম রাযী (রহ.)-এর উপর শয়তানের হামলা /১০৭

ডাক্তার মৃত্যুর সময় অজ্ঞানের ইঞ্জেকশন দিবে না /১০৮
মৃত্যুযাত্রীর উপর জুলুম না করা /১০৮
কালেমার তালকীনের তরিকা /১০৮
নেসবতে নকশবন্দিয়ার বরকতের ঘটনা /১০৯
ইমাম আহমাদ (রহ.)–এর উপর শয়তানের হামলা /১১০
ইমাম রাযী (রহ.)-এর বাণী /১১০
শয়তানের ধোঁকার চূড়ান্ত পর্যায় /১১১
শয়তানের বিভিন্ন ধোঁকা /১১২
শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার উপায় /১১৩
হযরত উমর (রাযি.)-এর শয়তানের ভয় /১১৪
শয়তান কঙ্কালসার কীভাবে হলো? /১১৫
বিবস্ত্র হয়ে শয়তানের ঘোরাফেরা /১১৫
শয়তানের যত ভয় /১১৫
শয়তানের সঙ্গে এক আবেদের কুস্তি /১১৬
শয়তানের উপর শয়তানি /১১৭
শয়তানের আর্তনাদ /১১৮
শয়তানের অপদস্থ ও অপমানিত হওয়া /১১৮
বনী আদমকে বিপদগামী করার প্রত্যয় ও তার জবাব /১১৯
দুটি সংরক্ষিত দিক /১২০

মাখলুকের মহব্বত /১২২
তৃতীয় বড় দুশমন /১২২
মাখলুকের মহব্বতের সীমারেখা /১২৩
ঈমানে পরিপূর্ণতা /১২৪
আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতের মর্যাদা /১২৪
তিনটি পৃথক নির্দেশ /১২৬
আলোকরশ্মির মাধ্যমে চিকিৎসা ১২৮
পরিচয়-পরিচিতির গুরুত্ব ১২৯
অমানবিকতার যুগ /১৩০
বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে দীনদারির গুরুত্ব /১৩১
বন্ধুত্বের আদব /১৩১
স্ত্রী-সন্তানের মহব্বত /১৩৪
মহব্বত নিন্দনীয় হয় কখন? /১৩৪

সম্পদ ও সন্তানের মাধ্যমে পরীক্ষা /১৩৫
দীনদারির পাশাপাশি সদাচরণও প্রয়োজন /১৩৭
মুসলমান হওয়ার পথে বাধা /১৩৮
স্বীয় পরিবারের সঙ্গে নবীজির ব্যবহার /১৩৯
মুচকি হাসি মহব্বতের উৎস /১৪১
আল্লাহর মহব্বতের শামিয়ানা /১৪২
মহব্বত, না নফ্সানিয়াত /১৪৩
কামতাড়িত ভালবাসার উন্মাদনা /১৪৪
মহব্বতের আলামত /১৪৬
শরীয়তের সৌন্দর্য /১৪৭
যিনার প্রথম পর্ব /১৪৭
দোজখের সঙ্গে আলাপ /১৪৮
আলাপের পরবর্তী পর্ব সাক্ষাত /১৪৮
পবিত্রতার জন্য দুটি জিনিস সংরক্ষণের প্রয়োজন /১৪৯
আয়াতের সূক্ষ্ম তথ্য /১৫০
গায়রে মাহরামদের দেখার শাস্তি /১৫১
তরুণদের মুক্তির একটি উপায় /১৫২
একটা শয়তানি ধোঁকা /১৫২
অশ্লীল কাজ হারাম /১৫৩
শয়তানের অবস্থা /১৫৩
যিনা করার ৬ ক্ষতি /১৫৪
তিনজন বঞ্চিত লোক /১৫৪
পরপুরুষ বা পরনারী হতে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার ফযিলত /১৫৫
একটি সোনালী মূলনীতি /১৬৫
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /১৫৬
জান্নাতের গ্যারান্টি /১৫৭
সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রহ.)-এর তাকওয়া /১৫৭
এক ছাত্রের শিক্ষণীয় ঘটনা /১৫৭
মাখলুকের মহব্বতের চিকিৎসা /১৬০
এক হেদায়াতপ্রার্থীর ইসলাহের ঘটনা /১৬১
আমার নিজের মা'মুল /১৬২
এক যুবকের ঘটনা /১৬৩
দিল মুসিবতগ্রস্ত হওয়ার কারণ /১৬৪

আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধকে ভয় করতে থাকুন /১৬৫
কুদৃষ্টির কুফল /১৬৫

আত্মশুদ্ধি /১৬৮

চতুর্থ বড় দুশমন /১৬৮
আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব /১৬৯
আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ /১৭০
ইল্‌মি তথ্য /১৭০
সফলতা দ্বারা উদ্দেশ্য
সফলতার জন্য ৩টি জিনিসের প্রয়োজন /১৭১
মানবসৃষ্টি এবং উপাদান চতুষ্টয়ের প্রভাব /১৭২
বাতেনি রোগ-বালাই ও নফ্‌স /১৭৩
রূহানী উন্নতি ও অবনতি /১৭৫
অসুস্থ দিলের আলামত /১৭৫
নফ্‌স ও শয়তানের চাল /১৭৭
ভালো ও মন্দ কামনা /১৭৮
কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পুরো খামিরে /১৭৮
অনাদি অবাধ্যতায় নফসের ভূমিকা /১৭৮
স্বাদের পাগল /১৮১
এক বাদশার বিব্রতবোধ করা /১৮১
সবচেয়ে দুর্দান্ত ও ভয়ঙ্কর শত্রু /১৮২
মানুষের নফ্‌স এত ভয়ঙ্কর কেন? /১৮৩
নফ্‌স কন্ট্রোল করার উপায় /১৮৪
হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অপূর্ব বিনয় ও আত্মরক্ষা /১৮৫
হযরত থানবী (রহ.) ও ইসলাহে নফ্‌স ১৮৬
দীক্ষার সূচনা ১৮৯
আমার পীর ও মুরশিদের তরবিয়তের এক ঝলক ১৮৯
রূহানী পাহলোয়ান হওয়ার জন্য করণীয় /১৯১
বেলায়েতের প্রকার /১৯৩
বিশেষ বেলায়েত /১৯৪
ইসলাহে নফসের জন্য সর্বোত্তম উপায় /১৯৪
স্বতন্ত্র রুচির এক ঝলক /১৯৫
শরীয়তের লাগাম /১৯৬

শরীয়তের খাদেমা-সেবিকা /১৯৬
অবস্থার বিবর্তন /১৯৬
নফসের চাল ও ছল /১৯৮
বাইয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা /১৯৯
কুপ্রবৃত্তির কেন্দ্র ও অফিস /২০০
কমিউনিজম ও নফসের প্রেরণা /২০২
প্রকৃত মুজাহিদ /২০২
প্রশংসা মূলত সাত্তারেরই /২০৩
যিনার ক্রিয়া /২০৪
এক আজব অভ্যাস /২০৪
প্রবৃত্তির পিপাসা /২০৫
ইউরোপে ধর্ষণ /২০৫
আপন বোনকে বিবাহ করা /২০৫
সমকামিতা নফসেরই ধোঁকার ফল /২০৬
ইসলাহে নফসের সহজ উপায় /২০৭
আল্লাহর মহব্বতের কষ্টিপাথর /২০৭
ভাঙ্গা মনের ফযিলত /২০৮
একটি মজার ঘটনা /২০৮
কুরআনী ফয়সালা /২১০
ঈমানের হেফাযত /২১০
জান্নাত দু-কদমের ব্যাপার মাত্র /২১১
'লা-হাওলা- এর উপযোগী পরিবেশ /২১১
অসৎ চিন্তার কারণে শাস্তি /২১২
ইসলাহে নফ্সরে জন্য দু'আ /২১২
তাহাজ্জুদের তাওফীক লাভের জন্য দু'আ /২১৩
আল্লাহপাকের মূল্যায়ন /২১৩
একটি ইল্মি তথ্য /২১৪
ইসলাহে নফসের অর্থ /২১৬
প্রথম ও শেষ ধাপের সালেকদের মধ্যে পার্থক্য /২১৬
নাম ও কাজের মধ্যে অমিল /২১৭
একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল /২১৮

মাহে রমজানের ফযিলত /২২০
রোযার শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা /২২১
রোযার নিয়ত করার সময় /২২২
ইমাম জাফর সাদেক (রহ.)-এর তাহকীক /২২২
মাহে রমযান পাওয়ার মাসনুন দু'আ /২২৩
মাহে রমযানের জন্য অধিক গুরুত্বারোপ /২২৩
সারা বছরের প্রাণ /২২৩
দু'আ কবুলের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান /২২৪
ইবাদাতের মাস /২২৪
ইবাদাত কাকে বলে? /২২৫
রোযাদারদের মর্যাদা /২২৫
রোযাদারদের জন্য দুটি খুশি /২২৫
একটি গোপন চুক্তি /২২৭
রিয়াহীন ও দৃষ্টান্তবিহীন ইবাদাত /২২৮
রোযা ঢালস্বরূপ /২২৮
রোযা ও কুরআনের শাফাআত /২২৯
নেক আমলের মৌসুম /২২৯
মাগফিরাতের মৌসুম /২২৯
আমলে দৃঢ়তা লাভের সোনালী সুযোগ /২৩০
ইতেকাফের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ /২৩১
ইতেকাফের মৌলিক উদ্দেশ্য /২৩১
শেষ দশকে নবীজির মুজাহাদা /২৩১
লায়লাতুল কদরের ফযিলত /২৩২
জীবনের সুবর্ণ সময় /২৩২
খোসনসিব সে, যে রমযানকে কাজে লাগায় /২৩৩
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /২৩৪
নেকীর চেক বই /২৩৫
মাহে রমযান ও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাঝে যোগসূত্র /২৩৬
মাজালিসে ইতেকাফের টার্গেট /২৩৬
এক বদদু'আয় নবীজির আমীন বলা /২৩৬
ঈদ, না অভিশাপ! /২৩৮
সম্মিলিত আমলের ফযিলত /২৩৮

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-১০

আল্লাহর মহব্বতের তাৎপর্য /২৪৪
সৃষ্টিজগতে মহব্বতের বিভাজন /২৪৪
লোহার মধ্যে চুম্বকের মহব্বত /২৪৫
সূর্যমুখী ফুলের সূর্যের প্রতি মহব্বত /২৪৫
মাছের মধ্যে পানির মহব্বত /২৪৬
পতঙ্গের মাঝে প্রদীপের মহব্বত /২৪৬
তিতির পাখির মাঝে চাঁদের মহব্বত /২৪৭
ফুলের প্রতি বুলবুলের মহব্বত /২৪৮
মানবমাঝে মহব্বতের প্রেরণা /২৪৮
শিক্ষণীয় কবিতা /২৪৯
অস্থায়ী প্রেমের শিক্ষণীয় পরিণতি /২৫০
লোহার পরিণতি /২৫০
মাছের পরিণাম /২৫১
পতঙ্গের পরিণতি /২৫১
আল্লাহর মহব্বতে প্রতারণার শিকার /২৫২
উঁইপোকার পরিণতি /২৫২
বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রভাব /২৫৩
আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্য /২৫৪
হযরত মূসা (আ.)-এর উপর খোদায়ী তাজাল্লীর প্রভাব /২৫৫
আল্লাহর তাজাল্লির বরকতসমূহ /২৫৬
আল্লাহর অবমূল্যায়ন /২৫৭
নবীজির অবমূল্যায়ন /২৫৮
পবিত্র কুরআনের অবমূল্যায়ন /২৫৮
লায়লার সৌন্দর্যের অবস্থা /২৫৮
প্রেমের তিন পরীক্ষা /২৫৯

নমরূদের আগুনে নির্দ্বিধায় লাফিয়ে পড়া /২৫৯
পানিশূন্য মরু প্রান্তরে স্ত্রীকে নির্বাসন /২৬২
হযরত ইসমাঈলকে কে শেখাল সন্তানের শিষ্টাচার? /২৬২
আদর্শ মাতা একেই বলে /২৬৯
আল্লাহর স্মরণের গুরুত্ব /২৬৯
হৃদয়জগৎ পরিষ্কার করা /২৭২
আলোচনার সারনির্যাস /২৭২

উপকারী ইল্‌মের বরকত /২৭৬
ইল্‌ম ও মহব্বতের পাত্র /২৭৬
তিনটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন /২৭৭
দার্শনিক ও আম্বিয়ায়ে কেরামের মূলনীতির মধ্যে প্রভেদ /২৭৮
মানুষ হলো খনি /২৮১
প্রতিভা কখন বিকশিত হয়? /২৮৪
খানকা দ্বারা কী উদ্দেশ্য? /২৮৪
ইউনিভার্সিটি ও খানকার শিক্ষার মধ্যে তফাৎ /২৮৪
খানকাগুলোর সবচেয়ে বড় উপকারিতা /২৮৫
খানকায় কীসের দীক্ষা দেওয়া হয়? /২৮৬
সাহাবায়ে কেরামের দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ /২৮৭
দীনি উপকারী ইল্‌মের প্রভাব /২৮৮
ঈমানদারদের দুটি চিহ্ন /২৮৯
রহমতের জোয়ারের মধ্যে অবস্থান করেও
রহমত থেকে বঞ্চিত থাকা /২৯১
সূরা যিলযাল শোনার আকাঙ্ক্ষা /২৯২
এত আল্লাহভীতি কেন? /২৯২
হাদীছে জিবরাঈলের ব্যাখ্যা /২৯৪
নামাযের ব্যাপারে মেহনত করার প্রয়োজনীয়তা /২৯৮
নামাযে বাইরের চিন্তা কীভাবে দূর হবে? /২৯৮
নববী আবেগ ও ভাবের উত্তরসূরী /২৯৯
ইল্‌ম শিখতে হবে আমলের নিয়তে /৩০০
জুতা সোজা করার দরুন অহংকার দূর হওয়া /৩০১
অহংকার একটি এটমি গুনাহ /৩০২
বড় মাশায়েখদের নিজেদের নিয়ে ভাবনা /৩০৩

যদি কারো অহমিকা থাকে, তাহলে... /৩০৪
আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও /৩০৫
নূরের কিরণ /৩০৬
নবীজির দাওয়াত /৩০৬
তালেবে ইল্‌মের দু'আর বরকত /৩০৭
প্রতি সপ্তাহে নবীজির যেয়ারত /৩০৯
তার কান্না বড়ই ভালো লাগে /৩০৯
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর সফলতার রহস্য /৩১০
স্মৃতিশক্তি কাকে বলে? /৩১০
উপকারী ইল্‌মের টানে কারাবরণ /৩১১
এক নারীর জন্য চার পুরুষ জাহান্নামে যাবে /৩১৩
দাওরায়ে হাদীছের পরে আবার দাওরায়ে হাদীছ /৩১৫
পত্রিকাভিত্তিক জুমুআর নিন্দা /৩১৫
অধ্যয়নের গুরুত্ব /৩১৬
কিতাবের খাজানা /৩১৬
বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি /৩১৭
ভুলে যাওয়ার বড় কারণ পাপাচার /৩১৮
উপকারী ইল্‌মের নেসবত /৩১৮
শরীয়তের বার্নিশ /৩১৮
রিজালুল্লাহর গুরুত্ব /৩১৯
মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ /৩২০
কুকুরের উপদেশ /৩২০
একটি বিরাট উপদেশের কথা /৩২১

কুরআনের বরকত /৩২৪

অন্ধকার হতে আলোর দিকে /৩২৪
হিদায়েতের কিতাব /৩২৫
আল্লাহর রহমতের চুম্বকার্ষণ /৩২৫
মারেফাতে ভরপুর কিতাব /৩২৬
একটি ঈমানদীপ্ত ঘটনা /৩২৬
ডিপ্রেশন শব্দটা কোথা থেকে এল? /৩২৮
কুরআনের সন্ধানে এক রুশ মহিলা /৩২৯
এক হিন্দু পরিবারের ইসলাম গ্রহণের আজব ঘটনা /৩৩০

কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় মোজেযা /৩৩৫
কুরআনের ফয়েজ বক্ষে-বক্ষে /৩৩৫
এ কেমন ইনসাফ? /৩৩৮
কেয়ামত ঘনিয়ে আসার একটি আলামত /৩৩৮
চিন্তার বিষয়! /৩৩৯
গুনাহ্ ও অপবিত্রতা /৩৪০

শান্তির ঠিকানা /৩৪৪

অন্তরের শান্তির অব্যর্থ প্রেসক্রিপশন /৩৪৪
দুটি অসীম বস্তু /৩৪৫
ইমাম আবু ইউসুফকে ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর উপদেশ /৩৪৬
পশ্চিমা বিশ্ব শান্তির অন্বেষায় /৩৪৬
সুইডেনে এক মনোবিজ্ঞানীর স্বীকারোক্তি /৩৫১
আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভের কারণ /৩৫৫
আমি আপনার মতো হতে চাই /৩৫৬
জনৈক এসপির বাতেনি ইসলাহ /৩৫৯
জনৈক এম.এন.আই.-এর উপর নেসবতের বরকত /৩৬০
নকশবন্দী তরিকার নামকরণ /৩৬৫
কলবে আঙুল লাগানোর ফায়দা প্রাণ ত্যাগের সময় প্রকাশ /৩৬৭
জীবন বদলের ধারা /৩৬৭
ইসলাহী সম্পর্কের বরকত /৩৬৮
১০ দিন এতেকাফের সুফল /৩৬৯
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও শুকরিয়া আদায় /৩৭০
নেককার স্বামী তার স্ত্রীর মুরশিদ হতে পারেন /৩৭০
মহিলাদের ধন্যবাদযোগ্য মেহনত /৩৭১
আগামী বছর এতেকাফের দাওয়াত /৩৭১
স্থানীয় বন্ধুদের প্রতি আহ্বান /৩৭১
বাস্তবতা স্বীকার /৩৭২

গুনাহের কুফল /৩৭৪

গুনাহ ছাড়ার নির্দেশ /৩৭৪
গুনাহের ক্ষতিসমূহ জানাও জরুরি /৩৭৪
জ্ঞানী হয়েও পথহারা /৩৭৮
'ইল্‌ম থাকা সত্ত্বেও পথহারা'-এর অর্থ কী? /৩৭৮

নেকী ও গুনাহের মধ্যে পার্থক্য /৩৭৯
আলোকিত অন্তরের হেফাযত /৩৭৯
গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার লাভ /৩৮১
গুনাহ নাপাক বস্তুর মতো /৩৮৩
গুনাহের দুর্গন্ধ /৩৮৪
নেকীর সুঘ্রাণ /৩৮৫
কবরে লাশ পচা আর না পচার কারণ /৩৮৯
একটি বিস্ময়কর ঘটনা /৩৯০
কবর মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কেমন আচরণ করে? /৩৯১
কবরের আযাবের দৃশ্য /৩৯২
কবরের মাটিতে ফুল! /৩৯৫
একটি পরীক্ষিত বাস্তবতা /৩৯৭
গুনাহের ক্ষতিকর প্রভাব /৩৯৮
গুনাহকে হাল্কা মনে না করা /৪০৫
বড়ই চিন্তার খোরাক /৪০৫
দীন অর্জনের মাধ্যমে ঈমানের হেফাযত /৪০৭
আল্লাহওয়ালাদের দু'আর বরকত /৪০৮
আল্লাহভীতি এমনই থাকা উচিত /৪০৯
এমন চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব! /৪১১
তাওবার দুটি লাভ /৪১১
হিসাব গ্রহণের আগেই তাওবা করুন /৪১৩
'তাওবা' অনুতপ্ত হওয়ার নাম /৪১৪
লজ্জার আগুনে জ্বলাও অনেক উত্তম /৪১৪
জাহান্নাম থেকে মুক্তির একটি বিস্ময়কর উপায় /৪১৬
গুনাহ থেকে বাঁচার দু'আ /৪১৬
দুটি অপূর্ব দু'আ /৪১৭
তাওবার সময় কান্নার ফযিলত /৪১৮
এক মহিলার তাওবা /৪১৯
আল্লাহর আনুগত্যের পুরস্কার /৪১৯

রাগ ও তার চিকিৎসা৪২৪
তরবিয়তের প্রয়োজনীয়তা /৪২৪
মানুষের তিনটি পাত্র /৪২৫
প্রেরণার পাত্র /৪২৫

চিন্তার পাত্র /৪২৫
ভাবনার ট্রাফিক /৪২৬
কোন ধরনের চিন্তার জন্য ধরপাকড় হয়? /৪২৭
ঈমানের আলামত /৪২৭
প্রবৃত্তির পাত্র /৪২৮
বাতেনি ইসলাহের দুটি তরিকা /৪২৮
চিশতিয়া ও নকশবন্দী তরিকার মৌলিক পার্থক্য /৪২৮
আম্বিয়ায়ে কেরামের মেহনতের ময়দান /৪২৯
তিন পাত্র এবং তিন নেয়ামত /৪৩০
প্রবৃত্তি ও রাগ নিয়ন্ত্রণে মাশায়েখদের অবদান ৪৩১
জনৈক সাহাবীর বাতেনি ইসলাহের ঘটনা /৪৩৩
ফয়েজ স্থানান্তর /৪৩৪
নফসের 'ধোপি-আছাড়' (নিষ্ঠুর আচরণ) থেকে বাঁচুন /৪৩৬
শায়েখদের মূলনীতি /৪৩৬
বাদশা আওরঙ্গজেব আলমগীর (রহ.)-এর ঈমানি দূরদর্শিতা /৪৩৬
'রাগ'শীর্ষক আলোচনা /৪৩৭
রাগ করার কুফল বনাম রাগ দমনের সুফল /৪৩৭
রাগের সময় নবীজির অবস্থা /৪৩৯
আল্লাহর ওলীদের রাগ /৪৩৯
দোজখে যাওয়ার কারণ /৪৪০
দুর্বলতার লক্ষণ /৪৪০
উত্তম মানুষ কে? /৪৪১
হযরত মুরশিদে আলম ও আল্লাহভীতি /৪৪১
প্রতিশোধস্পৃহা /৪৪২
নবীজির ক্ষমা ও দয়া /৪৪২
মাফ করার মাঝেই সম্মান নিহিত /৪৪৬
সবচেয়ে জঘন্য লোক /৪৪৭
হযরত ইমাম হুসাইন (রাযি.)-এর ক্ষমা /৪৪৮
ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ.)-এর ক্ষমা /৪৪৮
ইমাম আজম আবুহানিফা (রহ.)-এর হিংসুকরা ৪৪৯
ইমাম আজম (রহ.)-এর ধৈর্য /৪৪৯
হযরত থানবী (রহ.)-এর ধৈর্য /৪৫০
আল্লাহর ওয়াস্তে ছাত্রকে শাস্তি প্রদান /৪৫০
ছাত্রকে মারার শরয়ী হুকুম /৪৫১

ক্ষমার ফযিলত /৪৫২
হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ক্ষমা /৪৫২
হাউজে কাউছার থেকে বঞ্চিত /৪৫৩
বিশ্বের চারদিকে উত্তম চরিত্রের ঘোষণা /৪৫৩
হযরত আয়েশা (রাযি.)কে নবীজির দরদমাখা উপদেশ /৪৫৩
জান্নাতে যাওয়ার আমল /৪৫৪
এক অফিসারের শিক্ষণীয় ঘটনা /৪৫৪
হযরত যুননূন মিসরী (রহ.)-এর মায়াভরা দু'আ /৪৫৬
হযরত ইবরাহীম আদহামের ক্ষমা /৪৫৬
দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ /৪৫৭
নকশবন্দী সিলসিলার বরকতে রাগ খতম /৪৫৮
রাগ দমনের টিপ্‌স /৪৫৯

দু'আ কবুলের রাতসমূহ /৪৬২
রজব, শাবান ও রমযানের ফযিলত/৪৬২
রহমতের সূচনা /৪৬৩
বাজেট পেশের রাত /৩৬৪
১৫ শাবানের দিন /৪৬৪
দু'আ কবুল হওয়ার কারণ /৪৬৫
আপাদমস্তক ভিক্ষুকবেশে দু'আ চাওয়া /৪৬৬
চাইলে আল্লাহ খুশি হন /৪৬৭
কল্যাণের ইচ্ছা /৪৬৮
সম্মিলিতভাবে দু'আ করার ফযিলত /৪৬৯
তিন বস্তু অপর তিন বস্তুর মধ্যে /৪৭০
এত মানুষের ক্ষমা! /৪৭১
ক্ষমার ঘোষণা /৪৭১
শবে বরাতে নবুওয়াত প্রদান /৪৭২
ঝুলন্ত ভাগ্য ও চূড়ান্ত ভাগ্য /৪৭২
দুই শ্রেণীর লোক বঞ্চিত /৪৭৫
সুধারণা রেখে দু'আ করা /৪৭৬
দু'আ কবুলের ঘটনাসমূহ /৪৭৭
দয়ার আপীল /৪৭৮
ইস্তেগফার ও রবওয়ালা গুণ /৪৭৯
গুনাহ মাফ করানোর সূবর্ণ সুযোগ /৪৮০

খুতুবাতে যুলফিকার

নবম খণ্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

দুনিয়া বর্জনের স্বরূপ

[১৪২২ হিজরীর ২২ রমযান মোতাবেক ২০০১ সালের ৭ই ডিসেম্বর মসজিদে নূর লুসাকায় (জাম্বিয়া) এ বয়ান হয়। এতে অসংখ্যা ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।]

'ধন-সম্পদ পানির মতো। নৌকা চলাচলের জন্য পানি জরুরি। তবে নৌকা তখনই চলবে, যখন পানি নৌকার তলে থাকবে। পানি যদি তলে থাকার পরিবর্তে নৌকার মধ্যে চলে আসে, তখন এই পানিই তার ডোবার কারণ হয়ে যাবে।

এর থেকে জানা গেল, হে মুমিন! তোমার ধন-সম্পদ পানির মতো আর তুমি নৌকার মতো। যদি ধন-সম্পদ তোমার অধীনে থাকে, তবে তা তোমার জীবন পাড়ি দেওয়ার (সফলতার) অনেক বড় অবলম্বন হবে। আর যদি ধন-সম্পদ তোমার দিলের মধ্যে চলে আসে, তাহলে তখন এই ধন-সম্পদই পতনের কারণ হবে।

সারকথা হলো, অর্থ-কড়ি পকেটে থাকলে তা বড় খাদেম আর যদি তা অন্তরে ঢুকে যায়, তাহলে তা বড়ই মন্দ মনিব।'

দুনিয়া বর্জনের স্বরূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَنْ أَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا۔

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّا عَقْلَ لَهُ. اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

দুনিয়াদারদের জন্য 'জনাব' শব্দের উপহার

উর্দূ ভাষার কিছু-কিছু শব্দ এমন যে, তার প্রতিটি অক্ষরই অর্থবোধক। যেমন 'জনাব'- (جناب) শব্দটি। একস্থানে ইংরেজি পড়ুয়া কতক লোক ছিল। তারা মাদরাসার ছাত্রদের খুব জ্বালাতন করত। তারা মাদরাসার শিক্ষার্থীদের কুরবানির ভেড়া বলত। কখনও অন্য কিছুও বলত। মোটকথা, তারা ছাত্রদের বিভিন্নভাবে উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। মাদরাসার ছাত্ররা একবার সবাই বসে সিদ্ধান্ত নিল, তারা এই ইংরেজী পড়ুয়াদের জন্য এমন একটি শব্দ বানাবে, যার মধ্যে তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য চলে আসবে। তারা প্রথমে চিন্তা করল তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী-কী?

একজন বলল, তারা জাহেল তথা মূর্খ হয়।

আরেকজন বলল, তারা খুবই নালায়েক বা অযোগ্য হয়।

আরেকজন বলল, তারা খুবই আহমক হয়।

চতুর্থজন বলল, তারা সাধারণত বেকুফ হয়।

তারপর তারা বলল, যেহেতু তাদের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাই এসো, আমরা এই চার শব্দের প্রত্যেকটির প্রথম অক্ষর নিয়ে একটি নতুন শব্দ বানাব। তারা নতুন শব্দ গঠন করল 'জনাব'- جناب।

ج দ্বারা জাহেল।

ن দ্বারা নালায়েক।

ا দ্বারা আহমক এবং

ب দ্বারা বেকুফ।

তারপর থেকে মাদরাসার ছাত্ররা প্রত্যেক ইংরেজী পড়ুয়া ছাত্রদের 'জনাব'- جناب বলা শুরু করল। এভাবে বলতে-বলতে শব্দটি এতই প্রচার লাভ করল যে, বর্তমানে কেউ জানেই না শব্দটি কীভাবে তৈরি হয়েছিল? এখন ভদ্র ব্যক্তিবর্গ একে অপরকে 'জনাব' বলেই সম্বোধন করেন। চলতি সমাজে 'জনাব' শব্দটি মহামান্য অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন 'হযরত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে 'জনাব' ও 'হযরত' উভয় শব্দ সম্মানজনক সম্বোধনের অংশ হয়ে গেছে।

'দুশমন' শব্দের গঠন

যেমনিভাবে 'জনাব' শব্দের প্রতিটি অক্ষর অর্থবহ, তেমনি 'দুশমন'- (دشمن) শব্দেরও প্রতিটি অক্ষর অর্থবোধক। 'জনাব' শব্দটি ছাত্ররা দুষ্টুমি করে বানিয়েছে। কিন্তু দুশমন (دشمن) শব্দটি আল্লাহ তা'আলা নেক নিয়তে বানিয়েছেন। দুশমন শব্দের অক্ষর যেমন চারটি, তেমনি মানুষের দুশমনও চারটা।

د দ্বারা দুনিয়া।

ش দ্বারা শয়তান।

م দ্বারা মাখলুকের মহব্বত।

ن দ্বারা নফ্‌স।

আজকের মাহফিলে এই চার দুশমনের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে। কারণ, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার দুশমন সম্পর্কে না জানবে, ততক্ষণ তার আক্রমণ হতে রক্ষা পাবে না। দুশমন তাকে ধ্বংস করে দিবে। কেননা, বন্ধুরূপে শত্রুতাকারীর লোকসংখ্যা অনেক। যেহেতু দুনিয়া, শয়তান, মাখলুক

ও নফ্‌স মানুষের আখেরাতের দুশমন। তাই এই দুশমন বেশি বড় ও বিপজ্জনক।

আজকের আলোচনার শিরোনাম হলো 'দুনিয়া'। অর্থাৎ দুনিয়ার স্বাদ বর্জন। দুনিয়ার স্বাদ আমাদের পেছনে এমনভাবে লেগে আছে যে, তা আল্লাহর স্মরণ থেকে আমাদের গাফেল করে দেয়। মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে ভুলে যায়, আমি কী এবং কী নই।

ইমাম গাযযালির মতে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত

ইমাম গাযযালি (রহ.) দুনিয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, একলোক পথ চলছিল। একটা বাঘ তার পিছু নিল। লোকটির আশেপাশে কোনো গাছ ছিল না যে, তাতে উঠে যাবে। ইত্যবসরে একটা কূপ তার নজরে পড়ল। লোকটি চিন্তা করল, আমি কূপে লাফিয়ে পড়ব। যখন বাঘ চলে যাবে, তখন আমি কূপ থেকে বেরিয়ে আসব। এই ভেবে লোকটি যখন কূপে লাফ দিতে গেল, তখন দেখল, কূপের পানির উপর একটা সাপ সাঁতরাচ্ছে।

এবার লোকটি পড়ল উভয় সংকটে। পেছনে বাঘ আর নিচে কূপে সাপ। লোকটি আরও বিমর্ষ হয়ে চিন্তা করতে থাকল, এ মুহূর্তে আমার করণীয় কী? এ সময়ে কূপের দেওয়ালের কিছু ঘাসের উপর তার দৃষ্টি পড়ল। লোকটি চিন্তা করল, এই ঘাস আঁকড়ে ধরে যদি ঝুলে থাকি, তাহলে যখন বাঘ চলে যাবে, তখন আমি বেরিয়ে আসব। সত্যই সে ঘাস ধরে ঝুলে পড়ল। পরে তার নজরে পড়ল, একটা কালো ইঁদুর, একটা সাদা ইঁদুর উভয়ে মিলে ওই ঘাস কাটছে, যে ঘাস ধরে সে কূপের মধ্যে ঝুলে রয়েছে। এতে তার পেরেশানি আরও বেড়ে গেল। পেরেশান অবস্থায় যখন সে এদিক-ওদিক তাকাল, তখন নিকটেই মৌমাছির একটা চাক সে দেখতে পেল। মৌচাকে মৌমাছি না থাকলেও তা মধুতে ভরপুর ছিল। এই মৌচাক দেখে তার মন চাইল, একটু দেখি তো তার মধু কেমন? লোকটি এক হাতে ঘাস আঁকড়ে ধরল আর অপর হাতের আঙুলে মধু নিয়ে যখন তার স্বাদ আস্বাদন করল, তখন স্বাদ বড়ই মজাদার বলে মনে হলো। যখন লোকটি মজা করে মধু চাটতে থাকল, তখন তার না বাঘের কথা মনে থাকল, না কালনাগিনীর কথা মনে থাকল, না ইঁদুরের কথা মনে থাকল। এখন চিন্তা করুন, এই লোকের পরিণতি কেমন হবে?

এই দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর ইমাম গাযযালি (রহ.) বলেন–

হে বন্ধু! তোমার দৃষ্টান্ত হলো ওই মানুষের মতো। মৃত্যুর ফেরেশতা বাঘের মতো তোমার পিছু লেগে আছে। কবরের আযাব ওই সাপের আকৃতিতে তোমার আগমনের অপেক্ষায় আছে। কালো ও সাদা ইঁদুর হলো তোমার জীবনের দিন-রাত। ঘাস হলো তোমার জীবন, যা ইঁদুর কেটে ফিরছে। আর মৌচাক হলো, দুনিয়ার স্বাদ, যা হতে মজা লুটতে এবং উপভোগ করতে তুমি মগ্ন রয়েছ। তোমার এ চিন্তা ও স্মরণ নেই যে, তোমার পরিণাম কী হবে।

বাস্তব কথা এটাই যে, মানুষ দুনিয়ার স্বাদ ও মজায় মোহগ্রস্ত হয়ে স্বীয় প্রভুকে নারাজ করে থাকে। কেউ খানাপিনার স্বাদে ডুবে আছে। কেউ উচ্চ পদমর্যাদা ও সুনাম-সুখ্যাতির মজায় বিভোর রয়েছে। এই স্বাদ-মজা-ই মানুষকে তার আখেরাতের স্মরণ থেকে বিমুখ করে দেয়। এ কারণে যেখানে দুনিয়া বর্জনের কথা আসবে, সেখানে উদ্দেশ্য হবে, দুনিয়ার স্বাদ-মজা বর্জন করা।

উম্মতে মুহাম্মদীর গরীবদের মর্যাদা

আমাদের মাশায়েখগণ দুনিয়ার ব্যাপারে বিস্ময়কর ভাববোধক কথা বলেছেন–

حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا وَبَالٌ

'দুনিয়ার সম্পদ যদি হালাল হয়, তাহলে তার হিসাব দিতে হবে। আর যদি তা হারাম হয়, তাহলে তা মানুষের ভোগান্তির কারণ হবে।'

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

'আমার উম্মতের গরীব লোকেরা ধনীদের ৫০০ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

কেননা, এই গরীব বেচারারা দুনিয়া পেয়েছে কম। তারা এই স্বল্প রিযিকেই তুষ্ট থেকেছে এবং তার উপর সবর করেছে। পক্ষান্তরে ধনীরা বিপুল সম্পদ যেমন পেয়েছে, তেমনি মনমতো পানাহার করেছে।

স্মরণ রাখবেন, আখেরাতের একটি দিন দুনিয়ার ৭০ হাজার বছরের সমান হবে। কোনো-কোনো বর্ণনায় এসেছে, ৫০ হাজার বছরের সমান হবে। সুতরাং যদি এক দিন হয় ৫০ হাজার বছরেরও সমান এবং গরীবরা ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে যায়, তাহলে তখন ধনীরা এই আকাঙ্ক্ষা করবে যে,

হায় যদি আমরা দুনিয়াতে ফকীর হতাম, তাহলে তো فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ এই সুসংবাদ আমরাও লাভ করতাম।

দুনিয়া ও আখেরাতে আরাম-আয়েশ

অনেক সময় ধন-সম্পদের কারণে মানুষের মধ্যে অহমিকা চলে আসে। মানুষের কথার মধ্যে ধন-সম্পদের ঝংকার বেজে ওঠে। কতক ধনী লোক তো রীতিমত ফেরাউন হয়ে যায় এবং তারা খোদার ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। এর বিপরীতে কোনো লোক যদি ধনী হওয়া সত্ত্বেও বিনয়ী হয় এবং সে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নেককার হয়, তাহলে সে গরীবদের থেকেও বেশি ফযিলত পেয়ে যাবে। এজন্যই বলা হয়েছে, কতক লোক এমন হবেন, যারা দুনিয়াতে নরম-কোমল শয্যায় আরাম করবেন এবং আখেরাতেও আল্লাহ তাদের জান্নাতী শয্যা দান করবেন।

মদীনার গরীবদের পেরেশানি

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মদীনার গরীবরা এল। মদীনার গরীব দ্বারা উদ্দেশ্য আসহাবে সুফফা, যাদের কারো শরীরে পূর্ণ পোশাক থাকত, কারও থাকত না। শুধু সতর ঢাকে এটুকু কাপড় থাকত। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা একে অপরের আড়ালে বসা থাকতাম, যাতে আমাদের নগ্ন দেহ নবীজির চোখে না পড়ে।

এই গরীব সাহাবীগণ নবীজির খেদমতে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাদের যে অবস্থায় রেখেছেন, তাতেই আমরা খুশী। তবে আমাদের চিন্তা হলো, ধনী সাহাবীগণ আমাদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন। কেননা, তারা আর্থিক ইবাদাত করতে পারেন; কিন্তু আমরা তা পারি না। তাই আমাদের কাম্য হলো, আমরাও আখেরাতের পানে এগিয়ে যেতে চাই এবং ধনীদের থেকে আগে বেড়ে যেতে ইচ্ছুক। সেজন্য আমাদের এমন কোনো আমল বাতলে দিন, যার দ্বারা আমরা ধনীদের পিছে ফেলে সামনে চলে যেতে পারব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা নামায শেষে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে। এটি নিয়মিত পড়লে আল্লাহ আখেরাতে তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

গরীব সাহাবীগণ আখেরাতের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যবস্থাপনা পেয়ে দারুণ খুশি হলেন। তারপর থেকে প্রতি নামাযের পর গোপনে-গোপনে ৩৩ বার

সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার-এর আমল করতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা যেসব ধনী সাহাবীকে স্বচ্ছলতা প্রদান করেছিলেন, তাঁরাও অসম্ভব আল্লাহমুখী ছিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন, গরীব সাহাবীদের কেউ এদিকে কেউ ওদিকে বসে কী যেন গুণে-গুণে পড়ছেন, তখন তারা চিন্তা করলেন, ব্যাপারটা কী? খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, নবীজি তাদেরকে আখেরাতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য একটি আমল শিক্ষা দিয়েছেন, যা তারা লুকিয়ে-লুকিয়ে পালন করছে। তারপর ধনী সাহাবীগণও ওই আমল শুরু করে দিলেন।

যখন গরীব সাহাবীরা জানতে পারলেন, ধনী সাহাবীগণও তাদের মতো আমল করা শুরু করে দিয়েছেন, তখন তারা আবার চিন্তায় পড়ে যান। তারা ভাবতে থাকেন, এই ধনী শ্রেণী হতে কীভাবে আগে যাওয়া যায়? সুতরাং তারা আবার নবীজির কাছে এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পরকালীন উচ্চ মর্যাদা লাভের যে ব্যাবস্থাপনা আমাদের দিয়েছিলেন, তা এখন ধনী সাহাবাও করতে শুরু করেছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

'এটি আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা প্রদান করেন।'[১]

অর্থাৎ সওয়াবের সাথে-সাথে আল্লাহ যদি কারো রুজিও বাড়িয়ে দেন, তবে তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ বলে বিবেচিত করতে হবে।

পক্ষান্তরে ধন-সম্পদ যদি দুনিয়াদারি, অহংকার, সুখ্যাতি ও লৌকিকতার কারণ হয়, তবে তা মানুষের জন্য বড়ই 'ভোগান্তি'। সেজন্য এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা অতীব জরুরি, যাতে মানুষ বাড়াবাড়ি-ছাড়াছড়ি হতে বেঁচে থাকতে পারে।

সমস্ত পাপের মূল

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

'দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত পাপের মূল।'

---

১. সূরা জুমু'আ : আয়াত ৪

আমাদের বড়রা এই হাদীছের মর্মার্থ বোঝাতে হাদীছকে সামনে রেখে কয়েকটি শব্দ সংযোজন করেছেন। তাঁরা এভাবে বলেন,

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ وَتَرْكُهَا مِفْتَاحُ كُلِّ فَضِيْلَةٍ

'দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত পাপের মূল আর তা বর্জন করা সমস্ত ফযিলতের (লাভের) চাবি।'

দুনিয়া বর্জনের অর্থ ও উদ্দেশ্য

দুনিয়া বর্জনের অর্থ এ নয় যে, স্ত্রী-সন্তান-পিতামাতাকে ফেলে রেখে কোনো জঙ্গলে গিয় জায়নামায বিছিয়ে ইবাদাতে লেগে যাও। কেননা, হাদীছে এসেছে–

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ

'ইসলামে কোনো বৈরাগ্য নেই।'

বনী ইসরাঈল যে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিল, তার ব্যাপারে কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْنَهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ

'বৈরাগ্যবাদকে তারা নতুনভাবে আবিষ্কার করে নিয়েছিল। আমি তা তাদের প্রতি ফরজ করিনি।'[১]

সারকথা হলো, ইহুদীরা নিজেদের মর্জিমতো বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এটা করার নির্দেশ দেননি।

এ আয়াত থেকে জানা যায়, বৈরাগ্যবাদকে 'দুনিয়া বর্জন' বলে না; বরং তা কামচোরদের কাজ। মূলত কোনো কাজ করতে তাদের মন চায় না তাই বলে, আমরা আল্লাহনির্ভর হয়ে জীবন যাপন করছি।

দুনিয়া বর্জনের প্রকৃত মর্ম হলো, মানুষ দুনিয়ার স্বাদ-মজাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং বিশ্বাস করবে, স্বাদ-মজা উপভোগের জায়গা হলো আখেরাত। যেলোক দুনিয়াকে প্রয়োজন অনুপাতে ব্যবহার করে, সে সফলকাম হয়। আর যারা দুনিয়ার মজা ও মোহে বিমোহিত হয়, তারা ধ্বংস হয়। তাই মানুষ দুনিয়ায় থাকবে ঠিকই; কিন্তু দুনিয়ার পাগল হবে না।

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ২৭

সে চিন্তা করবে–

دنیا میں ہوں دنیا کا طلب گار نہیں ہوں

بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

দুনিয়াতে থাকব ঠিকই
কিন্তু হব না দুনিয়ার,
বাজারেতে ঘুরব যদিও
হবে না ভাই খরিদ্দার।

মানুষ বাজারে-মার্কেটে গেলেও তার মনটা সবসময় থাকে বাড়ির দিকে যে, কখন কেনাকাটা শেষ হবে আর বাড়ি ফিরে যাব। পথে অনেক ট্রাফিক থাকে; কিন্তু সে তার দিকে মন দেয় না। সে দ্রুত পথ অতিক্রম করে। এমনিভাবে যখন আমরা বাজারে যাই, তখন সেখানে বিভিন্ন ধরনের চেহারা নজরে আসে। চোখ বিভিন্ন জিনিসের দিকে আটকে যায়, সেগুলোও শয়তানের পাতা ফাঁদ। এসব ফাঁদ ও জাল থেকে আমাদের বাঁচতে হবে।

দুনিয়ার স্বাদ-মজা বর্জনের উদ্দেশ্য এ নয় যে, মানুষ ভালো-ভালো খাদ্য ছেড়ে দিবে; বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে যে রিযিক মিলবে, তা গ্রহণ করতে হবে; কিন্তু অন্তরে মাল-সম্পদ অর্জনের মোহ থাকবে না। দুনিয়ায় রিযিক হিসেবে যা পাবে, তাকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে ব্যবহার করবে ও উপকৃত হবে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলতেন–

'আমরা আমাদের আকাবিরদের থেকে এই জ্ঞানপূর্ণ শিক্ষা অর্জন করেছি দুনিয়া বর্জনের মাধ্যমে – তাসবীহাতের মাধ্যমে নয়।'

এক বাচ্চার আমলি নসিহত

এক বুযুর্গের খেদমতে জনৈক লোক তার ছেলেকে নিয়ে এসে নিবেদন করল, হযরত! এর জন্য একটু দু'আ করুন। এটি একটি ভালো অভ্যাস। পূর্বের যুগেও মানুষ আল্লাহওয়ালাদের দ্বারা সন্তানদের জন্য দু'আ করাত। আল্লাহ তাওফীক দিন, যেন আল্লাহওয়ালাদের দু'আ আমাদের জন্য কুবল হয়। তবে এটা ভিন্ন কথা যে, কোনো-কোনো মানুষ তার সন্তানকে বারবার দু'আ করার জন্য নিয়ে আসে; কিন্তু পিতার অবস্থা এমন হয় যে, আগে তার জন্য দু'আ করতে মন চায় যে, আল্লাহ যেন আগে তাকে হেদায়েত দিন।

যাহোক বুযুর্গ বাচ্চার জন্য দু'আ করে দিলেন। বাচ্চাদের প্রতি মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা থাকে। এই সুবাদে বুযুর্গও বাচ্চার প্রতি মহব্বত প্রকাশ করেন। বুযুর্গের পকেটে কোনো মিষ্টান্নদ্রব্য ছিল। বুযুর্গ তা বের করে বাচ্চাকে দিতে চাইলেন। বুযুর্গ যখন মিষ্টান্ন বের করে বাচ্চার দিকে এগিয়ে দিলেন, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং তার পিতার মুখের দিকে তাকাল। অথচ শৈশবে মিষ্টি জাতীয় বস্তুর প্রতি বাচ্চাদের আগ্রহ থাকে বেশি। বুযুর্গ এবার পিতার দিকে তাকালেন। পিতা বলল, বাবা! হযরত দিচ্ছেন, গ্রহণ করো। পিতার অনুমতি পেয়ে বাচ্চা এবার হাত বাড়াল এবং মিষ্টান্নটি গ্রহণ করে নিল।

বাচ্চা বুযুর্গের হাত থেকে মিষ্টান্ন নিলে বুযুর্গের চোখে পানি চলে এল। বাচ্চার পিতা বুযুর্গের চোখে পানি দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি কাঁদছেন কেন? বুযুর্গ বললেন, আমার থেকে এই বাচ্চা অনেক ভালো। কারণ, আমি তাকে এমন জিনিস দিতে গেছি, যার প্রতি তার আকর্ষণ প্রচণ্ড, কিন্তু তারপরও সে ওই বস্তুর দিকে তাকায়নি; বরং আপনার দিকে তাকিয়েছে পিতা এ ব্যাপারে কী বলেন জানার জন্য।

হায়! যদি আমরা বাজারে-রাস্তায় চলার সময় এভাবে আমাদের চোখগুলো ফিরিয়ে নিতাম! কোনো বস্তুর প্রতি নজর দেওয়ার আগে যদি চিনে নিতাম, এই নজরের ব্যাপারে আল্লাহ কী বলেন! বাচ্চা মিষ্টান্নের প্রতি চোখ দেওয়ার পূর্বে যেমন তার পিতার দিকে তাকিয়েছে অনুমতি আছে কিনা জানতে, ঠিক তেমনি আমাদেরও কর্তব্য হলো, কোনো বস্তুর প্রতি নজর দেওয়ার আগে এটা জানা যে, এর প্রতি নজর দেওয়ার অনুমতি আল্লাহর পক্ষ্য হতে আছে কি-না!

ভয়ঙ্কর জাদুকর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلدُّنْيَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ كَانَ سِحْرُ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ وَهٰذِهِ السَّارَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهٖ.

'দুনিয়া হারুত-মারুত হতে বড় জাদুকর। হারুত-মারুতের জাদু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করত। পক্ষান্তরে দুনিয়া এমন জাদুকর যে, সে বান্দা ও তার মনিবের মধ্যকার সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে।'

হারুত ও মারুত দুজন ফেরেশতা। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মানুষের পরীক্ষার জন্য জাদুবিদ্যা দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। কিন্তু মানুষকে তাদের জাদু শিখাতে এবং তা ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন। এ কারণে যে কেউ তাদের কাছে জাদুবিদ্যা শিখতে এলে তারা বলে দিতেন, এটা ক্ষতিকর। কিন্তু মানুষ তারপরও শিখত এবং তার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া হারুত-মারুত অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর ও ভয়ঙ্কর জাদুকর। কেননা, দুনিয়া বান্দা ও তার মনিবের মাঝে সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি করে এবং মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এক কবি অতি চমৎকার বলেছেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ اِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ

وَلَيْسَ لِلّٰهِ اِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ

'তুমি দুনিয়ার যেকোনো জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন হও না কেন তার বিকল্প আছে। কিন্তু যদি তুমি আল্লাহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও, তাহলে তোমার জন্য কোনোই বিকল্প নেই।'

একটি শিক্ষণীয় উপদেশ

হযরত সালমান ফার্সী (রাযি.) একজন মর্যাদাবান সাহাবী। আমাদের মহান নকশাবন্দিয়া সিলসিলার মধ্যে হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর পরেই তাঁর নাম আসে। তিনি অগ্নিপূজকের সন্তান ছিলেন। তিনি কয়েকজন ধর্মগুরুর হাত ঘুরে পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হন। নবীজি তাঁকে আসহাবে সুফ্ফার দায়িত্বশীল বানান। নবীজি তাঁকে এত মহব্বত করতেন যে, একবার তাঁর ব্যাপারে নবীজি বলেন,

سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ

'সালমান আমার পরিবারের লোক।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর যখন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন, তখন হযরত সালমান ফার্সী (রাযি.)কে হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.)-এর ভাই বানালেন। এই দুই ভাই একে অপরকে নিজের ইতিহাস শোনাতেন। হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.) পরে বায়তুল মাকদিস চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করেন।

সেখান থেকে তিনি হযরত সালমান ফার্সী (রাযি.)-এর উদ্দেশ একটি পত্র পাঠান। সেই পত্রে তিনি লিখেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَنِىْ فِى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسِ وَاَتَانِىَ اللّٰهُ مَالاً وَّ اَوْلاَدًا.

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাকে পবিত্র ভূমিতে অবস্থানের তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও অনেক প্রদান করেছেন।'

হযরত সালমান ফার্সী (রাযি.) পত্র পড়ে জবাবি পত্র লিখেন এভাবে–

فَاعْلَمْ يَا اَبَا الدَّرْدَا اِنَّ الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَ لاَتُقَدِّسُ الْاِنْسَانَ وَلٰكِنْ تَقَدَّسَ الْاِنْسَانُ بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالْاَخْلاَقِ الْفَاضِلَةِ فَلَيْتَ اَعْطَاكَ اللّٰهُ بَدْلَ الْمَالِ عِلْمًا نَافِعًا وَبَدْلَ الْاَوْلاَدِ عَمَلاً صَالِحًا.

'হে আবুদ্দারদা! আপনি জেনে রাখুন, পবিত্র ভূমির কারণে মানুষ কখনও পবিত্র হয় না; বরং মানুষ পবিত্র হয় নেক আমল উত্তম চরিত্র দ্বারা। আল্লাহ যদি আপনাকে সম্পদের বদলে উপকারী ইল্‌ম দান করতেন সন্তান না দিয়ে নেক আমল করার তাওফীক দিতেন!'

এ ঘটনা হতে আপনি অনুমান করুন, সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি কীসের উপর থাকত। তারা দুনিয়াবি ধন-সম্পদ ও বস্তুর প্রতি তাকাতেন না; বরং সর্বদা তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত একমাত্র আখেরাতের প্রতি।

ইহকালীন ও পরকালীন বিবেক

আল্লাহওয়ালাদের মতে বিবেক দুই প্রকার। যথা–

(১) ইহকালীন বিবেক।

(২) পরকালীন বিবেক।

ইহকালীন বিবেক, যা দুনিয়াবি বিষয় শুধু চিন্তা করে। আপনি দেখবেন, কতক লোক এমন আসে, যারা দুনিয়াবি ব্যাপারে খুব পটু হয়; কিন্তু দ্বীনি বিষয় এলে বলে, এটা তো আমাদের মাথায় আসছে না, আমাদের বুঝে আসছে না।

এর বিপরীতে পরকালীন বিবেক বলা হয়, যে বিবেক প্রত্যেক কাজে আখেরাতের প্রতি ঝুঁকে থাকে। হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম দুনিয়াতে পরকালীন বিবেক নিয়ে আগমন করেছেন। তারপর তাদের বদৌলতে

ঈমানদারদেরও পরকালীন বিবেক নসিব হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনাকে আখেরাতের দৃষ্টি দিয়ে দেখেন। একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

ভালো সংশ্রবের পুরস্কার

একলোক কমলা বিক্রি করছিল এবং এভাবে আওয়াজ দিচ্ছিল–

چنگے سنگرے چنگے سنگرے

'ভালো কমলা, ভালো কমলা।'

এক বুযুর্গ ওই লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বুযুর্গের কানে কমলা বিক্রেতার আওয়াজ গেলে তাঁর মধ্যে এক আজব অবস্থা ও ভাব সৃষ্টি হলো এবং উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ-আল্লাহ বলতে লাগল। পরে যখন তাঁর হুশ ফিরে এল, তখন একব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! ঘটনা কী? বুযুর্গ বললেন, শুনছ না ও কী বলছে? বলল, হযরত! সে তো কমলা বিক্রি করছে এবং গ্রাহক আকৃষ্ট করতে বলছে–

چنگے سنگرے چنگے سنگرے

'ভালো কমলা, ভালো কমলা।'

বুযুর্গ বললেন, তুমি বোঝনি, সে কী বলছে। সে মূলত বলছে–

چنگے سنگ ترے

'ভালো সংশ্রবপ্রাপ্ত সফল।'

অর্থাৎ, যেব্যক্তি নেককারদের সাহচর্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছে, তার জীবনতরি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে।

এখান থেকে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষণীয় যে, দুনিয়াদার দুনিয়া নিয়ে চিন্তা করেছে; কিন্তু আল্লাহওয়ালা ওই একই কথা থেকে আখেরাত চিন্তা করেছেন। এ কারণেই আল্লাহওয়ালারা দুনিয়ায় থাকলেও দুনিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না। কারণ, তাদের কাছে দুনিয়ার ধোঁকা-প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে যায়।

সাপের মন্ত্র

যারা সাপের মন্ত্র জানে, তারা সাপ ধরে ফেলে; কিন্তু সাপ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আমি নিজে এমনটা প্রত্যক্ষ্য করেছি। আমার একজন পরিচিত লোক ছিল; আমার কাছাকাছিই একজাগায় থাকত। সাপ ধরার

বিদ্যা তার জানা ছিল। আল্লাহর শান যে, সে এক-এক মিটার কালো সাপ ধরে নিয়ে আসত।

একবার একটা সাপ রাস্তায় ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। লোকটি তার এক বন্ধুর সঙ্গে সাপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বন্ধু তাকে বলল, দেখো; একটা সাপ পড়ে আছে। লোকটি বলল, ঘুমন্ত সাপ ধরে লাভ কী! একথা বলে সে সাপটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলল। সাপ যখন পালাতে শুরু করল, তখন গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। তার বন্ধু বলল, তুমি তো সাপ ধরেছ; কিন্তু আমরা কিন্তু সাইকেল চালাতে বের হয়েছিলাম। লোকটি বলল, ঠিক আছে, চলো। তারপর সে জীবিত সাপটা তার পকেটে চালান করে দিল। পরে জীবিত সাপ পকেটে রেখে সে দিব্যি সাইকেল চালাতে থাকল। এ থেকে জানা যায়, যারা সাপের মন্ত্র জানে, সাপ তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

দুনিয়ার মন্ত্র

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে থেকে দুনিয়ার মন্ত্র শিক্ষা করেছিলেন। ফলে তাঁরা দুনিয়াতে থাকলেও দুনিয়া তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। আমাদেরও কর্তব্য হলো, আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে থেকে দুনিয়ার মন্ত্র শিখে নেওয়া। তাহলে আমরা দুনিয়ায় থাকলে দুনিয়া আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।

হযরত আলী (রাযি.) প্রায়ই মেহরাবে দাঁড়িয়ে বলতেন–

يَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّيْ

'হে স্বর্ণ! হে রৌপ্য! আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ধোঁকা দাও।'

অর্থাৎ আমি তোমার ধোঁকার জালে আটকাব না।

হযরত শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) একটি আজব কথা লিখেছেন। তিনি বলেন–

'সাধারণত মুসলমানরা মনে করে, সাহাবায়ে কেরামের সর্বোচ্চ কারামত হলো, হযরত সাদ বিন ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর বাহিনীর সমুদ্রের পানির উপর দিয়ে নিরাপদে পার হয়ে যাওয়া। তবে ওলামায়ে কেরামের মতে সাহাবায়ে কেরামের সব চেয়ে বড় কারিশমা হলো, তাঁদের সামনে বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হলে দুনিয়ার সমুদ্র তাঁদের সামনে দিয়ে প্রবাহিত হয়; কিন্তু তাঁরা তাদের ঈমানকে দুনিয়ার সমুদ্র হতে বাঁচিয়ে নিরাপদ রেখেছেন। দুনিয়ার সমুদ্রে তাঁদের ঈমান না ডোবা-ই তাঁদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

হযরত উমর (রাযি.)-এর অন্তরে আখেরাতের ফিকির

আখেরাতের ফিকির হযরত উমর (রাযি.)-এর এত বেশি ছিল যে, একবার তিনি পান করার জন্য পানি চাইলেন। একজন তাকে পানির পরিবর্তে শরবত দিল। হযরত উমর (রাযি.) শরবত পান করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি কাঁদছেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, কুরআন শরীফের একটি আয়াত আমার মনে পড়ে গেছে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কিছু লোককে বলবেন–

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

'তোমরা দুনিয়ার স্বাদ-মজা দুনিয়াতেই নিয়ে নিয়েছ এবং তা ভোগ করেছ। ফলে আজ তোমাদের জন্য কোনো পাওনা নেই।'[১]

এখানে দেখার বিষয় হলো, আখেরাতের ফিকির হযরত উমর (রাযি.)-এর মধ্যে কেমন প্রবল ছিল যে, পানির পরিবর্তে শরবত পান করতেও তিনি ভয় পান যে, না জানি আখেরাতের প্রাপ্য তাঁকে দুনিয়াতেই দেওয়া হচ্ছে কিনা?

হযরত উমর (রাযি.)-এর দুনিয়াবিমুখতা

হযরত উমর (রাযি.)-এর সংসার চলত খুব টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে। একবার হযরত আলী (রাযি.) সহ কতিপয় সাহাবী মিলে পরামর্শ করলেন যে, বায়তুল মাল হতে আমীরুল মুমিনীনের মাসিক ভাতার পরিমাণ খুবই কম। তাঁর ভাতা বাড়ানো দরকার। সকলে মিলে ঠিক করলেন, এত বাড়াতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল, এ ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনকে জানাবে কে? কেউ এই দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন না। পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হলো, উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাযি.)কে আমাদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের কথা জানানো হোক। পরে তিনি তাঁর পিতাকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন। তাঁরা এই অনুরোধও জানান যে, পরামর্শদাতা হিসেবে আমাদের নাম আমীরুল মুমিনীনকে জানাবেন না।

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাযি.) একবার সুযোগ বুঝে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাযি.)কে জানান, আব্বাজান! কতিপয় সাহাবী ভেবেছেন, আপনার ভাতা বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। কেননা, আপনার সংসার

---

১. সূরা আহকাফ : আয়াত ২০

চলে কষ্টে। হযরত উমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, কে-কে এই পরামর্শ দিয়েছে। তিনি বললেন, আমি তাদের নাম বলব না। একথা শুনে হযরত উমর (রাযি.) বললেন, বললে আমি তাদের এমন শাস্তি দিতাম যে, তাদের শরীরে দাগ পড়ে যেত। কেননা, তারা আমাকে দুনিয়ার স্বাদে ঝুঁকিয়ে দিতে চায়। তিনি আরও বললেন, হাফসা! তুমি বলো তো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসার কীভাবে চলত?

হযরত হাফসা (রাযি.) জবাবে বললেন, আমার স্বামীর কাছে পরিধানের জন্য মাত্র এক জোড়া কাপড়ই ছিল। আরেকটি সেট ছিল গেরুয়া রংয়ের। তিনি সেটি কোনো প্রতিনিধিদল এলে কিংবা জুমআর দিন পরিধান করতেন। খেজুরের ছালভর্তি একটি বালিশ ছিল। একটি কম্বল ছিল, যা শীতকালে অর্ধেক দেহের নীচে বিছাতেন আর বাকি অর্ধেক গায়ে দিতেন। সেটি গরমকালে চার ভাগ করে নীচে বিছিয়ে দিতেন। আমার ঘরে কয়েক মাস যাবত চুলা জ্বলত না। আমি একদিন ঘিয়ের কৌটার নীচের অংশ দ্বারা রুটি বানালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজেও আগ্রহভরে খান এবং অন্যদেরও খাওয়ান।

হযরত হাফসা (রাযি.) এর মুখে নবীজীবনীর এই দাস্তান শুনে হযরত উমর (রাযি.) বললেন, হাফসা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি সাধারণভাবে জীবন-যাপন করেছেন। তাঁর পরে আমীরুল মুমিনীন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) সেভাবেই জীবন কাটিয়ে তাঁর বন্ধু নবীজির সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছেন। যদি আমিও তাঁদের মতো জীবন পার করতে পারি, তাহলে আশা করি, আমি তাঁদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতে পারব। পক্ষান্তরে আমার রাস্তা যদি বদলে যায়, তাহলে মনযিলও বদলে যাবে।

সুবহানাল্লাহ! তাঁদের বাস্তবতা পূর্ণরূপে অনুধাবন হয়ে গিয়েছিল যে, দুনিয়ার এই ক্ষুদ্র জীবন খুবই অস্থায়ী। এ কারণে তাঁরা একান্ত প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া অর্জন করে তুষ্ট থাকতেন এবং স্বাদ-মজা ভোগ সব আখেরাতের জন্য তুলে রাখতেন।

হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর দুনিয়াবিমুখতা

একবার হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর বিবির মনে বাসনা জাগল, তিনি ঘরে কোনো মিষ্টান্ন দ্রব্য তৈরি করবেন। হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর কাছে তিনি এর জন্য পয়সা চাইলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত আবুবকর (রাযি.) বললেন, আমার কাছে তো দেওয়ার মতো পয়সা নেই। স্বামীর কাছে পয়সা

চেয়ে না পেয়ে তিনি চিন্তা করতে থাকলেন, কী উপায়ে মিষ্টান্ন বানানো যায়। হঠাৎ তার মনে হলো, প্রতিদিন যে পয়সা তিনি ব্যয়ের জন্য পান, তা থেকে অল্প-অল্প বাঁচিয়ে তিনি অতি সহজেই মিষ্টান্ন বানাতে পারেন।

যা ভাবা তা-ই কাজ। অল্প-অল্প পয়সা জমিয়ে একদিন সত্যই তিনি মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুত করে ফেললেন। তিনি নিজেও তা মনভরে খেলেন এবং হযরত আবুবকর (রাযি.)কেও খেতে সামনে পেশ করেন। হযরত আবুবকর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, আগে বলো, তুমি পয়সা পেলে কোথায়? স্ত্রী বললেন, আপনি আমার প্রতিদিনের খরচের যে টাকা দেন, তা হতে অল্প-অল্প করে জমিয়ে আজ তা দিয়ে এটি বানিয়েছি। হযরত আবুবকর (রাযি.) বললেন, খুব ভালো কথা। তবে এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, সংসারের প্রয়োজনে যে খরচ তোমাকে দিয়ে থাকি, তা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। তারপর তিনি বায়তুল মাল হতে অতিরিক্ত পরিমাণ ভাতা কমিয়ে নেন।

হযরত উসমান (রাযি.)-এর দানশীলতা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সমস্ত সাহাবাকে ধন-দৌলত দিয়েছিলেন, তাঁরা তা মুক্তহস্তে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতেন, যাতে আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। হযরত উসমান (রাযি.)কে আল্লাহ তা'আলা অঢেল সম্পদ দান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে সম্পদের মোহ ছিল না। তিনি স্বীয় মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে কখনো কুণ্ঠিত হতেন না।

'বীরে রূমা' নামে একটি কূপ ছিল। কূপের মালিক ছিল এক ইহুদী। সে সময় মুসলমানদের মিষ্টি পানির ব্যবস্থা করা বড়ই কঠিন ছিল। মুসলমানরা ওই ইহুদীর কাছ থেকে পানি ক্রয় করতেন। এতে তাদের আর্থিক ক্ষতিসহ অনেক বিড়ম্বনা পোহাতে হত। হযরত উসমান গনী (রাযি.) যখন মুসলমানদের এই দুরবস্থা দেখলেন, তখন তিনি কূপের মালিক ইহুদীর কাছে গেলেন। তাকে বললেন, তোমার কূপটি বিক্রি করে দাও। ইহুদী বলল, কূপ হতে আমার বিরাট মুনাফা অর্জিত হয়, আমি তা বিক্রি করব না। ইহুদীর জবাব শুনে হযরত উসমান গনী (রাযি.) বললেন, তুমি কূপের অর্ধেকটা বিক্রি করো, তবে মূল্য পাবে পুরো কূপের। ইহুদীরা কথার গভীরতা অনুধাবন করতে পারে না। আল্লাহওয়ালারা দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী হয়ে থাকেন। ফলে ইহুদী হযরত উসমান (রাযি.)-এর লোভনীয় প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। ইহুদী অর্থ বুঝে পেয়ে বলল, আজকের থেকে একদিন আপনি কূপ থেকে পানি বের করবেন আর আরেকদিন আমি বের করব।

হযরত উসমান গনী (রাযি.) ইহুদীকে অর্থ পরিশোধ করে ঘোষণা দেন যে, আমার পালার দিন মুসলিম-কাফের নির্বিশেষে সকলেই বিনামূল্যে পানি নিয়ে যাবে। এই ঘোষণায় যখন মানুষ একদিন বিনা পয়সায় পানি পেতে শুরু করল, তখন তারা অপর দিন পয়সা দিয়ে পানি ক্রয় করা ছেড়ে দিল। ফ্রি পেলে কিনে কে? সুতরাং ইহুদী কয়েক মাস পরে হযরত উসমান (রাযি.)-এর নিকট এসে বলল, আপনি আমার থেকে বাকি অর্ধেক কূপও কিনে নিন। হযরত উসমান (রাযি.) বাকি অর্ধেকও কিনে পুরোটা কূপ আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াকফ করে দিলেন।

একবার হযরত উসমান গনী (রাযি.) মালবোঝাই এক হাজার উট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করলেন। ঘটনাটা এভাবে ঘটল যে, একবার যুদ্ধের সময় খাদ্য-পানীয়র প্রয়োজন দেখা দিল। অথচ দেশে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। সাহাবায়ে কেরাম বড়ই করুণ অবস্থায় ছিলেন। এ সময়ে হযরত উসমান (রাযি.)-এর খাদ্যশস্য বোঝাই এক হাজার উট শাম দেশ হতে এল। মদীনার সকল ব্যবসায়ী তা ক্রয়ের জন্য এল। তারা বলল, আপনি যত লাভ চান আমরা দেব। হযরত উসমান (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কত লাভ দিবেন? এক ব্যবসায়ী বলল, আমি দ্বিগুণ দেব। হযরত উসমান (রাযি.) বললেন, না এ তো সামান্য লাভমাত্র। অপর ব্যবসায়ী প্রস্তাব দিল, আমি দ্বিগুনের দ্বিগুণ দেব। তৃতীয়জন আরও বেশি লাভ দিতে চাইল। চতুর্থজন আরও বেশি। কিন্তু হযরত উসমান (রাযি.) বরাবর একই জবাব দিলেন যে, আমি এই লাভে বিক্রি করব না। তবে এর চেয়ে বেশি কেউ পারলে বলতে পার। তারা বলল, এর চেয়ে বেশি লাভ কেউ দিতে পারবে না।

হযরত উসমান (রাযি.) বললেন, আমার জানামতে এমন একজন গ্রাহক আছেন, যিনি দশ গুণের তো পাক্কা গ্যারান্টি দিয়েছেন, তার পক্ষ হতে ৭০ গুণেরও প্রস্তাব রয়েছে। এমনকি ৭০০ গুণেরও। তিনি চাইলে কাউকে আরও বাড়িয়ে লাভ দিতে পারেন। কেননা, তিনি ঘোষণা দিয়েছেন–

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব বাড়িয়ে দিতে পারেন।'

একথা বলে হযরত উসমান (রাযি.) সমুদয় মাল-সম্পদ তখনই আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ!

নবীজির কথায় হাজার গাছের কুরবানি

যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম নতুন-নতুন মুসলামান হয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মনজয়ের জন্য তাদের খুব ভালোবাসতেন। একবার নবীজি মসজিদে তাশরীফ আনেন। এক নওমুসলিম নবীজির খেদমতে এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার একটি বাগিচা আছে। আমার বাগানের পাশে আরেক মুসলমানেরও বাগিচা আছে। সে বৃদ্ধ। যদি আমি আমার বাগিচার লাইন সোজা করতে যাই, তাহলে তাতে তার দশটি গাছ চলে আসে। আর তা এসে গেলে আমি বাগিচা হেফাজতের জন্য বেড়া দিতে পারি। আমি ওই বৃদ্ধ মুসলমানকে বলেছি, গাছগুলো আমার কাছে যেন বিক্রি করে দেন। কিন্তু তিনি রাজি হচ্ছে না। আপনি একটু বলে দিলে হয়ত দিয়ে দিতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃদ্ধ মুসলমানকে ডেকে পাঠালেন। তিনি নবীজির খেদমতে এসে উপস্থিত হলেন। মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে তার বিচার-বুদ্ধি পাল্টে যায়। বয়সের ধর্ম এটা। বুড়ো মানুষ অনেক সময় বলতেও পারে না, তার সমস্যাগুলো কী।

এক বুড়োর ঘটনা শুনুন!

এক বুড়ো একবার এক ডাক্তারের কাছে যায়। তখন ডাক্তার ও তার মাঝে নিম্নরূপ কথাবার্তা হয়–

বুড়ো : ডাক্তার সাহেব! আমি চোখে কম দেখি।

ডাক্তার : এটা বার্ধক্যের ব্যাপার।

বুড়ো : আমার দাঁতগুলো একে-একে পড়ে গেছে।

ডাক্তার : এটা বার্ধক্যের কারণে।

বুড়ো : আমার খাবার হজম হয় না।

ডাক্তার : এটা বার্ধক্যের ধর্ম।

বুড়ো : আমি চলতে লাগলে সামনে অন্ধকার দেখি।

ডাক্তার : এটা বার্ধক্যের প্রভাব।

ডাক্তার সাহেবের একই জবাব শুনে বুড়ো লোকটার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে, এটা কেমন কথা যে, প্রত্যেক সমস্যা-ই বার্ধক্যের ফল? ডাক্তার সাহেব এবারও বলেন, চাচাজান! এটাও আপনার বার্ধক্যের প্রতিক্রিয়া।

যাহোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুড়ো মুসলিম সাহাবীকে ডেকে বললেন, আপনার এই ভাই চাচ্ছে, যদি আপনি তাকে দশটি গাছ দিয়ে দেন, তাহলে তার লাইন সোজা হয়। বুড়ো সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কী আপনার নির্দেশ, না পরামর্শ। নবীজি বললেন, এটা আমার পরামর্শ। আপনি যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বৃদ্ধ লোকটি বললেন, হে আল্লাহর নবী। আমি তাকে গাছ দেব না। বুড়ো মুসলমান গাছ দিতে অস্বীকার করলে নওমুসলিম নিরাশ হয়ে যায়। নবীজি তারপর বললেন, যদি আপনি তাকে না দিতে চান, তাহলে আমি ক্রয় করতে প্রস্তুত আছি। আমাকে দিয়ে দিন। লোকটি জানতে চাইল, এটা কী আপনার নির্দেশ, না পরামর্শ? নবীজি বললেন, পরামর্শ। বুড়ো মুসলমান বললেন, আমি আপনাকে দেব না।

এই সাফ কথা জানিয়ে দিয়ে বুড়ো নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে উদ্ধত হলেন। তখন নবীজি পুনরায় তাকে বললেন, শুনুন। আপনি যদি গাছ দেন, তাহলে জান্নাতে আপনি তার বদলে গাছ পাবেন। আমি এর গ্যারান্টি দিচ্ছি। শুধু গাছ নয়; আপনি জান্নাতে বাড়িও পাবেন। কিন্তু বৃদ্ধ বললেন, হে আল্লাহর নবী! জান্নাতী গাছের ও বাড়ির আমার প্রয়োজন নেই। এই কথা বলে বুড়ো চলে গেলেন।

নবীজির এই উক্তি আরেক সাহাবী শুনলেন। তার এক হাজার গাছের একটি বাগিচা ছিল। লোকটি নবীজির খেদমতে এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি তাকে যে সুসংবাদ দিলেন যে, দশটি গাছ দিলে তুমি জান্নাতে বাগিচা পাবে এবং ঘরও পাবে এই ওয়াদা কি শুধু তার জন্য? নাকি আমার সঙ্গেও হতে পারে? নবীজি বললেন, যদি তুমি গাছ দশটি ক্রয় করে তাকে দিয়ে দাও, তাহলে তোমার ক্ষেত্রেও এ ওয়াদা প্রযোজ্য। লোকটি বললেন, ঠিক আছে।

সাহাবী নবীজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা বৃদ্ধ মুসলমানের কাছে এলেন। তিনি এসে বুড়োকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আমাকে চেনেন? বৃদ্ধ বললেন, না; চিনি না। আপনিই নিজের পরিচয় দিন। সাহাবী বললেন, আমি কোবার অমুক ধনী লোক, যার হাজার গাছের একটি বাগিচা আছে। বৃদ্ধ বললেন, এবার চিনেছি। আমি তো আপনার খুব নাম-ডাক শুনেছি। শুনেছি আপনার বাগিচায় উন্নত জাতের খেজুর রয়েছে এবং আপনার বাগিচায় খুব ফল হয়।

সাহাবী বললেন, আমিও আপনার বাগিচার খুব তারিফ শুনেছি। এখন আপনার কাছে এসেছি একটি সওদা করতে। বুড়ো জানতে চাইলেন, তা কীসের সওদা? সাহাবী বললেন, আপনার এই দশটি গাছ আমাকে দিয়ে দিন আর তার বদলে আপনি আমার হাজার গাছের বাগিচাটি নিয়ে নিন। একথা শুনে বুড়োর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। লোকটি ছিল বৃদ্ধ এবং ওই বাগিচার থেকেই তার সংসার চলত। তাই যখন তিনি দশটি গাছের প্রস্তাব পান, তখন তিনি রাজি হয়ে গেলেন এবং এক হাজার গাছের বাগিচার বিনিময়ে তাঁর দশটি গাছ বিক্রি করে দিলে।

সাহাবী বুড়োর সঙ্গে লেনদেন করে সোজা নবীজির খেদমতে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি গাছ পেয়ে গেছি। এখন আমি তা আপনার খেদমতে পেশ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, এই গাছের বদলে তুমি জান্নাতে বাড়িও পাবে এবং বাগিচাও পাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে জান্নাতের গ্যারান্টি ও সুসংবাদ শুনে সাহাবী হাজার গাছের বাগিচার কাছে এলেন; কিন্তু বাগিচায় প্রবেশ করলেন না। বাগিচার পাশে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললেন, অমুকের মা! স্ত্রী আওয়াজ শুনে দৌড়ে এসে বলল, কী খবর? ডাকছেন কেন? বাগিচার ভেতরে আসছেন না কেন? সাহাবী বললেন, আমি এই বাগিচা বিক্রি করে দিয়েছি। এই বাগিচার মালিক এখন আমি নই; বরং আমি জান্নাতী বাগিচার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। তুমি সামানপত্রসহ বাইরে বেরিয়ে এসো। আমি এখানেই অপেক্ষায় রইলাম।

স্ত্রী একথা শুনে বলল, আমার জীবন আপনার চরণে কুরবান হোক। আপনি প্রথমবারের মতো একটি ভালো কাজ করে আমার মনটা খুশি করে দিয়েছেন। মহিলা সামানপত্র ও বাচ্চাদের নিয়ে বাগিচা হতে বের হয়ে এল এবং তারা এভাবে সেই বাগিচা আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ!

যাদের ধন-সম্পদ এমন হয় যে, তারা তা আখেরাত অর্জনের জন্য ব্যয় করে, তাহলে এই মাল-সম্পদ তাদের জন্য আখেরাতের উত্তম সওয়ারী হবে। পক্ষান্তরে ধন-সম্পদ যদি দুনিয়ার খাতিরে ব্যয় হয়, তবে তা ক্ষতির ব্যাপার হবে।

মালদার নাকি মালের চৌকিদার

ভালো করে মনে রাখবেন, কিছু লোক মালদার তথা ধনী হন, আর কিছু লোক হয় মালের চৌকিদার। মালদার তারা, যাদের কিছু মাল থাকে আর তারা তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে। আর মালের চৌকিদার হলো তারা, যারা প্রতি দিন ব্যাংক-ব্যালেন্স চেক করে। তারা প্রত্যহ হিসাব করে, আজ এত জমা হলো, কাল এত জমা হলো। তারা মূলত মালের চৌকিদারী করে। কেননা, তারা এভাবে মাল জমা করে এক সময় চলে যাবে আর তাদের সন্তানরা তা দ্বারা ফুর্তি করে বেড়াবে।

দুনিয়া পানির মতো

আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ

'তাদের বলুন, দুনিয়ার জীবন এমন যেমন আমি আসমান হতে পানি অবতীর্ণ করেছি।'[১]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জীবনের উপমা দিয়েছেন পানির সঙ্গে। দুনিয়া ও পানির মধ্যে কয়েক দিক দিয়ে সম্পর্ক রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রথম তুলনা ও সম্পর্ক

পানির একটি গুণ হলো তা কখনো এক স্থানে স্থির থাকে না। যখনই সে বয়ে চলার সুযোগ পায় বয়ে যায়। যেভাবে পানি একস্থানে স্থির থাকে না, ঠিক তেমনি দুনিয়াও একস্থানে স্থির থাকে না। যখনই সুযোগ পায়, হাত থেকে বের হয়ে যায়।

যেব্যক্তি ভাবে, আমার নিকট দুনিয়া আছে, তার নিকট থেকে দুনিয়া প্রত্যহ সরে পড়তে চায়। কারো হাত থেকে সত্তর বছরে ছোটে, কারো থেকে একশ বছরে। কিন্তু মানুষের এ খবর থাকে না। দুনিয়া প্রত্যহ লোকের কাছে যায়; কিন্তু কারো কাছে স্থায়ী হয় না। দুনিয়া যেন কয়েকজনের সঙ্গে শাদী করেছে এবং সে সবাইকে সঙ্গ দেয়।

---

১. সূরা কাহাফ : আয়াত ৪৫

এক বুযুর্গের ঘটনা

জনৈক বুযুর্গ একবার স্বপ্নে দুনিয়াকে কুমারী মহিলার আকৃতিতে দেখেন। বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি লাখ-লাখ লোকের সঙ্গে বিবাহ করা সত্ত্বেও সেই কুমারীই রয়ে গেছ! মহিলা বলল, যারা আমাকে বিবাহ করেছে, তারা সুপুরুষ নয়। আর যারা সুপুরুষ তারা আমাকে বিবাহ করতেই চায় না।

মূলত এ কারণেই আল্লাহওয়ালাগণ দুনিয়াকে মহব্বতের নজরে দেখেন না। তাঁদের দৃষ্টি পুরোপুরি নিবদ্ধ থাকে শুধু আল্লাহর জাতের প্রতি। তাঁরা আখেরাতের প্রত্যাশী হন। এমনকি যখন তারা দুনিয়ার স্বাদ-মজা অনুভব করেন, তখন চিন্তায় পড়ে যান যে, এমন তো হচ্ছে না যে, আমার নেক আমলের প্রতিদান আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াতেই দেওয়া হচ্ছে!

দুনিয়ার সঙ্গে পানির সম্পর্কের দ্বিতীয় দিক হলো, যে পানিতে নামে, সে অবশ্যই ভিজে যায়। এমনিভাবে দুনিয়াও এমন যে, যে তাতে ডুব দেয়, সে প্রভাবিত না হয়ে থাকে না।

দুনিয়ার সঙ্গে পানির তৃতীয় মিল এভাবে যে, পানি প্রয়োজনমতো হলে উপকার দেয়; কিন্তু প্রয়োজন থেকে বেড়ে গেলেই তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে দুনিয়াও যদি প্রয়োজনমতো হয়, তাহলে তা বান্দার জন্য উপকারী হয়। কিন্তু যখনই দুনিয়া বেড়ে যায়, তা ক্ষতি করতে শুরু করে। পানির সয়লাব যখন আসে, তখন বাঁধও ভেঙে যায়। কেননা, তা প্রয়োজন হতে বেশি।

এমনিভাবে যেসব লোকের নিকট প্রয়োজনের বেশি অর্থ-সম্পদ আসে, তারা তা দিয়ে ফুর্তি করে বেড়ায় এবং শরীয়তের সীমারেখা লংঘন করে। যারা জুয়া খেলে এবং এক-এক করতে লাখ-লাখ টাকা খোয়ায়, সেগুলো তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পয়সা-ই হয়। তারা টাকা উড়ানোর ব্যাপারে কোনো পরোয়া করে না।

এক তাফসীরে এই আয়াতের অধীনে লেখা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে পানির সঙ্গে এজন্য তুলনা করেছেন যে, পানি বেশি হলে পাক হয়। তবে শর্ত হলো, তার স্বাদ, রং, গন্ধ পরিবর্তন না হতে হবে। যদি তার এসব গুণ বদলে যায়, তাহলে সব পানি নাপাক হয়ে যায়। ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যে পানির স্বাদ, রং ও গন্ধ পরিবর্তন না হয়, তা নিজেও পাক হয় এবং অন্যকেও পাক করে।

একটি ইল্‌মি তত্ত্ব

অযুতে চেহারা ধোওয়া জরুরি। এখন তার পূর্বে হাতও ধুতে হয়, কুলিও করতে হয় এবং নাকেও পানি দিতে হয়। এখানে কোনো ছাত্রের মনে হয়ত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, অযুর ধারাবাহিকতায় সুন্নতকে ফরজের আগে স্থান দেওয়া হলো কেন? অথচ নিয়ম হলো, আগে ফরজের স্থান, তারপর সুন্নতের। ফোকাহায়ে কেরাম এ প্রশ্নের উত্তর লিখেছেন, যখন কোনো লোক পানি দ্বারা অযু করে এবং সে হাতে পানি নেয়, তখন চোখে দেখে সে পানির রং সম্পর্কে জানতে পারে। তারপর যখন মুখে পানি দেয়, তখন পানির স্বাদ সম্পর্কে তার জ্ঞান লাভ হয়। তারপর যখন নাকে পানি দেয়, তখন গন্ধ সম্পর্কেও তার অবগতি লাভ হয়। এ তরিকায় যখন সে নিশ্চিত হয়ে যায়, পানির রংও ঠিক আছে, স্বাদও ঠিক আছে এবং গন্ধের ব্যাপারেও অপত্তি নেই, এবার সে শরীয়তের হুকুম আমল করার জন্য চেহারা ধুইবে।

এমনিভাবে মানুষের কাছে যত সম্পদই থাকুক না কেন, যদি হারাম হওয়ার কারণে তার স্বাদ বিগড়ে না যায়, সন্দেহ ঢোকার কারণে তার রং বদলে না যায় এবং যাকাত আদায় না করার কারণে তার গন্ধ নষ্ট না হয়, তবেই সমস্ত ধন-সম্পদ পবিত্র হবে। অর্থাৎ যে বান্দার ভিতরে হারাম মাল আসবে, সন্দেহপূর্ণ মাল আসবে অথবা হালাল মাল হলেও তার মাঝে অহংকার ও আমিত্ব থাকবে, তাহলে পানির মতো দুনিয়াও নাপাক হয়ে যাবে।

দুনিয়া খেল-তামাশা

আল্লাহপাক কুরআনের অপর এক আয়াতে বলেন,

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

'দুনিয়ার এই জীবন খেল-তামাশা বৈ নয় এবং আখেরাতের যিন্দেগী চিরস্থায়ী। হায়! মানুষ যদি তা জানত!'[১]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার জীবনকে খেল-তামাশার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর কারণ কয়েকটি। যথা–

১. দুনিয়ায় যা সবচেয়ে দ্রুত সমাপ্ত হয়, তা হলো খেল-তামাশা। যত খেল-তামাশাই হোক-না কেন, তা কিছুক্ষণের জন্য হয়। স্ক্রীনে যে ছবি

---

১. সূরা আনকাবুত : আয়াত ১৪

আসে, তাও কিছু সময়ের জন্য থাকে। সার্কাসে যে খেলা হয়, তাও সীমিত সময়ের জন্য। বিভিন্ন দৌড়প্রতিযোগিতাও হয় কিছু সময়ের জন্য। আল্লাহ তা'আলাও দুনিয়াকে খেল-তামাশার সঙ্গে তুলনা করেছেন, যাতে মানুষ জানতে পারে, দুনিয়া ক্ষণিকের বস্তুমাত্র। এ কারণেই মানুষ কেয়ামতের দিন বলবে–

مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ

'তারা সামান্য সময়ে অবস্থান করেছে মাত্র।'[১]

এমনকি কিছু লোক বলবে–

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

'তারা দুনিয়াতে অবস্থান করেনি; কিন্তু সামান্য সময় অথবা সন্ধ্যার কিছু সময়মাত্র।'[২]

শত বছরের জীবনও ক্ষণিকের মনে হবে, যেন স্বপ্ন ছিল, যা কিছু দেখেছে, যা কিছু শুনেছে সবই কল্পনা ছিল।

হযরত নূহ (আ.)-এর বয়স এক হাজারেরও বেশি ছিল। ৯৬০ বছর ছিল তাঁর তাবলিগী বয়স। এর পরে আযাব এল এবং আযাবের পরেও তিনি ৬০ বছর জীবিত ছিলেন। রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত নূহ (আ.)-এর ইন্তেকাল হলে আল্লাহপাক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার প্রিয় নবী! আপনি হাজার বছরের যিন্দেগী কেমন পেলেন? তিনি জবাবে বললেন, হে আল্লাহ! আমার মনে হলো, একটি ঘরের দুটি দরজা ছিল। আমি একটি দিয়ে ঢুকে অপরটি দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

তাহলে যখন এক হাজার বছরের যিন্দেগী এমন লাগে, দুনিয়ার শত বছরের যিন্দেগী কেমন সামান্য মনে হবে!

যে মারা যায়, সে অনুভব করে, দুনিয়ার জীবন ক্ষণিকের ব্যাপার ছিল মাত্র। আপনি নিজেও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আপনি প্রাইমারী স্কুল জীবনের কথা স্মরণ করে দেখুন। আপনার মনে হবে, এটা তো গত কালকের ব্যাপার। অথচ তারপর ৫০ বছর চলে গেছে।

---

১. সূরা রূম : আয়াত ৫৫

২. সূরা নাযি'আত : আয়াত ৪৬

২. দুনিয়াকে খেল-তামাশার সঙ্গে তুলনা করার দ্বিতীয় কারণ হলো, সাধারণত খেল-তামাশা দেখার পরে মানুষের আফসোস লাগে এবং বলে, এমন কাজ করলাম, যাতে সময়ও গেল আবার অর্থও নষ্ট হলো। দুনিয়াদারদের অবস্থাও ঠিক এমন হয় যে, মৃত্যুর সময় আফসোস করে, আমি স্বীয় জীবন বরবাদ করেছি।

৩) একটি কারণ এটিও যে, বর্তমানের খেল-তামাশা সাধারণত ছায়ার মতো হয়। যদিও স্ক্রীনে দেখা যায়, মানুষ চলাফেরা করছে; কিন্তু বাস্তবতা হলো, তার ছায়া চলাফেরা করে। যারা তার পিছনে দৌড়ায়, তারা ছায়ার পেছনেই দৌড়ায়। দুনিয়ার ব্যাপারটিও ঠিক এমন। দুনিয়ার পেছনে যে ছোটে, সে মূলত ছায়ার পেছনেই দৌড়ায়। শেষ পর্যন্ত সে কিছুই পায় না।

দুনিয়া মৃত প্রাণীর মতো

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَطَالِبُوْهَا كِلَابٌ

'দুনিয়া মৃত প্রাণী আর তার অন্বেষণকারীরা কুকুর।'

হাদীছটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। নবীজি উম্মতের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। তারপরও তিনি অতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন যে, দুনিয়া মড়াতুল্য আর যারা এ দুনিয়ার পিছনে ছোটে, তারা হলো কুকুর।

দেখুন, হাদীছে দুনিয়ারদের উদাহরণ দিতে গিয়ে কাকের কথা বলা হয়নি; বরং কুকুর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ যেভাবে কুকুর মড়া খায়, তেমনি কাকও খায়। এর পশ্চাতে কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

প্রথম কারণ : প্রথম কারণ হলো, কাকের স্বভাব হলো, কোথাও কোনো মড়া পেলে একা খায় না; বরং কাক মুর্দা দেখে শোরগোল করে এবং সমজাতীয় সমস্ত কাককে ডাকে। তারপর সবাই এলে সকলে মিলে খায়। কিন্তু কুকর মড়া পেলে একাকি খায়। অন্য কুকুরের অংশগ্রহণ সে বরদাশত করে না। এক কুকুরের সামনে যদি বিশালদেহী কোনো মড়া পড়ে থাকে, যাকে সে খেয়ে শেষ করতে পারবে না, তারপরও সে তাতে অন্যকে ভাগ বসাতে দেয় না। যদি কোনো কুকুর চলে আসে, তাহলে সে মড়া খাওয়া রেখে আগে ওই কুকুরের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। লড়াইয়ে যে বেশি শক্তি দেখাতে পারে, সে-ই মড়া খাওয়ার অধিকার রাখে।

ঠিক এমন অবস্থা দুনিয়াদারদের। সে একাই সমস্ত দুনিয়া করায়ত্ব করতে চায়। যদি কয়েকজন লোক মিলে কাজ করে, তাহলে তাদের সকলের ইচ্ছা এমন থাকে যে, কীভাবে আমি বেশি অংশ লাভ করব। কেউ অন্যকে অংশ দিতে পছন্দ করে না; বরং সব লাভ একাই নিতে চায়। সুতরাং যেন মানুষের মধ্যে কুকুরের স্বভাবই বিদ্যমান। কুকুরও একাই মড়া খেতে চায়, তেমনিভাবে দুনিয়াদারও সমগ্র দুনিয়ার ধন-সম্পদ একা দখল করতে চায়।

দ্বিতীয় কারণ : দুনিয়াদারকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, এক কাক কখনও অপর মৃত কাকের গোশত খায় না। কোথাও মুর্দা কাক দেখলে সেখানে সে যেতে অনীহা দেখায় এবং আওয়াজ করতে থাকে। এর বিপরীতে কুকুরের অবস্থা হলো, সে সামনে অপর কোনো মৃত কুকুরের হাড় পেলেও তা চিবিয়ে খায়। এমন অবস্থা দুনিয়ারদেরও। সে সবাইকে তো ধোঁকা দেয়ই, এমনকি আপন ভাইয়ের সঙ্গে কারবার করলেও তাকে ধোঁকা দেয়। নিকটতম আত্মীয়-স্বজন মিলে অনেক সময় কাজ করে। কিন্তু সেখানেও ধোঁকাবাজি করে। সুতরাং তার মধ্যে ঠিক ওই স্বভাব বিদ্যমান, যা একটা কুকুরের মধ্যে রয়েছে।

তৃতীয় কারণ : তৃতীয় কারণ হলো, এক কাক অপর কাক থেকে শিখে। কোনো লোক যদি একটা কাক মেরে ঝুলিয়ে রাখে, তাহলে অন্য কাক তার ধারে-কাছে আসে না। তারা এই শিক্ষা গ্রহণ করে যে, লোকটি যখন একটা কাক মেরেছে, এখন সেখানে আমরা গেলে আমাদেরও মেরে ফেলবে। কিন্তু এক কুকুর কখনও অন্য কুকর থেকে শিক্ষা নেয় না। ঠিক এই অবস্থা দুনিয়াদারেরও। তার সামনে প্রতিদিন কোনো-না-কোনো দুনিয়াদারের মৃত্যু হয় এবং তার করুণ পরিণতি নিজের চোখে দেখে। কিন্তু তারপরও দুনিয়াদার চায়, আমার আরও দুনিয়া লাভ হোক। একজন সিংহাসন ছাড়ে এবং তাকে (অপরাধে) ফাঁসিতে ঝুলানো হয়; কিন্তু তারপরও অন্য লোক ওই সিংহাসনে বসতে তৈরি হয়ে যায়। দাবি করে, লড়াই করে সিংহাসন দখল করে। এটা প্রতিদিনের চিত্র। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে,

* রাতে আমীর ছিল, দিনে ফকীর হয়ে গেছে।
* রাতে মন্ত্রী ছিল দিনে বন্দী হয়ে গেছে।
* রাতে প্রধানমন্ত্রী ছিল, দিনে প্রধান আসামী হয়েছে।
* রাতে প্রেসিডেন্ট ছিল, সকালে গতিচ্যুত হয়েছে।

চোখের সামনে হরহামেশা এমন বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। একজন গেলে আরেকজন তৈরি হয়ে যায়। মানুষ এটা দেখে না যে, আমার পূর্বে যে ছিল, তার পরিণাম কেমন হয়েছে!

চতুর্থ কারণ : উপমার আরেকটি কারণ এও যে, কোথাও মড়া পড়ে থাকলে কাক তা হতে কিছু খেলেও রাত হলে ঠিকই নীড়ে ফিরে যায়। সে রাতভর মড়ার কাছে বসে থাকে না। দিনে খেয়ে রাতে ফিরে যায়। কিন্তু কুকুরের অভ্যাস ভিন্ন। সে মড়া পেলে সারা দিন তো খায়ই এবং রাতের বেলায় সেখানে বসে পাহারা দেয়, যেন অন্য কুকুর এসে দখল করতে না পারে। ঠিক এমন অবস্থা দুনিয়াদারেরও। সে সারা দিন দোকানের মধ্যে থাকে আর রাতে দোকান তার মধ্যে থাকে। এমনকি সে নামায পড়লেও দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, দুনিয়া অন্বেষী কুকুরের মতো অভ্যাস পোষণ করে।

পঞ্চম কারণ : একটি কারণ এ-ও যে, কাক যদি মড়া খায়, তাহলে নরম গোশত খায় – হাড্ডি খায় না। কিন্তু কুকুর গোশতও খায় এবং হাড়ও চাবায়। এই অবস্থা দুনিয়াদারেরও। সে প্রথমে বৈধ লাভ গ্রহণ করে। পরে ক্রমে সুদী কারবারও করে।

সুতরাং যেন গোশতের সাথে-সাথে হাড়ও চাবাল। সুবহানাল্লাহ! কত বাস্ত ব কথা বলেছেন নবীজি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে দুনিয়াদার হওয়া থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

বর্তমান সময় সবচেয়ে বড় ফেতনা

বর্তমান সময়ের শীর্ষ ফেতনা হলো দুনিয়ার মহব্বত। প্রত্যেক লোকের আন্তরিক কামনা হলো–

يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝

'হায় যদি আমাদের কাছে এত সম্পদ থাকত, যেমন কারুনকে দেওয়া হয়েছিল; সে তো বড়ই ভাগ্যবান!'[১]

বর্তমানে নারী-পুরুষ সকলের বাসনা এই একটাই। দুনিয়াকে কে বেশি অর্জন করবে এই তীব্র প্রতিযোগিতায় সবাই লিপ্ত।

---

১. সূরা কাসাস : আয়াত ৭৯

দুনিয়া কী?

এত কিছু শোনার পরে অন্তরে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, দুনিয়া আসলে কীসের নাম? হযরত জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) একস্থানে অতি সুন্দরভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন–

چیست دنیا از خدا غافل بدن

نے قماش و نقره و فرزند و زن

'দুনিয়া কী? আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার নামই দুনিয়া।
অর্থ-সম্পদ, বিবি-বাচ্চার নাম দুনিয়া নয়।'

সারকথা হলো, যে বস্তুই মানুষকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দেয়, সেটাই দুনিয়া। চাই সে যে জিনিসই হোক-না কেন। যদি সেটা স্ত্রী হয়, তাহলে সেটাও দুনিয়ার মধ্যে গণ্য। যদি সেটা সন্তান হয়, তবে সেটাও দুনিয়া হিসেবে বিবেচিত। যদি সেটা কায়-কারবার হয়, তবে সেটাও দুনিয়ার মধ্যে গণ্য। ঘর-বাড়ি হলে সেটাও দুনিয়া। এ ছাড়া অন্য কিছুও যদি মানুষকে আল্লাহ হতে গাফেল করে, তাহলে সেটাও দুনিয়া হবে। এজন্য এটা হতে পারে যে, কোনো লোক জায়নামাযে বসে থেকেও দুনিয়াদার হতে পারে। আবার এটাও হতে পারে যে, কোনো লোক দোকানে বসে থাকা সত্ত্বেও সে দীনদার। বিষয়টি নির্ভর করে দিলের উপর। দিল আল্লাহমুখী থাকলে দীনদার আর দিল আল্লাহ হতে গাফেল হলে দুনিয়াদার।

দুই লোকের হৃদয়গত অবস্থা

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহ.) লিখেছেন, আমি একবার হজে যাই। আমি সেখানে দেখি, একলোক কাবা শরীফের গেলাফ ধরে দু'আ করছে। সেখানে আমি তার দিলের প্রতি নজর দিলাম, তখন দেখলাম, তার অন্তর আল্লাহ থেকে গাফেল। আর তা এভাবে যে, ওই লোকের সঙ্গে আরো কিছু লোক হজে এসেছিল। দু'আ করার সময় তার অন্তরে এই ইচ্ছা জাগ্রত হচ্ছিল যে, হায় যদি আমার সাথীরা দেখত, আমি কীভাবে কেঁদে-কেঁদে দু'আ করছি! বোঝা গেল, এই আমলটি সে আল্লাহর জন্য করছিল না; বরং সাথীদের দেখানোর জন্য করছিল। ফলে লোকটি কাবার গেলাফ ধরে কাঁদার অবস্থাতেও দুনিয়াদার ছিল।

হযরত বলেন, তারপর আমি মিনায় যাই। সেখানে দেখি, এক যুবক তার পণ্য বিক্রি করছে। তার চারপাশে এত লোকের ভিড় ছিল যে, সে ক্রেতা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং বিক্রি করে শেষ করতে পারছিল না। যখন আমি তার দিলের প্রতি নজর দিলাম, দেখলাম, তার দিল একটি মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ থেকে গাফেল নয়।

মূলত এটাই জীবনের উদ্দেশ্য যে, আমরা যা কিছুই করি না কেন এবং যেখানেই থাকি না কেন আমাদের দিল সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণে লেগে থাকবে। অর্থাৎ হাতে করবে কাজ, অন্তরে থাকবে আল্লাহ। এমন অবস্থার কথা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

'এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত থাকে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।'[১]

মারেফাতের নূর অর্জনের অমোঘ নীতি

আল্লাহর মারেফাত অর্জনের ক্ষেত্রে দুনিয়ার মোহ একটি বিরাট বাধা। আমাদের বড়রা বলেন, ঝোল মূলত গোশত এবং তরকারির সঙ্গে মিলে তৈরি হয়। ঘি-মরিচ এ ক্ষেত্রে বাড়তি বিষয়। কারো কাছে এই অতিরিক্ত জিনিস যদি না থাকে এবং শুধু তরকারি সিদ্ধ করে, তাহলে এই তরকারি দ্বারাই খাওয়া হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি শুধু গোশত থাকে এবং তা সিদ্ধ করা হয়, তবুও তা দ্বারা খাওয়ার কাজ হয়ে যায়। কিন্তু যদি কারো নিকট তরকারি বা গোশত না থাকে; বরং শুধু পানি, ঘি, লবণ ও মরিচ থাকে, তবে তা দ্বারা ক্ষুধা মিটে না। বিভিন্ন আমল ও ওজিফার দৃষ্টান্ত লবণ, মরিচ ও অন্যান্য অতিরিক্ত বিষয়ের মতো।

পক্ষান্তরে দুনিয়ার মোহ বর্জন এবং মনের চাহিদা বর্জনের দৃষ্টান্ত হলো তরকারি ও গোশতের মতো। সুতরাং যেলোক চায়, আমার মারেফাতের নূর অর্জিত হোক, তাহলে তার কর্তব্য হলো, সে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করবে। কেননা, আল্লাহ যে রিযিক বরাদ্দ করে রেখেছেন, তা অর্জিত হবেই। অন্তরের মধ্যে দুনিয়ার মোহ ও কামনা রাখবে না। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

---

১. সূরা নূর : আয়াত ৩৭

'আমরা আমাদের বড়দের থেকে এই মারেফাতের সবক দুনিয়ার মোহ বিসর্জনের মাধ্যমে শিখেছি; তাসবীহাতের মাধ্যমে নয়।'

বাতেনি সফরে সহজতা

আমাদের মাশায়েখগণ কাউকে তার কাজ বা চাকরি ছেড়ে দিতে বলতেন না। এ কারণে আমরাও মানুষের কাছে তাদের অবসর সময় কামনা করি। বিশ্বাস করুন, আজ মুসলমানরা যদি তাদের অবসর সময়টুকুও দীনের জন্য ব্যয় করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এতেও সফলতা দান করবেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা রুহানী স্তরসমূহ অতিক্রম করার জন্য খুব সহজ ব্যবস্থা দিয়েছেন। বলুন তো, আল্লাহপাক জাহেরি সফর তথা দুনিয়ার সফরের জন্য সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কি-না? অবশ্যই করেছেন। আগেকার যুগে মানুষ উট-ঘোড়ায় সফর করত। আর বর্তমানকার মানুষ বাস, ট্রেন ও বিমানে সফর করে। আগে এক হাজার মাইলের সফর করতে এক মাস সময় লাগত। উট-ঘোড়ায় চড়ে মানুষ দিনে মাত্র বিশ মাইল সফর করত। তারা টানা বিশ মাইল সফর যাত্রাবিরতি দিত। আর বর্তমানে মাত্র এক ঘন্টায় হাজার মাইলের সফর হয়ে যায়।

এখানে চিন্তার বিষয় হলো, যে আল্লাহ এত বড় মেহেরবান যে, তিনি মানুষের দুর্বলতা দেখে তাদের দুনিয়ার সফরের ক্ষেত্রে সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তবে কি তিনি বাতেনি সফরের ব্যবস্থাও সহজ করেননি? অবশ্যই করেছেন। এ কারণে বর্তমান যুগে বাতেনি সফর করা খুবই সহজ। যেকোনো লোক এই সফর করতে পারে। কেউ এটা বলতে পারবে না যে, আমার দ্বারা বাতেনি সফর করা সম্ভবই নয়; বরং অসুস্থ ব্যক্তিও এই সফর করতে পারে। যারা নিয়মিত কাজ করে, তারাও করতে পারে। বৃদ্ধরাও করতে পারে, যুবকরাও করতে পারে।

মনের চাহিদা পূরণের জায়গা

আমাদের বড়রা দুনিয়ার মোহ থেকে দূরে পালাতেন। তারা বলতেন, দুনিয়ার মোহে পড়লে আর কোনো সীমা-পরিসীমা থাকবে না। এটা সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, প্রয়োজনের একটি সীমা থাকে। কিন্তু মনের চাহিদার কোনো সীমা থাকে না। এ কারণে আল্লাহপাক বলেছেন, তোমরা দুনিয়ায় তোমাদের প্রয়োজন মেটাও। তোমাদের মনের অসীম চাহিদা পূরণের জন্য আমি জান্নাত বানিয়েছি।

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

'তোমাদের জন্য জান্নাতে তা-ই থাকবে, যা তোমাদের মন চাইবে এবং তোমরা যা চাইবে পাবে।'[১]

সুতরাং একথা ভালো করে অন্তরে গেঁথে রাখুন যে, মনের যত চাহিদা সব পূরণ হবে জান্নাতে গিয়ে। দুনিয়ায় সকল আশা পূরণ হবে না। এখানে শুধু প্রয়োজন পূরণ করতে হবে এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন পার করতে হবে।

খাজা আবুল হাসান খিরকানী (রহ.)-এর অমুখাপেক্ষিতা

আমাদের মাশায়েখগণ সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকতেন। তাদের দৃষ্টিতে মানুষের সম্মান-মর্যাদা তার দীনের ভিত্তিতে হতো। দুনিয়াবি কারণে তারা মানুষকে সম্মান করতেন না।

খাজা আবুল হাসান খিরকানী (রহ.) নকশবন্দিয়া সিলসিলার একজন অন্যতম বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি ছিলেন দরবেশ মানুষ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করেছিলেন। তাঁর খানকায় তৎকালীন যুগের রাজা-বাদশাহরা আসা-যাওয়া করতেন।

হযরত খাজা সাহেবের মাথায় লম্বা চুল ছিল। তাঁর মাথায় চুলকানি হওয়া শুরু হয়। মাথায় খুঁজলি কখনো উকুনের কারণে হয় আবার কখনো বেশি দিন গোসল না করার কারণেও হয়। হযরত মাথায় চুলকানি ও খুঁজলি অনুভব করলে এক খাদেমকে বললেন, আমার চুলের মধ্যে দেখো তো উকুনের কারণে চুলকাচ্ছে, না-কি অন্য কোনো কারণে? খাদেম বলল, জি হযরত! দেখছি। হযরত বসে যান আর খাদেম উকুন বাছা শুরু করে। বাইরে লোকজন ঝাড়ু দিচ্ছিল। এতে খুব ধুলা-বালি উড়তে থাকে।

এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন বাদশা সুলতান মাহমুদ গযনবী হযরত খাজা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন। মুরীদরা বাদশাহকে আসতে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে যায়। এক খাদেম ঘরে ঢুকল খাজা সাহেবকে বাদশার আগমনের সংবাদ দিতে। কিন্তু খাদেম এসে দেখল, খাদেম হযরতের চুল থেকে উকুন খুঁজছে। মুরীদ খাদেমকে ইশারায় বাদশার আগমনের কথা জানাল। খাদেম তার মুখ পানে মাথা উঁচিয়ে তাকালে সে বলল, হযরত!

---

১. সূরা হা-মীম সাজদাহ্ : আয়াত ৩১

বাদশা আসছেন। হযরত এই কথা শুনে বললেন, ওহ্ হো! আমি তো মনে করেছি, তুমি বড় একটা উকুন পেয়েছ। তাঁর একথা থেকে অনুমতি হয়, তাঁদের অন্তরে দুনিয়ার কোনো স্থান ছিল না।

সুলতান মাহমুদ গযনবী (রহ.) হযরত আবুল হাসান খিরকানী (রহ.)-এর কাছে এলে তিনি পূর্ববৎ বসে থাকেন। সুলতান স্বয়ং এগিয়ে এসে স্বাক্ষাত করেন। সাক্ষাতের পরে সুলতান থলেভর্তি কিছু টাকা হযরতকে হাদিয়া প্রদান করেন। কিন্তু হযরত তা নিতে অস্বীকৃতি জানান। সুলতান আবার হাদিয়া এগিয়ে দেন। এবার হযরত তাঁর খানকা থাকা একটি শুকনো রুটি সুলতানের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা খান। হযরতের কথায় সুলতান রুটি ছিড়ে মুখে দিলেন। কিন্তু রুটি শুকনা থাকায় তা গলা দিয়ে সরছিল না। রুটি সুলতানের গলদেশে আটকে যায়। হযরত যখন দেখলেন, সুলতানের গলায় রুটি আটকে গেছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী? রুটি গলা দিয়ে নীচে নামছে না? সুলতান বললেন, জি হযরত! রুটি নীচে নামছে না। হযরত তখন বললেন, আপনার এই টাকাভর্তি থলেও আমার গলা দিয়ে নামছে না। সুবহানাল্লাহ! কেমন জ্বলন্ত নসীহত।

তারপর বাদশা দীর্ঘক্ষণ হযরতের মজলিসে বসে কথা শুনতে থাকেন। হযরতের কথা বাদশার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণে বাদশা যখন বিদায় নেন, তখন হযরত নিজে খানকার দরজা পর্যন্ত বাদশাকে এগিয়ে দিয়ে আসেন। হযরতের এই আচরণে বিস্মিত হয়ে এক মুরীদ জিজ্ঞাসা করে, হযরত! বাদশা আসার সময় আপনি পূর্ববৎ বসে থাকলেন। অথচ বিদায় বেলায় দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিলেন; রহস্য তো বুঝলাম না। হযরত বললেন, বাদশা যখন এখানে প্রথমে এলেন, তখন তিনি নিজেকে একজন বাদশা মনে করে এসেছিলেন। তাঁর অন্তরে অহংকার, গর্ব ছিল। এ কারণে তিনি এলে আমি বসেই থাকি। পরে আমি তার গর্ব-অংকারের চিকিৎসা করি। তিনি কিছুক্ষণ আমার মজলিসে থাকায় তার অন্তর হতে গর্ব দূর হয়েছিল এবং তার অন্তরে আল্লাহওয়ালাদের মহব্বত পয়দা হয়েছিল, যার কারণে তার মধ্যে বিনয় চলে এসেছিল। ফলে তার বিনয় চরিত্রের মূল্যায়ন হিসেবে খানকা থেকে বিদায়কালে আমি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

সোমনাথ বিজয়

হযরতের সঙ্গে সাক্ষাতের এক পর্যায়ে বাদশাহ বললেন, হযরত! আমি সোমনাথ আক্রমণের ইচ্ছা করেছি। শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশি। তাই

মোকাবেলা হবে কঠিন। অনুগ্রহপূর্বক দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেন। বাদশা যখন হযরতের সমীপে দু'আর জন্য দরখাস্ত করেন, তখন হযরতের নিকটে একটি জুব্বা ছিল। হযরত জুব্বাটি নিয়ে বাদশাকে দিলেন এবং বললেন, এটা আপনার সঙ্গে নিয়ে যান এবং যখন একান্ত প্রয়োজন অনুভব করবেন, তখন এই জুব্বাটি সামনে রেখে দু'আ করবেন, হে আল্লাহ! যদি এই জুব্বার মালিকের কোনো মর্যাদা আপনার দরবারে থাকে, তাহলে এর বরকতে আমার বিষয়টি সমাধা করে দিন। বাদশা বললেন, হযরত! তা-ই হবে। তারপর বাদশা জুব্বাটি নিয়ে চলে যান।

ফিরে এসে সুলতান মাহমুদ গযনবী প্রস্তুতি নিয়ে সোমনাথ আক্রমণ করেন। সে সময়ে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের লোকেরা সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করত। এ কারণে কাফেরদের সংখ্যা ছিল বিপুল। যখন বাদশা দেখলেন, মুসলিম সৈন্যদের মাঝে দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে, তখন তার মনে পড়ে যায়, হযরত তো আমাকে একটি জুব্বা দিয়েছিলেন। সুতরাং সুলতান মাহমুদ জুব্বাটি সামনে রাখলেন এবং আল্লাহর সকাশে দু'আ করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! যদি এই জুব্বার মালিকের কোনো মূল্য থাকে তোমার শহী দরবারে এবং তিনি আপনার বন্ধুদের একজন হন, তাহলে এর বরকতে আপনি আমাকে সোমনাথের বিজয় দান করুন। এই দু'আর পর যুদ্ধের চিত্র পাল্টে যায়। আল্লাহপাক পরাজয়কে জয়ে পরিণত করে দেন। সোমনাথ বিজয় হয়।

সোমনাথ বিজয়ের অনেক দিন পরে সুলতান মাহমুদ গযনবী চিন্তা করেন, আমি হযরতের কাছে গিয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায়ও করব এবং তাকে সুসংবাদও প্রদান করব। সুতরাং তিনি হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যান। বাদশাহ হযরতকে যুদ্ধের পুরো বৃত্তান্ত শোনালেন। হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি জুব্বা সামনে রেখে কী দু'আ করেছিলেন। বাদশা বললেন, আমি দু'আ করেছিলাম, হে আল্লাহ! এই জুব্বার মালিকের যদি আপনার দরবারে কোনো মান-মর্যাদা থাকে এবং তিনি আপনার বন্ধুদের একজন হন, তাহলে আমাকে সোমনাথ বিজয় দান করুন। হযরত একথা শুনে বললেন–

আপনি খুবই সস্তা সওদা করেছেন। যদি আপনি এই দু'আ করতেন যে, হে আল্লাহ! এর বরকতে আপনি আমাকে সমগ্র দুনিয়ার বিজয় দান করুন, তাহলে আল্লাহ পুরো দুনিয়ার বিজয় আপনাকে দান করতেন।'

জি হ্যাঁ, বাস্তবিকই আল্লাহর দরবারে আল্লাহওয়ালাদের একটি মাকাম থাকে। যেহেতু তাদের পুরো যিন্দেগী নেকী ও তাকওয়ার উপর অতিবাহিত হয়, তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মুখ থেকে নির্গত শব্দের লাজ রক্ষা করেন।

খানকার মাটির আদব

সুলতান মাহমুদ গযনবী (রহ.) কে তাঁর মৃত্যুর পরে একব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, তিনি জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করে, জনাব! আপনি তো দুনিয়ার বাদশা ছিলেন আর আখেরাতে বাদশাদের পরিণতি ভয়াবহ হয়, তাদের দীর্ঘ হিসাব-কিতাব হয়, তাহলে আপনি এত দ্রুত জান্নাতে এলেন কীভাবে? বাদশা জবাবে বললেন, আমার ছোট একটি আমল ছিল। আল্লাহ সে আমলটিই পছন্দ করেছেন, যার ফলে তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল। লোকটি জানতে চায়, সেই ছোট আমলটি কী? বাদশা বললেন, আমি একবার খাজা আবুল হাসান খিরকানী (রহ.)-এর খানকায় গিয়েছিলাম। সেখানে লোকজন ঝাড়ু দিচ্ছিল, যার ফলে ধুলো-বালি উড়ছিল। আমি ওই ধুলোর মধ্যে দিয়ে এই নিয়তে এগিয়ে চলি এবং ওই ধুলোবালি চেহারায় মাখিয়াছিলাম যে, এই আল্লাহওয়ালাদের কাপড় ও বিছানার ধুলোবালি। এ ভক্তি ও নেক নিয়তের কারণে আল্লাহ আমাকে বললেন, তুমি আমার রাস্তায় চলাচলকারী দরবেশদের মাটির মূল্যায়ন করেছ, তাই তার বরকতে তোমার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ!

হযরত সালেম (রহ.)-এর অমুখাপেক্ষিতার শান

আমাদের আকাবিরদের জীবনে এমন এমন ঘটনা ঘটেছে যে, তৎকালীন সময়ের বাদশা বিরাট-বিরাট জায়গীর তাদের প্রদান করেছেন। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য তা গ্রহণ করেননি। হযরত উমর (রাযি.)-এর পুত্রের পুত্র ছিলেন হযরত সালেম (রহ.)। একবার তিনি মক্কার হারাম শরীফে এলেন। মাতাফে তাঁর সাক্ষাত হয় তৎসময়ের বাদশা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের সঙ্গে। হিশাম সালাম দিয়ে বললেন, হযরত! কোনো প্রয়োজন থাকলে বলুন, যাতে আমি আপনার খেদমত করতে পারি। হযরত সালেম (রহ.) বললেন, হিশাম! বায়তুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে গায়রুল্লাহর কাছে কিছু চাইতে আমার শরম লাগে। কেননা, আদাবে ইলাহীর দাবি হলো, এখানে কেবল তাঁর কাছেই হাত পাতা হবে।

হিশাম নিরুত্তর হয়ে যান। হযরত সালেম (রহ.) যখন হারাম শরীফ থেকে বাইরে বের হন ঘটনাক্রমে ঠিক তখনই বাদশাও বের হন। দুজনের আবার সাক্ষাত ঘটে। বাদশা হযরত সালেম (রহ.)কে দেখে তার কাছে এগিয়ে যান এবং বললেন, হযরত! এবার বলুন, আমি আপনার কী খেদমত করতে পারি? হযরত সালেম (রহ.) বললেন, হিশাম! বলো তো, আমি তোমার কাছে কী চাইব? দীন, না দুনিয়া? যেহেতু হিশাম জানতেন, দীনি ক্ষেত্রে হযরত সালেম (রহ.) উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তিত্ব, তাই তিনি বললেন, হযরত! আপনি আমার কাছে দুনিয়া চান। হযরত সালেম (রহ.) তৎক্ষণাৎ বললেন, দুনিয়াকে তো আমি কখনও দুনিয়ার মালিকের কাছেও চাইনি; তোমার কাছে কীভাবে চাইব? একথা শুনতেই হিশামের চেহারাটা পাল্টে গেল এবং তিনি মুখ নীচু করে ফেললেন।

আল্লাহপাক কী চান?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَمَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ

'দুনিয়া অভিশপ্ত। দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তার সবই অভিশপ্ত। আল্লাহর স্মরণ এবং যা তার কাছাকাছি তা ব্যতীত।'

অর্থাৎ যিকিরকারী এবং যা যিকিরের কারণ হয় তা ছাড়া দুনিয়ার বাকি সব কিছু অভিশপ্ত। এর থেকে চিন্তা করলে বোঝা যায়, আল্লাহপাক এই দুনিয়া হতে কী চান? তিনি শুধু চান, আমরা যেন যিকিরের মধ্যে আমাদের জীবনকে আখেরাতের যিন্দেগি বানাই এবং দুনিয়া হতে আমাদের জীবনকে পৃথক করি। এটা মানুষের অর্জিত হয় ইল্‌ম ও যিকিরের মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'আলা যখন দুনিয়া বানিয়েছেন, তখন একবারের জন্যও তার প্রতি মায়ার দৃষ্টিতে তাকাননি। আল্লাহ তা'আলা চান, আমার বান্দারা দুনিয়ার প্রতি অন্তর নিবদ্ধ না করে আখেরাতের প্রতি নিবদ্ধ করুক। এ কারণে আমাদের পূর্বসূরীগণ দুনিয়াকে তুচ্ছ নজরে দেখতেন। তারা বলতেন, দুনিয়ার অস্থায়ী মজার পেছনে পড়ে লাভ কী? যেন এমন না হয় যে, এর কারণে আমরা আখেরাতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। যদি কোনো যুবকের মনে একথার উদয় হয়, তাহলে চিন্তা করুন, তার অন্তর কন্ট্রোল করা কত সহজ হবে। সে কী প্রবৃত্তির স্বাদের পেছনে দৌড়াবে? না; বরং যদি তার সামনে গুনাহের হাতছানিও আসে তবুও সে বেঁচে থাকবে এবং বলবে,

আমি ক্ষণস্থায়ী স্বাদের পেছনে দৌড়াব না। কেননা, এমনটি যেন না হয় যে, এর বদলে আমি আখেরাতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব।

ভারসাম্যপূর্ণ পথ

মুমিনের কাজ হলো, সে হালাল রিযিক লাভের চেষ্টা করবে এবং পরে বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিবে। আল্লাহ অনেক দিলে তার জন্য শুকরিয়া আদায় করবে আর যদি আল্লাহপাক অল্প রিযিক দেন, তাহলে সবর করবে। শোকর আদায়কারীও জান্নাতী এবং সবরকারীও জান্নাতী। মানুষের জন্য উভয় দিকে জান্নাত। মনে রাখবেন, ফলাফল আমাদের হাতে নয়। তা আল্লাহপাকের বরাদ্দ। আল্লাহপাক বলেন,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ

'আমি তাদের মাঝে রিযিক বন্টন করেছি।'[১]

আমরা আল্লাহর বরাদ্দ ও বন্টনের উপর খুশী থাকব। কেননা, হাদীছে এসেছে, দুনিয়াতে যে বান্দা অল্প রিযিক পায় এবং এতদসত্ত্বেও আল্লাহর উপর রাজী থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার দেওয়া অল্প রিযিকে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিলে। ফলে আজ আমি তোমার অল্প আমলে রাজী হয়ে গেলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত প্রদান করবেন।

তাই বলছিলাম, আল্লাহ যদি কাউকে প্রচুর রিযিক দেন, তাহলে সে শোকর আদায় করবে আর যদি তিনি কাউকে অল্প রিযিক দেন, তাহলে সে সবর করবে। এমন যেন না হয় যে, অল্প রিযিকহেতু মিথ্যা বলা শুরু করল অথবা ধোঁকা দিতে থাকল এবং অন্যের মাল অবৈধ পন্থায় হস্তগত করার চেষ্টা করল। পক্ষান্তরে সম্পদ বেশি পেলে সে যেন আল্লাহকে ভুলে না যায়। দেখুন, ইসলাম কেমন মধ্যপন্থা প্রদর্শন করেছে যে, মানুষের কাছে অর্থও থাকবে আবার তার মধ্যে বিনয়-নম্রতাও থাকবে।

সম্পদ ঈমানের জন্য ঢাল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেই টাকা-পয়সা কতই-না উত্তম, যা মানুষের আখেরাতের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা

---

১. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৩২

জানা গেল, দুনিয়ার সব কিছুই খারাপ নয়। কেননা, যে অর্থ-সম্পদ আখেরাত সাজানোর মাধ্যম হয়, তা মূলত দুনিয়া নয়; বরং আল্লাহর নেয়ামত। বরং এক ধাপ সামনে অগ্রসর হয়ে এই অধম বলি যে, বর্তমান যুগে টাকা-পয়সা মানুষের ঈমানের জন্য ঢালস্বরূপ।

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

'রিক্ততা এমন এক দুরবস্থা যা হতে পারে যে, তোমাকে কুফরিতে পৌঁছিয়ে দিবে।'

বিশ্বাস করুন, আমরা অনেককে কাফের হতে দেখেছি। তারা সম্পদহীনতার কারণে দুটি পয়সার জন্য স্বীয় মুসলমানি নাম পরিবর্তন করে কাফেরদের নামে নাম গ্রহণ করে। আপনারাও হয়ত জেনে থাকবেন, কয়েকটি দেশে ক্রমবর্ধমান জনবসতিতে মিশনারীরা কাজ করছে। মাসিক কিছু টাকা বেতন-ভাতা দেওয়ার বদলে তাদের নাম মুসলমান হতে খৃস্টানে পরিবর্তন করে ঈমানি দৌলত হতে বঞ্চিত করেছে।

মনে রাখবেন, আমরা পরীক্ষার যোগ্য নই। তাই আল্লাহর কাছে অর্থের স্বল্পতা হতে পানাহ চাইতে হবে এবং যাদেরকে আল্লাহপাক স্বচ্ছলতা দিয়েছেন, তারা এর জন্য শুকরিয়া আদায় করবে।

মাছরাঙ্গার মতো হোন

মাছরাঙ্গা একটি পাখি। এই পাখির বৈশিষ্ট্য হলো, সে পানিতে বসে। কিন্তু যখনই তার উড়ার সময় হয় পানি থেকেই উড়াল দেয়। এভাবে উড়তে তাকে কোনো বেগ পেতে হয় না। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, উড়তে তার এ কারণে অসুবিধা হয় না যে, মাছরাঙ্গা পানিতে বসলেও তার পায়ের পর এত মোলায়েম হয় যে, তা পানিতে ভিজে না। ফলে যখনই সে উড়তে চায়, তৎক্ষণাৎ উড়তে পারে। মুমিনের উচিত মাছরাঙ্গার মতো হওয়া। যদি অর্থ-সম্পদ পানির মতো ধরা হয়, তাহলে সে এই পানির মধ্যে থাকবে ঠিকই; কিন্তু নিজের পর ভিজতে দিবে না। যখন মৃত্যুর সময় আসবে, তখন সে মাছরাঙ্গার মতো উড়াল দিয়ে নিজের আসল বাড়ি যাবে।

ভালো খাদেম ও মন্দ মনিব

ধন-সম্পদ পানির মতো। নৌকা চলাচলের জন্য পানি জরুরি। কিন্তু নৌকা তখনই চলবে, যখন পানি নৌকার নিচে থাকবে। যদি পানি নিচে

থাকার পরিবর্তে নৌকার মধ্যে চলে আসে, তখন এই পানিই তার ডুবে যাওয়ার কারণ হবে। এর থেকে জানা যায়, হে মুমিন! তোমার ধন-সম্পদ পানির মতো এবং তুমি নৌকার মতো। যদি এই ধন-সম্পদ তোমার নিচে থাকে, তবে তা তোমার সাঁতরানোর মাধ্যম হবে। পক্ষান্তরে যদি ধন-সম্পদ তোমার দিলের মধ্যে চলে আসে, তখন এটা তোমার ডুবে যাওয়ার কারণ হবে। অতএব প্রমাণিত হলো, ধন-সম্পদ পকেটে থাকলে তা উত্তম সেবক। পক্ষান্তরে তা অন্তরে চলে এলে নিকৃষ্ট মনিব।

নিরুত্তরকারী প্রশ্ন

আমরা দেখেছি, যেব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যত বেশি খরচ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তত বেশি দান করেন। আপনাদের মধ্যে অনেকে প্রভাবশালী ও অর্থপতি আছেন। কেউই কী এমন লোকের সন্ধান দিতে পারেন, যিনি দীনি কাজে অনেক অর্থ ব্যয় করে দেউলিয়া হয়ে গেছেন? এমন একটি দৃষ্টান্ত ও কি পেশ করতে পারেন? আমি জানি, কারো পক্ষে এমন উদাহরণ পেশ করা সম্ভব নয়। কেননা, আমি কয়েকটি দেশের লোকের কাছে এই প্রশ্ন করেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এর জবাব দিতে পারেনি। এর বিপরীতে আমি এমন অনেক লোকের উদহারণ দিতে পারি, যারা দুনিয়া দুহাতে উপার্জন করে লাখপতি, কোটিপতি হয়েছে; কিন্তু অবশেষে দেউলিয়া হয়ে গেছে। এমন নজির অনেক আছে যে, কোটিপতি দেউলিয়া হয়ে গেছে। যারা দুনিয়া কামাই করে দুনিয়ার পিছেই ব্যয় করে, তাদেরকে দেউলিয়া হতে দেখেছি; কিন্তু দীনের জন্য অর্থ ব্যয় করে দেউলিয়া হওয়ার একটি উদাহরণও সারা বিশ্বে নেই। অতএব বোঝা গেল, যেলোক দীনের জন্য যত খরচ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তত বেশি দান করেন।

লাভজনক ব্যবসা

হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে একলোক ছিল। লোকটি ছিল গরীব। একদিন হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে লোকটির সাক্ষাত ঘটে। লোকটি বলল, হযরত! আপনি তো কালীমুল্লাহ এবং আপনি তুর পর্বতে যান। আল্লাহর সমীপে আমার পক্ষ হতে এই আবেদন রাখবেন, যেন তিনি আমার পুরো জীবনের রিযিক দিয়ে দেন, যাতে আমি কিছু দিন ভালোভাবে আনন্দ-ফুর্তি করতে পারি। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে ওই লোকের আবেদন পেশ করেন। আল্লাহপাক আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাকে কয়েকটি ছাগল,

গমের কিছু দানা এবং আরও যা কিছু তার ভাগে বরাদ্দ ছিল, তার সবই দিয়ে দেন।

এক বছর পর হযরত মূসা (আ.)-এর খেয়াল হলো, ওই লোকের কী হলো তা জানা দরকার। তিনি লোকটির বাড়িতে গিয়ে দেখেন, লোকটি একটি বিরাট অট্টলিকা বানিয়েছে। তার বন্ধুরা এসেছে। তাদের জন্য দস্তরখানা বিছানো হয়েছে। দস্তরখানে বিভিন্ন ধরনের খানা রয়েছে। মানুষ মজা করে খেয়ে ফুর্তি করছে। এসব দৃশ্য দেখে হযরত মূসা (আ.) খুবই বিস্মিত হলেন। এর কিছু দিন পর যখন তিনি আবার তুর পাহাড়ে যান এবং আল্লাহর সঙ্গে কথার বলার সুযোগ হয়, তখন তিনি বললেন, হে পরওয়ারদেগার! তুমি ওই লোকটিকে সারা জীবনের যে রিযিক দিয়েছিলে, তার পরিমাণ তো খুবই সামান্য ছিল। কিন্তু সে এই বিপুল ধন-সম্পদ ও অট্টলিকার মালিক হলো কীভাবে?

আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা! যদি সে ওই রিযিক নিজের জন্য শুধু ব্যবহার করত, তাহলে তো তার রিযিক ঠিক অতটুকুই ছিল, যা আমি তাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার সঙ্গে লাভের ব্যবসা করেছে। হযরত মূসা (আ.) জানতে চান, সেই ব্যবসা কীরূপ? আল্লাহ তা'আলা বললেন, সে রিযিক পেয়ে মেহমানদের খানা খাওয়াতে শুরু করে এবং আমার রাস্তায় ব্যয় করতে থাকে। আর আমার নিয়ম হলো, যেব্যক্তি আমার রাস্তায় এক টাকা খরচ করে, আমি তাকে কমপক্ষে দশ গুণ দান করি। যেহেতু ব্যবসায় তার লাভ অনেক হয়, তাই তার কাছে তুমি এত ধন-সম্পদ দেখছ।

দুটি বস্তু স্থিতিশীলতার কারণ

একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শুনুন। আল্লাহপাক পৃথিবীর মধ্যে দুটি বস্তুকে স্থিতিশীলতার কারণ বানিয়েছেন। ১. বায়তুল্লাহ শরীফ ২. অর্থ-সম্পদ। যেখানে কাবা শরীফকে স্থিতিশীলতার কারণ বলা হয়েছে, সেখান ইরশাদ হয়েছে–

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ

'আল্লাহ সম্মানিত গৃহ কাবাকে মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ বানিয়েছেন।'[১]

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৭৯

আর যেখানে অর্থ-সম্পদকে স্থিতিশীলতার কারণ বলা হয়েছে, সেখানে বলেছেন–

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ۝

'আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন বানিয়েছেন তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিয়ো না।'[১]

এখানে মুফাসসিরীনে কেরাম একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব লিখেছেন। আর তা হলো, বায়তুল্লাহ হলো মানুষের রূহানী যিন্দেগীর স্থিতিশীলতার কারণ আর ধন-সম্পদ মানুষের দৈহিক জীবনের স্থিতিশীলতার কারণ। এ কারণে যদি কাউকে আল্লাহপাক মাল দেন, তাহলে সে একে আল্লাহর নেয়ামত মনে করবে এবং এ সম্পদকে নিজের আখেরাত বানানোর কাজে ব্যয় করবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শান্তির রিযিক দান করুন। এমন সমম্পদ দিন, যা বিপদের কারণ হবে না এবং ওই মাল যেন আমরা আখেরাত বানানোর কাজে ব্যয় করতে পারি। আল্লাহপাক আমাদেরকে দুনিয়ার হাকীকত বোঝার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে প্রতিটি ক্ষণে আখেরাতের প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফীক দান করুন এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর মাকবুল বান্দাদের মধ্যে শামিল করুন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

১. সূরা নিসা : আয়াত ৫

'নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশমন; অতএব তাকে দুশমন হিসেবেই গ্রহণ করো।' –সূরা ফাতির : ৬

শয়তানের ধোঁকা

'ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, শয়তান আমাদের এমন দুশমন যে, সে কখনও ঘুষ নেয় না। অন্যান্য দুশমনদের হাদিয়া দিলে, ঘুষ দিলে নরম হয়ে যায় এবং শত্রুতা ছেড়ে দেয়। খোশামোদ-তোষামোদ করলেও বাগে চলে আসে। কিন্তু শয়তান এমন নিকৃষ্ট দুশমন যে, সে না ঘুষ নেয়, না তোষামোদ কবুল করে। কেউ বলতে পারে না যে, আমরা একদিন তাকে তোশামোদ করে কাবু করে ফেলব এবং সে আমাদের শত্রুতা ছেড়ে দিবে। শয়তান কখনও ছাড়বে না। কেননা, সে হলো ঈমানের ডাকাত। তার সার্বক্ষণিক চেষ্টা হলো, কীভাবে মানুষকে ঈমানহারা করবে।'

শয়তানের ধোঁকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

দ্বিতীয় বড় দুশমন

যদি মানুষ তার দুশমনকে চিনতে পারে, তাহলে তার হামলা থেকে বাঁচতে পারে। দৈহিক গোপন শত্রু ক্ষতিকর হলেও রূহানী দুশমন তার থেকেও বেশি ক্ষতিকর হয়ে থাকে। মানুষের জ্ঞান চলে গেলে সে মৃত্যুর মুখে পৌঁছে যায়। কিন্তু মানুষের রূহের উপর হামলা হলে সে জাহান্নামের মুখে চলে যাবে। মানুষের প্রথম বড় দুশমন হলো দুনিয়ার মহব্বত। এ ব্যাপারে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এ পর্যায়ে আলোচনা দ্বিতীয় বড় দুশমন শয়তানের ব্যাপারে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ!

শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা বোঝার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন-

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا

'নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরাও তাকে দুশমন মনে করো।'[১]

শয়তান এমন হতভাগা এবং অভিশপ্ত যে, সে আল্লাহরও দুশমন এবং আল্লাহর বান্দাদেরও দুশমন। শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা সম্পর্কে আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে। কেননা, চোর যখন জানে, গৃহস্থ আমার উপস্থিতি

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ৬

জানতে পেরেছে, তখন সে আর চুরি করতে ঘরে ঢোকে না। এমনিভাবে শয়তান যখন জানতে পারে, লোকটি আমার ধোঁকা-প্রতারণা ধরে ফেলেছে, তখন সে নিরাশ হয়ে যায়। তার পাতা ফাঁদ আর কাজে আসে না। এ কারণে ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর উপর স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। একটি কিতাবের নাম تلبيس ابليس (তালবীসে ইবলীস)। এটা ইমাম জাওযী (রহ.) কর্তৃক বিরচিত। কিতাবটি সংগ্রহ করে পড়া দরকার, যাতে জানা যায়, শয়তান কিভাবে আক্রমণ করে।

কুরআনের ভাষায় শয়তান প্রসঙ্গ

শয়তান যেহেতু মানুষের ভয়ংকর শত্রু, তাই পবিত্র কুরআনে এই শত্রুর ব্যাপারে বিশদ বিবরণ ও পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন–

كَانَ مِنَ الْجِنِّ

'সে জিনদের অন্তর্গত ছিল।'[১]

শয়তান এক কালে বড় আবেদ ছিল। জমিনের প্রতিটি অংশে তার সেজদার দাগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ইবাদাতের সুবাদে আল্লাহর দিকে অনেকখানি এগিয়েও গিয়েছিল। অধিক ইবাদাতের দরুণ তার নাম ও পরিচয় হয়ে গিয়েছিল طاؤس الملائكة (তাউসুল মালায়েকা)।

যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেন এবং বললেন, এ দুনিয়াতে আমার খলিফা হবে এবং ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন–

اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ

'তোমরা আদকে সেজদা করো।'[২]

তখন সমস্ত ফেরেশতা সেজদা করল; কিন্তু শয়তান সেজদা করল না।

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

'শয়তান অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং কাফেদের অন্তর্গত হয়ে গেল।'[৩]

---

১. সূরা কাহাফ : আয়াত ৫০
২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১১
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ৩৪

আল্লাহপাক জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সেজদা করলে না কেন? সে উত্তর দিল–

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾

'আমি তার চেয়ে উত্তম। আমাকে আপনি বানিয়েছেন আগুন থেকে আর তাকে বানিয়েছেন মাটি থেকে।'[১]

শয়তান তার উত্তম হওয়ার ব্যাখ্যা এভাবে দিল যে, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর আগুনের শিখা উপরের দিকে ওঠে। অথচ আদমকে আপনি বানিয়েছেন মাটি থেকে আর মাটির গতি হলো নিচের দিকে। অতএব, আমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ায় নিম্নমানের লোককে সেজদা করব কেন?

সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে শয়তান দুটি কাজ করল। প্রথমত সে ইজমার ব্যাপারে (সর্বসম্মত বিষয়ে) বিরোধিতা করল এবং এভাবে বলা যায় যে, সে দুনিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম বিরোধী হলো। অন্য কথায় সমস্ত ফেরেশতা যখন এক দিকে, তখন সে একা একদিকে গেল। শয়তান বলল, আল্লাহ! আপনি বলেছেন, আদমকে সেজদা করো। কিন্তু আমি করব না। আমি অপরের কথা মানব কেন? আমি কাউকে মানব না। আমি সেই কাজই করব, যা আমার অন্তরে আসবে।

দ্বিতীয় যে কাজটি শয়তান করল, তা হলো, সে মন্দ কিয়াস করল। সে কিয়াস করল, আমি আদম থেকে ভালো। অথচ ভালো তো সে-ই হয়, যাকে আল্লাহ ভালো বলেন। কিন্তু শয়তান এখানে ধোঁকা খেয়ে গেল। এখানে চিন্তার বিষয় হলো, সেসময় তার মাথায় কোন নেশা উঠেছিল? তখন তার মাথায় 'আমিত্ব'র নেশা চেপে বসেছিল। মদের নেশা মামুলি হয়; কিন্তু 'আমিত্ব'র' নেশা মারাত্মক।

শয়তান সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানালে আল্লাহ তা'আলা বললেন,

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ

'আমার দরবার থেকে বেরিয়ে যাও। নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত।'[২]

পাশাপাশি আরেকটি কথাও তাকে জানিয়ে দিলেন–

---

১. সূরা আরাফ : আয়াত ১২

২. সূরা হিজর : আয়াত ৩৪

إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

'কেয়ামত পর্যন্ত তোর উপরে আমার অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে।'[১]

আল্লাহ তা'আলা যখন শয়তানকে তাঁর দরবার থেকে বের করে দিলেন, তখন তার করুণ পরিণতির কথা জেনে ফেরেশতারা থরথর করে কাঁপতে থাকল।

শয়তান হলো হতভাগা ও বিতাড়িত। সে তখনও একথা শুনতে থাকে এবং তার রাগ হতে থাকে। আমরা চাই, সে রেগে যাক। আমরা যখন আল্লাহর পানাহ চেয়েছি, তখন আমাদের আর ভয় কিসের? সে এত বড় উদ্ধত যে, সে নিজের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে জেনেও বলল, হে আল্লাহ! আমাকে যখন আপনার দরবার থেকে বেরই করে দিলেন, তখন আমার একটি আবেদন পূরণ করুন।

এখানে ওলামায়ে কেরাম একটি সূক্ষ্ম কথা লিখেছেন। তা হলো, যেহেতু শয়তানের আল্লাহর মারেফাত অর্জিত ছিল, তাই স্বাভাবিকই তার জানা ছিল, আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ আছে দয়া, আরেকটি গুণ আছে ক্রোধ। উভয় গুণে তিনি সর্বদা গুণান্বিত। রাগের মুহূর্তেও আল্লাহ তা'আলা দয়াবান হন। তাই শয়তান ভাবল, যদিও আল্লাহ এ মুহূর্তে রাগান্বিত এবং তাঁর মেজাজ খারাপ, তথাপিও তাঁর মধ্যে দয়ার গুণও রয়েছে। ফলে এ সুযোগটা কাজে লাগাল। সে আবেদন জানাল–

رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

'হে আল্লাহ! আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দিন।'[২]

আল্লাহপাকের মধ্যে ঠিকই দয়া ছিল। তিনি আবেদন মঞ্জুর করে নিয়ে বললেন–

فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝

'ঠিক আছে; তোকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হলো।'[৩]

এখানে ওলামায়ে কেরাম একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব লিখেছেন। তা হলো, হাজারো রাগ এবং ক্রোধ সত্ত্বেও আল্লাহপাক শয়তানের মতো বিতাড়িত ও অভিশপ্তকে

---

১. সূরা সোয়াদ : আয়াত ৭৮

২. সূরা হিজর : আয়াত ৩৬

৩. সূরা হিজর : আয়াত ৩৭

যখন সুযোগ দিয়েছেন অর্থাৎ তার দু'আ কবুল করেছেন, তখন আমরা যদি আল্লাহর খুশি ও আনন্দের মুহূর্তে তার কাছে কোনো আবেদন জানাই, তাহলে তিনি কি সেই আবেদন রাখবেন না? অবশ্যই রাখবেন।

শয়তান চিন্তা করল, আদম জান্নাতে ঠাঁই পেল আর আমি সেখান থেকে বিতাড়িত হলাম, তাই যেভাবেই হোক আদমকেও জান্নাত থেকে বের করতে হবে। তারপর সে এ চেষ্টায় লেগে গেল। তার হাতে সময়ের কোনো কমতি ছিল না। তার মাত্র একটি কাজ করার ছিল। সে ভাবল, আমি কীভাবে আদমকে জান্নাত থেকে বের করতে পারি। ভেবে-চিন্তে সে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, আদমকে তো ফুসলানো কঠিন; কিন্তু তার স্ত্রী একজন মহিলা। আমি তার কাছে গিয়ে কসম দিয়ে আমার কথার প্রতি আস্থা তৈরি করব।

এদিকে আল্লাহপাক হযরত আদম (আ.)কে বলে দিলেন, তোমরা দুজন এ জান্নাতে থাকবে। কিন্তু অমুক গাছের ফল খাবে না। শয়তান আম্মাজান হযরত হাওয়া (আ.)-এর কাছে গেল এবং তাঁকে প্রস্তাব দিল, আমি কী আপনাকে এমন একটি কথা বলব, যা করলে আপনি চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকতে পারবেন? কেউ আপনাকে এখান থেকে বের করতে পারবে না? সাথে-সাথে আপনি এমন রাজত্ব পাবেন, যা কখনও আপনার থেকে অপসারিত হবে না। শয়তান আম্মাজানকে এই প্রস্তাব দিলে তিনি বিষয়টি হযরত আদম (আ.)কে জানালেন। কিন্তু হযরত আদম (আ.) বললেন, না; আল্লাহপাক আমাদের যা নিষেধ করেছেন, তা আমরা খেতে পারি না।

হযরত আদম (আ.) উক্ত নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে অস্বীকৃতি জানানো সত্ত্বেও শয়তান পিছু হটল না; বরং আরেকটি পয়েন্ট সামনে নিয়ে এল। শয়তান হযরত আদম (আ.)-এর সামনে এসে বলল, যখন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে গাছের ফল খেতে নিষেধ করেন, তখন আপনি অমুক গাছের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আল্লাহপাক তো বিশেষ করে সেই গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন আর আমি খেতে বলছি আরেক গাছের ফল। আপনি ওই বিশেষ গাছের ফল খাবেন না ঠিকই; কিন্তু অন্যান্য গাছের ফল তো খাবেন। হযরত আদম (আ.) বললেন, না, আমি খাব না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَقَاسَمَهُمَا

'শয়তান উভয়ের সামনে কসম করল।'[১]

---

১. সূরা আরাফ : আয়াত ২১

কেউ কসম দিয়ে কোনো কথা বললে ওই কথার প্রতি শ্রোতার আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। যেহেতু শয়তান বারবার কসম করে কথাটি বলল, তাই আম্মাজান হযরত হাওয়া (আ.)-এর অন্তরে খেয়াল জাগল, এটা জান্নাত এবং আমরা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ হয়ে আছি। যদি আমরা এই গাছের ফল খাই, তাহলে চিরদিনের জন্য আল্লাহর কাছাকাছি থাকতে পারব। একথা ভেবে আম্মাজান হযরত আদম (আ.)কে বারবার ফলটি খেতে অনুরোধ জানাতে থাকেন। একপর্যায়ে হযরত আদম (আ.) ও আম্মাজান হযরত হাওয়া (আ.) নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলেন। তখন তাঁদের মাথায় একথা মোটেও ছিল না যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করছি। কারণ, তাঁরা বুঝছিলেন, যে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন শুধু সেই গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে। এ দ্বারা অন্য গাছের ফল খাওয়া দোষের নয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কয়েক জায়গায় বলেন–

وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

'আমি আদমের মধ্যে গুনাহের ইচ্ছা পাইনি।'[১]

অর্থাৎ তাঁর অন্তরে একথা ছিল না যে, এটা আল্লাহর অবাধ্যতা এবং আমরা তাঁর অবাধ্যতা করছি।

হযরত আদম ও মা হাওয়ার সাক্ষাত

হযরত আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.) নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। আল্লাহপাক বললেন, হে আদম! এবার তোমাকে জান্নাত ছাড়তে হবে। হযরত আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.)কে দুনিয়াতে নামিয়ে দেওয়া হলো। হযরত আদম (আ.)কে নামানো হলো শ্রীলঙ্কার একটা পাহাড়ে। পাহাড়টা ছিল সবুজ-শ্যামল এবং সেখানে বাগিচাও ছিল। আর মা হাওয়াকে আফ্রিকার এব দেশে নামানো হলো। স্থানটি ছিল অনূর্বর। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাঁরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাঁদতে থাকেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হাদীছে এসেছে, তারা উভয়ে তিনশত বছর পর্যন্ত কাঁদতে থাকেন।

পরিশেষে হযরত আদম (আ.) শ্রীলঙ্কা হতে যাত্রা শুরু করেন আর এদিকে মা হাওয়া আফ্রিকা হতে রওনা হন। আরাফাতের ময়দানে 'জাবালে

---

১. সূরা ত্বোয়াহা, আয়াত : আয়াত ১১৫

রহমত' নামে একটি পাহাড় আছে। এক দিক দিয়ে হযরত আদম (আ.) পাহাড়ের উপরে ওঠেন আর অপর দিক দিয়ে ওঠেন মা হাওয়া (আ.)। ওই পাহাড়ের সর্বপ্রথম দুজনের সাক্ষাত ঘটে। এই পাহাড়কে 'জাবালে রহমত' এই কারণে বলা হয় যে, এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) এবং মা হাওয়া (আ.)-এর তাওবা কবুল করেছিলেন।

তাদের তাওবা কবুল হলে আল্লাহ তাদের অন্তরে একথার উদ্রেক করেন যে, আমরা বায়তুল্লাহ শরীফে যাই। ফলে যখন তারা আরাফা হতে মক্কা মুকাররামায় যান, তখন পথে মুযদালিফায় রাত হয়ে যায়। মুযদালিফা চাদরকে বলে। তখন তাদের কাছে একটি বড় চাদর ছিল। স্বামী-স্ত্রী একটি চাদরের নীচে ঘুমিয়ে যান। এ কারণে স্থানটির নাম হয়েছে মুযদালিফা।

তারপর হযরত আদম (আ.) আল্লাহর ঘর বানান। ওদিকে মা হাওয়া মারা যান। যেস্থানে তার ইন্তেকাল হয়, তার নাম হয় জিদ্দা। জাদ্দাহ অর্থ দাদী। মা হাওয়া (আ.)-এর কবর জেদ্দায় এখন বিদ্যমান।

এই বিস্তারিত কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, একথা বলা যে, শয়তান আমাদেরও দুশমন, আমাদের বাপ-দাদারও দুশমন। তার সামনে আমাদের শত্রুতা খান্দানি বা বংশানুক্রমিক। যুগ-যুগ ধরে এ দুশমনি চলতেই থাকবে।

মহিলাদের দুর্বলতা

আরেকটি কথাও শুনে রাখুন যে, শয়তান প্রথমে হযরত আদম (আ.) কে বিভ্রান্ত করেনি। কেননা, সে জানত, হযরত আদম (আ.) তার কথার ফাঁদে পড়বেন না। এ কারণে সে প্রথমে মা হাওয়াকে টোপ দেয় এবং বিভ্রান্ত করে। মহিলাদের দুর্বলতা হচ্ছে, তারা নিজেরা যেমন দ্রুত ফেঁসে যায়, তেমনি অন্যদেরও তাড়াতাড়ি ফাঁসাতে পারে।

শয়তানের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টির এক বিরল তরিকা

শয়তানের সঙ্গে আল্লাহর দুশমনি ব্যক্তিগত। এ কারণে আল্লাহপাক বলেছেন, শয়তান তোমাদেরও দুশমন, আমারও দুশমান। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে শয়তানের প্রতি বিদ্বেষ পয়দা করার জন্য কুরআন শরীফে বড়ই আজব তরিকার কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআনের একটি বড় সৌন্দর্য ও স্বকীয়তা হলো, যেখানে প্রভাব ফেলতে চায়, সেখানে সূক্ষ্মতা অবলম্বন করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বনী ইসরাঈলদের তাদের প্রতি অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিতে আজব তরিকা অবলম্বন করেছেন। বনী ইসলাঈদের প্রতি ফেরাউনের জুলুম-নির্যাতনের ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ফেরাউন ছোট মেয়েদের জিন্দা রাখত আর ছোট ছেলেদের জবাই করত। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে বনী ঈসরাঈলদের নিজের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন, তখন বললেন–

يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ

'ফেরাউন তোমাদের বাচ্চাদের হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত।'[১]

এখানে চিন্তার বিষয় হলো, ফেরাউন ছোট ছেলেদের হত্যা করত এবং ছোট মেয়েদের জীবিত রাখত। কিন্তু কুরআন শরীফে 'বাচ্চা'র স্থলে ছেলে এবং মেয়ে স্থলে মহিলা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর রহস্য কী? রহস্য হলো, যদি কাউকে একথা বলা হয় যে, সে তোমাদের পুরুষদের মেরেছে এতে এতটুকু রাগ হয় না, যতটুকু রাগ হয় একথা বললে যে, সে তোমাদের মাছুম পুত্রদের হত্যা করেছে।

কারণ, মাছুম বাচ্চার কথা বললে সকলের রাগ হয়। এমনিভাবে যদি এভাবে বলা হয় যে, সে তোমাদের মাছুম মেয়েদের জীবিত রেখেছে, তাহলে এতে এতটুকু রাগ হয় না, যতটুকু রাগ হয় একথা বললে যে, সে তোমাদের নারীদের জীবিত রেখেছে। এ কারণে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বাচ্চাদের জন্য ابن শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে শ্রোতার অন্তরে আত্মমর্যাদাবোধ জাগে এবং মেয়ের জন্য بنت এর পরিবর্তে نساء শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ উথলে ওঠে।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে শয়তানের প্রতি দুশমনি পয়দা করার জন্য কুরআন শরীফে বলেছেন, শয়তান তোমাদের দুশমন। তারপর বলেছেন–

كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

'যেমনিভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছে।'[২]

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ৪৯

২. সূরা আরাফ : আয়াত ২৭

অপর স্থানে আল্লাহপাক বলেন,

يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا

'সে তাদের থেকে তাদের পোশাক খুলেছে।'[১]

শয়তানের প্রতি অন্তরে দুশমনি পয়দা করার এ এক অভিনব পদ্ধতি। একথাটি আপনাদের একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝাতে চাই, যাতে বিষয়টি সহজে বুঝে আসে।

মনে করুন, আপনার পিতামাতা কারো ঘরে আছে। এখন একলোক এসে বাড়ির মালিককে বলল, তাদের ঘর হতে বের করে দাও। পরে আপনি জানতে পারলেন, অমুক আপনার পিতামাতাকে গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, তাহলে একথা শুনে আপনার রাগটা কেমন হবে? এর চেয়েও বেশি রাগ হবে একথায় যে, যদি কারো পিতামাতাকে কেউ ধরে আর অন্য লোক এসে বলে যে, তাদেরকে বস্ত্রহীন করে দাও। এবার যদি সন্তানকে কেউ জানায়, তোমার পিতামাতাকে অমুকে ধরেছিল আর অমুকে পরামর্শ দিয়েছিল, তাদের পরনের কাপড়ও খুলে দাও। এখন বলুন, একথা শুনে সন্তানের রাগটা কোন মাত্রার হবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক উভয় কথা-ই বলে দিয়েছেন, যাতে এটা জানার পরে রাগে সারা শরীর জ্বলে ওঠে এবং একমাত্র আল্লাহর হয়ে যায়; শয়তানের ধারে-কাছেও না যায়।

ব্যক্তিগত দুশমনের জন্য ব্যক্তিগত নাম ব্যবহার

যেহেতু শয়তানের সঙ্গে আল্লাহর শত্রুতা ব্যক্তিগত, তাই আল্লাহপাক স্বীয় সত্তার কাছে শয়তান হতে পানাহ চাওয়ার জন্য যে 'পানাহরীতি' আমাদের শিখিয়েছেন, সেখানে গুণবাচক নাম ব্যবহার করেননি; বরং সেখানে শুধু আল্লাহর ব্যক্তিনাম রয়েছে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

এ হলো تعوذ বা আল্লাহকর্তৃক শিক্ষা দেওয়া পানাহবাক্য। মুফাসসিরগণ লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা পানাহবাক্যে সত্তাগত নাম এজন্য ব্যবহার করেছেন যে, তিনি বলতে চান, হে আমার বান্দা! বিতাড়িত শয়তান হলো

---

১. সূরা আরাফ : আয়াত ২৭

আমার ব্যক্তিগত শত্রু। যখন তার থেকে তোমাদের পানাহ চাইতে হবে, তখন আমার নাম নিয়ে ডাকবে; তাহলে আমি তোমাকে তার কবল থেকে রক্ষা করব।

যদি কেউ সকালে দশবার আউযু বিল্লাহ পড়ে, তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর সন্ধ্যায় দশবার পড়লে সকাল পর্যন্ত সে শয়তানের অনিষ্ট হতে হেফাযত থাকবে।

শয়তান সৃষ্টির রহস্য

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, যখন শয়তান আল্লাহ ও আমাদের এত বড় দুশমন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর হলো–

فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَايَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ

'জ্ঞানীর কোনো কাজ বিজ্ঞতা হতে মুক্ত হয় না।'

আল্লাহপাক শয়তানকে যে সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যেও বহু রহস্য ছিল। কয়েকটি নিম্নরূপ–

১। একটি রহস্য হলো, যদি পৃথিবীতে হযরত আদম (আ.)কে বাতিলের প্রতি আহ্বান করার মতো কেউ না হতো, তাহলে হকের পথে আসার যে বিশাল প্রতিফল রয়েছে, তা আল্লাহ কীভাবে দিতেন? মূলনীতি হলো, যদি কোনো খারাপ শক্তি থাকে আর কেউ যদি তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাকে বলা হয়, শাবাশ! তুমি পুরস্কারের উপযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, সে আদম (আ.) ও বনী আদমকে আমার পথ থেকে দূরে সরাতে চেষ্টা করবে; কিন্তু বান্দা তার কথা শোনার পরিবর্তে আমার কথায় সাড়া দিবে। পরে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন আমি আমার কথা শোনার কারণে তাকে চিরকালের শান্তিময় স্থান জান্নাত প্রদান করব।

২। দেখুন, যদি আগুন না থাকত, তাহলে খোশবুদার উদের সুগন্ধি কীভাবে প্রকাশ পেত! উদকে আগুনে জ্বালালে তবেই তা হতে সুগন্ধি ছড়ায়। যেমনিভাবে আগুন সৃষ্টি হওয়ায় আমরা উদের সুগন্ধির সন্ধান পেয়েছি, তেমনি শয়তান সৃষ্টির ফলে আমরা সৎকাজ করার প্রতিদানের সন্ধান পেয়েছি। এটি হলো দ্বিতীয় হিকমত।

৩। ওলামায়ে কেরাম শয়তান সৃষ্টির একটি তাৎপর্য এ-ও বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ যদি দুনিয়ায় আসত আর শয়তান না থাকত, আর মানুষ নফসের কারণে মন্দ কাজ করত, তাহলে তার ক্ষমা লাভের সুযোগ শেষ হয়ে যেত এবং বলা হতো, সে নিজেই অপরাধ করেছে। অতএব ক্ষমার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু এর বিপরীত শয়তানকে যেহেতু সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সে নিজেও আক্রমণ করে, তাই আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন যাদের ক্ষমা করতে চাইবেন, তাদের সমস্ত পাপ-তাপ শয়তানের মাথায় চাপিয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার এসব বান্দাকে শয়তান বিভ্রান্ত করেছিল, তাই আমি এদের মাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করাচ্ছি।

শয়তানের উপর অভিযোগ আরোপ

আপনি যদি কুরআন শরীফ মনোযোগ দিয়ে পড়েন, তাহলে জানবেন, আল্লাহ তা'আলা যেখানেই নেক বান্দাদের আলোচনা করেছেন এবং তাদের থেকে কোনো অনুত্তম কাজ প্রকাশ পেয়েছে, সেখানেই তিনি বিষয়টি শয়তানের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন।

এমন কয়েকটি উদাহরণ দেখুন।

১। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا

'শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।'[১]

এখানে আল্লাহপাক পাপের দায় হযরত আদম ও মা হাওয়া (আ.)-এর কাঁধে চাপাননি; বরং শয়তানকে অভিযুক্ত আখ্যা দিয়েছেন।

২। আল্লাহপাক অপর স্থানে উল্লেখ করেন–

وَمَا أَنْسَانِيهُ الشَّيْطَانُ

'তারপর শয়তান ঝগড়া লাগিয়ে দেয়।'[২]

এসব আয়াতে খেয়াল করুন। যদিও গুনাহ বিভিন্নজন থেকে প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি অভিযোগ আরোপ না করে শয়তানকে সকল অনিষ্টের গুরু সাব্যস্ত করেছেন।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ৩৬

২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১০০

শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার নির্দেশ

আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

'হে বনী আদম! আমি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদাত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? এবং আমার ইবাদাত করো। এটিই সরল পথ।'[১] আরেক স্থানে বলেছেন,

إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ

'নিশ্চয় সে বিভ্রান্তকারী প্রকাশ্য শত্রু।'[২]

কোথাও আল্লাহপাক বলেছেন,

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

'সে যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা না দেয়।'[৩]

غرور শব্দটি আধিক্যবোধক। অর্থাৎ অতি প্রবঞ্চক। এতে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। তার কাজই মানুষকে প্রতারিত করে কুফর ও গুনাহে লিপ্ত করা। 'শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা না দেয়।' এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিপ্ত করে না দেয়। তখন তোমাদের অবস্থা হবে, তোমরা গুনাহ করার সাথে মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয় এবং তোমাদের শাস্তি হবে না।

এসব আয়াতে আল্লাহপাক সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তোমাদেরকে অবশ্যই শয়তানের ধোঁকা হতে বাঁচতে হবে এবং আমার বান্দা হয়ে জীবন যাপন করতে হবে।

রহমান ও শয়তানের আলাপ

শয়তান আল্লাহর পক্ষ হতে কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত লাভ করে বলে–

رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

---

১. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৬০, ৬১

২. সূরা কাসাস : আয়াত ১৫

৩. সূরা ফাতির : আয়াত ৫

'হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন আমি তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব।'[১]

সামনে সে আরও বলে–

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

'আপনি তাদের বেশির ভাগকে অকৃতজ্ঞ পাবেন।'[২]

আল্লাহপাক শয়তানের কথার জবাবে বললেন–

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

'যারা আমার বান্দা হবে, তাদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা চলবে না।'[৩]

ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ্ হতে হেফাযত

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, নেক বান্দাদের থেকে কখনও কোনো গুনাহ হবেই না। বরং মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, আল্লাহর একথার মতলব হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যারা আমার খাস বান্দা হবে, শয়তান তাদের দ্বারা এমন কোনো গুনাহ্ করাতে পারবে না, যা ক্ষমার অযোগ্য। সুতরাং ঈমানদার বান্দা অসর্তকতাবশত যদি কোনো গুণাহ্ করেও ফেলে, তবে তা ক্ষমার যোগ্য হবে। তাওবার দরজা সদা খোলা থাকে। যখনই সে তাওবা করবে, আল্লাহ্ তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।

শয়তানের প্রাথমিক চেষ্টা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ

'শয়তান মানুষের কলবের প্রতি মুখ করে বসে থাকে। যখন মানুষ যিকিররত থাকে, তখন শয়তান পিছে হটে যায় আর যখন সে গাফেল থাকে, তখন শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেয়।'[৪]

---

১. সূরা হিজর : আয়াত ৩৯
২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭
৩. সূরা হিজর : আয়াত ৪২
৪. বুখারী, মেশকাত : আয়াত ১৯৯

শয়তানের সবচেয়ে বিধ্বংসী অস্ত্র

দুনিয়ার নিয়ম হলো, যখন কেউ স্বীয় শত্রুর উপর প্রবল হয়, তখন সে তাকে দুহাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে, যাতে সেসময় যদি তার কাছে এমন কোনো ক্ষতিকর বস্তু থাকে, যার দ্বারা সে ক্ষতি করতে পারে, তখন তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তার হাত খালি করে দেওয়া হয়।আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ

'শয়তান তাদের উপর প্রবল হয় এবং সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়।'[১]

যিকরুল্লাহ তথা আল্লাহর স্মরণ শয়তানের জন্য একটি বিধ্বংসী অস্ত্র। এজন্য সুযোগ পেলেই শয়তান মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়।

ফরেস্ট ডিফেন্স লাইনের হেফাযত

এমনকি শয়তান নামাযের পূর্বেও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন–

إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

'শয়তান চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে।'[২]

এখানে আল্লাহ তা'আলা আগে 'আল্লাহর স্মরণ' ও পরে নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। এর থেকে জানা যায়, মানুষ প্রথমে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল হয়, তারপর নামায থেকে গাফেল হয়। এ কারণে বুদ্ধিমান তো সে, যে শত্রুকে বাউন্ডারী লাইন থেকে দূরে রাখে। প্রত্যেক দেশের একটি ফরেস্ট ডিফেন্স লাইন থাকে আর একটি হয় সেকেন্ড ডিফেন্স লাইন। চেষ্টা এটাই থাকে যে, শত্রু যেন ফরেস্ট ডিফেন্স লাইনের বাইরে থাকে। যদি শত্রু

---

১. সূরা মুজাদালাহ : আয়াত ১৯

২. সূরা মায়েদা : আয়াত ৯১

ফরেস্ট ডিফেন্স লাইন অতিক্রম করে যায়, তখন সে দ্বিতীয় লাইনের কাছেও পৌঁছে যায়।

যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর স্মরণ হলো ফরেস্ট ডিফেন্স লাইন। যদি আমরা আল্লাহর স্মরণ বেশি-বেশি করি, তাহলে বিতাড়িত শয়তান এমনিই আমাদের থেকে দূরে থাকবে। আর যদি আমরা গাফেল হয়ে যাই, তাহলে সে ফরেস্ট ডিফেন্স লাইন ক্রস করে দ্বিতীয় ডিফেন্স লাইন তথা নামাযের কাছে চলে আসবে এবং আমাদের নামাযকেও বরবাদ করতে থাকবে। এজন্য চেষ্টা করবে আল্লাহর যিকির বেশি করে করার জন্য, যাতে যিকিরের বরকতে আমরা শয়তানের চালবাজি ও ধোঁকা থেকে বাঁচতে পারি। নিঃসন্দেহে এমনটি হয়। এর প্রমাণস্বরূপ পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পেশ করা যেতে পারে। আল্লাহপাক বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ

'নিঃসন্দেহে আমার যেসব বান্দা মুত্তাকী হয়, যখন তাদের উপর এক প্লাটুন শয়তান আক্রমণ করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে শয়তানের ধোঁকা হতে বাঁচিয়ে দেন।'[১]

এ থেকে জানা গেল, শয়তান থেকে বাঁচার জন্য মুমিনের বড় হাতিয়ার হলো যিকরুল্লাহ। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা যিকিরের কোনা সীমা নির্ধারণ করে দেননি। আল্লাহপাক বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি-বেশি আল্লাহর যিকির কর।'[২]

অধিক যিকিরের সংজ্ঞা

প্রশ্ন হতে পারে, অধিক যিকির কাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েও আল্লাহপাক একটি মোটা কথা বলে দিয়েছেন। আর তা হলো–

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আমাকে স্মরণ করে।'[৩]

---

১. সূরা আরাফ : আয়াত ২০

২. সূরা আহযাব : আয়াত ৪১

৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯১

অধিক যিকিরের ব্যাখ্যা হলো, আমরা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করব এবং মনে আল্লাহর ধ্যান রাখব। যখন অন্তরে 'আল্লাহর স্মরণ' এসে যাবে, তখন মানুষের অন্তর শয়তানের আক্রমণ থেকে হেফাযত থাকবে।

এক অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই

শয়তান মানুষকে দেখে; কিন্তু মানুষ শয়তানকে দেখতে পারে না। এখানে হয়ত কোনো ছাত্রের মাথায় এই প্রশ্ন আসতে পারে, দুই লোকের মাঝে মোকাবেলা হলে একজন অপরজনের সামনে থাকে। কিন্তু শয়তানের সঙ্গে মানুষের লড়াই আজব ধরনের। শয়তান মানুষকে দেখলেও মানুষ তাকে দেখতে পারে না। ওই পাপিষ্ট এ মুহূর্তেও আমাদেরকে দেখছে যে, আমরা মসজিদে বসা আছি এবং তার বুকে আগুন জ্বলছে। সে চিন্তা করছে, আমি তাকে কতভাবে বোঝালাম, এ বছর ইতেকাফে না বসে আগামী বছর বসবে; কিন্তু সে আমার কথা না শুনে এ বছরই বসে গেল।

ওলামায়ে কেরাম এই ছাত্রসুলভ প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, যেহেতু সে আমাদের দেখে এবং আমরা তাকে দেখি না, তাই আমাদের না দেখতে পারার কারণে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সাহায্য আমাদের পক্ষে করে দিয়েছেন। যদি আমরাও তাকে দেখতে পেতাম, তাহলে মোকাবেলা সমানে-সমান হতো। তার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হতো। তাই এর মধ্যেই হেকমত নিহিত ছিল যে, মানুষ তাকে দেখার শক্তি রাখবে না। শুধু এতটুকুই বলে দিয়েছেন যে, বিতাড়িত শয়তান থেকে বাঁচতে চাইলে আমার নাম ধরে ডাক দিবে। তুমি তার সঙ্গে লড়াই করে পারবে না; বরং আমিই তোমাদেরকে তার হাত থেকে রক্ষা করব। যেমন পিতামাতা ছোট বাচ্চার হাতে লাঠি দেয় না; বরং তারা তাকে বলে, বৎস! কেউ তোমাকে কিছু বললে আমাকে বলবে। আল্লাহ তা'আলা ঠিক এমনটি করেছেন।

বান্দাকে শয়তান দেখার শক্তি দেননি। পরে একেই বাহানা বানিয়েছেন যে, আমার বান্দা! তুমি শয়তানকে দেখ না; কিন্তু সে তোমাকে দেখতে পায় এবং দেখে-শুনে আক্রমণ করে। তাই যখন তুমি ওই বিতাড়িত শয়তান হতে বাঁচতে আমাকে ডাকবে, তখন আমি নিজেই তোমাকে শয়তানের অনিষ্ট হতে রক্ষা করব। এ কারণে যখন আমরা لاحول ولا قوة الا بالله পড়ি, তখন শয়তান পালিয়ে যায়; বরং পালানোর সময় তার পায়ুপথ থেকে বাতাসও বের হয়ে যায়।

দুই বন্ধু ছিল। একজন আরেকজনের সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখল, সে নামায পড়ছে। ফলে বন্ধু চলে গেল। পরে যখন পরস্পরের সাক্ষাত হলো, তখন আগত বন্ধু বলল, বন্ধু! আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম; কিন্তু তুমি নামায পড়ছিলে। দুই বন্ধুর মাঝে গভীর হৃদ্যতা ছিল। অপর বন্ধু বলল, তবে এসে আবার চলে গেলে কেন? আমি কী لاحول ولاقوة পড়েছিলাম?

আমাদের কর্তব্য হলো, যখন কোনো গুনাহের খেয়াল মনে জাগবে, তখন لاحول ولاقوة الا بالله পড়ব। যেমনটি হযরত ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন–

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ

'বললেন, আমি আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি।'[১]

আমাদেরও উচিৎ গুনাহের খেয়াল আসতেই আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া। তাহলে আল্লাহপাক আমাদের রক্ষা করবেন। সুতরাং শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে বাঁচার সহজ পদ্ধতি হলো মাথায় ও মনে গুনাহের কল্পনা এলে তাকে মাথায় ঠাঁই না দেওয়া; বরং তৎক্ষণাৎ لاحول ولا قوة الا بالله পড়া। তাহলে শয়তান পালিয়ে যাবে। আর সে পালিয়ে গেলে ওয়াসওয়াসাও দূর হয়ে যাবে।

শয়তান ও নফসের কুমন্ত্রণা বোঝার উপায়

একটি ইল্‌মি তত্ত্ব শুনুন। মানুষের মনে গুনাহের যে খেয়াল উদয় হয়, তা কখনও শয়তানের পক্ষ হতে হয় আবার কখনও নফসের পক্ষ হতে হয়। এই নফ্‌সটাও বড় মারাত্মক; বরং একটা মহাবদমাশ। তার প্রসঙ্গেও আলোচনা আসবে। এখন আলোচনা চলছে শয়তানের প্রসঙ্গে।

চিন্তার বিষয় হলো, বান্দা কীভাবে বুঝবে, এই খেয়ালটি শয়তানের পক্ষ হতে নাকি নফসের পক্ষ হতে? এটা যাচাইয়ের সহজ পদ্ধতি হলো, যদি কোনো কুমন্ত্রণা অন্তরে আসে আর আউযুবিল্লাহ বা লা হাওলা পড়া হয়, তাহলে যদি সেটা শয়তানের পক্ষ হতে হয়, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে দূর হয়ে যাবে। আর যদি আউযুবিল্লাহ বা লা হাওলা পড়া সত্ত্বেও অন্তরে গুনাহের খেয়াল পূর্ববৎ রয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে, এটা শয়তানের পক্ষ থেকে নয়; বরং মানুষের ভেতরের নফসের পক্ষ হতে।

শয়তানের ধোঁকা আজব ও অভিনব, যার দ্বারা সে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এই নিয়মটি আপনার জানা থাকলে আপনি সহজেই ধরতে পারবেন, শয়তান

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৩

আপনাকে প্রবঞ্চনা দিচ্ছে কি-না? তখন আপনি আর ধোঁকা খাবেন না। কমপক্ষে আপনার এতটুকু অবশ্যই জানা হবে যে, ঘটনা কী ঘটেছে?

শয়তানের একটি চেষ্টা হলো, মানুষকে বড় নেক কাজ হতে সরিয়ে ছোট নেক কাজের দিকে নিয়ে আসে। যেমন– যে কাজ করলে এক লাখ ছাওয়াব হতো, শয়তান ওই কাজ থেকে ফিরিয়ে তাকে এমন নেক কাজে লাগিয়ে দেয়, যাতে মাত্র একশ নেকী হয়, যাতে সে বেশি লাভবান না হতে পারে।

তাহাজ্জুদের মধ্যে শয়তানের জাগিয়ে দেওয়া

এক বুযুর্গ সম্পর্কে এসেছে, এক রাতে তার তাহাজ্জুদ নামায ছুটে যায়। তিনি এই আফসোসে সকালে উঠে আল্লাহর কাছে কেঁদে-কেঁদে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এর কিছু দিন পরে বুযুর্গ আবার এক রাতে ঘুমিয়ে পড়েন। সারা দিন জিহাদে লিপ্ত থাকার কারণে রাতে তিনি প্রচুর ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার উপক্রম হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় একব্যক্তি এসে বুযুর্গকে জাগিয়ে দিল এবং বলল, হযরত! উঠুন এবং জলদি তাহাজ্জুদ পড়ুন। তাহাজ্জুদের সময় চলে যাচ্ছে। বুযুর্গ লাফ দিয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, তুমি আমার বড়ই হিতাকাঙ্ক্ষী। কেননা, তুমি ঠিক সময়ে আমাকে জাগিয়ে দিয়েছ। তবে আমি জানতে চাই, তুমি কে? লোকটি বলল, আমি শয়তান। বুযুর্গ বললেন, শয়তান তো কাউকে তাজাজ্জুদ পড়ার জন্য জাগায় না, তাহলে তুমি আমাকে জাগিয়ে দিলে কেন? তুমি তো কারো ভালো চাও না। শয়তান বলল, আমি আজও আপনার ভালো চাইনি। বুযুর্গ বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি আমাকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে দিলে আবার বলছ, আজও ভালো চাইনি- তাহলে এ জাগানোর রহস্য কী? শয়তান বলল, আপনাকে জাগিয়ে দেওয়ার কারণ হলো, কিছুদিন পূর্বে একবার আপনার তাহাজ্জুদ কাজা হয়ে গিয়েছিল। তখন আপনি এর জন্য এত কেঁদেছিলেন যে, এই কাঁদার কারণে আপনার এত ছাওয়াব লাভ হয়, যা সারা বছর তাহাজ্জুদ পড়েও লাভ হয় না। আজও আপনার তাহাজ্জুদ কাজা হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আমি চিন্তা করলাম, আজও যদি আপনার তাহাজ্জুদ ছুটে যায় আর আপনি তার জন্য আগের দিনের মতো ক্রন্দন করেন, তাহলে আপনি আবার পূর্বের মতো বিশাল ছাওয়াব লাভ করবেন। তাই এটাই ভালো মনে করি যে, আপনাকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে দিই এবং আপনি মাত্র এক রাতের তাহাজ্জুদের ছাওয়াব পান।

শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা

এক বুযুর্গ একটি দেওয়ালের কাছে খাট বিছিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। তার নিকট শয়তান এল এবং তাকে জাগিয়ে দিল। বুযুর্গ জানতে চাইলেন, কী হয়েছে? শয়তান বলল, এই দেওয়ালটা এখনই ভেঙে পড়বে, আপনি এখনই এক দিকে সরে যান। বুযুর্গ দ্রুত দেওয়ালের নিকট থেকে সরে গেলেন। বুযুর্গ সরে যেতেই দেওয়ালটা ভেঙে পড়ল। বুযুর্গ বললেন, ভাই! তোমার কল্যাণ হোক! তুমি আমার বড়ই হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনার পরিচয়টা বলবেন কি? শয়তান বলল, আমি শয়তান। বুযুর্গ বললেন, শয়তান তো জীবনে কারো উপকার করে না, তাহলে তুমি আমার উপকার করলে কেন? শয়তান বলল, আমি আজও আপনার উপকার করিনি।

বুযুর্গ অবাক হয়ে বললেন, তুমি আমাকে দেওয়ালে চাপা পড়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছ; তারপরও বলছ আমার কল্যাণ করনি? বিষয়টি খুলে বলো। শয়তান বলল, এখানেই আমার ওস্তাদগিরি, এটাই আমার কারিশমা! যদি আপনি স্বস্থানে ঘুমিয়ে থাকতেন আর দেওয়ালটা পড়ে যেত, তাহলে আপনি দেওয়ালে চাপা পড়ে মারা যাওয়ায় শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতেন। আমি আপনাকে আগেই জাগিয়ে দিয়েছি, যাতে আপনি সরে যান এবং দেওয়ালচাপায় মারা গিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে না পারেন।

দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরাতে শয়তানের কারসাজি

শয়তান সুখময় দাম্পত্য সম্পর্ককে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। সে চায়, স্বামী স্ত্রীর মাঝে তিক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক এবং দাম্পত্য সম্পর্ক বরবাদ হোক। শয়তান স্বামীদের দেমাগ খারাপ করে দেয়। তাই স্বামীরা ঘরের বাইরে গোলাপ ফুলের মতো সুন্দর থাকে। কিন্তু যেইমাত্র ঘরে ঢোকে, অমনি বাঘে পরিণত হয়ে যায়। যুবকরা এসে আমাকে বলে, হযরত! কেন জানি না, বাড়িতে এলেই মাথাটা গরম হয়ে যায়। স্বামীদের মাথা গরম করে শয়তান। সে স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরাতে চায়।

শয়তান প্রকাশ্যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি করে স্বামীর মুখ থেকে তালাক শব্দ বের করিয়ে ছাড়ে। যখন তার মাথা ঠাণ্ডা হয়, তখন সে বলে, আমি তো রাগের মাথায় তালাক বলেছি। সুতরাং পরে তারা বিষয়টি কাউকে না বলেই নিজেরা স্বামী-স্ত্রীর মতোই ঘর-সংসার করতে থাকে। মনে রাখবেন, তালাক দেওয়ার পরে স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরে মিলিত হতে থাকে,

তাদের যিনার গুনাহ হতে থাকবে। এবার দেখুন, শয়তান কত বড় গুনাহে জড়িয়ে দিল। সে এমনি অপকর্ম করে থাকে।

হাদীছে এসেছে, কেয়ামতের একটি আলামত হলো, স্বামীরা স্ত্রীকে তালাক দিবে এবং পুনরায় বিবাহ করা কিংবা স্ত্রীকে রুজু করা ছাড়াই তাদের নিয়ে ঘর-সংসার করতে থাকবে।

শয়তানের এক আঙুলের অনিষ্টতা

একবার শয়তানের সঙ্গে একলোকের সাক্ষাত হয়। লোকটি বলল, পাপিষ্ট! তুই বড়ই বদমাশ। দুনিয়াতে তুই বিপর্যয় সৃষ্টি করে রেখেছিস। তুই যদি একস্থানে বসে থাকতি, তবে দুনিয়া নিরাপদ হয়ে যেত। শয়তান জবাবে বলল, আমি কিছুই করি না, শুধু আঙুল লাগাই মাত্র। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, খুলে বল, বুঝলাম না। শয়তান বলল, তবে নিজের চোখে দেখে এসো।

নিকটেই একটি মিষ্টির দোকান ছিল। সেখানে একটি পাত্রে মিষ্টির ঝোল ছিল। শয়তান মিষ্টির ঝোলে একটি আঙুল ডুবিয়ে তা দেওয়ালের গায়ে লাগিয়ে দিল। একটু পরেই মাছি এসে সেখানে বসল। মাছি দেখে একটা টিকটিকি এল। সেখানে একলোক কাজ করছিল। সে টিকটিকি দেখে জুতা দিয়ে তাকে মারল। জুতা দেওয়ালে লেগে মিষ্টির মধ্যে এসে পড়ল। জুতা মিষ্টির পাত্রের মধ্যে পড়তে দেখে মিষ্টির দোকানদার দাঁড়িয়ে গেল এবং রাগে ফেটে পড়ে বলল, এই হতভাগা! তুই আমার মিষ্টান্নে জুতা মারলি কেন? এ দিক আয়। তারপর শুরু হয়ে গেল দুজনের ঝগড়া। এদিক দিয়ে জুতাওয়ালার বন্ধুরা এল আর ওদিক দিয়ে এল মিষ্টির দোকানদারের সঙ্গীরা। পরিশেষে এমন ঝগড়া ও গন্ডগোল বেঁধে গেল, যা বলার নয়। এবার শয়তান ওই লোককে বলল, দেখো, আমি কি বলিনি, আমি শুধু একটি আঙুল লাগাই।

যখন তার মাত্র একটা আঙুলের অনিষ্টতা এত মারাত্মক, তখন সে নিজে কতখানি জঘন্য!

ইল্‌ম থেকে বিরত রাখা শয়তানের কাছে বড়ই প্রিয়

এক হাদীছে একটি ঘটনা এসেছে। ঘটনাটি হলো, শয়তান সমুদ্রের পানির উপর সিংহাসন স্থাপন করে সেখানে তার দরবার বসায়। শয়তান তার চেলা-চামুন্ডাদের ডেকে তাদের থেকে সারা দিনের কারগুজারি শোনে। একজন বলে, আমি অমুক খারাপ কাজ করিয়েছি। আরেক শয়তান বলে,

আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তালাক সংঘটিত করেছি। শয়তান তাকে এ কাজের জন্য বাহবা দেয় এবং বলে, তুমিই কাজের কাজ করেছ। তারপর তাকে নিজের কাছে বসিয়ে সম্মান দেয়। যখন একে-একে সবাই কারগুজারি শোনায়, তখন শয়তান দেখে, এক ক্ষুদ্র শয়তান এক কোণে বসে আছে। শয়তান তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কী করেছ? সে বলে, আমি একটি ছোট কাজ করেছি। আর তা হলো, একটি ছোট তালেবে ইল্‌ম বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। তার মা তাকে পড়ার জন্য মাদরাসায় পাঠিয়েছিল। আমি তাকে বোঝাই, মাদরাসায় গিয়ে কী হবে? তার চেয়ে অমুক স্থানে গিয়ে খেলা কর। ফলে আমার ধোঁকায় পড়ে ছেলেটি মাদরাসায় পড়তে যাওয়ার পরিবর্তে খেলতে লেগে যায়। সারা দিন সে খেলায় কাটিয়ে পড়ে বাড়ি ফিরে।

শয়তান এ বৃত্তান্ত শুনে আনন্দে গদগদ হয়ে বলে, তুমি এমন একটি বড় কাজ করেছ, যা আর কেউ করতে পারেনি। পরে শয়তান এই ছোট চেলাকে পুরস্কার প্রদান হিসেবে তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়।

এ হাদীছ থেকে জানা গেল, ইল্‌ম হতে বিরত রাখা শয়তানের বড়ই প্রিয় কাজ। কেননা, সে জানে, যদি কেউ ইল্‌ম অর্জন করে, তাহলে সে আমার ধোঁকা থেকে পার পেয়ে যাবে। এ কারণে যারা ইল্‌ম হাসিল করে এবং সুন্দর জীবন কাটায়, তারা আল্লাহপাকের হেফাযতে থাকে।

নবীজির শয়তানের মুসলিম হওয়া

হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে একটা করে শয়তান থাকে। হযরত আয়েশা (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার সঙ্গেও থাকে কি? জবাবে নবীজি বললেন, হ্যাঁ; আমার সঙ্গেও একটা শয়তান আছে। তবে আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে।

আল্লাহ যেন আমাদের শয়তানদেরও মুসলমান বানিয়ে দেন আল্লাহর দরবারে এই দু'আ বেশি-বেশি করা চাই।

বান্দার প্রতি আল্লাহর অভিযোগ

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহপাক বলেন–

يَا بَنِيْ اٰدَمَ مَا اَنْصَفْتَنِيْ

'হে বনী আদম! তুমি আমার সঙ্গে ইনসাফ করনি।'

এটা কীভাবে? এভাবে যে, হে বনী আদম! শয়তান তোমাদের দুশমন ছিল। আমি তোমাদের দুশমনকে তোমাদের আদি বাড়ি জান্নাত থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার দুশমন হওয়া সত্ত্বেও তোমরা তাকে আমার ঘরে অর্থাৎ তোমাদের অন্তর থেকে বের করছ না। আমাদেরও কর্তব্য হলো, শয়তানকে আল্লাহর ঘর থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া।

দিল সাফ করার জিম্মাদার কে?

এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন জাগে, মানুষের অন্তর যখন আল্লাহর ঘর এবং আল্লাহর সেখানে আসা-যাওয়া হয় আর আল্লাহ এটাও চান যে, শয়তান তার ঘর থেকে বের হয়ে যাক, তাহলে আল্লাহ নিজেই তাকে বের করে দেন না কেন?

ওলামায়ে কেরাম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তারা বলেন, মানুষ হলো মেজবানের মতো আর আল্লাহ হলেন মেহমানের মতো। আর এটা কে না জানে যে, ঘর পরিষ্কারের দায়িত্ব মেজবানের হয়, মেহমানের নয়। এজন্য দিল সাফ করা আমাদের যিম্মাদারি। যখন দিল সাফ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ মানুষের অন্তরে তাঁর তাজাল্লি দান করবেন।

সালেকদের বিভ্রান্ত করার দুটি পথ

শয়তান আল্লাহ-অভিমুখীদের দুভাবে বিপদগামী করে। যথা–

১. কামনা-বাসনার মাধ্যমে ও

২. সংশয়-সন্দেহের মাধ্যমে।

কামনা-বাসনার দ্বারা উদ্দেশ্য বিভিন্ন বস্তু কিংবা নারীর মহব্বত। অনেক আল্লাহপ্রেমিক মহব্বতের শিকলে জড়িয়ে থাকে। তারা এর বিপরীত করতে চাইলেও করতে পারে না। আর যেসব আল্লাহপ্রেমিকের মন-মেজাজ ভালো এবং তারা মাখলুকের প্রতি চোখ তুলে তাকায় না; শুধু আল্লাহর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে, শয়তান তাদেরকে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করে। যেমন– দ্বীনি বিষয়ে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। তাসাওউফ ও সুলুকের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে। পীরের ব্যাপারে সন্দেহ করে তোলে। কখনো যিকির-আযকারের ব্যাপারেও সন্দেহ সৃষ্টি করে। এ পদ্ধতিতে সে মানুষকে বিপদগামী করতে সফল হয়ে যায়।

এমনকি অনেক সময় তো এমন অবস্থাও হয় যে, আল্লাহপ্রেমিকদের মাথায় ইবাদাত করা অবস্থায়ও এমন জঘন্য খেয়াল পয়দা হয় যে, তারা রীতিমতো আঁৎকে ওঠে। আজ যারা এ তথ্য শুনে বিস্মিত হবেন যে, আমাকে এক তালেবে ইল্‌ম লিখেছে, হযরত! আমি কুরআন শরীফ পড়ছিলাম আর ওস্তাদের উপস্থিতিতে দরস চলাকালেই কবীরা গুনাহের পরিকল্পনা করছিলাম।

মুমিন ও ফাসিকের গুনাহের অবস্থা

শয়তান মানুষের সামনে গুনাহকে হালকা করে পেশ করে। তাই মানুষ কবীরা গুনাহ করলেও তাকে ছোট মনে করে। হাদীছে বলা হয়েছে, মুমিনের অবস্থা হলো, সে কবীরা গুনাহকে এমন মনে করে, যেন তার মাথার উপরে কোনো পাহাড় এসে পড়েছে। পক্ষান্তরে ফাসেক গুনাহকে মনে করে যেন মাছি শরীরে বসেছিল, পরে তা উড়ে গেছে।

সালেকদের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনা

শয়তান মানুষের আমলকে সুশোভিত করে পেশ করে। তাই এমন লোকও পাওয়া যায়, যে তাসবীহ-ওজিফাও পড়ে এবং সাথে-সাথে তার জীবনে শরীয়তের পাবন্দিও নেই। এতদসত্ত্বেও সে নিজেকে সালেক মনে করে। এর থেকে বড় ফেতনা আর কী হতে পারে যে, শরীয়তের লংঘন করেও আল্লাহর নৈকট্যশীল বলে মনে করবে? এমনটি করার অর্থ হলো–

اوپر سے لاالٰہ اور اندر سے کالی بلا

'মুখে লা ইলাহা বলা আর ভিতরে-ভিতরে মূর্তিকে স্মরণ করা।'

তরীকতের নামাযগুলোর দুর্দশা

শয়তান এক শ্রেণির মানুষের অন্তরে এই খেয়াল সৃষ্টি করে দেয় যে, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, তারা হলো শরীয়তের নামাযী আর আমরা পড়ি তরীকতের নামায। তারা আরও বলে–

تہاڈی نیچ ویلے ساڈی ہر ویلے

এসব হলো কুফরি ও নাস্তিক্যমার্কা কথা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার একটি রাস্তা ব্যতীত সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। সেই রাস্তাটি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত রাস্তা।

যেব্যক্তি নবীজির রাস্তায় চলবে, সে-ই আল্লাহপাকের নৈকট্য অর্জন করতে পারবে। আর যদি এ রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তা ধরে, তাহলে তার গন্তব্যস্থল বদলে যাবে।

শয়তানের সঙ্গ

শয়তান অত্যন্ত মন্দ সঙ্গী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا

'আর শয়তান যার সঙ্গী হয়, সে হয় চরম মন্দ সঙ্গী।'[১]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে শয়তানের সঙ্গী হওয়া থেকে এবং তার ধোঁকাবাজি থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

ঈমানের ডাকাত

শয়তান মানুষের ঈমানের ডাকাত। এ কারণে সে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তার প্রমাণ আমরা এর থেকে পাই যে, আল্লাহপাক মানুষের প্রাণের হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন ফেরেশতাদের; কিন্তু তাদের ঈমানের হেফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত স্বয়ং তিনি। হাদীছে এসেছে, যেভাবে মানুষ দুনিয়ায় চলা-ফেরা করে, তেমনিভাবে কতক স্থানে জিনরাও থাকে। জিনদের এত শক্তি যে, তারা চাইলে মানুষকে প্রাণে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিয়েছেন, যারা তার হেফাযত করে এবং সে কারণে জিনরা মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। এমনিভাবে ফেরেশতাদের পক্ষ হতে এটাও হেফাযত হয় যে, মানুষ দুর্ঘটনা হতে পদে-পদে বেঁচে যায়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মানুষের ঈমানের হেফাযতের দায়িত্ব নিজের কাঁদে তুলে নিয়েছেন, সেহেতু এমনিই বোঝা যায়, ঈমানের হেফাযত প্রাণের হেফাযত হতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। শয়তান আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ঈমানের ডাকাত। তাই তার খপ্পর হতে বাঁচার প্রয়োজনীয়তা অনেক-অনেক বেশি।

হঠকারী দুশমন

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, শয়তান আমাদের এমন দুশমন, যে কখনও ঘুষ গ্রহণ করে না। অন্য শত্রুরা এমন হয় যে, কিছু হাদিয়া দিলে,

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৩৮

ঘুষ দিলে নমনীয় হয়ে যায় এবং বিরোধিতা ছেড়ে দেয়। তোষামোদ করলেও সে নরম হয়ে যায়। কিন্তু শয়তান এমন দুশমন যে, সে না ঘুষ নেয়, না তোষামোদে বিগলিত হয়। এটা কেউ বলতে পারে না যে, আমরা একদিন তাকে খোশামোদ করে হাত করে ফেলব, ফলে সে আর আমাদের ক্ষতির চিন্তা করবে না। এমনটা কখনো হবে না। কেননা, শয়তান হলো ঈমানের দস্যু; সর্বক্ষণ অপেক্ষায় থাকে, আমি কীভাবে মানুষের ঈমান হরণ করব।

দুটা মারাত্মক আত্মিক রোগ

হযরত নূহ (আ.) যখন স্বীয় উম্মত নিয়ে নৌকায় চড়ে বসেন, তখন তিনি নৌকায় এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন। কিন্তু তাকে চিনছিলেন না। হযরত নূহ (আ.) নৌকায় প্রত্যেক বস্তুকে জোড়ায়-জোড়ায় স্থান দেন; কিন্তু বৃদ্ধ ছিল একা। মানুষ তাকে আটক করল। তারা হযরত নূহ (আ.)কে জিজ্ঞাসা করল, এ বুড়ো কে? হযরত নূহ (আ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তোমার পরিচয় কী? বৃদ্ধ বলল, আমি শয়তান। হযরত নূহ (আ.) বললেন, তুই এত খারাপ যে, চালাকি করে আমার নৌকায় চলে এসেছিস। শয়তান বলল, হুজুর! আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। হযরত নূহ (আ.) বললেন, আমি তোকে এমনিতেই ছেড়ে দেব না। তুই আমাকে সেই টিপস্ জানিয়ে দে, যার দ্বারা তুই মানুষকে সবচেয়ে বেশি ক্ষত করিস। শয়তান বলল, আমি আজ সত্য কথা বলছি। তবে তার পূর্বে আপনাকে ওয়াদা করতে হবে, আপনি আমাকে মুক্তি দিবেন। হযরত নূহ (আ.) তার আবেদন মঞ্জুর করলেন। তখন শয়তান বলল, আমি দুটি বিষয় দ্বারা মানুষের সর্বাধিক ক্ষতি করে থাকি। ১. হিংসা ২. লোভ।

শয়তান আরও জানাল, হিংসা এমন একটা বস্তু, আমি নিজেই তার কারণে ধ্বংস হয়েছি। আর লোভ এমন বস্তু, যার কারণে হযরত আদম (আ.)কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি এই দুটি অস্ত্র দ্বারাই মানুষকে বেশি ঘায়েল করে থাকি।

এ দুটা বিষয় সত্যই এত মারাত্মক রোগ যে, যা সমস্ত রোগের উৎস। বর্তমানের সমস্ত ঝগড়া-লড়াই হয়ত হিংসার কারণে হয় নতুবা লোভের কারণে। হিংসুক নিজেই ভিতরে-ভিতরে ২৪ ঘন্টা জ্বলতে থাকে। সে কখনও কারো ভালো দেখতে পারে না। মানুষ আল্লাহর পক্ষ হতে নেয়ামত পেলে হিংসুক এ কারণে হিংসার আগুন জ্বলতে থাকে যে, সে এত সুখী কেন? ধনী কেন? আরামে কেন?

শয়তানের অভিজ্ঞতার নির্যাস

একবার শয়তানের সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষাত হয়। হযরত মূসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? শয়তান বলল, আমি শয়তান। হযরত মূসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা একটি সত্য কথা বলো তো, তুমি তো মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য দিন-রাত দৌড়-ঝাঁপ কর। তা এ ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতা কী? শয়তান বলল, আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিজ্ঞাসা করেছেন। এ কীভাবে সম্ভব যে, আমি আপনাকে আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা বলে দেব? হযরত মূসা (আ.) বললেন, সমস্যা নেই, বলো। শয়তান বলল, আমার সমস্ত অভিজ্ঞতার সারনির্যাস তিনটি বিষয়। যথা–

প্রথম কথা : আপনি দান-খয়রাতের নিয়ত করলে তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিবেন। কেননা, আমার কাজ হলো, বান্দা নিয়ত করলে আমি তাকে সে কথা ভুলিয়ে দিই। আর আমি কাউকে একবার ভুলিয়ে দিলে সে তা আর স্মরণ করতে পারে না যে, সে নিয়ত করেছিল কি-না?

দ্বিথীয় কথা : আপনি আল্লাহর সঙ্গে কোনো ওয়াদা করলে সঙ্গে-সঙ্গে তা পূরণ করবেন। কেননা, আমার চেষ্টা থাকে ওয়াদা ভঙ্গ করিয়ে দেওয়ার। যেমন কেউ ওয়াদা করল, হে আল্লাহ! আমি অমুক গুনাহ করব না। তখন আমি নিজেকে এই চেষ্টায় নিবেদিত করি, যেন সেই গুনাহ আবার তার থেকে প্রকাশ পায়।

তৃতীয় কথা : কোনো বেগানা মহিলার সঙ্গে নির্জনে অবস্থান করবেন না। কেননা, আমি তখন পুরুষের অন্তরে মহিলার আকর্ষণ এবং মহিলার অন্তরে পুরুষের আকর্ষণ সৃষ্টি করি। আমি এ কাজটা আমার কোনো কর্মীর দ্বারা না করিয়ে আমি নিজেই করি।

শয়তানের রশি

হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَلنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ

'মহিলারা শয়তানের রশি।'

মহিলারা শয়তানের এমন জাল, যে জালের ফাঁদে পুরুষরা সহজে আটকা পড়ে যায়। কোনো-কোনো কিতাবে শয়তানের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে,

মহিলারা আমার তীর, যা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। বস্তুত এ কারণেই শয়তান পুরুষদেরকে মহিলাদের মাধ্যমে ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছে আর মহিলাদের ধ্বংসের পথ বেঁছে নিয়েছে অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে। নফ্স পরিশুদ্ধ না থাকলে যুবক-বৃদ্ধ সকলেই কুদৃষ্টির রোগের শিকার হয়ে যায়। বরং পাপপ্রবণ লোকেরা তো এমনও বলে যে, সন্তান নিজেরটা ভালো লাগলেও বউ ভালো লাগে পরেরটা। (নাউযুবিল্লাহ!)।

আমাদের বড়রা মহিলাদের ফেতনা থেকে যারপরনাই বেঁচে থাকতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে যান এবং মাথার চুল সাদা হয়ে যায়, তখনও দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে হত্যা এবং ব্যভিচার থেকে রক্ষা করুন। কেউ তার এই দু'আ শুনে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এই বুড়ো বয়সে এমন দু'আ করছেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, আমার শয়তান এখনও আমার সঙ্গ ছাড়েনি।

আমাদের সিলসিলার এক বুযুর্গ ছিলেন হযরত খাজা আব্দুল মালিক (রহ.)। একবার তিনি কোনো মুরীদের বাড়িতে যান। মুরীদের স্ত্রী হযরতের সঙ্গে পর্দা করে না। হযরত মুরীদকে ডেকে ধমক দিলেন এবং বললেন, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেলেও আমার শয়তান তো বৃদ্ধ হয়নি। একথা শুনে মুরীদের চৈতন্য ফিরে আসে এবং সে পর্দার বন্দোবস্ত করে।

বারসীসা পাদ্রীর ভ্রষ্টতা ও তার করুণ পরিণতি

শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা সম্পর্কে হাদীছে আজব একটি ঘটনা এসেছে। ইবনে আমের হযরত উবাইদ বিন ইয়াসার থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এই ঘটনার সনদ যোগ করেছেন। ঘটনাটি 'তালবীসে ইবলীস' গ্রন্থে বর্ণনা হয়েছে।

বনী ইসরাঈলে বারসীসা নামক এক পাদ্রী ছিল। সে সময়ে তার মতো বড় আবেদ বনী ইসরাঈলে আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। সে একটি ইবাদাতখানা বানিয়েছিল। সে সেখানেই ইবাদাতে নিমগ্ন থাকত। মানুষের সঙ্গে তার ওঠাবসা ছিল না। সে কারো কাছে যেত না এবং কেউ তার কাছে আসতও না। শয়তান তাকে বিপদগামী করার মনস্থির করল।

বারসীসা স্বীয় কামরা হতে কখনো বের হত না। সে এমন আবেদ ছিল যে, একটি মুহূর্তও নষ্ট করত না। শয়তান দেখল, যখন সে দিনে ইবাদাত করে ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন ক্লান্তি দূর করতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। সে দিকে কোনো জনবসতি ছিল না। শুধু তার গির্জা-ই ছিল। চারপাশে

ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা ছিল। যখন শয়তান দেখল, পাদ্রী দিনে এক-দুবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়, তখন সে মানুষের রূপ ধারণ করে ওই সময় জানালার সামনে দিয়ে নামায পড়া শুরু করে। নামায তো পড়া নয়, ভান ধরা উদ্দেশ্য ছিল। আসলে যে যে লাইনে থাকে, শয়তান তাকে গোমরাহ করার জন্য ওই লাইনের আকর্ষণীয় রূপ ধারণ করে।

সুতরাং পাদ্রী যখন জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকায়, তখন তার চোখ এক নামাযরত ব্যক্তির উপর পড়ে। এ দৃশ্য দেখে সে বড়ই তাজ্জব হয়। দ্বিতীয়বার যখন পাদ্রী বাইরে তাকায়, তখন ওই লোকটিকে রুকুতে দেখতে পায়। রুকু ছিল খুব লম্বা। তৃতীয়বার দেখল সেজদারত অবস্থায়। কয়েক দিন চলল এই অবস্থা। ক্রমে পাদ্রী বারসীসার অন্তরে এই খেয়াল এল যে, লোকটি তো খুবই বড় তবকার বুযুর্গ! সে দিন-রাত লাগাতার ইবাদাত-বদেন্দগীতে লিপ্ত। কয়েক মাস পর্যন্ত ছদ্মবেশী শয়তান কিয়াম, রুকু ও সেজদা করতেই থাকে। এক পর্যায়ে পাদ্রীর অন্তরে ধারণা জাগল, তার কাছে গিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করার দরকার।

পাদ্রীর অন্তরে এই খেয়াল এলে শয়তান জানালার কাছে এসে জায়নামায বিছাল। বরসীসা তাকে একেবার কাছে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? শয়তান বলল, এ জেনে আপনার লাভ কী? আমি স্বীয় কাজে ব্যস্ত আছি। আমাকে ডিস্টার্ভ করবেন না। পাদ্রী ভাবল, এ বুযুর্গ তো বড়ই আজব! কথা শুনতেও প্রস্তুত নয়। দ্বিতীয় দিন পাদ্রী আবার জিজ্ঞাসা করল, ভাই! আপনার পরিচয়টা বলবেন কি? শয়তান বলল, আমার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করো না।

আল্লাহর শান দেখুন। একদিন বৃষ্টি হলো। শয়তান বৃষ্টির মধ্যে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকল। এ দৃশ্য দেখে পাদ্রীর অন্তরে খেয়াল জাগল, বেচারা কত বড় ইবাদাতগুযার যে, বৃষ্টির মধ্যেও নামায পড়ছে। আমার কর্তব্য এমন বুযুর্গকে বাইরে না রেখে ভেতরে জায়গা দেওয়া। একথা চিন্তা করে পাদ্রী শয়তানকে প্রস্তাব দেয়, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আপনি ভেতরে চলে আসুন। শয়তান বলল, ঠিক আছে। মুমিনের উচিত অপর মুমিনের দাওয়াত কবুল করা। অতএব, আমি আপনার দাওয়াত কবুল করলাম। শয়তান চাচ্ছিলও এটাই।

পাদ্রীর দওয়াত পেয়ে শয়তান গির্জায় এল এবং এসেই জায়নামায বিছিয়ে নামায শুরু করল। সে কয়েক মাস পর্যন্ত নামায পড়তেই থাকল। সে মূলত নামায পড়ে না; বরং নামাযের ভান করে। কিন্তু পাদ্রী বুঝছিল, সে আসলেই নামায পড়ছে। শয়তানের মূল উদ্দেশ্য নামায পড়া ছিল না; তার টার্গেট ছিল স্বীয় মিশন পূর্ণ করা।

কয়েক মাস অতিবাহিত হলে পাদ্রী নামাযীরূপী শয়তানকে উচ্চ স্তরের বুযুর্গ বলে মনে করতে থাকে এবং তার প্রতি অন্তরে ভক্তি জমা হতে শুরু হয়। দীর্ঘদিন পর শয়তান পাদ্রীকে বলল, আমার এক বছর পুরো হয়ে গেছে। এবার আমি বিদায় নিতে চাই। আমার গন্তব্য অন্য কোথাও। কেউ বিদায়কালে তার মন নরম হয়। ফলে শয়তান পাদ্রীকে বলল, আমি আপনাকে এমন একটি হাদিয়া দিয়ে যাচ্ছি, যা আমি বড়দের থেকে পেয়েছি। যদি আপনার কাছে কোনো অসুস্থ লোক আসে, তাহলে এটি পড়ে তাকে ফুঁ দিবেন; সে সুস্থ হয়ে যাবে। তখন আপনার আমার কথা মনে পড়ে যাবে। পাদ্রী বলল, আমার এর প্রয়োজন নেই। শয়তান বলল, আমি এই উপহারটি দীর্ঘদিন মেহনত করে লাভ করেছি। আমি তা আপনাকে দিতে চাচ্ছি আর আপনি তা নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্চেন? আপনি তো বড়ই অকৃতজ্ঞ মানুষ! একথা শুনে পাদ্রী বলল, ঠিক আছে আপনি আমাকে মন্ত্রটি শিখিয়ে দিন। শয়তান পাদ্রীকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিল এবং একথা বলে বিদায় নিল যে, আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।

শয়তান পাদ্রী থেকে বিদায় নিয়ে সোজা বাদশার দরবারে গেল। বাদশার তিন পুত্র এবং এক কন্যা ছিল। শয়তান রাজকুমারীর উপর এমন আছর করল যে, সে পাগলের মতো হয়ে গেল। রাজকুমারী খুবই সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা মেয়ে ছিল। কিন্তু শয়তানের আছরে মেয়েটির মতিভ্রম ঘটে গেল। বাদশা তাঁর একমাত্র মেয়ের চিকিৎসার জন্য কবিরাজ-ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। কয়েকদিন যাবত চিকিৎসা চলল। কিন্তু কোনো কিছুতেই কাজ হয় না।

দীর্ঘদিন চিকিৎসা করেও যখন কোনো ফল হয় না, তখন শয়তান বাদশার অন্তরে এই খেয়াল জাগিয়ে দিল যে, হেকিম-ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করা হয়েছে, এবার ঝাঁড়-ফুঁক করানো দরকার। মাথায় এই চিন্তা আসতেই বাদশা তা বাস্তবায়নে ব্রত হলেন। তিনি সর্বত্র লোক পাঠিয়ে দিলেন, যেন তারা ঘুরে-ঘুরে সংবাদ আনে, বর্তমানে এ রাজত্বে সবচেয়ে বড় বুযুর্গ কে? সবাই এক বাক্যে বলল, বর্তমানে পাদ্রী বারসীসার চেয়ে অধিক বুযুর্গ দ্বিতীয় আর কেউ নেই। কিন্তু তিনি কারো সঙ্গে সাক্ষাত করেন না। বাদশা বললেন, যদি তিনি এখানে না আসেন, তবে তার কাছে গিয়ে আমার পক্ষ্য হতে দরখাস্ত করুন, আমরা তার কাছে যেতে চাই।

কিছু লোক পাদ্রী বারসীসার কাছে গেল। পাদ্রী তাদের দেখে বলল, তোমরা আমাকে ডিস্টার্ভ করতে কেন এসেছ? তারা বলল, রাজকুমারী

অসুস্থ। কবিরাজ ও ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করানো হয়েছে; কিন্তু কোনো সুফল মিলছে না। বাদশা চাচ্ছেন, আপনি রাজমহলে আসবেন না, যাতে আপনার ইবাদাতে বিঘ্ন না ঘটে। আমরা আপনার এখানে রাজকুমারীকে আনব। আপনি এখানে থেকেই রাজকুমারীকে ঝাড়-ফুঁক করবেন। আমরা আশাবাদী, আপনি ঝাড়-ফুঁক করলে শাহজাদী সুস্থ হয়ে যাবে।

মানুষের একথা শুনে পাদ্রীর মনে পড়ে গেল, তা-ই তো, আমি একটি মন্ত্র শিখেছিলাম। মন্ত্রটি পরীক্ষা করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেখি, মন্ত্রটি ঠিক কি না? একথা ভেবে পাদ্রী শাহজাদীকে গীর্জায় আনার অনুমতি দিয়ে দিল।

বাদশা তাঁর মেয়েকে নিয়ে বারসীসা পাদ্রীর কাছে এলেন। পাদ্রী মন্ত্রটি পড়ে দম করতেই শাহজাদী সুস্থ হয়ে গেল। অসুস্থ করেছিল শয়তান এবং দমও শিখিয়েছিল সে-ই। তাই দম করতেই শয়তান শাহজাদীকে ছেড়ে চলে গেল এবং শাহজাদী পূর্ণ আরোগ্য লাভ করল। বাদশার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে গেল, পাদ্রীর ঝাড়-ফুঁকেই আমার কন্যা সুস্থতা লাভ করেছে।

এক-দেড় মাস পরের ঘটনা। শয়তান পুনরায় শাহজাদীর উপর আছর করল। বাদশা শাহজাদীকে পাদ্রীর কাছে নিয়ে গেল। পাদ্রী ঝাড়-ফুঁক করলে শয়তান তাকে ছেড়ে চলে গেল এবং শাহজাদী ভালো হয়ে গেল। এভাবে কয়েকবার ঘটলে বাদশার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল, আমার কন্যার চিকিৎসা পাদ্রীর দমের মধ্যেই নিহিত। এ ঘটনায় পাদ্রী বারসীসার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল, তার দমে রাজকন্যা সুস্থ হয়ে যায়।

কিছু দিন পরের ঘটনা। সে দেশে বাইরের শত্রু আক্রমণ করল। বাদশা শাহজাদাদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এ সময়ে বাদশা চিন্তায় পড়ে যান যে, তিনি যুদ্ধে গেলে মেয়েকে কোথায় রেখে যাবেন? কেউ পরামর্শ দেয়, কোনো মন্ত্রীর হেফাযতে রেখে যান। কেউ অন্য পরামর্শ দেয়। বাদশা বললেন, বারসীসা পাদ্রী তো অন্য কারো কথা শুনবে না। শেষমেষ বাদশা বললেন, আমি রবসীসা পাদ্রীর কাছে আমার মেয়েকে রেখে যাব। চিন্তা করুন, শয়তান কীভাবে সবদিকে গুছিয়ে আনছে।

বাদশা তিন পুত্র ও রাজকন্যাকে নিয়ে পাদ্রী বারসীসার কাছে এলেন এবং বললেন, আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি। জীবন-মরণের কোনো নিশ্চয়তা নেই। বর্তমানে আমার বড় ভরসা আপনার উপরেই এবং আমার মেয়ের চিকিৎসাও আপনার কাছে। তাই আমি ইচ্ছা করছি, মেয়েটি এখন থেকে এখানেই

থাকবে। বারসীসা বলল, তাওবা! তাওবা! এটা কখনো সম্ভব নয়। সে কীভাবে আমার কাছে একা থাকবে?

বাদশা বললেন, সমস্যা নেই এটা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। আপনি শুধু একটু অনুমতি দিন। আমি তার থাকার জন্য ইবাদাতখানার সামনে একটি ঘর বানিয়ে দেব। সে এ ঘরেই থাকবে। বারসীসা সব শুনে বলল, ঠিক আছে, তা-ই হবে। পাদ্রীর অনুমতিসাপেক্ষে বাদশা ইবাদাতখানার সামনে একটি ঘর বানালেন এবং স্বীয় কন্যাকে সেখানে রেখে যুদ্ধে চলে গেলেন।

বারসীসা পাদ্রীর অন্তরে চিন্তা এল, আমি তো নিজের জন্য খাদ্য তৈরি করি, যদি এর সাথে রাজকন্যার খাবারও তৈরি করি, তাহলে তাতে সমস্যা কোথায়? কেননা, সে একা থাকে। জানি না সে নিজের জন্য খানা তৈরি করে কি-না! একথা ভেবে পাদ্রী খাবার তৈরি করে অর্ধেক নিজে খেত আর অর্ধেক স্বীয় ইবাদাতখানার বাইরে রেখে দিত এবং নিজের দরজা নাড়াত। এটা মেয়ের জন্য ইশারা ছিল যে, খাবার এসে গেছে, উঠিয়ে নাও। এভাবে মেয়েটি খাবার নিয়ে চলে যেত এবং নিজের ঘরে এসে খেত। কয়েক মাস এভাবে চলল।

তারপর শয়তান একদিন পাদ্রীর অন্তরে একথার উদ্রেক করল যে, দেখো, মেয়েটি একা থাকে। তুমি খাবার তৈরি করে বাইরে রেখে আস আর তা নিতে মেয়েটিকে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। কখনো কোনো পুরুষ মেয়েটিকে এভাবে তোমার এখানে আসতে দেখলে তোমার সুনাম নষ্ট হবে, মানুষ বাজে কথা বলবে। এর থেকে ভালো হয় যে, খাবার তৈরি করে মেয়েটির ঘরের দরজয় পৌঁছে দাও, যাতে তাকে ঘরের বাইরে বের না হতে হয়। তারপর থেকে পাদ্রী খাবার তৈরি করে মেয়েটির ঘরের দরজায় রেখে আসতে শুরু করল। পাদ্রী খাবার রেখে দরজার কড়া নাড়াত আর মেয়েটি এসে খাবার নিয়ে যেত। এই নিয়ম চলতে থাকল।

আরও কয়েক মাস এভাবে চলার পর শয়তান পাদ্রীর মনে একথা জাগিয়ে দিল যে, তুমি নিজে তো ইবাদাত কর; অথচ এই মেয়েটি একা থাকে। এমনও তো হতে পারে যে, সারাদিন একা থাকার কারণে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই ভালো হয়, তাকে কিছু-কিছু নসীহত করো, যাতে সেও ইবাদাতগুযার হতে পারে এবং তার সময় নষ্ট না হয়।

এই খেয়াল মনে জাগতেই সে একে ভালো মনে করল এবং বলল, কাজটা করতে পারলে তো ভালো হয়; কিন্তু তার প্রক্রিয়া কেমন হবে? শয়তান তার

এ খটকা এভাবে দূর করে দিল যে, পাদ্রী মেয়েটিকে বলবে, যেন সে তার ঘরের ছাদে আসে আর এদিকে পাদ্রীও নিজ ইবাদাতখানার ছাদে এসে মেয়েটিকে ওয়াজ-নসিহত করবে। পাদ্রী এ নিয়মে ওয়াজ-নসিহত করা শুরু করল। এতে মেয়েটির উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ল। সে নামায ও ওজিফা আদায় করতে শুরু করল।

পরে শয়তান পাদ্রীর অন্তরে একথা উদ্রেক করে দিল যে, তোমার নসীহত তার মধ্যে অনেক প্রভাব ফেলেছে। এমন নসিহত প্রতিদিন হওয়া দরকার। তারপর থেকে পাদ্রী রাজকন্যাকে প্রতিদিন নসিহত করা শুরু করল। এভাবে যখন কিছু দিন গত হয়ে গেল, তখন শয়তান নতুনরূপে ধোঁকা দিল। সে পাদ্রীর অন্তরে একথা সৃষ্টি করে দিল যে, তুমি এক বাড়ির ছাদে আর রাজকন্যা অপর বাড়ির ছাদে। সেখানে কথা হলে রাস্তা দিয়ে চলাচলকারীরা একে ভালো চোখে দেখবে না। তারা এভাবে কথা বলাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে। তার চেয়ে ভালো হবে, ছাদে বসে উঁচু আওয়াজে কথা বলার পরিবর্তে রাজকন্যার ঘরের দরজার বাইরে থেকে ওয়াজ করবে আর রাজকন্যা ঘরের ভিতর থেকে তা শুনবে। এতে আওয়াজও হবে এবং পর্দাও হবে। তারপর থেকে সেভাবেই ওয়াজ-নসিহত শুরু হলো। কিছুদিন এভাবেই চলল।

একপর্যায়ে শয়তান রাজকন্যার অন্তরে বারসীসার মহব্বত আর বারসীসার অন্তরে রাজকন্যার মহব্বত সৃষ্টি করে দিল। রাজকন্যা বলল, আপনি দাঁড়িয়ে ওয়াজ করেন কেন? আমি খাটের ব্যবস্থা করছি। আপনি সেখানে বসে ওয়াজ করবেন। পাদ্রী বলল, ঠিক আছে, তা-ই হবে। মেয়েটি দরজার কাছে খাট পেতে দিল। বারসীসা সেখানে বসে নসিহত করতে থাকল এবং মেয়েটি দূরে বসে কথা শুনতে থাকল। এ সময়ে শয়তান বারসীসার অন্তরে মেয়েটির প্রতি আসক্তি ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিল।

কিছুদিন এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর শয়তান বারসীসার অন্তরে এই খেয়াল সৃষ্টি করে দিল যে, রাজকন্যাকে ওয়াজ শোনাতে গিয়ে তাকে দূর থেকে উঁচু আওয়াজে কথা বলতে হয়। ফলে তার কথা পথের লোকও শোনে। ভালো হয়, যদি খাটটা আরেকটু ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নীচু স্বরে কথা বলা যায়। তারপর থেকে বারসীসার খাট রাজকন্যার খাটের কাছাকাছি চলে এল। কাছাকাছি বসেই চলল ওয়াজ-নসিহত।

কিছুদিন এভাবে যাওয়ার পর শয়তান নয়া পলিসি গ্রহণ করল। শয়তান রাজকন্যার রূপকে অতি আকর্ষণীয় করে বরসীসার সামনে উপস্থাপন করল।

একপর্যায়ে শয়তান পাদ্রীর অন্তরে সেই কামনা উস্কে দিল, যার ফলে পাদ্রীর মন ইবাদাতখানা হতে সরে গেল এবং সে বেশির ভাগ সময় রাজকন্যার সাথে কথা বলে কাটাতে শুরু করল। এভাবে এক বছর চলে গেল। ইতিমধ্যে শাহজাদারা এসে শাহজাদীর খবর নিল। তারা শাহজাদীকে সুস্থ, ও প্রফুল্ল দেখল এবং পাদ্রীর অনেক গুণগান করতে শুনল। শাহজাদারা বোনের খবর নিয়ে আবার যুদ্ধের ময়দানে চলে গেল। তারা বোনের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত হয়ে প্রস্থান করল। শাহজাদারা চলে যাওয়ার পর শয়তান তার চক্রান্ত তীব্র করল। শয়তান বারসীসার অন্তরে রাজকন্যার প্রতি প্রেম সৃষ্টি করল। একপর্যায়ে পাদ্রী ও রাজকন্যা উভয়ের অন্তরে প্রেমের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল।

তারপর থেকে নসিহতের ধারা পাল্টে গেল। যতক্ষণ পাদ্রী নসিহত করত, তার দৃষ্টি সর্বক্ষণ শাহজাদীর চেহারার উপর নিবদ্ধ থাকত। শয়তান শাহজাদীকে বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গি শেখাত। ফলে শাহজাদী বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও কমনীয় পদ্ধতিতে পাদ্রীর মন ভোলাতে শুরু করল। একপর্যায়ে পাদ্রী আলাদা কক্ষে একান্তে কাছে এসে শাহজাদীর সঙ্গে একই খাটে এসে বসা শুরু করল। একান্তে এসে শাহজাদীকে দুচোখ ভরে দেখলে তার সৌন্দর্য ও রূপ পাদ্রীকে জাদুর মতো মোহগ্রস্ত করল। পাদ্রী তার যৌনশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। শাহজাদীকে কাছে টেনে নিল। শাহজাদী মুচকি হেসে নিজেকে আরও এগিয়ে দিল। একপর্যায়ে পাদ্রী যিনায় লিপ্ত হয়ে গেল। একবার মিলনে যখন উভয়ের মাঝ থেকে পর্দার খেয়াল সরে গেল এবং ব্যভিচার করে ফেলল, তখন তারা পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মতো অবস্থান করতে থাকল। একসময়ে শাহজাদী গর্ভবর্তী হয়ে গেল।

এবার পাদ্রীর টনক নড়ল। তার মাথায় চিন্তা ঢুকল, মানুষ ঘটনাটা জানতে পারলে কী উপায় হবে? কিন্তু শয়তান এসে তাকে এই বলে আশ্বস্ত করল যে, কোনো চিন্তা নেই। বাচ্চা ভূমিষ্ট হলে নবজাতককে জিন্দা পুঁতে ফেলবে এবং শাহজাদীকে বুঝিয়ে দিবে, বাচ্চা না থাকার মধ্যেই আমাদের স্বার্থ নিহিত। এতে আমার দোষও গোপন থাকবে এবং তোমার দোষও ঢাকা পড়ে যাবে। শয়তানের পক্ষ হতে পাদ্রীর মনে এই সমাধান এলে পাদ্রীর পেরেশানি দূর হয়ে গেল এবং সে পূর্বের মতো নির্ভয়ে ব্যভিচার চালিয়ে যেতে লাগল।

একদিন শাহজাদীর বাচ্চা হলো। শাহজাদী মাতৃস্নেহে বাচ্চাকে লালন-পালন করতে থাকল। এ সময়ে শয়তান এসে বারসীসার অন্তরে এই খেয়াল জাগিয়ে দিল যে, প্রায় দেড়-দু বছর হলো বাদশা যুদ্ধে গেছেন। কিছু দিনের মধ্যেই বাদশা সৈন্যসহ ফিরে আসবেন। তখন শাহজাদী সমস্ত ঘটনা ফাঁস করে দিবে। তাই ভালো হয়, বাচ্চাটাকে কোনো বাহানায় হত্যা করে ফেলো, যাতে পাপের প্রমাণ না থাকে।

একদিন শাহজাদী শুয়ে ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় পাদ্রী বাচ্চাকে তুলে নিয়ে গেল এবং হত্যা করে ঘরের বারান্দায় মাটির নীচে পুঁতে ফেলল। মা তো মা-ই হয়ে থাকে। শাহজাদী ঘুম থেকে উঠে বলল, আমার বাচ্চা কোথায়? পাদ্রী বলল, আমি তো জানি না। মা এদিক-ওদিক খুঁজে বাচ্চার কোনো হদিস পায় না। বাচ্চাকে না পেয়ে শাহজাদী পাদ্রীকে সন্দেহ করল। শাহজাদী ও পাদ্রীর মাঝে প্রথমে অবিশ্বাস ও পরে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। শাহজাদী পাদ্রীর উপর ক্ষেপে গেল। এ সময়ে শয়তান বারসীসার অন্তরে এই খেয়াল জাগিয়ে দিল যে, দেখো, এই মেয়ে শত হলেও মা। সে কখনও তার বাচ্চার কথা ভুলবে না। আগে সে এই ঘটনা না জানালেও এখন অবশ্যই জানিয়ে দিবে। সুতরাং এখন একটাই উপায় আছে। আর তা হলো, মেয়েটিকে হত্যা করে ফেলো, যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে। যখন বাদশা এসে জিজ্ঞাসা করবে, তাকে বলবে, সে অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। পাদ্রীর অন্তরে একথা আসতেই সে প্রফুল্লচিত্তে বলল, একদম ঠিক কথা। এমনটিই করা দরকার। এক সুযোগে পাদ্রী শাহজাদীকে হত্যা করে তাকেও ঘরের বারান্দায় মাটির নীচে পুঁতে রাখল। তারপর পাদ্রী পূর্বের মতো বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করল।

শাহী মহলে এসে শাহজাদারা ঘুমালে শয়তান স্বপ্নে বড় ভাইয়ের কাছে এল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের বোনের খবর কী? ভাই বলল, আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম। বোনকে রেখে গিয়েছিলাম বারসীসার কাছে। পরে সে মারা গেছে। শয়তান বলল, না, তোমার বোন মরেনি। ভাই জানতে চাইল, তাহলে ঘটনা কী ঘটেছিল? শয়তান বলল, পাদ্রী বারসীসা এই এই কাণ্ড ঘটিয়ে অবশেষে যে নিজহাতে তোমার বোনকে হত্যা করে অমুক স্থানে মাটি চাপা দিয়েছে। বাচ্চাকেও সে মায়ের সঙ্গে কবরস্ত করেছে। শয়তান তারপর মেঝো ভাইয়ের কাছে গেল এবং তাকেও ঘুমন্ত অবস্থায় বিষয়টি জানাল। তারপর ছোট ভাইয়ের কাছে গিয়ে তাকেও একইভাবে জানাল।

তিন ভাই সকালে ঘুম থেকে উঠলে একজন আরেকজনের কাছে বলল, আমি স্বপ্নে এমন-এমন দেখেছি। দ্বিতীয় ভাই বলল, আমিও এমন স্বপ্ন দেখেছি। তৃতীয় ভাই বলল, আমিও এমন দেখেছি। তারা বলাবলি করতে থাকে, এটা তো বড়ই আজব কথা যে, সকলে একই স্বপ্ন দেখেছি। ছোট ভাই বলল, এটা ছোট-খাট কোনো বিষয় নয়। তদন্ত করতে হবে। অন্য দুভাই বলল, আরে, স্বপ্নে কথা বাদ দাও। ছোট ভাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, আমি অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখব। তারপর ছোট ভাই অনুসন্ধানে নেমে পড়ল। ছোট ভাইয়ের দৃঢ়তা দেখে অন্য দুভাইও তার পিছু-পিছু রওনা হলো। তারা গিয়ে যখন মাটি খুঁড়লে বোনের হাড়-গোড় বেরিয়ে এল। পাশাপাশি একটি ছোট শিশুর কঙ্কালও পাওয়া গেল।

হত্যার প্রমাণ পেয়ে তারা বারসীসা পাদ্রীকে গ্রেফতার করল। তাকে ধরে যখন আদালতে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন কাজী সাহেবের আদালতে পাদ্রী তার সমস্ত অপকর্মের কথা স্বীকার করল। বিজ্ঞ বিচারক পাদ্রীর স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে 'ডাবল মার্ডার' প্রমাণিত হওয়ায় পাদ্রীকে ফাঁসির আদেশ দিলেন। যখন পাদ্রীকে ফাঁসির কাষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তার গলায় রশি পরানো হলো ও রশি টানার সময় ঘনিয়ে এল, তখন দু-চার মুহূর্ত বাকি থাকতে শয়তান পাদ্রীর নিকট পূর্বের ইবাদাতগুজার ব্যক্তির ছুরত ধরে উপস্থিত হলো এবং বলে, আমাকে চেন, আমি কে? পাদ্রী বলল, হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালো করেই চিনি। তুমি তো সেই বুযুর্গ লোক, যে আমাকে মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলে। শয়তান বলল, সেই মন্ত্র আমিই তোমাকে শিখিয়েছিলাম। শাহজাদীর উপর আছর করে আমিই তাকে অসুস্থ বানিয়েছিলাম। আমি তোমার দ্বারা তাকে হত্যা করিয়েছিলাম। এবার বারসীসা জিজ্ঞাসা করল, এখন তুমি আমাকে কীভাবে বাঁচাবে? শয়তান বলল, তুমি শুধু আমার একটি কথা মান্য করো, এই মুহূর্তে আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করতে পারি। পাদ্রী জিজ্ঞাসা করল, এই মুহূর্তে তোমার কোন কথা মানতে হবে? শয়তান বলল, শুধু এতটুকু বলে দাও, আল্লাহ নেই। পাদ্রীর অনুভূতি ও বোধশক্তি তো অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সে এ ক্ষেত্রেও চিন্তা করল, আপাতত একবার বলে ফাঁসি থেকে বেঁচে নেই। পরে আবার স্বীকার করে নেব। সুতরাং শয়তানের চক্করে পড়ে পাদ্রী শেষকালে বলে দিল, আল্লাহ নেই। ঠিক যে মুহূর্তে পাদ্রীর মুখ থেকে বের হলো, 'আল্লাহ নেই" তখনই জল্লাদ ফাঁসির রশি ধরে টান দিল এবং কুফরের উপর পাদ্রীর মৃত্যু ঘটে গেল।

এ ঘটনা বড়ই বেদনাদায়ক ও শিক্ষণীয়। শয়তান কীভাবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যেমে মানুষকে ধীরে-ধীরে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করায় আলোচ্য ঘটনা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। পাদ্রীকে ঈমানহারা করতে শয়তান বিভিন্নভাবে তার প্রতি সূক্ষ্ম হামলা চালিয়েছে।

১. প্রথমে পাদ্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মুসল্লী সেজেছে।

২. তাকে জোর করে রোগমুক্তির মন্ত্র শিখিয়েছে।

৩. শাহজাদীর উপর আছর করে তাকে রোগী বানিয়েছে।

৪. বাদশাকে পরামর্শ দিয়ে শাহজাদীকে পাদ্রীর কাছে পাঠিয়েছে।

৫. বাদশাকে পরামর্শ দিয়ে শাহজাদীর জন্য পাদ্রীর গীর্জার কাছে তার ঘর বানিয়েছে।

৬. পাদ্রীর কাছাকাছি শাহজাদীকে একাকী রাখার বন্দোবস্ত করিয়েছে।

৭. শাহজাদীর খানার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা পাদ্রীর অন্তরে পয়দা করেছে।

৮. শাহজাদীকে ওয়াজ-নসিহতের ব্যবস্থা করিয়েছে।

৯. ওয়াজ-নসিহতের সূত্র ধরে পাদ্রীকে ক্রমে শাহজাদীর কাছাকাছি করেছে।

১০. পাদ্রীর অন্তরে শাহজাদীর মহব্বত সৃষ্টি করেছে।

১১. শাহজাদীর অন্তরে পাদ্রীর মহব্বত জাগিয়েছে।

১২. শাহজাদীর চেহারাকে অতিশয় আকর্ষণীয় ও কমনীয় করে পাদ্রীর চোখে প্রকাশ করেছে।

১৩. একই খাটে দুজনকে একত্র করেছে।

১৪. যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত করিয়েছে।

১৫. হায়া-শরমের বাধা উঠিয়ে দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতো দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়েছে।

১৬. শাহজাদীর বাচ্চাকে হত্যা করিয়েছে।

১৭. শাহজাদীকে হত্যা করিয়েছে।

১৮. হত্যার ঘটনা শাহজাদাদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে।

১৯. পাদ্রীকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

২০. মৃত্যুর সময় পাদ্রীকে ঈমানহারা করেছে।

এই কুড়িটা প্রক্রিয়ায় শয়তান ক্রমান্বয়ে পাদ্রীর সর্বনাশ ঘটিয়েছে। পাদ্রীকে হিরো থেকে জিরো বানিয়েছে। যেখানে পাদ্রী ছিল সে যুগের সেরা আবেদ ও বুযুর্গ তাকে ক্রমান্বয়ে ২০টি পাপে লিপ্ত করিয়ে অবশেষে বেঈমান করে ছেড়েছে।

শয়তানের এই দীর্ঘমেয়াদী নীলনকশা থেকে আত্মরক্ষা করা বড়ই কঠিন। মানুষ নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা বাঁচতে পারে না। আল্লাহই কেবল বাঁচাতে পারেন। তাই আমাদের ঈমান রক্ষা ও গুনাহ থেকে বাঁচতে সবসময় আল্লাহর দরবারে দু'আ করা দরকার। এভাবে দু'আ করতে হবে–

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ.

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিতাড়িত শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করুন। হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এর থেকে যে, শয়তান যেন আমার নিকট না আসতে পারে।'

হযরত উমর (রাযি.)-এর সতর্কতা

মানুষের কর্তব্য ২টি। (১) নিজের ইবাদাতে গর্ব না করা এবং (২) নিজের উপর পূর্ণ আস্থা না রাখা। একবার একলোক হযরত উমর (রাযি.)কে দেখল, তিনি তাঁর বাড়ির দহলিজে বসা আছেন। লোকটি তাকে সালাম দিয়ে চলে গেল। খানিক পর লোকটি ফেরৎকালে দেখল, হযরত উমর (রাযি.) স্বীয় স্থানে পূর্ববৎ বসা আছেন। লোকটি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি ঘরে না গিয়ে এই দরজায় সেই কখন থেকে বসা আছেন; ব্যাপার কী? জবাবে হযরত উমর (রাযি.) বললেন, আমার কন্যা হাফসা উম্মুল মুমিনীন। সে আজ আমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। কিন্তু আমার স্ত্রী ঘরে নেই। ফলে তার সঙ্গে থাকার পরিবর্তে এখানে দরজায় বসে আছি। আল্লাহু আকবার! আমাদের বড়রা শয়তানের অনিষ্ট হতে এমন সাবধানতা অবলম্বন করতেন। বিতাড়িত শয়তানের চাল বোঝা ততক্ষণ সম্ভব হয় না, যতক্ষণ আল্লাহপাকের মদদ না মেলে।

শয়তানের বাহন

একলোকের বড় শখ ছিল শয়তানের সঙ্গে সাক্ষাত ও কথা বলার। ঘটনাক্রমে শয়তানের সঙ্গে লোকটির একদিন দেখা হয়ে গেল। শয়তানের

নিকট বড় একটা জাল ছিল। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? সে বলল, শয়তান। জালের দিকে ইশারা করে বলল, এই জাল নিয়ে ঘুরছ কেন? এ দিয়ে কী হবে? শয়তান বলল, এগুলো জাল, আমার ফাঁদ। এই জাল ও ফাঁদ দ্বারা আমি মানুষকে আটকাই। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, আমাকে ধরার জাল কোনটি? শয়তান বলল? তোমাকে আটকাতে কোনো জালের প্রয়োজন নেই। লোকটি বলল, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, আমি এত সাধারণ লোক নই যে, ফাঁদ ছাড়াই তোমার হাতে ধরা খাব। শয়তান বলল, ঠিক আছে; অচিরেই দেখা যাবে।

তারপর লোকটি নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলো। পথে একটি নদী ছিল। যখন সে নদীর কূলে পৌঁছল, ততক্ষণ পারাপারকারী নৌকা চলে গিয়েছিল। তাই সে পানিতে নেমে নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। একটু এগিয়েই দেখল, এক অতিশয় বৃদ্ধা বসে-বসে কাঁদছে। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, আম্মা! আপনি কাঁদছেন কেন? কী হয়েছে আপনার? বৃদ্ধা বলল, আমি নদীর ওপারে যাব। কিন্তু নৌকা চলে গেছে। আমার সঙ্গে কেউ নেই। একা এখানে থাকাও সম্ভব নয়। আমার বাড়িতে মেয়েরা একাকি আছে। তুমি বাবা যেভাবে পার আমাকে একটু নদীটা পার করিয়ে দাও। আমি তোমাকে অনেক দু'আ দেব। আমি অতি জীর্ণ-শীর্ণ একজন বৃদ্ধা। আমাকে তোমার কাঁদে তুলে নাও। লোকটি বলল, না, আমি আপনাকে কাঁধে নিতে পারব না। বৃদ্ধা লোকটিকে অনেক দু'আ দিল এবং বলল, তোমার কল্যাণ হবে। আমার মেয়েরা ঘরে একাকি রয়েছে। আমি বাড়িতে পৌঁছলে তারাও তোমাকে দু'আ দেবে।

বুড়ীর এসব কথায় যুবকের মন গলে গেল। তার অন্তরে মায়া জাগল। তাই লোকটি বলল, ঠিক আছে, আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। প্রথমে লোকটি চাচ্ছিল, বৃদ্ধাকে কোলে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণে চিন্তা করল, তাতে আবার পিছলে পড়ে যায় কিনা। তাই পরিশেষে সে বৃদ্ধাকে কাঁধেই তুলে নিল।

বৃদ্ধা লোকটির কাঁধে চড়ে নদীর মাঝে নেমে পড়ল। চলতে-চলতে নদীর মাঝবরাবর এলে বৃদ্ধা লোকটির চুল টেনে ধরল এবং বলল, হে আমার গাধা! দ্রুত চল। লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? বৃদ্ধা বলল, আমি সে, যে তোমাকে বলেছিল, তোমাকে কাবু করতে আমার কোনো জাল পাতার দরকার হয় না। এখন দেখ, আমি তোমাকে কীভাবে জাল ছাড়াই ফাঁদে

ফেলেছি। তোমার খেয়াল হয়নি যে, আমি একজন গায়রে মাহরাম মহিলা। অথচ তুমি আমাকে তোমার কাঁধে তুলে নিয়েছে। এটা ছিল আমার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র, যার শিকার তুমি হয়েছ।

ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুর ফিকির

শয়তান সবচেয়ে বড় হামলা করে মৃত্যুর সময়। আমার বন্ধুগণ! আমাদের সুস্থ অবস্থায় কতভাবে ধোঁকা দেয়। যে সুস্থ অবস্থায় এমন করে, সে মৃত্যুর নাজুক মুহূর্তে মানুষের অবস্থা যখন খুবই করুণ থাকে, তখন কত সহজভাবে ধোঁকা দেয়। এ কারণে আমাদের মৃত্যু যাতে ঈমানের উপর হয়, তার জন্য আমাদের ফিকির করা দরকার। আমাদের বড়রা ঈমানের উপর মৃত্যুর জন্য বড়ই চিন্তিত থাকতেন এবং কেঁদে-কেঁদে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমাদের শেষ অবস্থা ভালো করুন। ঈমানের উপর মৃত্যু দিন।

বেদীন বানানোর শেষ চেষ্টা

হাদীছ শরীফে এসেছে, শয়তান মানুষের মৃত্যুর সময় তার আত্মীয়-স্বজন যেমন মা, বাপ, ভাই প্রভৃতি সুরতে আসে এবং তার শিয়রে বসে। এ সময়ে সে তাকে বেদীন বানাতে জোর চেষ্টা চালায়। যেমন মায়ের সুরতে এসে আদর করে ডাকে। ঠিক সেভাবে কথা বলে, যেভাবে একজন মা তার সন্তানকে বলে। মায়ের ছদ্মবেশী শয়তান বলে, বেটা! আমি ইসলামের উপর মারা গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি শাস্তির সম্মুখীন হয়েছি। এখন তোমার মৃত্যুর সময় হয়েছে। আমি তোমাকে সদুপদেশ দেওয়ার জন্য এসেছি, যাতে তুমি কখনও জাহান্নামে না যাও। তুমি আমার কথা শোনো এবং আল্লাহকে অস্বীকার করো।

মৃত্যুগামী ব্যক্তি যেহেতু সামনে মাকে দেখে, ফলে সে মায়ের কথা মেনে নিয়ে নাস্তিক হয়ে যায়। এমনিভাবে শয়তান কাউকে খৃস্টান হওয়ার দীক্ষা দেয়। কাউকে ইহুদী হওয়ার জন্য নসিহত করে। এখন বলুন, শয়তান যখন বিভিন্ন আত্মীয়ের সুরতে এসে ধোঁকা দিবে, তখন তার অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়া কেমন কঠিন হবে! এ কারণে ঈমানের প্রশ্নে খুবই সতর্ক হওয়া দরকার।

তাকবীরে উলা ও নিয়মিত মেসওয়াক করার খোদায়ী পুরস্কার

হাদীছ শরীফে এসেছে, যেব্যক্তি তাকবীরে উলার সঙ্গে নিয়মিত নামায পড়ে এবং নিয়মিত মেসওয়াক করে, তার মৃত্যুর সময় যখন আল্লাহ তা'আলা

মালাকুল মওত তথা মৃত্যুর ফেরেশতা পাঠান, তখন ফেরেশতা তিনটি কাজ করে। যথা–

১. শয়তানকে পিটিয়ে ওই বান্দা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

২. সে বান্দাকে জানিয়ে দেয়, তোমার মৃত্যুর ক্ষণ উপস্থিত।

৩. তাকে কালেমা শরীফ স্মরণ করিয়ে দেয়।

সুতরাং বান্দা বেশি-বেশি কালেমা শরীফ পড়ে এবং ওই অবস্থায় মালাকুল মওত তার রূহ কব্জ করে নিয়ে যায়। হাদীছে এসেছে–

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যার শেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে যাবে।'

তাই আমাদের কর্তব্য হলো, বেশি-বেশি এই দু'আ করা যে, হে আল্লাহ! আমাদের নিজেদের উপর কোনো ভরসা নেই। শুধু আপনার উপরই সমস্ত ভরসা। আপনি মৃত্যুর সময় মালাকুল মওতকে নির্দেশ দিন, যেন সে আমাদেরকে কালেমা শরীফ স্মরণ করিয়ে দেয় এবং কালেমা পড়া অবস্থায় যেন আমাদের জান কব্জ হয়।

ইমাম রাযী (রহ.)-এর উপর শয়তানের হামলা

ইমাম রাযী (রহ.) অনেক বড় একজন আলেম ছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপর কটি কিতাব লিখেছেন, যার মধ্যে তিনি আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে একশত দলীল উপস্থাপন করেছেন। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে শয়তান তার নিকট এসে বলল, রাজী! আল্লাহ তো বিদ্যমান নেই। তিনি বললেন, এটা হতে পারে না, আল্লাহ অবশ্যই বিদ্যমান। শয়তান বলল, দলীল পেশ করুন। ইমাম রাযী (রহ.) একটি দলিল দিলেন। শয়তান সেই দলীল খণ্ডন করে দিল। তিনি দ্বিতীয় দলিল দিলেন। কিন্তু শয়তান সেটিও ভ্রান্ত প্রমাণিত করল। তিনি তৃতীয় দলিল দিলেন। শয়তান সেটিও খণ্ডন করল। এভাবে ইমাম রাযী (রহ.) তার জমাকৃত একশত দলীল পেশ করলেন। কিন্তু শয়তান দলীল খণ্ডন করে দিল। এবার ইমাম রাযী (রাযি.) ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর অন্তরে ইখলাস ছিল, তাই আল্লাহ তাঁর ঈমান হেফাযতের ব্যবস্থা করলেন।

সে সময়ে ইমাম রাযী (রহ.)-এর পীর ও মুরশিদ শায়েখ নাজমুদ্দীন কুবরী (রহ.) দূরে কোথাও অবস্থা করে ওজু করছিলেন। তিনি রাগান্বিত হয়ে অযুর

পানির পাত্র দেওয়ালে ছুড়ে মারলেন এবং ইমাম রাযী (রহ.)কে ডেকে বললেন, এই রাযী! তুমি কেন বলছ না, আমি বিনা দলিলে আল্লাহকে এক মানি? সেসময় শায়েখ নাজমুদ্দীন কুবরী (রহ.)-এর রাগান্বিত চেহারা ইমাম রাযী (রহ.)-এর সামনে ভেসে উঠল। তিনি পীরের নির্দেশ মোতাবেক একথা বলে দিলে শয়তান পালিয়ে গেল।

ডাক্তার মৃত্যুর সময় অজ্ঞানের ইঞ্জেকশন দিবে না

কারো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তাকে ডাক্তারের খপ্পর থেকে বাঁচানো দরকার। সাধারণত ডাক্তাররা এমন করে যে, কারো মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাকে অচেতন করার জন্য ইঞ্জেকশন পুশ করে। এ কারণে বেচারা অজ্ঞান-অচেতন হয়ে যাওয়ায় জীবনের শেষ মুহূর্তে কালেমা পড়ার সুযোগ পায় না। কালেমা পড়া ছাড়াই দুনিয়া হতে বিদায় নেয়। তাই কারো সম্পর্কে যদি জানা যায়, তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত, তাহলে ডাক্তারকে কঠোরভাবে নিষেধ করতে হবে, জনাব! আপনি যথাসাধ্য তার আরোগ্যের জন্য চেষ্টা করেছেন। এখন যেহেতু মৃত্যুর আলামত দেখা গেছে। তাই তাকে আল্লাহর দরবারে পৌঁছার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার অবকাশ দিন এবং তার চেতনা বাকি থাকার ব্যবস্থা করুন, যাতে সে কালেমা শরীফ পড়া অবস্থায় দুনিয়া হতে বিদায় নিতে পারে।

মৃত্যুযাত্রীর উপর জুলুম না করা

অসুস্থ ব্যক্তি একবার কালেমা পড়লে তার সঙ্গে আর কথা না বলা চাই, যাতে এই কালেমা-ই হয় জীবনের শেষ উচ্চারণ। এমন যেন না হয় যে, বোন এসে বলল, ভাই আমাকে চিনছেন, আমি কে? এ নাজুক সময়ে পরিচয়-পরিচিতি বাদ দিবে এবং চুপ থাকবে, যাতে তার উচ্চারিত কালেমা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। ঘরে আলেম থাকলে এই চাপাচাপি হয় না। কিন্তু আলেম না থাকলে বেশির বাগ আত্মীয়-স্বজন তার উপর জুলুম করে এবং তাকে শেষ সময়ে কালেমা পড়া হতে বঞ্চিত করে দেয়। এজন্য মৃত্যুগামী ব্যক্তির শিয়রে কোনো আলেম থাকা ভালো, যিনি তাকে কালেমা পড়ার তালকীন করবেন।

কালেমার তালকীনের তরিকা

মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে জোর দেওয়া উচিত নয় যে, আপনি কালেমা পড়ুন। বারবার চাপাচাপি করলে সে বিগড়ে যেতে পারে। এ

সময়ে যেহেতু অস্বীকার করতে পারে, তখন এটা হিতে বিপরীত হবে। তালকীনের উত্তম পদ্ধতি হলো, মৃত্যুগামী ব্যক্তির শিয়রে বসে একটু উঁচু স্বরে নিজেরা কালেমা পড়া, যাতে সে তাদের আওয়াজ শুনে কালেমা পড়ে নেয়।

নেসবতে নকশবন্দিয়ার বরকতের ঘটনা

এখন একটি গোপন কথা বলছি। এমন কথা বলা আমার অভ্যাস নয়। তথাপি একটি ঘটনা আল্লাহর পক্ষ হতে মনে পড়ে যাওয়ায় বলছি। হতে পারে, এর দ্বারা কারো উপকার হবে।

আমার এক পুরাতন বন্ধু ছিল। তিনি আমার সমবয়স্ক এবং সহপাঠী ছিলেন। তার পিতা সিলসিলায়ে নকশবিন্দয়ার বাইয়াত ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার সময় আমি বিদেশে ছিলাম। বিদেশ থেকে ফিরে এলে আমার সহপাঠী বন্ধু তার পিতার ঘটনা আমাকে অযুর সঙ্গে মসজিদে শোনান। বন্ধু বলেন–

আমার পিতার উপরে মৃত্যুর আলামত পলিক্ষিত হতে থাকে। আমরা ভাই-বোন সকলে নিকটে বসে ছিলাম। কেউ সূরা ইয়াসীন পড়ে আর কেউ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা পড়তে থাকি। আমি পনের মিনিট ধরে এক দৃষ্টিতে পিতার চোহারার দিকে তাকিয়ে থাকি এবং কালেমা পড়তে থাকি। কিন্তু তাঁর মুখটা যেন সেলাইকরা; একটুও নড়ে না।

ইতিমধ্যে বোন ইশারায় জানাল, পিতাজির পা আগে খাড়া থাকলেও এখন তা ঢলে গেছে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি, পায়ের দিক থেকে তাঁর রূহ বের হতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর আমি লক্ষ করলাম, তাঁর হাঁটু আগে খাড়া থাকলেও এখন ঢলে গেছে। তখনও শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়নি। তবে পূর্বের তুলনায় একটু গতি দেখা যাচ্ছিল। আমরা স্পষ্টই বুঝছিলাম, আর সামান্য সময়ের ব্যাপারে মাত্র। আমি যখন পিতার হাঁটু ঢলতে দেখি, তখন আমার অন্তরে একথা জাগল যে, আমি পনের মিনিট ধরে আব্বার চেহারার দিকে চেয়ে আছি। আমি তাকে ঠোঁট নাড়াতে দেখিনি, তবে কি তিনি কালেমা পড়া ছাড়াই দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন? একথা ভেবে আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি এবং দু'আ করতে থাকি, হে আল্লাহ! আমার পিতার সম্পর্কে শায়খ যুলফিকার আহমাদ দামাত বারাকাতুহুমের সঙ্গে। তাঁর সম্পর্ক তার শায়খের সঙ্গে। এভাবে উপরে যেতে-যেতে এই সম্পর্ক পৌঁছেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। হে আল্লাহ! যদি এই নেসবতের কোনো মূল্য

আপনার কাছে থাকে, তাহলে তার বরকতে আমার পিতাকে কালেমা পড়ার তাওফীক দিন।

বন্ধু বলেন, আমার দু'আয় কারেন্টের মতো কাজ হলো। দু'আ শেষ হতেই পিতার ঠোঁট খুলে গেল এবং তিনি পাঁচবার কালেমা পাঠ করে মৃত্যুবরণ করলেন। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট এই নেসবতের দাম অনেক। আমাদের বড়দের জীবন তাকওয়ার দ্বারা ঘেরা ছিল। আমরা যদিও মেহনতী নই; কিন্তু আমাদের বড়রা ঠিকই আল্লাহর মকবুল বান্দা ছিলেন।

ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর উপর শয়তানের হামলা

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে এলে ছাত্ররা তার সামনে কালেমা তায়্যেবা পাঠ করা শুরু করল। তাদের আওয়াজ শুনে ইমাম সাহেব বললেন ৸ (না)। এর কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন ৸। তাঁর ছাত্ররা অবাক হয়ে গেল যে, ইমাম সাহেব পুরো কালেমা শরীফ পড়ার পরিবর্তে শুধু ৸ বলছেন কেন! কিছুক্ষণ পর তাঁর শরীর কিছুটা ভালো হলে এবং হুশ ফিরে এলে একটু কথাও বলতে শুরু করলেন। এসময়ে এক ছাত্র জিজ্ঞাসা করল, হযরত! যখন আমরা কলেমা পড়ছিলাম, তখন আপনি পুরো কলেমা পড়ার পরিবর্তে শুধু ৸ বলছিলেন; এর কারণ কী? ইমাম সাহেব বললেন, সেসময় শয়তান আমার সামনে ছিল এবং সে আমাকে বলছিল, আহমদ ইবনে হাম্বল! তুমি ঈমান বাঁচিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছ। জবাবে আমি শয়তানকে বলছিলাম ৸ এখনও নয়, এখনও নয়; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত রূহ বের না হবে, ততক্ষণ আমি তোমরা থেকে নিরাপদ নই।

ইমাম রাযী (রহ.)-এর বাণী

হযরত ইমাম রাযী (রহ.) বলতেন–

হে বান্দা! শয়তান অবসর আর তুমি কর্মব্যস্ত। শয়তান তোমাকে দেখে আর তুমি তাকে দেখতে পাও না। তুমি তাকে ভুলে যাও; কিন্তু সে তোমাকে ভোলে না। তোমার ভেতর থেকে তোমারই নফ্স তার সাহায্যকারী। তাই আবশ্যক হলো, শয়তানের আক্রমণ হতে যেকোনো মূল্যে নিজেকে রক্ষা করো। অন্যথায় ঈমানি যুদ্ধে সে তোমাকে পরাস্ত করে ঈমান থেকে বঞ্চিত করে দেবে।

শয়তানের ধোঁকার চূড়ান্ত পর্যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নামায পড়ালেন এবং সূরা নাজ্‌ম তেওয়াত করলেন। পড়তে-পড়তে এই আয়াতে পৌঁছান–

أَفَرَءَيْتُمُ اللَّٰتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾

'তোমরা কি লাত ও উয্‌যা সমন্ধে চিন্তা করেছ? তৃতীয় আরেকটি সম্বন্ধে, যার নাম মানাত?'[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পড়ে শ্বাস নিতে থাকেন। এই বিরতির সময়ে সাহাবায়ে কেরামের অনুভূত হলো, নবীজি এ বাক্যও বলেছেন–

وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ

'তাদের থেকে শাফয়াতের আশা করা যায়।'

নবীজির তেলাওয়াত মুশরিকরাও শুনছিল। যখন তারা দেখল, মুহাম্মদ এই আয়াতও পড়েছে, তখন তারাও মুসলমানদের সঙ্গে মিলে সেজদা দিল এবং খুশি প্রকাশ করে বলল, আজ থেকে সমস্ত গন্ডগোল মিটে গেল।

সাহাবায়ে কেরামের অন্তর ভারাক্রান্ত হলো। এমনকি তারা নবীজির খেদমতে এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর নবী! এ আয়াত কী নতুন অবতীর্ণ? এ আয়াতখানা আমরা সদ্য শুনলাম। নবীজি জবাবে বললেন, আমি তো এ আয়াত তেলাওয়াত করিনি। এরই মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর প্রিয় হাবীব! যখন আপনি লাত, মানাত ও উযযাওয়ালা আয়াত পড়ে বিরতি দেন, তখন শয়তান এমন আওয়াজ সৃষ্টি করেছিল যে, সাহাবারা ধরতে পারল না, কে পড়ছে এবং তারা মনে করল, সম্ভবত আপনার পক্ষ হতে এই আয়াত পড়া হয়েছে। শয়তান তাদেরকে ধাঁধাঁয় ফেলতে চেষ্টা করেছে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্তমানে যখন জামাতের সঙ্গে নামায আদায় হতো এবং খুশু-খুজুর কোনো অন্ত ছিল না, তখনও ধোঁকা দিতে শয়তান কার্পণ্য করেনি। তাহলে এটাই স্বাভাবিক যে, আমাদেরকে সে কোনো সময়ে ধোঁকা দেওয়া থেকে বিরত হবে না।

---

১. সূরা নাজ্‌ম : আয়াত ১৯, ২০

শয়তানের বিভিন্ন ধোঁকা

শয়তান বিভিন্নভাবে ধোঁকা দেয়। যথা–

(১) ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, শয়তান মানুষকে সৎকর্ম হতে বিরত রাখে। অর্থাৎ মানুষের মন থেকে সৎকর্মের গুরুত্ব বের করে দেয়। আর সে কারণেই বান্দা বলে, ঠিক আছে, নামায পড়ব। অথচ তার অন্তরে নামায পড়ার নিয়ত থাকে না।

(২) শয়তানের বলা সত্ত্বেও মানুষ যদি সৎকর্ম হতে বিরত না হয় এবং সে নিয়ত করে, আমি এই সৎকাজ করব, তখন সে অন্য হাতিয়ার ব্যবহার করে। তার টালবাহানা সৃষ্টি করে। যেমন– কারো মনে এ খেয়াল ঢুকিয়ে দেয় যে, ঠিক আছে, কাল তাওবা করিস। কারো অন্তরে এই খেয়াল এল যে, সে সৎ কাজকে পিছিয়ে দেয়। আর যে কাজ একবার পিছিয়ে যায়, সে কাজ দ্বিধার মধ্যে পড়ে যায়।

(৩) যদি কোনো মানুষ শয়তানের প্ররোচনা সত্ত্বেও সৎ কাজ করা হতে বিরত না হয়, তখন শয়তান অন্তরে জাগিয়ে দেয় যে, দ্রুত কর। যেমন– খানা খাওয়া এবং নামায পড়ার ব্যাপারে শয়তান বলে, আগে দ্রুত নামায পড়ে নাও, তারপর ধীরে-সুস্থে খাবার খাও। না ভাই! এমন নয়; বরং এভাবে বলতে হবে যে, দ্রুত খানা খেয়ে তারপর প্রশান্তির সঙ্গে নামায পড়ব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচ কাজে তাড়াহুড়া জায়েয। এই পাঁচ কাজ ছাড়া অন্য কাজে তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ হতে হয়। যথা–

(১) মেয়ে বড় হলে এবং উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া।

(২) ঋণী হলে জলদি ঋণ পরিশোধ করা।

(৩) কেউ মারা গেলে জলদি তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা।

(৪) মেহমান এলে দ্রুত তার মেহমানদারি করা। এ কারণে আমরা এশিয়ার দেশসমূহে দেখেছি, মেহমান ঘরে এলেই আর কিছু না থাকলেও অন্তত মেহমানের সামনে পানি পেশ করা হয়। তারপর অন্যান্য পানীয়, শরবত, খানা ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়।

মনে রাখবেন, পানি পান করানোও মেনমানদারির অন্তর্গত। সুতরাং যেব্যক্তি মেহমানের সামনে জগ ভরে পানি রাখল, তাও মেহমানদারির মধ্যে পরিগণিত হবে।

(৫) কোনো গুনাহ হয়ে গেলে জলদি করে তাওবা করা।

এই পাঁচটি বিষয়ে তাড়াহুড়া করা ভালো এবং হাদীছের নির্দেশ। এ ছাড়া অন্যত্র জলদি করা শয়তানের ষড়যন্ত্র ও কারসাজি।

(৪) কেউ জলদি কোনো নেক কাজ করলে, শয়তান সেই কাজ নষ্ট করতে তাতে রিয়ার সংযোগ করে দেয়। আমলকারী ভাবে, লোকজন দেখুক, আমি কেমন নেক কাজ করছি।

(৫) যদি কারো আমল রিয়াহীন হয়, তখন শয়তান তার অন্তরে আত্মগর্বের ভাব পয়দা করে। ফলে আমলকারী ভাবে, আমি অন্যের তুলনায় ভালো। যেমন– বলে, আমি তো নামায পড়ি, কিন্তু অমুক তো নামাযই পড়ে না। সে বোঝে, আমি তো আলেম, হাফেয, কারী এবং আমি এত হজ করেছি। যখন এভাবে তার মধ্যে বিভিন্নভাবে নিজেকে ভালো মনে করার মনোভাব জাগে, তখন এই মনোভাবই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(৬) যদি তার অন্তরে আত্মগর্ব সৃষ্টি না হয়, তখন শয়তান শেষ অস্ত্র ব্যবহার করে। শয়তান মানুষের অন্তরে যশ-খ্যাতির বাসনা সৃষ্টি করে দেয়। সে যদিও মৌখিকভাবে সুখ্যাতির কথা বলবে না; কিন্তু মনে-মনে ভাবে, মানুষ যেন আমার প্রশংসা করে। যখন মানুষ তার প্রশংসা করে, তখন সে খুশি হয়।

শয়তান এই ছয় প্রক্রিয়ায় মানুষের নেক আমল বরবাদ করে।

শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার উপায়

শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার উপায় তিনটি। যথা–

(১) আমাদের বুযুর্গানে কেরাম উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, বন্ধু যদি বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যায় এবং তার বাড়ির বারান্দায় পালিত কুকুর থাকে আর সেই কুকুর তাকে কামড়াতে আসে, তাহলে তার থেকে বাঁচার উপায় তিনটি–

এক. সে নিজের বাড়িতে ফিরে আসবে। এমনটি করলে বন্ধুর সঙ্গে তার কখনও সাক্ষাত হবে না।

দুই. কুকুরের সঙ্গে লড়াই শুরু করবে। এতে অবশ্যই সে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

তিন. বন্ধুকে বাইরে থেকে ডেকে বলবে, তোমার কুত্তা সামলাও। যখন বাড়িওয়ালা বন্ধু তার কুত্তাকে ইশারা করবে, তখন কুত্তা দমে যাবে এবং পথ থেকে সরে এক কোনায় গিয়ে বসে পড়বে।

আমাদের শায়খগণ বলেন, শয়তান হলো কুকুরের মতো। যদি শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ি, তাহলে আমাদের সময় নষ্ট হবে। তাই উত্তম হলো তার মালিককে ডাকা যে, হে আল্লাহ! এই বিতাড়িত শয়তান থেকে আমাদের হেফাযত করুন। আমাদের ডাকে আল্লাহ ইশারা দিলে শয়তান দমে গিয়ে পথ থেকে সরে যাবে এবং আল্লাহ তার অনিষ্ট হতে আমাদের হেফাযত করবেন। যেহেতু বাঁচাবেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তাই প্রত্যেক দিন শয়তানের ফেতনা থেকে বাঁচার দু'আ করা উচিত। আমাদের মাশায়েখদের রীতি ছিল, তাঁরা ইশার নামাযের পরে দুই রাকাত নফল পড়ে স্বীয় ঈমানের হেফাজতের জন্য প্রতিদিন এভাবে দু'আ করতেন যে, হে আল্লাহ! আমরা অক্ষম ও অসহায়; আপনি আমাদের ঈমান রক্ষা করুন।

(২) শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার দ্বিতীয় উপায় হলো সুন্নতের অনুসরণ। কেননা, মানুষ যখন প্রত্যেক কাজ সুন্নত মোতাবেক করে, তখন শয়তান সেখানে নাক গলানোর অবকাশ পায় না। যেমন– নবীজি প্রত্যেক ওই কাজ করেছেন, যার দ্বারা শয়তানের পথ আপন-আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। এর বিপরীতে আপনি যেখানেই সুন্নত ত্যাগ করবেন, সেখানেই শয়তান নাক গলানোর সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত নবীজির প্রত্যেকটি সুন্নতের উপর আমল করলে শয়তানের ধোঁকার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।

(৩) শয়তানের ফেতনা থেকে বাঁচার তৃতীয় উপায় হলো বেশি-বেশি যিকির করা। বস্তুত এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, অধিক হারে যিকির করার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করেন।

হযরত উমর (রাযি.)-এর শয়তানের ভয়

আমাদের বড়দের জীবন এমন পূতঃপবিত্র ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদ করে দিয়েছিলেন। হাদীছে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শয়তান উমরের ছায়াকেও ভয় করে। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত উমর (রাযি.) যে রাস্তা দিয়ে চলতেন, শয়তান সে রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরত। আল্লাহু আকবার! আল্লাহপাকের দরবারে তাঁর এমন মকবুলিয়াত ছিল যে, তাঁর প্রত্যেকটি কাজ শতভাগ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মোতাবেক হতো।

বর্ণনায় এসেছে, শয়তান তিনবার হযরত উমর (রাযি.)কে বিপথগামী করার চেষ্টা করেছে। তিনি তিনবারই তাকে ধরাশায়ী করে দেন এবং তারপর শয়তান তার কাছে আসাই ছেড়ে দেয়।

শয়তান কঙ্কালসার কীভাবে হলো?

শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) ফাযায়েলে যিকির-এ একটি ঘটনা লিখেছেন। ঘটনাটি হলো–

একলোক শয়তানকে দেখে। তখন তার অবস্থা বড়ই কঙ্কালসার ও করুণ ছিল। লোকটি শয়তানকে জিজ্ঞাসা করল, এমনটা কীভাবে হলো? শয়তান বলল, কী আর বলব, কিছু লোক এমন আছে, যারা আমার কলিজাটাকে কাবাব বানিয়ে দিয়েছে। তারা আমাকে কঙ্কালসার বানিয়ে দিয়েছে। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, তারা কারা? শয়তান বলল, তারা হলো, যারা অমুক জামে মসজিদে বসা আছে। লোকটি তখনই সেই মসজিদে গেল। সে মসজিদে ঢুকে দেখল, সেখানে কতক মুত্তাকী, পরহেযগার ও আল্লাহওয়ালা লোক বসে আল্লাহর যিকির করছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরেও বিষয়টি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে লোকটি মসজিদে ঢুকতেই তারা মুচকি হেসে আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, ওই মরদুদের উপর আস্থা রেখো না।

বিবস্ত্র হয়ে শয়তানের ঘোরাফেরা

একবুযুর্গ কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি শয়তানকে বিবস্ত্র দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মরদুদ! মানুষের মধ্যে এভাবে বিবস্ত্র হয়ে চলতে তোমার লজ্জা লাগে না? শয়তান বলল, খোদার কসম! এরা মানুষ নয়। যদি এরা মানুষই হতো, তাহলে আমি এদের সঙ্গে ওইভাবে খেলতাম না, যেভাবে বাচ্চারা বল নিয়ে খেলে। মানুষ তো তারা, যারা যিকিরের মাধ্যমে আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলেছে।

শয়তানের যত ভয়

শয়তান যিকিররত ব্যক্তির অন্তরের নূরের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। কেননা, তার অন্তর আল্লাহর তাজাল্লির ঘর হয়ে যায়। আবু সাঈদ খাযায (রহ.) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, শয়তান আমার উপর আক্রমণ করেছে। আমি তার প্রতিরোধ করতে হাতে একটি লাঠি তুলে নিয়ে তাকে মারতে শুরু করি। শয়তান এর কোনো পরোয়া করে না। তখন গায়েব হতে আওয়াজ

এল, এই মরদুদ লাঠিকে ভয় করে না; বরং সে মানুষের অন্তরের নূরকে ভয় করে। সুতরাং যার দিল যত নূরান্বিত হয়, শয়তান তাকে ততখানি ভয় করে।

শয়তানের সঙ্গে এক আবেদের কুস্তি

ইহয়াউল উলূম গ্রন্থে লেখা আছে, বনী ইসরাঈলে এক আবেদ বাস করতেন। তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত থাকতেন। একবার তার কাছে কতিপয় লোক এল এবং বলল, হযরত! এখানে এমন একটা কওম বাস করে, যারা একটা গাছের পূজা করে। তাদের বুঝিয়ে ওই বৃক্ষপূঁজা হতে বিরত রাখলে ভালো হয়। শুনে আবেদ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি একটা কুড়াল নিয়ে ওই গাছটি কাটতে রওনা হন।

পথিমধ্যে শয়তান এক বুড়োর রূপ ধরে আবেদের মুখোমুখী হয়। বুড়োর ছদ্মবেশী শয়তান তাকে জিজ্ঞাসা করে, হযরত কোথায় চলেছেন? আবেদ বললেন, অমুক গাছটা কাটতে যাচ্ছি। শয়তান বলল, সেই গাছের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী? আপনি ইবাদাতে লিপ্ত থাকবেন। একটা অনর্থক কাজ করতে গিয়ে স্বীয় ইবাদাত ছাড়বেন কেন? আবেদ বললেন, এটাও ইবাদাত। শয়তান বলল, আমি আপনাকে ওই গাছ কাটতে দেব না। পরিশেষে দুজনের মাঝে কুস্তি বাঁধল। আবেদ দ্রুত শয়তানকে পরাস্ত করে ফেললেন এবং তাঁকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে তার বুকে চেপে বসলেন।

শয়তান নিজেকে অসহায় দেখে আরেকটি চাল চালল। সে বলল, ঠিক আছে, একটি কথা শুনুন। আবেদ তাকে ছেড়ে দিলেন, শয়তান বলল, আল্লাহ আপনার উপর এই গাছ কাটা ফরজ তো করেননি। গাছের দ্বারা আপনার তো কোনো খতি হচ্ছে না। আপনি তার পূঁজাও করেন না। আল্লাহর অনেক নবী এসেছেন। আল্লাহ চাইলে কোনো নবীর দ্বারা গাছটি কাটিয়ে দিতে পারেন। তাই আমি বলি, আপনি গাছ কাটার ইচ্ছা বাদ দিন। কিন্তু আবেদ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমি অবশ্যই কাটব।

শয়তান আবার তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো এবং আবেদ তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বরকতে এবারও তাকে পরাস্ত করে তার বুকে চেপে বসলেন।

শয়তান এবার পন্থা বদল করল। বলল, আপনি একজন গরীব মানুষ। দুনিয়াবাসীর বোঝা হয়ে আছেন। এবার আমি চূড়ান্ত কথা বলছি যে, আপনি সিদ্ধান্ত পরিহার করুন। আমি আপনাকে প্রতিদিন তিনটি করে দিনার প্রদান

করব। প্রতিদিন আপনার শিয়র থেকেই তা আপনি পেয়ে যাবেন। এই মুদ্রা দ্বারা আপনার প্রয়োজনও মিটবে, গরীবদের সাহায্য করতে পারবেন এবং আত্মীয়দের হকও আদায় করতে পারবেন। এমনটি করায় আপনার অনেক ছাওয়াব হবে। অথচ গাছ কাটলে শুধু গাছ কাটার ছাওয়াব হবে। এর বেশি নয়।

শয়তানের এ প্রস্তাবে আবেদ সম্মত হলেন। তিনি প্রতিদিন তিনটি করে স্বর্ণমুদ্রা পেতে থাকেন। কয়েক দিন পর মুদ্রা বন্ধ হয়ে গেল। এতে তিনি শয়তানের উপর ক্ষেপে গিয়ে আবার কুড়াল নিয়ে গাছ কাটতে রওনা হলেন। পথিমধ্যে পূর্বের বুড়োর সঙ্গে আবার দেখা হলো। বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, কোথায় চলেছেন? আবেদ বললেন, গাছটা কাটতে যাচ্ছি। শয়তান বলল, আপনি গাছটা কাটতে পারবেন না। একথায় দুজনের মধ্যে আবার মারামারি শুরু হলো। এবার শয়তান জিতে গেল এবং সে আবেদের বুকের উপর চেপে বসল।

আবেদ আবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার? এবার তুমি বিজয়ী হলে কী করে? শয়তান বলল, প্রথমবার আপনার রাগ ছিল খালেস আল্লাহর জন্য। তাই আল্লাহ আপনাকে আমার উপর বিজয়ী করেছিলেন। কিন্তু এবার যেহেতু আপনার রাগের সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ার লোভ মিশ্রিত ছিল, তাই এবার আমি বিজয়ী হয়েছি।

শয়তানের উপর শয়তানি

বর্তমান যুগে আমাদের অনেক বেশি মেহনত করা জরুরি। কেননা, অতীতে ফেতনা আসত পায়ে হেঁটে। কিন্তু বর্তমান যুগে ফেতনা আসছে বাহনে চড়ে। একবার জনৈক লোক শয়তানকে অবসর দেখতে পায়। সে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপার কী; আজ মনে হচ্ছে ছুটি কাটাচ্ছ? শয়তান বলল, বর্তমানে মানুষের মধ্যেই আমার অনেক শিষ্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। তারাই আমার কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে। তাই আমার বেশি মেহনতের প্রয়োজন নেই। লোকটি অবাক হয়ে বলল, সত্যিই মানুষ এখন তোমার কাজ করছে? শয়তান বলল, হ্যাঁ, আমার শিষ্যরা বড় পাকা। আগে আমি তাদের গুনাহের পদ্ধতি শেখাতাম। এখন তারা এমন হয়েছে যে, আমি নিজেই তাদের থেকে পদ্ধতি শিখি। বাস্তবিক মানুষ যখন বিগড়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে আর মানুষ থাকে না। শয়তান থেকেও এগিয়ে যায়। শয়তানিতে শয়তানকেও ছেড়ে যায়। মানুষ হয়ে যায় গুরু আর শয়তান হয়ে যায় তার শিষ্য।

শয়তানের আর্তনাদ

প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবালের কথা হৃদয়ে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার ফার্সী কাব্য উর্দূ কাব্য হতে বেশি ভালো। আল্লাহপাক যাদেরকে ফার্সী ভাষার জ্ঞান দান করেছেন, তারা বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন। বরং এটুকু বললেও অতুক্তি হবে না যে, ফার্সীতে তার কবিতা এত আজব হয় যে, তিনি বাস্তবিকই রুমীর যোগ্য পাকিস্তানী শাগরেদ সাব্যস্ত হয়েছেন। তিনি ফার্সীতে একটি আজব কাব্য লিখেছেন, যার নাম হলো- নালায়ে শয়তান' তথা শয়তানের আর্তনাদ। তিনি বলেন, শয়তান একবার আসর বসায় এবং আল্লাহর কাছে এভাবে ফরিয়াদ করে–

ابن آدم چیست یک مشت خس است

مشت خس رایک شرر از من بس است

'হে আল্লাহ! বনী আদম কী? এক সৃষ্টি কুটো মাত্র। এক সৃষ্টি কুটোতে জ্বালানোর জন্য আমার পক্ষ হতে সামান্য আগুনই যথেষ্ট।'

اندریں عالم اگر جز خس نہ بود

ایں قدر آتش مرا دادن چہ سود

'হে আল্লাহ! যদি এই কুটো ছাড়া দুনিয়াতে অন্য কিছু না থাকত, তাহলে আপনি যে আমাকে এত আগুণ দিয়েছেন, তা আপনি আমাকে কেন দিলেন?'

اے خدا! یک زندہ مرد حق پرست

لذتے شاید کہ یابم در شکست

'হে আল্লাহ! কোনো একজন আল্লাহওয়ালা আমাকেও মিলিয়ে দিন, যাতে আমিও পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করতে পারি।'

শয়তানের অপদস্থ ও অপমানিত হওয়া

আল্লাহপাকের কত বড় দয়া যে, শয়তান মানুষকে যতই গুনাহ করাক না কেন, বান্দা যখনা লজ্জিত হয়ে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন। তখন এই অভিশপ্ত শয়তান নিজের মাথায় মাটি ছুড়ে ফেরে। এ কারণে উকুফে আরাফার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি শয়তানকে বদরের দিন বা আরাফার দিন যত

অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হতে দেখেছি, এর থেকে বেশি অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হতে তাকে আর কখনও দেখিনি। তার চুল উস্কোখুস্কো থাকে। মাথায় মাটি ছুড়ে কাঁদতে থাকে। কেননা, সে মানুষকে বিপদগামী করতে বছরের পর বছর মেহনত করে; অথচ মানুষ আরাফার ময়দানে এসে তাওবা করতেই আল্লাহ সারা বছর নয়; বরং সারা জীবনের গুনাহ মাফ করে দেন। তাওবা এমন একটি জিনিস যে–

It can change our minus into plus

'তা আমাদের গুনাহসমূহকে নেকী দ্বারা বদলে দেয়।'

বনী আদমকে বিপদগামী করার প্রত্যয় ও তার জবাব

যখন শয়তান বলেছিল, হে আল্লাহ! আমাকে আদম (আ.)-এর কারণে গলা ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। ফলে–

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

'আমি তোমার ইজ্জতের কসম দিয়ে বলছি, আমি বনী আদমকে বিপদগামী করব, তাদের প্রবঞ্চনা দেব এবং তাদের বেশির ভাগ লোক তোমার নাশোকর হবে।'[১]

তখন আল্লাহর রহমতে জোশ এল। তিনি বললেন, হে দুর্ভাগা শয়তান! তুমি আমার কসম খেয়ে বলছে, আমার বান্দাদের প্ররোচিত করবে, বিপদগামী করবে! তাহলে রে হতভাগা! তুইও আমার কথা শুনে রাখ, আমার বান্দারা যতই গুনাহ করুক, যতই গুনাহ করুক, যতই গুনাহ করুক, যদি তারা মৃত্যুর পূর্বে আমার সকাশে ফিরে মাফ চায়–

فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي

'তাহলে আমার ইজ্জতের কসম, আমার প্রতাপের কসম! আমি তাদের তাওবা কবুল করতে থাকব, যতক্ষণ তারা আমার কাছে মাফ চাইতে থাকবে।'

শয়তান মানুষকে বিপদগামী করতে একটি কসম খায় আর আল্লাহ তা'আলা মাফ করার জন্য দুটি কসম খেয়েছেন। তাই আমাদের কর্তব্য হলো, শয়তান আমাদের দ্বারা যতই গুনাহ করাক না কেন আমরা গুনাহ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আবার তাওবা করে নেব।

---

১. সূরা সোয়াদ : আয়াত ৮২

দুটি সংরক্ষিত দিক

যখন শয়তান বলে, হে আল্লাহ! আমি বনী আদমের উপর ডান, বাম, আগে, পিছে এই চারদিক থেকে হামলা করব, তখন ফেরেশতারা একথা শুনে বড়ই অবাক হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার ফেরেশতারা! এত বিস্মিত হচ্ছ কেন? ফেরেশতারা বলে, ব্যাপারটি তো বনী আদমের জন্য কঠিন হয়ে গেল। তারা অভিশপ্ত শয়তানের ধোঁকা হতে রেহাই পাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা এত চিন্তিত হয়ো না। শয়তান চার দিকের নাম নিয়েছে কিন্তু উপর ও নিচ– এ দুই দিকের কথা ভুলে গিয়েছে। তাই আমার গুনাহগার বান্দারা যখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আমার দরবারে আমাকে ডাকবে এবং দুহাত তুলে দু'আ করবে। তখন হাত যেহেতু উপর পানে তোলা থাকবে এবং শয়তান উপর দিক দিয়ে হামলা করতে পারবে না, তাই আমি বান্দার হাত উপর হতে নিচে যাওয়ার পূর্বে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেব। এমনিভাবে আমার বান্দা যদি কখনও লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আমার দরবারে এসে মাথা অবনত করে, যেহেতু মাথার নিচের দিকে থাকবে আর শয়তান নীচের দিক থেকে হামলা করতে পারবে না, তাই বান্দার মাথা সেজদা হতে উপরে ওঠার আগেই আমি তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেব।

আমার বন্ধুগণ! উপর ও নিচের দুটি দিক সুরক্ষিত আছে। তাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নির্জনে হাত উঁচু করে ক্ষমা চান। সেজদায় গিয়ে কাঁদুন। আপনারা এই মসজিদে অবস্থান করে তার ঘরের চৌকাঠ ধারণ করে আছেন। হতে পারে আমাদের মধ্যে কোনো অনুতপ্ত ব্যক্তির রোনাজারি আল্লাহর ভালো লেগে যাবে এবং তাঁর ইখলাসের বরকতে আল্লাহ সকলের তাওবা কবুল করবেন।

হে আল্লাহ! ভবিষ্যত জীবনে আমাদেরকে শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচান এবং মৃত্যুর সময় আমাদের ঈমান হেফাযত করুন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ

'এবং (এতদসত্ত্বেও) মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের এমনভাবে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করে যে, তাদেরকে তারা ভালোবাসে আল্লাহর ভালোবাসার মতো।' –সূরা বাকারা : ১৬৫

মাখলুকের মহব্বত

[১৪২২ হিজরীর ২৫ শে রমযান মোতাবেক ২০০১ সনের ১০ই ডিসেম্বর মসজিদে জাম্বিয়ায় এ বয়ান হয়। এতে অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।]

'প্রত্যেক জিনিসের একটি সীমা থাকে। যখন কোনো জিনিস সীমা অতিক্রম করে, তখন তা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। স্ত্রী-সন্তানের মহব্বত ভালো। তবে শর্ত হলো, মানুষ শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে এই মহব্বত করবে। যদি এই মহব্বত তাকে শরীয়তবিরোধী কাজে বাধ্য করে, তবে তা নিন্দনীয় হয়ে যাবে। অনেক মানুষ এমন আছে, যারা স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ঘুষ নেয়, ধোঁকা দেয়, না জানি আরও কত ঝুঁকি গ্রহণ করে। এতদ্ব্যতীত মানুষ সন্তানের বাহানা দিয়ে অবৈধভাবে অর্থ-সম্পদ কামাই করে। বাস্তবতা এমন হলে তখন স্ত্রী-সন্তানের এই মহব্বত তাদের জন্য ছাওয়াবের কাজ হবে না; বরং সম্পূর্ণ নিন্দাযোগ্য ও পরিত্যাজ্য কাজ হবে।'

মাখলুকের মহব্বত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

তৃতীয় বড় দুশমন

دشمن শব্দের তৃতীয় অক্ষর হলো م। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাখলুক। মাখলুকও আমাদের দুশমন। কেননা, মাখলুকও অনেক সময় বান্দা ও আল্লাহর মাঝে অন্তরায় হয়ে যায়। কতক মহব্বত এমন আছে, আল্লাহর পক্ষ হতে যা করার নির্দেশ রয়েছে। আর কতক মহব্বত এমন, যার থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ কারণে মাখলুকের প্রতি সীমার মধ্যে থেকে মহব্বত রাখা একটি নাজুক ও সংবেদনশীল বিষয়। সম্পর্ক হ্রাস পেলেও কৈফিয়ত নেওয়া হবে আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেও জবাবদিহিতা রয়েছে। যেহেতু انسان শব্দটি انس থেকে তৈরী, তাই মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা পরস্পরে কাছাকাছি থাকে। কখনও এমন হয় যে, দুজন লোক সমবেত হলে সেখানে কল্যাণ এসে জমা হয় আবার কখনও দুজন জমা হলে সেখানে অকল্যাণ এসে জায়গা করে নেয়। তখন অকল্যাণ ডাবল হয়ে যায়, যা দুজনেরই ফেতনার কারণ হয়। এ কারণে বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা

দরকার। কেননা, মানুষের সর্বোচ্চ মানবিক স্তরে উপনীত হওয়া এবং আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো মাখলুকের মহব্বতে জড়িয়ে পড়া।

মাখলুকের মহব্বতের সীমারেখা

এক্ষেত্রে সীমারেখা হলো, মানুষ মাখলুকের মহব্বত হতে মুক্ত হয়ে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক জুড়বে। তারপর আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের দাবির সুবাদে মাখলুকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে। অর্থাৎ কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক ব্যক্তিগত চাহিদার কারণে হবে না; বরং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে হবে। একে তাসাওউফ ও সুলুকের পরিভাষায় انقطاع عن المخلوق তথা মাখলুক থেকে বিচ্ছিন্নতা বলে। যেব্যক্তি এটি অর্জন করতে পারে না, আল্লাহর মারেফাত তার অর্জিত হয় না। মাখলুক থেকে বিচ্ছিন্নতার অর্থ কখনো এ নয় যে, লোকালয় পরিহার করে গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করবে; বরং উদ্দেশ্য হলো, সালেকের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

'এবং তোমার প্রতিপালকের নামের যিকির করো এবং সকলের থেকে পৃথক হয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে থাক।'[১]

অর্থাৎ মাখলুকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করো। তারপর আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের দাবি অনুযায়ী মাখলুকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো। বস্তুত এ কারণেই মানুষ

* পিতামাতাকে মহব্বত করে আল্লাহর কারণে।
* ওস্তাদকে মহব্বত করে আল্লাহর কারণে।
* স্ত্রীকে মহব্বত করে আল্লাহর কারণে।
* সন্তানকে মহব্বত করে আল্লাহর কারণে।
* মুসলমানদের মহব্বত করে আল্লাহর কারণে।

যদি এসব মহব্বত আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের কারণে হয়, তবেই তা জায়েয এবং তাতে ছাওয়াব হবে। পক্ষান্তরে এসব মহব্বতের কারণে যদি আল্লাহর মহব্বত হাল্কা হয়ে যায় এবং নফসের মহব্বত প্রবল হয়ে যায়,

---

১. সূরা মুয্যাম্মিল : আয়াত ৮

তাহলে তা নিন্দনীয় হয়ে যাবে। তাই আজকের আলোচ্য বিষয় হলো জায়েয মহব্বত ও নাজায়েয মহব্বত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা।

ঈমানে পরিপূর্ণতা

হাদীছ শরীফে এসেছে-

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

'যেব্যক্তি আল্লাহর জন্য মহব্বত করে, আল্লাহর জন্য রাগ করে, আল্লাহর জন্য প্রদান করে এবং আল্লাহর জন্য দেওয়া বন্ধ করে দেয়, সে অবশ্যই ঈমানকে পরিপূর্ণ করল।'[১]

'হুব ফিল্লাহ' তথা আল্লাহর জন্য মহব্বত সর্বাগ্রে। এটা কাঙ্ক্ষিত ও প্রশংসিত। এ কারণেই হাদীছে এসেছে, কেয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে; যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্য হতে দুজন তারা, যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে।

আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতের মর্যাদা

যারা আল্লাহর জন্য মহব্বত করে, আল্লাহর কাছে তাদের দাম অনেক। তাদের মর্যাদা অনেক বেশি। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

'কেয়ামতের দিন মানুষ তার সঙ্গে থাকবে, যার সাথে তার মহব্বত থাকবে।'

সাহাবায়ে কেরাম বলেন, এ হাদীছ শোনার পর আমরা যত খুশি হই, আমাদের জীবনে এমন খুশি আর কখনো হইনি। কারণ, নবীজির প্রতি তাদের মহব্বত ছিল যেমন বেশি, তেমনি আন্তরিক। তাই যখন এ হাদীছের সুবাদে তারা জানতে পারলেন, আখেরাতে মানুষ তার সঙ্গে থাকবে, দুনিয়াতে যাকে মহব্বত করে, তখন তাঁরা এক ধরনের গ্যারান্টি পেয়ে যান যে, কেয়ামতে তাঁরা নবীজির কদম মুবারকে স্থান পাবেন। এই আনন্দে তাঁরা আত্মহারা হয়ে যান।

---

১. আবু দাউদ, মেশকাত : আয়াত ১৪

বিষয়টি বর্তমানেও প্রযোজ্য। আজও কেউ যদি কোনো আল্লাহওয়ালাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে, তাহলে এই হাদীছ তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কেননা, এ হাদীছের ভাষ্য ও মর্ম এখনও বিদ্যমান। যে আল্লাহওয়ালাকে মহব্বত করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার সঙ্গেই হাশর করাবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুগামী হয়েছে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিদের তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেব এবং তাদের কর্ম হতে কিছুমাত্র হ্রাস করব না।'[১]

এ আয়াতের অধীনে মুফাসসিরীনে কেরাম কয়েকটি মজার কথা লিখেছেন। আর তা নিম্নরূপ।

(১) ওলামা ও মাশায়েখদের সন্তানদের জন্য এ আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে যে, যদি তাদের সন্তান তাদের পিতামাতার মতো তাকওয়া ও তাহারাতওয়ালা জীবন যাপন করার চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহ তাদের প্রতি নরম আচরণ করবেন এবং সন্তানদেরকে তাদের পিতামাতাদের সঙ্গে কেয়ামতে মিলিয়ে দিবেন।

(২) আলোচ্য আয়াতে আসাতিযা (শিক্ষকগণ) ও পীর-মাশায়েখদের ছাত্র ও মুরীদদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। কেননা, তারাও তাদের রূহানী সন্তান। যদি ছাত্র ও মুরীদরা শিক্ষক ও পীরদের প্রতি খাঁটি মহব্বত রাখে, তবে তাদেরও ওস্তাদ ও পীরদের সঙ্গে একত্রে হাশর করানো হবে।

(৩) ওলামায়ে কেরাম আরো লিখেছেন, যারা পরস্পরে আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে মহব্বত রাখবে, তাদের মধ্য হতে একজন যদি তাকওয়ার কারণে উচ্চ স্তরে উঠে যায় এবং বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে যায় আর অপর জন চেষ্টা করা সত্ত্বেও নিচে রয়ে যায় আর এ পারস্পরিক মহব্বত লালন করে সে মারা যায়, তাহলে আল্লাহ কেয়ামতের দিন ওই নিচু স্তরের লোককেও উচ্চ স্তরের সঙ্গীর মর্যাদায় উন্নীত করবেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর ওয়াস্তে কৃত মহব্বতের দাম আল্লাহর কাছে অনেক বেশি। এই খোদায়ী

---

১. সূরা তুর : আয়াত ২১

মহব্বত অব্যহত থাকার জন্য দু'আ করা চাই। কারো জানা নেই, হয়ত কারো মহব্বত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে এবং তা আমাদের ক্ষমার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আলোচ্য আয়াত হতে এ বিষয়টি সহজেই অনুমিত হয়েছে যে, শায়েখের সঙ্গে যে মুরীদের খাঁটি ও গভীর মহব্বত থাকবে, সে কেয়ামতের দিন স্বীয় শায়েখের সঙ্গে অবস্থান করবে। যদি এই শায়েখের অন্তরে তার শায়েখের মহব্বত থাকে, তবে তিনি তার শায়েখের সঙ্গে থাকবেন। এ ধারা উপরের দিকে অব্যাহত থাকবে। ফলে এভাবে একজন অপরজনের সঙ্গে মিলতে-মিলতে কোনো এক সাহাবীর সঙ্গে সকলের মহব্বত হয়ে যাবে। তখন সকলে সাহাবীর সঙ্গে মিলিত হবেন। সাহাবীর অন্তরে নবীজির মহব্বত থাকবে। এই মহব্বতের সুবাদে যখন তিনি নবীজির সঙ্গে মিলিত হবেন, তখন তার মহব্বতকারীরাও নবীজির সঙ্গে থাকার মহা-সৌভাগ্য লাভ করবেন। অতএব বোঝা গেল, যারা আল্লাহওয়ালাদের মহব্বত করবে, কেয়ামতের দিন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মুবারকে স্থান পাওয়ার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবেন।

তিনটি পৃথক নির্দেশ

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে একটি বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার এবং অপর দুটি বস্তু হতে দৃষ্টি হটানোর নির্দেশ দিয়েছেন। যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, সে বিষয়ে তিনি ইরশাদ করেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ

'ধৈর্যের সাথে নিজেকে সেসকল লোকের সংসর্গে রাখো, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে এ কারণে ডাকে যে, তারা তার সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তোমার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায়।'[১]

এখানে আল্লাহ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন। এর থেকে জানা গেল, যারা 'আল্লাহ-আল্লাহ' করে আল্লাহপাকের কাছে তাদের মর্যাদা এত বেশি যে, আল্লাহপাক চান, তাদের চেহারার প্রতি যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। যদি তাদের

১. সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ২৮

থেকে নজর ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে তা تُرِيْدُوْنَ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (তোমরা পার্থিব জীবনের শোভা কামনা কর) এর আওতায় পড়ে যাবে।

এ পর্যায়ে অন্তরে একটি প্রশ্নের উদয় হয় যে, আল্লাহওয়ালাদের চেহারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়ার কারণ কী? এর উত্তর হলো, তাঁরা এমন এক ভিন্ন জগতের মানুষ যে, তাঁদের চেহারা দেখলেই আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায়। মানুষ স্বীয় চেহারা তাঁদের চেহারার আয়নায় দেখে, যার ফলে তাদের মাঝে লজ্জার অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং মনোযোগ আল্লাহর দিকে ঘুরে যায়। এ কারণে আল্লাহপাক কামনা করেন, আমার প্রিয় বান্দাদের মানুষ যেন মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। এই দেখা কখনো বাদ না দেয়।

হযরত বায়েযিদ বুস্তামী (রহ.)-এর এক শিষ্য ছিল। সে বলত, আমার অন্তরে কখনো অন্ধকার ছেয়ে গেলে আমি সোজা গিয়ে স্বীয় শায়েখ হযরত বুস্তামী (রহ.)-এর চেহারার প্রতি তাকিয়ে থাকতাম। এতে আমার দিলের কালিমা দূর হয়ে যেত।

আল্লাহওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাতের একটি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থাকে, যার কারণে অন্তর নেকীমুখী হয়। তাদের সান্নিধ্যে থাকলে মন দুনিয়ার কথা ভুলে যায়। যতক্ষণ তাদের মজলিসে, তাদের সামনে বসে থাকা হয়, ততক্ষণ অন্তরে দুনিয়ার খেয়াল আসে না। আল্লাহওয়ালাদের অন্তর থেকে দুনিয়া এভাবে বিদায় নেয় যে, যারা তাদের সান্নিধ্যে বসে, তাদেরও দুনিয়ার কথা মনে পড়ে না। আল্লাহওয়ালাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত এত বেশি প্রগাঢ় থাকে যে, যারা তাদের কাছে বসে, তাদেরও অন্তর আল্লাহর মহব্বতে টইটুম্বর হয়ে যায়।

আর যে দুই বস্তু হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো গায়রে মাহরাম।

আল্লাহপাক বলেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

'আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে।'[১]

অর্থাৎ তোমরা গায়রে মাহরামদের থেকে স্বীয় দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। আর দ্বিতীয় বস্তুটি হলো, যারা ধনী হয়, চাই মুসলমান হোক বা কাফের তাদের

---

১. সূরা নূর : আয়াত ৩০

দেখে-দেখে মানুষ লালায়িত হয়। এজন্য আল্লাহপাক ধনীদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন–

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ

'আমি যেসব পার্থিব সম্ভার তাদের দিয়েছি, আপনি তার প্রতি কখনো চোখ তুলে তাকাবেন না।'[১]

কেননা, দুনিয়ার ধন-সম্পদ দু-চার দিনের বিষয়মাত্র। এ অনেকটা এমন যেমন কয়েকদিন পূর্ণিমার আলো; তারপরই টানা অমাবস্যার অন্ধকার।

যেহেতু জামাল (রূপ-লাবণ্য) ও মাল (ধন-দৌলত) মানুষকে কাছে টানে, তাই আল্লাহপাক এই দুটি বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করেছেন। এই দু-বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরিবর্তে আল্লাহওয়ালাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। তাহলে আল্লাহর মহব্বত হাসিল হয়ে যাবে।

আলোকরশ্মির মাধ্যমে চিকিৎসা

বুযুর্গদের দৃষ্টিও বড় দামী জিনিস। আল্লাহ তা'আলা আল্লাহওয়ালাদের এক ধরনের আত্মিক শক্তি দান করে থাকেন। বিজ্ঞান জগৎ চুম্বকের রশ্মিকে স্বীকার করে। বাহ্যিকভাবে দেখা যায়, চুম্বক দূরে পড়ে থাকে। কিন্তু সে দূর থেকেই লোহাকে আকর্ষণ করে, কাছে টানে। মূলত লোহাকে আকর্ষণ করতে থাকে চুম্বকের রশ্মিই। যেভাবে চুম্বকের রশ্মি লোহাকে টানে, তেমনি আল্লাহওয়ালাদের দিলের আলোও মুরিদদের অন্তরকে টানতে থাকে এবং মানুষ আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে।

বর্তমানে কিছু রোগের চিকিৎসা হয় আলোকরশ্মির মাধ্যমে। যেমন মানুষ হাসপাতালে গিয়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা আলোকরশ্মির মাধ্যমে করায়। যদি আলোকরশ্মির দ্বারা দেহের বাহ্যিক রোগ নিরাময় হতে পারে, তাহলে দৃষ্টির শক্তির মাধ্যমে দেহের বাতেনি রোগ দূর হতে পারবে না কেন? স্মরণ রাখতে হবে, কুনজর পড়লে মানুষ অসুস্থ হয়ে যায় আর সুদৃষ্টির দ্বারা মানুষ সুস্থতা লাভ করে। এ কারণে আল্লামা ইকবাল (রহ.) বলেন :

عقل کے پاس خرد کے سوا کچھ اور نہیں
ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

---

১. সূরা হিজর : আয়াত ৮৮

‘ ব্রেনে বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু নেই ।
তোমার চিকিৎসা ‘নজর’ ছাড়া আর কিছু নেই ।’

আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন, যেন আমরাও কোনো আল্লাহওয়ালার নজরে থাকা শিখতে পারি ।

কবি চমৎকার বলেছেন–

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

‘শুধু কিতাব, ওয়াজ-নসিহত ও ধন-সম্পদ দ্বারা দীনদারি সৃষ্টি হয় না ।
দীনদারি সৃষ্টি হয় বুযুর্গদের দৃষ্টি দ্বারা ।’

یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی

‘এটি দৃষ্টির অবদান ছিল অথবা মকতবের নৈপূণ্য ছিল ।
ইসমাঈলকে কে শেখালো ‘সন্তানের আদব’?’

آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں
دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں

‘চোখে গেঁথে গেছে কেয়ামতের বিভীষিকা;
মাত্র কদিন ছিলাম কারো দৃষ্টিতে ।’

যেব্যক্তি কোনো আল্লাহওয়ালার নজরে কয়েকদিন থাকে, এই নজর এমন ক্রিয়াশীল হয় যে, তার নজরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে শুরু করে দেয় । সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহওয়ালাদের মহব্বত মানুষের জন্য জরুরি, যাতে তার বাতেনি দোষ-ত্রুটি দূর হয় এবং তার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত গেঁথে যায় ।

পরিচয়-পরিচিতির গুরুত্ব

ঈমানদারদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা জরুরি । কেননা, একই সমাজে থেকে যদি মানুষের পরস্পরের মাঝে সালাম-কালাম ও আদান-প্রদান না থাকে, তাহলে জীবনযাপন কীভাবে চলবে?

এ কারণে হাদীছে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

أَكْثِرُوْا مِنْ مَعْرِفَةِ النَّاسِ فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ شَفَاعَةً.

'তোমরা বেশি-বেশি পরিচয়-পরিচিতি করবে। কেননা, প্রত্যেক মুমিনের শাফা'আতের অধিকার রয়েছে।'

হতে পারে, কাল কেয়ামতে যখন তোমাদের জবাবদিহি হবে, তখন এমন কোনো পরিচিত লোক মিলে যাবে, যার ক্ষমা হয়ে গেছে, তখন সে পূর্বপরিচিতির সুবাদে তোমার জন্য সুপারিশ করবে এবং সেই সুপারিশ তোমার ক্ষমার উসিলা হবে। এ কারণে ঈমানদারদের পরস্পরের মাঝে পরিচয়-পরিচিতি থাকা দরকার। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا

'আমি তোমাদেরকে গোত্র ও শাখায় এজন্য বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার।'[১]

আমি অনেক লোক দেখেছি, যাদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতির প্রয়োজনীয়তাবোধ নেই। তারা এর থেকে দূরে থাকে। আমি বলি, এর পেছনে বেশি সময় দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু যদি কখনো সুযোগ-সময় হয়, তাহলে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরিচিত হওয়া ভালো। অন্তত এটুকু জিজ্ঞাসা করা চাই যে, আপনার নাম কী? বাড়ি কোথায়? কেননা, অন্য কোনো সম্পর্ক না থাকলেও মুসলমান হওয়ার কারণে এক ধরনের 'দীনি সম্পর্ক' তো অবশ্যই আছে। এই সম্পর্কের দাবিও পরিচিত হওয়া।

অমানবিকতার যুগ

পারস্পরিক সম্পর্ককে যদি আমরা শরয়ী সীমারেখার আওতায় থেকে মজবুত করি, তাহলে তাতে অনেক ফায়দা হবে। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয় যে, বর্তমানে এমন অমানবিকতার যুগ এসে পড়েছে যে, দীর্ঘ দিনের আত্মীয়তার সম্পর্ককেও মুহূর্তের মধ্যে ছিন্ন-ভিন্ন করা হচ্ছে। রক্ত এত সাদা হয়ে গেছে যে, ভাই আপন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে না। এটা কোন

---

১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৩

ধরনের মানবতা এবং কোন ধরনের মুসলমানী? আজ পরস্পরের মাঝে 'আত্মগর্ব' ও 'হিংসা-বিদ্বেষ'-এর কারণে এমন গৃহযুদ্ধ চলছে যে, প্রত্যেকে অপরকে হত্যা করার জন্য যখন-তখন প্রস্তুত হয়ে যায়। আমাদের এই অমানবিকতা আল্লাহর দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়।

বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে দীনদারির গুরুত্ব

দীনি ভাইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

'নিশ্চয় ঈমানদাররা ভাই-ভাই।'[১]

'দীনি সম্পর্ক' রক্তসম্পর্ক হতেও অধিক প্রগাঢ় হয়। এই দীনি সম্পর্কের মধ্যে এক ধরনের মজা ও আকর্ষণ আছে। অবশ্য মানুষের কর্তব্য হলো, কাউকে বন্ধু বানালে দীনদারির ভিত্তিতেই তা করা। কেননা, অসৎ লোককে বন্ধু বানালে নিজেই অসৎ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সৎ লোককে বন্ধু বানালে নিজেও সৎ হয়ে যাবে। এ কারণেই বলা হয়েছে–

اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ

'মানুষ বন্ধুর দীন অবলম্বন করে। তাই সকলের লক্ষ্য রাখা উচিৎ, সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।'

এটা ব্যাপকভাবে পরীক্ষিত সত্য যে, বন্ধুত্বের ভিত্তি যদি নেকী ও তাকওয়ার উপর হয়, তাহলে এই সম্পর্ক যেমন স্থায়ী হয়, তেমনি দিন-দিন তার গভীরতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে সম্পর্ক যদি দুনিয়াবি স্বার্থে হয়, তাহলে পরে তা গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।

বন্ধুত্বের আদব

ইমাম বাকের (রহ.) স্বীয় পুত্র ইমাম জাফর সাদেক (রহ.)কে উপদেশ দেন। তখন তাদের মাঝে নিম্নরূপ আলাপ হয়।

ইমাম বাকের : 'বাবা! পাঁচ ধরনের লোকের সঙ্গে কখনো বন্ধুত্ব করবে না। বরং চলার পথে সামনে পড়লে তাদের এড়িয়ে চলবে।'

ইমাম জাফর সাদেক : আব্বাজান! সেই পাঁচ ধরনের লোক কারা?

---

১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১০

ইমাম বাকের : প্রথমত মিথ্যুক।

ইমাম জাফর : মিথ্যুককে বন্ধু বানানো যাবে না কেন?

ইমাম বাকের : মিথ্যাবাদী দূরবর্তীকে নিকটবর্তী এবং নিকটবর্তীকে দূরবর্তী করে। এভাবে সে তোমাকে ধোঁকা দিবে।

দ্বিতীয় হলো, পাপী ও বদকার। পাপী তাকে বলে, যে আল্লাহর নির্দেশের পরোয়া করে না। মন চাইলে আমল করে, নতুবা করে না।

ইমাম জাফর : পাপী ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যাবে না কেন?

ইমাম বাকের : কারণ হলো, পাপী ব্যক্তি তোমাকে একটা পয়সা কিংবা তারও কম মূল্যে বিক্রি করে দেবে।

ইমাম জাফর : এক পয়সায় বিক্রি করার বিষয়টি তো বুঝে আসে; কিন্তু এক পয়সারও কমে বিক্রি করার অর্থ কী?

ইমাম বাকের : এক পয়সারও কম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পাপী ব্যক্তি তোমাকে এক পয়সা পাওয়ার আশায় বিক্রি করে দিবে।

তৃতীয় হলো, নির্বোধ ব্যক্তি।

ইমাম জাফর : নির্বোধকে বন্ধু বানাব না কেন?

ইমাম বাকের : কারণ হলো, বেওকুফ বন্ধু তোমার উপকার করতে গিয়ে এমন কাজ করবে, যাতে তোমার ক্ষতি হবে। এ কারণেই বলা হয়, 'নির্বোধ বন্ধুর চেয়ে জ্ঞানী শত্রু ভালো'।

চতুর্থ ব্যক্তি হলো, কৃপণ। হাড়কিপটে এবং মাছিচোষা ব্যক্তির সঙ্গেও বন্ধুত্ব করবে না।

ইমাম জাফর : কারণটা খুলে বলুন।

ইমাম বাকের : কারণ হলো, এমন ব্যক্তি তোমাকে তখন ছুড়ে ফেলবে, যখন তার কাছে তোমার খুবই প্রয়োজন দেখা দিবে। অর্থাৎ কোনো সময় তুমি তার মুখাপেক্ষী হলে সে তোমাকে ধোঁকা দিবে।

পঞ্চম ব্যক্তি হলো, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। তাকেও তুমি বন্ধু বানাবে না।

ইমাম জাফর : তাকে বন্ধু বানাব না কেন?

ইমাম বাকের : কারণ হলো, এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে লা'নত দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ

'ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত (লানত) করেন, তারপর তাদের বধির ও দৃষ্টি-শক্তিহীন করেন।'[১]

সুবহানাল্লাহ! পূর্বের যুগে পিতামাতা শিক্ষিত হতেন। ফলে তারা স্বীয় অভিজ্ঞতার সারনির্যাস সন্তানদের বলে দিতেন। বর্তমানে এমন কোনো পিতা আছে, যে তার সন্তানকে বলবে, আমি সারা জীবনে এই কয়টি কথা শিখেছি, তুমি তা মনে রেখো! এ ধরনের কোনো উপদেশ অভিভাবকরা সন্তানদের দেন না। বাচ্চাদের দোষ দিয়ে কী লাভ যে, তারা কথা শোনে না? বরং এটা আমাদের অভিভাবকদের অনেক বড় দুর্বলতা যে, আমরা সন্তানদের আদব শিক্ষা দেই না।

পাকিস্তানের একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন হযরত সুলতান বাহু (রহ.)। তাঁকে 'সুলতানুল আরেফীন' বলা হতো। তিনি কাদেরিয়া সিলসিলার প্রথম সারির বড় শায়েখ ছিলেন। পাঞ্জাবের আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত তাঁর কয়েকটি কবিতা বড়ই প্রসিদ্ধ। তিনি বন্ধুত্বের আদব সম্পর্কে পাঞ্জাবী ভাষায় লিখেন -

نال کسنگی سنگ نہ کرئے کنڑنوں لاج نہ لائیے ہو
کوڑے کھوہ کدیں مٹھے نہ ہوندے بھانویں لکھو مناں گڑ پائیے ہو
کانواں دے پتر کدیں ہنس نہیں بندے بھانویں موتی چوگ چگائیے ہو
سپاں دے پتر متر نہ ہوندے بھانویں چلیاں دود پلائیے ہو
تمے کدیں تربوز نہ ہوندے بھانویں توڑ مکے لے جائیے ہو

'অসৎ ব্যক্তিকে বন্ধু বানাবে না এবং নিজের বংশে কখনো দাগ লাগাবে না।'

তিক্ত কূপ কখনো মিষ্ট হয় না। চাই তাতে তুমি হাজারো মণ গুড় ঢাল না কেন।

---

১. সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ২২, ২৩

কাকের বাচ্চা কখনো হাঁস হয় না। চাই তুমি তাকে মণি-মুক্তা খাওয়াও না কেন।

সাপের বাচ্চা কখনো বিশ্বস্ত হয় না। চাই তুমি তাকে কোষ ভরে দুধ পান করাও না কেন।

মাকাল ফল কখনো তরমুজ হয় না, চাই তুমি তাকে মক্কায় নিয়ে যাও না কেন।'

কথাগুলো অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। কতক লোক ঠিকই এমন হয়, যাদের মধ্যে নেক আমল কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। বন্ধু এমন হলে তার থেকে দূরে থাকা চাই। সে তিক্ত কূপের মতো, সাপের বাচ্চার মতো, কাকের বাচ্চার মতো, মাকাল ফলের মতো। এমন লোক থেকে দূরে থাকতে হবে। অন্যথায় তার সঙ্গে থাকলে তোমার জীবনকেও নোংরা বানিয়ে ফেলবে। যেব্যক্তি অসৎ বন্ধুর সাথে ঘোরে এবং বলে, আমার বন্ধু বাস্তবেই খারাপ; কিন্তু তার সঙ্গে ওঠাবসা করায় আমার কিছু হয় না, সে নিঃসন্দেহে মিথ্যা বলে। নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করুন, এমন ব্যক্তি তেমন বিশ্বাস নিয়ে মিথ্যাচার করে, আল্লাহওয়ালাগণ যেমন স্থির বিশ্বাস নিয়ে দীনের দাওয়াত দেন।

স্ত্রী-সন্তানের মহব্বত

মানবজীবনের অনেক সম্পর্ক সম্পূর্ণ আবেগকেন্দ্রিক। বিশেষত স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে যে গভীর সম্পর্ক তার পুরোটাই আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে মানুষ স্ত্রী-সন্তানের খুশিকে নিজের খুশি মনে করে। তাদের দুঃখকে নিজের দুঃখ জ্ঞান করে। স্ত্রী-সন্তানের মহব্বত মানুষের মাঝে এত প্রবল থাকে যে, সে নিজে অনেক কষ্ট সহ্য করে; কিন্তু তাদের সামান্য কষ্টও বরদাশত হয় না। এটা শরীয়তসমর্থিত মহব্বত। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

' তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সে, যে তার পরিবার-পরিজনের কাছে ভালো।'

মহব্বত নিন্দনীয় হয় কখন?

প্রত্যেক বস্তুর একটি সীমা থাকে। যখন বস্তুটি সেই নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তা ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। স্ত্রীর মহব্বত প্রশংসনীয়;

কিন্তু শর্ত হলো, মানুষ শরীয়তের অধীনে থেকে এই সম্পর্ক বজায় রাখবে। যখন এই সম্পর্ক মানুষকে শরীয়তবিরোধী কাজে বাধ্য করে, তখন তা নিন্দনীয় হয়ে যায়। অনেক মানুষ এমন আছে, যারা স্ত্রীর দাবি পূরণ করতে সুদ গ্রহণ করে। ধোঁকা দেয়। আল্লাহ জানেন, আরও কত ছল-চাতুরি করে। সন্তানের বাহানা দিয়ে অবৈধ অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে। যদি ঘটনা এমন ঘটে, তবে স্ত্রী-সন্তানের এই মহব্বত তার জন্য প্রশংসনীয় নয়; বরং নিন্দনীয়। এ কারণে আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

'হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ-কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক।'[১]

যে স্ত্রী-সন্তান মানুষকে আল্লাহর নাফরমানি করতে উৎসাহিত করে, তারা শত্রুতুল্য। এই আয়াতে এমন স্ত্রী-সন্তানদের কথা-ই বলা হয়েছে। সব স্ত্রী ও সকল সন্তান এক রকম হয় না। বহু নারী এমন আছে, যারা তাদের স্বামীদের দীন-ঈমান হেফাযত করে এবং নেক কাজে তাদের সৎ পরামর্শদাতা ও উত্তম সহযোগী হয়। এমনিভাবে অনেক সৌভাগ্যবান সন্তানও এমন রয়েছে, যারা তাদের পিতামাতার জন্য স্থায়ী পুণ্য হয়ে থাকে।

আমার উদ্দেশ্য একথা বলা যে, স্ত্রী-সন্তানদের মহব্বত বড়ই ভালো বিষয় এবং তা আল্লাহর পছন্দনীয়ও বটে। কিন্তু কথা হলো, এই মহব্বতের স্রোতে এমনভাবে ভেসে যাওয়া যাবে না যে, তার কারণে আল্লাহর নির্দেশ লংঘিত হতে থাকে এবং তাঁর প্রিয় নবীর সুন্নত বর্জিত হয়। সারকথা, স্ত্রী-সন্তানের সম্পর্ক ও মহব্বত যদি শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে হয়, তবে তা প্রশংসার যোগ্য। আর যদি শরীয়তের সীমা অতিক্রম করে, তাহলে তা বড়ই নিন্দনীয়। আমাদের সব কিছুর ভালো-মন্দের মানদণ্ড শরীয়তে মুহাম্মদী।

সম্পদ ও সন্তানের মাধ্যমে পরীক্ষা

কুরআনের একস্থানে আল্লাহপাক বলেন–

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

'নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষা।'[২]

---

১. সূরা তাগাবুন : আয়াত ১৪

২. সূরা তাগাবুন : আয়াত ১৫

এখানে মনে রাখতে হবে, 'ফেতনা' শব্দটি উর্দূ ভাষার শব্দ নয়; বরং আরবী শব্দ। অনেক সময় একই শব্দ বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত হয়; কিন্তু অর্থ দেয় ভিন্ন-ভিন্ন। যেমন ذلیل শব্দ উর্দূ ভাষায় নীচু ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অথচ শব্দটি আরবী ভাষায় দুর্বল ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। এর প্রমাণ হলো, পবিত্র কুরআনে ঈমানদারদের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

'আর আল্লাহ বদরে তোমাদের সাহায্য করেছেন; তখন তোমরা ছিলে দুর্বল।'

এমনিভাবে ১১ শব্দটি আরবী ভাষায় কমন এবং ব্যাপক ব্যবহৃত। হজ-উমরায় গেলে মক্কা-মদীনার স্থানীয় লোকদের জামার পেছনে ১১ কোম্পানীর নাম লেখা দেখতে পাওয়া যায়। জেদ্দার একটি ভবনের নাম দাল্লা টাওয়ার। সেখানে শব্দটি মোটেও খারাপ নয়। কিন্তু উর্দূ ভাষায় শব্দটি বললে তার অর্থ খুবই কটু হয়। এমনকি কেউ কাউকে ১১ বললে সে এটাকে চরম গালি বলে মনে করে।

১৯৮৫ সনে আমি ওয়াশিংটন সফরে যাই। তখন সেখানে সৌদী আরবের রাষ্ট্রদূত ছিলেন বুন্দার বিন সুলতান। আমি তার নাম শুনে চিন্তা করছিলাম যে, তার পিতা তার জন্মে কেন নারাজ হয়েছিল, যার কারণে তার নাম রাখে বান্দর। পরে জানতে পারি যে, আরবী ভাষায় সুদর্শন মানুষকে বলে বুন্দর। এ সময়ে আমার ভুল ভাঙল যে, এটা উর্দূ বান্দর নয় বরং আরবী বুন্দর। এমনিভাবে সন্তান ও সম্পদ ফেতনা। তবে তা উর্দূ ফেতনা নয়। আরবী ভাষায় পরীক্ষাকে বলে ফেতনা। পক্ষান্তরে উর্দূ ভাষায় ফেতনা বলে তাণ্ডব ও ফাসাদকে।

এক আলেম ছিলেন। তাঁর পরিবারে ঝগড়া লেগে থাকত। শেষমেষ আমাকে সেই ঝগড়া মিটাতে হয়। ঝগড়ার কারণ এই ছিল যে, আলেম তাঁর সন্তানদের 'ফেতনা' বলতেন। তার স্ত্রীর কাছে এটা ছিল মারাত্মক কথা। তার স্ত্রী স্বামীর কথার প্রতিবাদ করে বলে, আপনি শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নিজ সন্তানদের 'ফেতনা' বলেন কেন? যখন বিষয়টি আমার নলেজে এল এবং বিষয়টি আমাকে জানানো হলো, তখন আমি মাওলানা সাহেবের স্ত্রীকে বোঝালাম, আপনার কথাও ঠিক এবং আপনার স্বামীর কথাও সত্য। আপনি 'ফেতনা' শব্দকে উর্দূ ভাষায় গ্রহণ করেছেন; কিন্তু আপনার স্বামী শব্দটি

বলেছেন আরবী ভাষা হিসেবে। আরবীতে ফেতনা অর্থ পরীক্ষা। মানুষ অনেক সময় সন্তানকে আদর করে। আদরের কোনো বিশেষ মুহূর্তে অনেক শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। যাহোক, আমার সে দিনের তাদের ব্যাখ্যায় তাদের ঘরোয়া বিবাদ দূর হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, সন্তান 'পরীক্ষা' কীভাবে? এর উত্তর হলো, সন্তান আদুরে হয়। বাচ্চা বালেগ হয়ে গেলে পিতা তাকে নামাযের জন্য ঘুম থেকে একবার জাগায়। মহব্বত বেশি হওয়ায় 'ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে' এ কারণে বারবার তার ঘুম ভাঙায় না। অথচ সন্তান বালেগ হওয়ার পর নামায না পড়লে গুনাহগার হয়। পিতা মহব্বতের কারণে সন্তানকে গুনাহের উপর রেখে দেয়। ফরজ নামাযের জন্য ডেকে না তোলায় পিতাও তার নামায বর্জনের গুনাহের ভাগীদার হয়। যেহেতু এখানে পুত্রের কারণে পিতা গুনাহগার হলো, তাই সন্তানকে 'পরীক্ষা' বলা হয়েছে। এমনিভাবে স্ত্রীও অনেক সময় অন্যায় কাজ করে। কিন্তু স্ত্রীর নারাজির কথা ভেবে স্বামী কিছু বলে না। এতে স্বামীও গুনাহের ভাগী হয়।

শরীয়ত স্ত্রী-সন্তানের মহব্বত রাখারও নির্দেশ দিয়েছে আবার তার সীমাও বাতলে দিয়েছে। তাই আমাদের কর্তব্য হলো, শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে স্ত্রী-সন্তানদের মহব্বত করা। যে মহব্বত শরীয়ত লংঘনের কারণ হয় তা যেমন কাম্য নয়, তেমনি তা নাজায়েযও বটে। এটা মহব্বত নয় – দুশমনি।

দীনদারির পাশাপাশি সদাচরণও প্রয়োজন

কিছু লোককে দেখা যায়, যখন তারা দীনের ক্ষেত্রে সামনে অগ্রসর হয়, তখন স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার বড়ই অমার্জিত হয়। এটাও ভুল এবং অন্যায়। কেউ দীনদার হলে স্ত্রী-সন্তানের প্রতি আরও বেশি মেহেরবান হওয়া দরকার। কখনও এমন হওয়া উচিৎ নয় যে, তার কাজ ও আচার-আচরণের কারণে স্ত্রী-সন্তানরা তাওবা-তাওবা করবে এবং বলবে, এই যদি হয় দীনদারি, তবে এমন দীনদারি হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

কতক লোক আলেম এবং বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও এমন হন যে, যদি স্ত্রী নামাযে অবহেলা করে, তাহলে একবারেই পুরোপুরি নামাযের পাবন্দ বানিয়ে দিতে চান। অথচ ইতিপূর্বে নামায না পড়লে কিছু বলতেন না। পরে জিদের বশবর্তী হয়ে যান।

কেউ পীর সাহেবের মুরীদ হয়ে রাত জাগা শুরু করলে সঙ্গে স্ত্রীকেও টেনে এনে জায়নামাযে বসাতে চায়। অথচ বেচারী ইতিপূর্বে এক রাতও জাগেনি,

তাহলে আজ হঠাৎ কী করে পুরো রাত জেগে কাটাবে? একদিন হয়ত সেও জাগবে, কিন্তু তার জন্য সময় দিতে হবে। সকালেও যখন স্ত্রী ঘুম থেকে জাগে না, তখন সূফী সাহেবের ভীষণ রাগ ওঠে। সে ধমকা-ধমকি ও বকাঝকা শুরু করে। নামাযের সময় শুয়ে আছ লজ্জা লাগে না। মুর্দার মতো পড়ে আছ। এভাবে মুখে যা আসে তা-ই বলতে থাকে। এর ফল এই হয় যে, এতে স্ত্রীর জিদ আরও বেড়ে যায়। তখন হীতে বিপরীত হয়ে যায়।

এজন্য কেউ সদ্য দীনদার হলে, তার উচিত হলো দীনের সম্মান ও মান রক্ষা করা, যাতে তার দীনদারি দেখে স্ত্রী-সন্তানরা খুশি হয় এবং তারা এটা ভেবে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে যে, আমরা এক দীনদার ব্যক্তিত্বের ছত্রছায়ায় আছি। নতুবা আমরা এমন সন্তানও দেখেছি, যারা বলে, যদি দীনদারি এরই নাম হয়, যা আব্বুর মাঝে দেখি, তাহলে এমন দীনদারি হতে তাওবা। মূলত এখানে দীনের কোনো দোষ নেই; দোষ সবই ব্যক্তিগত। কিন্তু তারপরও যেহেতু পরিবারের লোকজন ব্যক্তির দীনকেই প্রকৃত দীন মনে করে, তাই তারা না বুঝেই পিতার দোষ দীনের উপর চাপিয়ে এমন কথা বলে।

মুসলমান হওয়ার পথে বাধা

বহির্দেশের একলোক আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি আহলে কিতাব এক মেয়েকে বিবাহ করেন। একদিন এসে লোকটি আমাকে একথা জানালে আমি বলি, ঠিক আছে, যে কিতাব আপনার পড়ার ছিল তা আপনি পেয়ে গেছেন।

বন্ধু লোকটি একদিন জানালেন, আমি সস্ত্রীক আপনার কাছে কিছু সময়ের জন্য আসতে চাই। আমি অনুমতি দিয়ে বলি, খুব ভালো কথা, চলে আসুন। লোকটি তার স্ত্রীকে নিয়ে এল। তার স্ত্রীকে পর্দার আড়ালে বসানো হলো। মহিলা বলল, আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। আমি বললাম, অবশ্যই করুন। মহিলা ইসলামের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করল আর আমি তার জবাব দিলাম। ১০/১৫ মিনিট পর মহিলা পরিতুষ্ট হয়ে গেল। এমনকি মহিলা বলল, তিনি ইসলামের ব্যাপারে খুবই তৃপ্ত ও পরিতুষ্ট। আমি একথা শুনে বললাম, তাহলে আপনি মুসলমান হন না কেন? মহিলা তার স্বামীর দিকে ইশারা করে বলল, এই লোককে জিজ্ঞাসা করুন। এর কারণেই আমি মুসলমান হতে পারছি না। মহিলা স্বামীর সামনে বসে থেকেই বলল, তার নাম আব্দুল্লাহ। কিন্তু কাজ করে সব শয়তানের। যেদিন সে ঠিক হয়ে যাবে, সেদিন আমি কালেমা পড়ে নেব।

তাহলে দেখুন, এখানে মহিলা মুসলমান হতে চায়, কিন্তু হচ্ছে না শুধু তার স্বামীর কারণে। স্বামী-ই তার ইসলামে প্রবেশের পথে বড় বাধা।

আমার বন্ধু লোকটি মনের দিক থেকে ভালো হলেও সমস্যা হলো, তার রাগ ছিল বেশি। সামান্য-সামান্য কারণে চটে যেত এবং স্ত্রীকে গাল-মন্দ করত। তার এই চরিত্রের কারণে তার স্ত্রী বলত, লোকটা মানুষ নয়; জানোয়ার। যেলোক সামান্য-সামান্য কারণে রেগে জিনিসপত্র ভাঙে এবং মারমুখী হয়ে ওঠে, সে কীভাবে মানুষের মধ্যে গণ্য হতে পারে? আমার কথা হলো, মানুষ এমন না হওয়া চাই যে, তার দীনদারি দেখে অন্য মানুষ দীনের প্রতি ঝুঁকতে বিব্রত হয়, বাধাগ্রস্ত হয়। মানুষের কর্তব্য হলো, দীনের মর্যাদা রক্ষার্থে মানুষের সঙ্গে এমন মার্জিত ও কোমল ব্যবহার করা, যা দেখে অন্যরাও সহজে দীনে প্রবেশ করে।

স্বীয় পরিবারের সঙ্গে নবীজির ব্যবহার

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরিবারের সঙ্গে অত্যন্ত মহব্বতসুলভ আচরণ করতেন। তিনি পরিবারের সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন–

أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

‘ আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের তুলনায় ভালো।’

একবার নবীজি বাসায় এলেন। সে সময় হযরত আয়েশা (রাযি.) পানি পান করছিলেন। নবীজি দূর থেকেই বললেন, হুমায়রা! আমার জন্যেও একটু পানি রেখো। আয়েশা মূল নাম হলেও নবীজি মহব্বত করে ডাকতেন হুমায়রা বলে। এ হাদীছ হতে জানা যায়, প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য হলো, সে তার স্ত্রীর প্রতি মহব্বত প্রকাশার্থে মায়াবী কোনো নাম রাখবে, যে নাম উভয়ের কাছে আকর্ষণীয় হয়। এ ধরনের নাম মহব্বতসুলভ হয়। যখন সে নামে কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে ডাকে, স্ত্রীর খুব মজা লাগে। সে স্বামীর ঘনিষ্টতা অনুভব করে। এটা নববী আদর্শ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন, হুমায়রা! আমার জন্যেও কিছু পানি রাখো, তখন হযরত আয়েশা (রাযি.) কিছু পানি রেখে দিলেন। নবীজি তাঁর কাছে এগিয়ে যান এবং হযরত আয়েশা নবীজির দিকে পানির পাত্র এগিয়ে দেন। হাদীছে এসেছে, যখন নবীজি পানির পাত্র হাতে নেন এবং তিনি পানি পান করার উপক্রম হন, তখন হঠাৎ তিনি থেমে যান

এবং হযরত আয়েশা (রাযি.)কে সম্বোধন করে বললেন, হুমায়রা! তুমি কোথায় মুখ লাগিয়ে পানি পান করেছ? কোন স্থানে তোমার ঠোঁট লেগেছিল? হযরত আয়েশা স্থানটি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, আমি এখানে মুখ লাগিয়ে পান করেছি। হাদীছে এসেছে, নবীজি পানপাত্রটা ঘুরিয়ে নিলেন এবং স্বীয় পবিত্র ঠোঁট সেখানে স্থাপন করলেন, যেখানে ঠোঁট লাগিয়ে হযরত আয়েশা (রাযি.) পান করেছিলেন।

কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে এমন মহব্বত উপহার দেয়, তাহলে সেই ঘরে শান্তির বাতাস কেন বইবে না? সেই ঘরে কেন জান্নাতী সুখ আসবে না?

চিন্তা করে দেখুন, নবীজি কেমন মর্যাদাবান মানুষ। তিনি উভয় জগতের প্রাণপুরুষ। সমস্ত মাখলুকের সেরা এবং আল্লাহর অতি প্রিয়জন। তারপরও তিনি স্ত্রীর এঁটো পানি পান করেছেন। হওয়ার দরকার ছিল তো উল্টো যে, হযরত আয়েশা নবীজির পানি পান করার পর অবশিষ্ট পানি পান করবেন। কিন্তু নবীজি তার উল্টো করে জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে স্ত্রীকে মহব্বত করতে হয়।

একবার নবীজি বাসায় এলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রাযি.)কে ডাকলেন, হুমায়রা! তুমি আমার কাছে খেজুর-মাখন দিয়ে মিলিয়ে খাওয়ার থেকে বেশি প্রিয়। জবাবে হযরত আয়েশা (রাযি.) মুচকি হেসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমার নিকট মাখন এবং মধু মিলিয়ে খাওয়ার চেয়েও বেশি প্রিয়। নবীজি মুচকি হেসে বললেন, হুমায়রা! তোমার জবাব আমার জবাব থেকে বেশি ভালো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আল্লাহর ভয় যে পরিমাণ ছিল, তা আমাদের অনুমানের বাইরে। তারপরও পরিবারের লোকদের সঙ্গে নবীজির হৃদ্যতা, মায়া-মমতা ও মহব্বত ছিল বর্ণনাতীত। এটি খুবই কাম্য এবং আল্লাহপাকও এমন মহব্বত ও সুসম্পর্ক পছন্দ করেন।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই বাসায় আসতেন, সর্বদা মুচকি হাসি দিতে-দিতে ঘরে ঢুকতেন। এই হাদীছের আয়নায় একটু নিজেদের চেহারাটা দেখি, যখন আমরা ঘরে ঢুকি, তখন আমাদের মেজাজ থাকে তিরিক্ষ। চেহারা থাকে কালো। গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকি, যা দেখে স্ত্রী-সন্তানের মুখে হাসি আসবে কি, তাদের পরাণ চমকে যায়। তারা মনে করতে থাকে, ঘরে কোনো মানুষ নয়, বরং বাঘ ঢুকেছে। ফলে সকলের হৃদকম্পন শুরু হয়ে যায়। কোথায় মহব্বত আর কোথায়

প্রাণখোলা হাসি! সব জানালা দিয়ে পালায়। স্ত্রীও কাছে আসে না এবং ছেলেমেয়েরাও আতঙ্ক বোধ করতে থাকে।

মুচকি হাসি মহব্বতের উৎস

আমার সঙ্গে করাচির একলোকের সম্পর্ক ছিল। একবার লোকটি সস্ত্রীক আমার এখানে এল। বলল, হযরত! আমাদের বিবাহ হয়েছে চার বছর। আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আমাদের পক্ষে ঘর-সংসার করা সম্ভব নয়। যেহেতু আমরা দুজনেই আপনার মুরীদ, তাই আপনার থেকে এ ব্যাপারে অনুমতি নিতে এসেছি, যাতে আপনি পরে নারাজ না হন এবং একথা বলতে না পারেন যে, আমাকে তো জানালে না।

স্বামী-স্ত্রীরা এসে তাদের কিছু সমস্যার কথা আমাকে জানায়। এমন পরিস্থিতিতে পীর সাহেবের কাজ হলো, প্রকাশ্য কথা হতে অন্তর্নিহিত সমস্যা অনুধাবন করা। আমিও তাদের উভয়ের কথা হলে মূল সমস্যা বের করার চেষ্টা করি। আমি বুঝতে পারি, তাদের পারিবারিক জীবনে কিছু জটিলতা এসেছে। আর জটিলতার মূল কারণ হলো, ওই লোকের ব্যবসায় মন্দাভাব সৃষ্টি হওয়া। ব্যবসায় লস দেখা দেওয়ায় তার প্রতিক্রিয়া তার মধ্যেও পড়ে। বাড়িতে এলেও চিন্তা-টেনশন তাকে ঘিরে রাখে। ফলে তার মুখে হাসি ফোটে না এবং সে পরিবারের কারো সঙ্গে ফ্রি হতে পারে না। স্ত্রী সারা দিন স্বামীর বাড়ি আসার অপেক্ষায় থাকে। এমনকি স্বামীর সঙ্গে একত্রে খাবে বলে আগে খায় না। কিন্তু স্বামী যখন বাড়ি ফিরে, তখন সে থাকে হাইমুডে। এমন অবস্থায় ঘরে মহব্বতের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে না।

যাহোক, আমি তাকে বললাম, আপনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তার জন্য ছয় মাস অপেক্ষা করুন। লোকটি বলল, ঠিক আছে, তা-ই হবে। আমি বললাম, আপনাকে একটি ওয়াদা দিতে হবে; পারবেন? লোকটি বলল, অবশ্যই পারব। আমি বললাম, ওয়াদা হলো, সামনে থেকে যখনই ঘরে ঢুকবেন, আপনি স্ত্রীকে দেখে মুচকি হাসবেন। লোকটি বলল, হযরত! এমনটিই করব ইনশাল্লাহ। লোকটি আমার কথায় সায় দিলেও তখন পর্যন্ত সে এর হাকীকত ধরতে পারেনি।

এখন কল্পনা করুন, স্ত্রী অপেক্ষায় আছে। স্বামী এলে একত্রে খানা খাব। একসময় স্বামী এল। স্ত্রী দরজা খুলে তাকে স্বাগত জানাল। ওদিকে স্বামী স্ত্রীকে দেখেই মুচকি হাসি দিল। তাহলে পরিস্থিতি কেমন হবে? কেমন দৃশ্য দেখা যাবে? প্রেমপরাগ খুলবে, না বন্ধ হবে?

আমি তাকে ছয় মাসের সময় দিয়েছিলাম। লোকটি আমার কথা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিল। ফল এই হয়েছিল যে, ছয় মাস তো দূরে থাক, মাত্র এক মাসের মাথায় সে ফোন করে জানাল, হযরত! যে মহব্বতে এখন আমরা জীবন পার করছি, তার কথা কখনও আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। এবার চিন্তা করুন! সামান্য একটু মুচকি হাসির অভাবে তাদের দাম্পত্যজীবন তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। যেখানে নবীর একটি সুন্নত ছাড়ার কারণে সংসার ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, সেখানে ওই সুন্নতটি ফের জিন্দা করার কারণে ভাঙা সংসারে জান্নাত নেমে এল।

আল্লাহর মহব্বতের শামিয়ানা

মানুষের কর্তব্য হলো সন্তানের মায়ায় শরীয়তের বিধান লংঘন না করা। যেমন– সন্তান যদি এমন জিদ ধরে যে, আব্বু টিভি এনে দিন, তাহলে এমন জিদ কখনো পুরো করা যাবে না। এ ধরনের জিদ ভালো নয়। কেননা, এটা শরীয়তবিরোধী। অনেক সময় মানুষ টিভি কিনে দায়ভার চাপায় সন্তানের উপর। অথচ সন্তানের আড়ালে তার নিজের মনের ইচ্ছাটাকেই পূরণ করে। তারা বলে, বাচ্চা প্রতিবেশীর ঘরে গিয়ে টিভি দেখে, তাই এভাবে অন্যের বাড়ি গিয়ে টিভি দেখার চেয়ে নিজের বাড়িতে দেখা-ই ভালো। তাদের এই যুক্তির উদাহরণ এমন, যেমন বলা হয়–

فَرَّ مِنَ الْمَطَرِ وَقَامَ تَحْتَ الْمِيْزَابِ

'সে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে পরনালার নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।'

এমনিভাবে আরও প্রবাদ আছে–

بَنٰى قَصْرًا وَهَدَمَ مِصْرًا

'সে শহর ধ্বংস করে মহল বানিয়ে দিয়েছে।'

বাস্তবতা হলো, যারা ঘরে টিভি কিনে আনল, তারা মূলত ঈমানের টিবি আনল। কারো শরীরে টিবি (যক্ষা) রোগের জীবাণু এলে যেমনি তার জীবন ধ্বংস হয়ে যায়, ঠিক তেমনি যে ঘরে-বাড়িতে টিভির গুনাহের জীবাণু ঢোকে, তার ঈমান শেষ হয়ে যায়।

শরীয়তে ওই জিদ ও মমতা গ্রহণযোগ্য নয়, যার দ্বারা শরীয়ত লঙ্ঘিত হয়। তাই মনে রাখতে হবে, সন্তানের প্রতি মহব্বতেরও একটি সীমা রয়েছে। এই মহব্বত অবশ্যই ভালো। তবে তা অবশ্যই হতে হবে আল্লাহর মহব্বতের অধীনে।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ফয়সালা শুনুন–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ.

'(হে নবী! মুসলিমদের) বলো, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসা, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করছ এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা করো, যে পর্যন্ত-না আল্লাহ নিজ ফয়সালা প্রকাশ করেন।'[১]

এখানে ফয়সালা দ্বারা শাস্তি বোঝানো হয়েছে। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে, পিতামাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, অর্থ-সম্পদ, ঘর-বাড়ি, জমি-জায়াগা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবই আল্লাহর নেয়ামত। তবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না এগুলো আল্লাহর হুকুম পালনে বাধা হবে। যদি বাধা হয়, তবে এসব জিনিসই আবার মানুষের জন্য আযাবে পরিণত হয়।[২]

আয়াতের সারকথা হলো, এসব বস্তুর মহব্বত আল্লাহর মহব্বতের শামিয়ানার অধীনে হতে হবে। যদি আল্লাহর মহব্বতের শামিয়ানার অধীনে তা না হয়, তাহলে এগুলো নাজায়েয হয়ে যাবে। এখানে আল্লাহপাক একথা বলতে চান যে, পিতামাতা, ভাই-বোন প্রমুখের মহব্বত ঠিক আছে, কিন্তু যখন এসব মহব্বত আল্লাহর মহব্বতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তখন তোমাদের কর্তব্য হলো, তোমরা এসব মহব্বত পদদলিত করে সামনে অগ্রসর হবে। কেননা, তোমাদের গন্তব্য অন্যকিছু।

মহব্বত, না নফ্সানিয়াত

মানুষ একধরনের মহব্বত করে প্রবৃত্তির চাহিদার কারণে। এমন মহব্বত শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। এই মহব্বতের সম্পর্ক যৌনকামনার সঙ্গে। এ কারণে এ ক্ষেত্রে 'মহব্বত' শব্দ ব্যবহার না করা-ই উচিৎ। কেননা, এমন

---

১. সূরা তওবা : আয়াত ২৪

২. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন ১ : আয়াত ৫২৯

মহব্বত মহব্বত নয়; বরং মূলত তা প্রবৃত্তির লালসা ও শয়তানি কাজ। এমন মহব্বত মানুষকে অন্যের সঙ্গে শরীয়তবিরোধী সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রেরণা জোগায়, বাধ্য করে। এমন সম্পর্কের পরিণাম হলো, যখন মানুষের কামনা-বাসনা মিটে যায়, তখন এই সম্পর্কও শেষ হয়ে যায়। মানুষের ভেতরকার নোংরামি তাকে এহেন কুসম্পর্ক করতে বাধ্য করে। কুপ্রবৃত্তির দাবিতে গড়ে ওঠা মহব্বত হতে আল্লাহর পানাহ চাওয়া উচিৎ।

এমন লোকেরা দুনিয়াতে বিভিন্ন সূরত পছন্দ করে বেড়ায়। মনে রেখো, দুনিয়াতে বহু রকমের সূরত ঘুরে বেড়ায়। তুমি কোন সূরত পছন্দ করবে? এ কারণে শরীয়ত বলে দিয়েছে, যা তোমার জন্য হালাল তাকে মহব্বত করা ভালো কাজ। আর যার থেকে নিষেধ করা হয়েছে, সেদিকে চোখ তুলেও চেয়ো না। সম্পর্ক তো দূরের কথা নজর দিতেও নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ অনেক সময় এমন সম্পর্কে ফেঁসে যায়। বরং সঠিক কথা হলো, এমন অনৈতিক সম্পর্কে ধসে যায়। ফেঁসে যাওয়া আর ধসে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। যে ফেঁসে যায় সে অনেক সময় নিজে চেষ্টা করলে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু যে ধসে যায়, সে নিজে বের হতে পারে না। বের হতে যতই জোর দেয়, ততই বেশি দেবে যায়। তাকে বের করার জন্য অন্য লোক চাই।

এমন ক্ষেত্রে আল্লাহওয়ালাগণ কাজে আসেন। তারা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। তাদের পক্ষে ক্ষমা চান। কেঁদে-কেঁদে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাদের প্রতি নেক দৃষ্টি দেন, তাদেরকে আন্তরিকভাবে বোঝান, যার ফলে এটা ধসে যাওয়া ব্যক্তির জন্য উদ্ধারের উসিলা হয়ে যায় এবং গুনাহে নিমজ্জিত ব্যক্তি গুনাহের নাগপাশ ছিন্ন-ভিন্ন করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

কামতাড়িত ভালবাসার উন্মাদনা

যৌনভিত্তিক মহব্বত মানুষকে উন্মাদ বানিয়ে দেয়। ফলে মানুষ ভালোবাসতে-বাসতে এক সময় পাগল হয়ে যায়। আরবে কায়েস নামে একলোক ছিল। এক মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। যদিও মেয়েটি অন্ধকারের মতো কালো ছিল এবং তার পিতামাতা এ কারণে তার নাম লায়লাও রেখেছিল, কিন্তু কায়েস তারই মহব্বতে উন্মাদ হয়ে যায়।

হযরত হাসান (রাযি.)-এর খেলাফতের যুগ ছিল। হযরত হাসান ও হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত

হয়। হাদীছে তাদের দুজনের ব্যাপারে فتنتين عظمتين বলা হয়েছে। হযরত হাসান (রাযি.) হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর হাতে খেলাফতের দায়িত্ব সমর্পণ করার ঘোষণা দেন। পরের দিন হযরত হাসান (রাযি.) পথ দিয়ে গমনকালে কায়েসের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কায়েস তাকে সালাম দেয়। হযরত হাসান (রাযি.) বলেন, কায়েস! আমি কি ভালো করিনি যে, আমি রাজত্ব মুয়াবিয়ার হাতে সোপর্দ করেছি? কেননা, তিনিই এর বেশি উপযুক্ত ছিলেন। কায়েস চুপ থাকেন। হযরত হাসান (রাযি.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কায়েস! তুমি জবাব দিচ্ছ না কেন? কায়েস এবার মুখ খুলল। বলল, সত্য কথা তো এটাই যে, রাজত্ব করা লায়লার জন্যই মানায়। একথা শুনে হযরত হাসান (রাযি.) বললেন, انت مجنون 'তুমি পাগল।' তখন থেকে তার নাম প্রসিদ্ধ হয়ে যায় 'মজনু'। তার এই নাম এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, তার মূল নাম অনেকেই জানে না।

মজনুর পিতা একবার তাকে বলল, তোমার কারণে আমার বড়ই বদনাম হচ্ছে। চলো তোমাকে বায়তুল্লাহ শরীফে নিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে তুমি লায়লার মহব্বত হতে তাওবা করবে। একসময় মজনু পিতার সঙ্গে মাকামে ইবরাহীমে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে দাঁড়িয়ে মজনুর পিতা তাকে বলল, এখানে দু'আ করো, হে আল্লাহ! আমি লায়লার মহব্বত হতে তাওবা করছি। মজনু পিতার নির্দেশে হাত উপরে তুলল। কিন্তু দু'আ করতে গিয়ে বলল–

اِلٰهِیْ تُبْتُ مِنْ كُلِّ الْمَعَاصِیْ

وَلٰكِنْ حُبِّ لَیْلٰی لَا اَتُوْبُ

'হে আল্লাহ! আমি সমস্ত গুনাহ হতে তাওবা করলাম। কিন্তু লায়লার প্রেম হতে আমি তওবা করছি না।'

মজনু এভাবে বললে তার পিতা রাগে-ক্রোধে ফেটে পড়ে তার দিকে তাকাল। যখন সে পিতার রক্তচক্ষু দেখল, তখন আবার দু'আ করল–

اِلٰهِیْ لَا تَسْلُبْنِیْ حُبَّهَا اَبَدًا

وَیَرْحَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ اٰمِیْنًا

'হে আল্লাহ! লায়লার মহব্বত কখনো আমার দিল থেকে বের করবেন না। যেব্যক্তি এই দু'আর উপর 'আমীন' বলবে, তার প্রতি আপনি রহম করুন।'

একলোক চিন্তা করল, লায়লার এত নাম-ডাক শুনি, একটু দেখা দরকার, মেয়েটা কেমন হুর-পরী, যার কারণে মজনু তার প্রেমে এভাবে পাগল হয়ে গেছে! একদিন ঘটনাক্রমে লায়লা ওই লোকের সামনে পড়লে, তার কাছে লায়লা কদাকার মহিলা লাগল। তাই সে লায়লাকে দেখেই বলল–

از دگر خوباں تو افزوں نیستی

'এই মেয়ে! কী ব্যাপার বলো তো! তুমি তো অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে দেখতে সুন্দরী নও (তারপরও মজনু তোমার জন্য পাগল হলো কেন?)

লায়লা বলল–

گفت خامش چو تو مجنوں نیستی

'তুমি চুপ করো। কেননা, তুমি তো মজনু নও।'

অর্থাৎ তুমি যদি আমাকে মজনুর চোখ দিয়ে দেখতে, তবে সারা দুনিয়ার সুন্দরী মহিলাদের চেয়ে আমি তোমার দৃষ্টিতে অধিক রূপসী সাব্যস্ত হতাম।

এমন মহব্বতকে মূলত মহব্বত বলে না, এটা নিছক পাগলামি।

একদিন মজনু একটা কুকুরকে চুমো দিতে থাকল। কেউ জিজ্ঞাসা করল, কী রে মজনু! কুত্তাকে চুমো দিচ্ছ কেন? জবাবে মজনু বলল, একারণে চুমো দিচ্ছি যে, সে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, যেখানে আমার লায়লা থাকে।

মহব্বতের আলামত

কোনো-কোনো সাহাবী নবীজির কাছে মজার-মজার প্রশ্ন করতেন। সেই প্রশ্নোত্তর সামনে থাকায় আমাদের জন্য কঠিন কথা বোঝা সহজ হয়ে গেছে। এক সাহাবী নবীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর নবী! মানুষের অন্তরে মাখলুকের প্রতি যে মহব্বত জন্মে, তার আলামত কী? জবাবে নবীজি বড়ই আজব কথা বললেন।

তিনি বললেন–

سَهَرُ اللَّيَالِيْ وَإِرْسَالُ اللَّآلِيْ

'রাত জাগরণ আর মোতি প্রবাহিত করা।'

অর্থাৎ যখন কেউ কাউকে মহব্বত করে, তখন তার দিল তার আয়ত্বে থাকে না আর এই সম্পর্ক তাকে এমন ভাবে চেপে বসে যে, তার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায় এবং তার চোখ থেকে মোতির মতো অশ্রু ঝরতে থাকে।

শরীয়তের সৌন্দর্য

এই মসিবত থেকে মানুষ কীভাবে বাঁচতে পারে? মানুষ যদি শরীয়ত ও সুন্নতের মালা গলায় পরিধান করে, তাহলে সে অতি সহজে এই বিপদ এড়াতে পারে। পবিত্র শরীয়তের সৌন্দর্য এমন যে, তাতে গুনাহের দরজা-ই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য শরীয়তের তুলনায় ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ বলার কারণ হলো, এই শরীয়তে যে কাজ থেকে নিষেধ করার ছিল তার ভূমিকার পথও রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যেমন– মনে করুন, শির্ক হতে বাঁচানো উদ্দেশ্য ছিল। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শির্কের দ্বার হিসেবে ছবি নির্মাণ করাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, শিরক তখন হয়, যখন মানুষ মূর্তি বানায়। ছবির মধ্যে মূর্তিপূজার সূচনা রয়েছে আর মূর্তিতে গিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। মোটকথা, যে মনযিলে যাওয়া হতে বিরত রাখা উদ্দেশ্য, তার দিকে কদম তোলা হতেই বাধা দেওয়া হয়েছে। যেমন– মানুষ বলে, যে রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না, তার দূরত্বের কথা জিজ্ঞাসা করায় লাভ কী?

এমনিভাবে শরীয়ত যিনা হতে নিষেধ করতে চেয়েছে। কিন্তু এর জন্য সরাসরি এমন বলেনি যে, যিনা করো না; বরং বলেছে-

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا

'তোমরা যিনার ধারে-কাছেও যাবে না।'[১]

এখানে নিকটে না যাওয়ার অর্থ কোনো গায়রে মাহরাম মেয়ের সঙ্গে নির্জনে একত্রিত না হওয়া এবং আলাপ না করা। কেননা, কথা বলা, নির্জনে মিলিত হওয়া এগুলো হলো যিনার সূচনা। যখন এই সূচনাই নিষেধ, তখন মূল বিষয়ের প্রশ্নই উঠবে না। মানুষ যখন এই সূচনাপর্ব পরিহার করবে, তখন আর যিনা সংঘটিত হবে না।

যিনার প্রথম পর্ব

আমি আবারো বলছি, যিনার প্রথম পদক্ষেপ হলো, গায়রে মাহরাম মহিলার সঙ্গে কথা বলা। এই মৌলিক কথাটি মনে রাখতে হবে। কেননা, পবিত্র কুরআনের কথাও এটি।

---

১. সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৩২

এ কারণে শরীয়ত মেয়েদের নির্দেশ দিয়েছে, তোমরা যদি গায়রে মাহরাম কারো সাথে একান্ত প্রয়োজনে কথা বল, তাহলে তার নিয়ম হলো–

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

'তোমরা কণ্ঠে নরমভাব রাখবে না।'[১]

অর্থাৎ– কণ্ঠে একটু শক্তভাব রাখবে। গম্ভীর শব্দ ব্যবহার করবে। এমন শব্দ ও কথা বলবে যে, মানুষ সামনে কথা বাড়াবার সুযোগ না পায়। সে যা জানতে চায় পুরো না বলে এবং নিজেই কথা বলা বাদ দেয়। কেননা, সকল পাপের উৎসমুখ হলো কথা। যখন মহিলা নরম ভাষায় কথা বলে, তখন সেখান থেকে পাপাচারের দরজা খোলে। এ কারণে শরীয়ত নরম ভাষায় কথা বলতেই নিষেধ করেছে।

মোটকথা, শয়তান যেসব রাস্তায় চলাচলের সম্ভাবনা রাখে, শরীয়ত সেসব রাস্তা আগেই বন্ধ করে দিয়েছে। তাই যেলোক শরীয়ত মোতাবেক জীবন-যাপন করবে, সে শয়তানের কুপ্রভাব থেকে হেফাযত থাকবে।

দোজখের সঙ্গে আলাপ

বর্তমান অবস্থা এমন যে, যুবক ও তরুণরা গায়রে মাহরাম মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খোঁজে। তারা একে 'শুধু কথা' মনে করে। অথচ এটা শয়তানের বড় ধোঁকা। বর্তমানে এই ধোঁকার আগুনে ঘি ঢেলেছে মোবাইল। পিতামাতা ছেলেমেয়েদেরকে মোবাইল কিনে হাতে তুলে দেয় আর তারা তা সবসময় কাছে রাখে। আমি অনেক দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে সেলফোন দেখেছি। আমি তাদের বলেছি, এটা সেলফোন নয়; বরং হেলফোন। কেননা গায়রে মাহরামদের সঙ্গে ফ্রিভাবে কথা বলা প্রকারন্তরে দোজখের সঙ্গে কথা বলারই নামান্তর।

আলাপের পরবর্তী পর্ব সাক্ষাত

একটি কথা মনে রাখবেন যে, মোবাইলে ফ্রিভাবে কথা বলাবলি ও ভাববিনিময় হতে থাকলে সরাসরি সাক্ষাতের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পবিত্র কুরআন হতে। আল্লাহ তা'আলা প্রায় এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৩২

এত নবীর মধ্য হতে মাত্র একজন নবী এমন ছিলেন, যিনি আল্লাহকে বলেছিলেন–

رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَ

' হে আমার মাওলা! আমাকে দেখা দিন, যাতে আমি আপনাকে দেখতে পারি।'[১]

এই আবেদনকারী হলেন হযরত মূসা (আ.)। তিনি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, যিনি কথা বলার সুযোগ পান, সাক্ষাতের জন্য তার মন আনচান করে। তাই আমরা অভিজ্ঞতার আলোকে বলি, কথার পরবর্তী পর্ব হলো সাক্ষাত। দেখা-সাক্ষাত হলে পরে মন ধাবিত হবে তৃতীয় পর্বের দিকে। এভাবেই পর্যায়ক্রমে শয়তান টানতে থাকে। কোনো এক কবি অবস্থাটি সুন্দারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

তিনি বলেন–

نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا

دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں

'তুমি খোদা নও আর আমার প্রেমও ফেরেশতার মতো নয়। দুজনই যখন মানুষ, তাহলে পর্দার আড়াল হতে যোগাযোগ কেন?'

পবিত্রতার জন্য দুটি জিনিস সংরক্ষণের প্রয়োজন

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ

'(হে নবী!) মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা। তারা যা কিছু করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।'[২]

এই আয়াতে চরিত্র হেফাযত তথা চারিত্রিক পবিত্রতা সংরক্ষণের দুটি পন্থা বলে দেওয়া হয়েছে।

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৩
২. সূরা নূর : আয়াত ৩০

যথা–

(১) দৃষ্টির হেফাযত তথা পরনারীর প্রতি না তাকানো।

(২) লজ্জাস্থানের হেফাযত তথা অবৈধভাবে যৌনচাহিদা পূরণ না করা।

আয়াতের সূক্ষ্ম তথ্য

আলোচ্য আয়াতের মধ্যে কিছু নিগূঢ় তথ্য রয়েছে, মনোযোগ দিয়ে তা শোনা দরকার।

আল্লাহপাক এ আয়াত শুরু করেছেন قل দ্বারা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নবীজিকে মাধ্যম বানিয়েছেন। সরাসরি বান্দাকে নির্দেশ দেননি, যেমন দিয়েছেন রোযা পালনের ক্ষেত্রে। এর কারণ হলো, আল্লাহ বলতে চান, হে আমার নবী! যখন আপনি আমার নির্দেশ পৌঁছাবেন এবং বান্দা আপনার মুখ থেকে নির্দেশটি শুনবে, তখন তারা আমল করতে চেষ্টা করবে। যদি আমল না করে, তাহলে দুনিয়া-আখেরাতে তারা আপনার সামনে লজ্জিত হবে। নবীজির সামনে উম্মতের লজ্জিত হওয়া এটা সাধারণ ব্যাপার। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ বান্দাকে সরাসরি নির্দেশ দিতেন আর বান্দা তা পালন না করত, তাহলে তাকে খোদ আল্লাহর সামনে লজ্জিত হতে হবে, যেটা বড়ই মারাত্মক। এ কারণে আল্লাহপাক উম্মতের প্রতি দয়া করে এই নির্দেশটি নবীর মাধ্যমে দিয়েছেন, যাতে আমার নবী হুকুমটি জানিয়ে দেয় এবং জানার পর কেউ তা পালন না করলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কিন্তু যদি হুকুমটি স্বয়ং আমি দেই আর সে হুকুম বান্দা পালন না করে, তাহলে বান্দা আমার রহমত পাওয়ার যোগ্য কীভাবে হবে? এ কারণে قل বলে নির্দেশ দিয়েছেন।

এর উদাহরণ এমন, যেমন অনেক সময় পিতা পুত্রকে কোনো নির্দেশ দিতে হলে বিশেষ স্বার্থের কারণে বা পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে পিতা সরাসরি পুত্রকে না বলে তার মায়ের মাধ্যমে জানায়। পিতা সরাসরি না বলে মায়ের মাধ্যমে বলার মধ্যে যেমন হেকমত থাকে, তেমনি এখানে সরাসরি আল্লাহ নির্দেশটি না দিয়ে নবীজির মাধ্যমে প্রদান করায় তার মধ্যে হেকমত রয়েছে।

দ্বিতীয় কথা হলো, এ আয়াতে আল্লাহপাক للمؤمنين বলেছেন। لبنى ادم বা للناس বলেননি। অর্থাৎ একথা বলেননি যে, বনী আদমকে বলুন বা মানুষদের

বলুন। বরং বলেছেন, ঈমানদারদের বলুন। এর উদ্দেশ্য হলো একথা বলা যে, হে ঈমানদারগণ! কাফেরা তো জাহান্নামী, তারা তো এমনিই জাহান্নামে যাবে, ফলে তাদেরকে কথা বলে লাভ নেই। পক্ষান্তরে তোমরা হলে জান্নাতী। তাই কেমন যেন আল্লাহ বলেছেন, হে জান্নাতে গমনকারীরা! আমি তোমাদেরকে এই আশা নিয়ে একটি নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা তা জলদি পালন করবে।

গায়রে মাহরামদের দেখার শাস্তি

হাদীছ শরীফে এসেছে–

যেব্যক্তি কোনো গায়রে মাহরাম মহিলার প্রতি তাকাবে কেয়ামতের দিন তার চোখে গলিত সিসা ঢেলে দেওয়া হবে।

আরেক হাদীছে এসেছে, তার চোখে কেয়ামতের দিন জ্বলন্ত কয়লা পুরে দেওয়া হবে।

আরেক হাদীছে এসেছে, তার চোখে কেয়ামতের দিন ফেরেশতারা লোহার শলাকা পুরে দিবে।

মুহাদ্দিছীনে কেরাম তিন হাদীছের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। তারা বলেন, ব্যক্তির ভিন্নতায় শাস্তিও বিভিন্ন হবে। কারো চোখে সিসা ঢালা হবে। কারে চোখে জ্বলন্ত কয়লা পুরে দেওয়া হবে। আবার কারো চোখে লোহার শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

তাঁরা আরও বলেন, এটাও হতে পারে, একই অপরাধীকে এই তিন আজাব পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে। আবার এমনও হতে পারে, একেকজনকে একটি করে শাস্তি দেওয়া হবে।

আরেক হাদীছে এসেছে, কেউ যদি এমন স্থানে তাকায়, যেখানে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে তাকে এই একবার তাকানোর অপরাধে জাহান্নামে চল্লিশ বছর ধরে জ্বলতে হবে।

আরেক হাদীছে এসেছে–

اَلنَّظْرُ بِالشَّهْوَةِ سَهْمٌ مَسْمُوْمَةٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ

'কুদৃষ্টির নজর ইবলীসের বিষাক্ত তীরের মধ্য হতে একটা তীর।'

কুদৃষ্টিপূর্ণ নজর বিষাক্ত তীর হয়, যা সোজা বান্দার দিলে গিয়ে বিদ্ধ হয়। এতে বান্দার মধ্যে মারাত্মক প্রভাব পড়ে।

এ কারণে বড়রা বলেন–

اَلْعَيْنُ عَيْنُ الْمَعَاصِىْ

'চোখ গুনাহের উৎস।'

আর কেউ-কেউ বলেছেন–

اَلنَّظْرُ اَسَاسُ الذُّنُوْبِ

'মানবদৃষ্টি গুনাহসমূহের ভিত্তিমূল।'

তরুণদের মুক্তির একটি উপায়

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক তরুণ সাহাবী এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল!

كَيْفَ النَّجَاةُ

'(তরুণদের) মুক্তি কীসে নিহিত?'

জবাবে নবীজি বললেন–

اِحْفَظْ عَيْنَكَ

' তোমরা চোখকে হেফাযত করো।'

হাদীছের এই বক্তব্য হতে জানা যায়, মুক্তির উপায় হলো স্বীয় চোখকে পরনারী হতে হেফাযত করা। অর্থাৎ তাদের না দেখা।

একটা শয়তানি ধোঁকা

যারা একথা বলে যে, আমরা পরনারী দেখি; কিন্তু তাতে আমাদের কিছু হয় না। অর্থাৎ তাতে আমাদের মধ্যে যৌনাবেগ সৃষ্টি হয় না, তারা বড়ই ধোঁকার মধ্যে আছে এবং ডাহা মিথ্যা কথা বলে। কেননা, কুরআন শরীফে পুরুষদেরও চোখ অবনমিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং মহিলাদেরও চোখ নিচু রাখার হুকুম করা হয়েছে। এর লাভ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ

'এতেই তোমাদের ও তাদের মনের পবিত্রতা নিহিত রয়েছে।'[১]

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৫৩

যখন কুরআন বলছে, না দেখার মধ্যে মনের পবিত্রতা নিহিত, তখন এর বিপরীতে যারা বলে, আমাদের মনে নারী দেখলে উতাল-পাতাল সৃষ্টি হয় না, তারা নিশ্চিত মিথ্যা বলে। তারা এভাবে মিথ্যা লুকিয়ে নিজেদের সাধু হিসেবে জাহির করতে চায়। যারা এমন করে বা বলে, তারা ডাবল পাপী। তারা সত্য লুকায় ও মিথ্যা জাহির করে। আর নারী-পুরুষ পরস্পরকে দেখার দ্বারা মনোজগতে যে ভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়, এটা নারী-পুরুষ সকলেরই হয়। কেউ এর থেকে মুক্ত নয় যতই সাধু হোক-না কেন। বরং ভণ্ড সাধুদের যৌনতাড়না একটু বেশিই হয়ে থাকে। শুধু ভালোমানুষি জাহির করার জন্য তারা 'মনের আগুন' চেপে রাখে। পবিত্র কুরআনে مذكر (পুরুষবাচক) ও مؤنث (মহিলাবাচক) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যা এর জ্বলন্ত প্রমাণ যে, পর্দার লংঘন হলে পুরুষ-মহিলা উভয়ের মনে অপবিত্রতা দানা বাঁধে। আর এ কারণে এর থেকে বাঁচতে উভয়কেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চোখ অবনমিত রাখতে তথা পুরুষের জন্য নারী না দেখতে ও নারীর জন্য পুরুষ না দেখতে।

অশ্লীল কাজ হারাম

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

'(হে নবী!) বলে দাও, আমার প্রতিপালক তো অশ্লীল কাজসমূহ হারাম করেছেন, তা সেই অশ্লীলতা প্রকাশ্য হোক বা গোপন।'[১]

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, প্রকাশ্য অশ্লীলতা দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যভিচার আর গোপন অশ্লীলতা দ্বারা উদ্দেশ গোপনভাবে যৌন চাহিদা পুরা করা। আল্লাহ তা'আলা উভয় ধরনের অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন।

শয়তানের অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা যেখানে عباد الرحمن এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন, সেখানে পাশাপাশি لا শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ রহমানের বান্দার আলোচনা শেষে ওই বান্দার কথাও আলোচনা করেছেন যে, কুরআনের বর্ণনা শৈলী বলে, আল্লাহপাক বলতে চান, যারা যিনা করে, তারা রহমানের বান্দা হয় না; বরং শয়তানের বান্দা হয়।

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৩৩

যিনা করার ৬ ক্ষতি

হাদীছে এসেছে, যিনা করলে তার ৩টি ক্ষতি দুনিয়াতে হয় আর ৩টি ক্ষতি আখেরাতের জন্য রয়েছে। দুনিয়ার ৩টি ক্ষতি নিম্নরূপ-

(১) যিনাকারীর চেহারার উজ্জ্বলতা দূরে হয়ে যায়। তার চেহারা হতে অভিশাপ ও অমঙ্গল ঝরতে থাকে।

(২) তার রুজির সংকট দেখা দেয়। সে সর্বদা ঋণে জর্জরিত হয়ে যায়।

(৩) আল্লাহপাক তার আয়ু কমিয়ে দেন। অল্পদিনেই সে মারা যায়।

আখেরাতে যিনার ৩টি ক্ষতি নিম্নরূপ-

(১) আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন তার প্রতি কঠিন রাগান্বিত থাকবেন এবং তার সঙ্গে কঠোর আচরণ করবেন।

(২) আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব কঠোরতার সঙ্গে নিবেন।

(৩) তাকে জাহান্নামে দীর্ঘদিন থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেন–

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

'কেয়ামতের দিন তার শাস্তি বৃদ্ধি করে দ্বিগুণ করা হবে এবং সে লাঞ্ছিত অবস্থায় তাতে সদা-সর্বদা থাকবে।'[১]

কুরআন শরীফের অপর স্থানে خالدين فيها শব্দ এসেছে। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, যদিও এখানে خالدين তথা স্থায়িত্ববাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু সে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকের মতো চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে না; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য, সে একটা দীর্ঘ সময় জাহান্নামে পড়ে থাকবে।

এই কঠিন আজাব হতে বাঁচতে মৃত্যুর আগেই তাওবা করতে হবে, যাতে আমরা আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।

তিনজন বঞ্চিত লোক

এক হাদীছে এসেছে, আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন ৩ ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে না কথা বলবেন, না তাদের দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকাবেন।

---

১. সূরা ফুরকান : আয়াত ৬৯

যথা–

(১) মিথ্যাবাদী বাদশা।

(২) বৃদ্ধ ব্যভিচারী।

(৩) দাম্ভিক ফকীর।

একটি হাদীছ আমি কিতাবে পড়েছি। সেই হাদীছে এসেছে, যে মহিলা এ উদ্দেশ্যে সাজে যে, পুরুষরা যেন তাকে গভীরভাবে দেখে, অর্থাৎ পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাজ-সজ্জা করে, তাহলে আল্লাহ ওই মহিলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন, কেয়ামতের দিন তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। এমনিভাবে কোনো পুরুষ যদি মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাজে, তার প্রতিও আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। এর কারণ হলো, এটা কোনো ছোট গুনাহ নয়; বরং মারাত্মক একটা গুনাহ, যা মানুষকে ক্রমে ব্যভিচার ও ধর্ষণের দিকে নিয়ে যায়। এর থেকে খাঁটি তাওবা করা জরুরি। আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তাকে হালাল জানতে হবে এবং যা হারাম করেছেন, তাকে হারাম জানতে হবে, মানতে হবে। এর মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

পরপুরুষ বা পরনারী হতে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার ফযিলত

গায়রে মাহরাম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার ফযিলত অনেক। কয়েকটি ফযিলত নিম্নরূপ–

(১) এক হাদীছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

'যেব্যক্তি হারাম বস্তু হতে চোখ অবনমিত রাখে অর্থাৎ তা দেখে না, আল্লাহপাক এর প্রতিদানে তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।'

(২) কোনো-কোনো কিতাবে লেখা আছে–

مَنْ تَعَشَّقَ وَكَتَمَ عِشْقَهُ فَهُوَ شَهِيْدٌ

'অন্তরে প্রেম-ভালোবাসা পয়দা হওয়া সত্ত্বেও যে তা গোপন করে, সে শহীদ।'

অর্থাৎ কারো প্রতি যদি কারো দৃষ্টি পড়ে আর তা তার কাছে ভালো লাগে; কিন্তু সে তার এই মনোভাব অন্তরে চেপে রাখে, কারো কাছে প্রকাশ করে না এবং ওই ভালোবাসার পক্ষে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না আর সেই

ভালোবাসা অন্তরে রেখেই মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে কেয়ামতের দিন শহীদদের কাতারে উঠাবেন।

(৩) এক হাদীছে এসেছে, তিন শ্রেণীর লোক এমন আছে, তাদেরকে জাহান্নামে ফেলা হলেও আগুন তাদের কোনো ক্ষতি করবে না বা কষ্ট দিবে না। যথা–

১. অধিক কুরআন তেলাওয়াতকারী।

২. বেশি-বেশি মেহমান আপ্যায়নকারী।

৩. ব্যভিচার হতে মুক্ত ব্যক্তি।

একটি সোনালী মূলনীতি

একটি কথা মনে রাখবেন, আমরা যদি নিজ-নিজ দৃষ্টি হেফাযতে না রাখি এবং অন্যদের মেয়েদের প্রতি কামভাব নিয়ে তাকাই, তাহলে অন্যরাও আমাদের মেয়েদের প্রতি এমন নাপাক দৃষ্টিতে তাকাবে। আমাদের মেয়েদের মানুষের কুদৃষ্টি হতে বাঁচাতে চাইলে প্রথমে আমাদেরকে পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকানো হতে বিরত থাকতে হবে।

একব্যক্তি নবীজির দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! স্ত্রীর প্রতি আমি আস্থা রাখতে পারি না। নবীজি জবাবে বললেন, তুমি স্বীয় দৃষ্টি গায়রে মাহরাম মহিলা হতে হেফাযত করো; তাহলে আল্লাহ তোমার স্ত্রীকে হেফাযত করবেন।

এ হাদীছের বার্তা হলো, মানুষ যদি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে মানুষের কুদৃষ্টি হতে বাঁচাতে চায়, তাহলে আগে নিজেদের দৃষ্টি হেফাযত করতে হবে। পবিত্র কুরআনের সিদ্ধান্ত হলো–

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

'অথচ কূট-চক্রান্ত খোদ তার উদ্যোক্তাদেরই পরিবেষ্টন করে নেয়।'[১]

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

এক স্বর্ণকারের যুবতী স্ত্রী ছিল। সে ছিল খুব সুন্দরী ও রূপসী। একদিন স্বর্ণকার বাড়িতে এসে দেখল, তার স্ত্রী বসে-বসে কাঁদছে। স্বর্ণকার পেরেশান হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার? স্ত্রী বলল, দু-

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ৪৩

তিন বছর বয়সী যে বাচ্চাটি আমরা লালন-পালন করে বড় করে তুলেছি, সে এখন যৌবনে উপনীত হয়েছে। তাকে আমি বাজার হতে সবজি আনতে পাঠাই। সে সব্জি এনে আমাকে দেওয়ার সময় মন্দ নিয়তে আমার হাত টিপে ধরে। তখন আমি তার দৃষ্টিতে কামনার আগুনে দেখেছিলাম। তাই আমার মনে হয়েছে, সে, যৌন লালসা নিয়েই আমার হাত চেপে ধরেছে। যাকে নিজের ছেলের মতো ছোট বয়স হতে লালন-পালন করেছি, তার থেকে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটায় আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি এবং কাঁদছি।

স্বর্ণকার স্ত্রীর মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে সেও কেঁদে ফেলল। তার চোখেও পানি চলে এল। স্ত্রী অবাক হয়ে জানতে চাইল, আপনি কাঁদছেন কেন? জবাবে স্বর্ণকার বলল, ছেলেটির কোনো দোষ নেই, সব দোষ আমার। স্ত্রী আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তা কীভাবে? স্বর্ণকার বলল, আমি স্বর্ণকার। আজ এক মহিলা এসেছিল চুড়ি কিনতে। মহিলা নিজে নিজে চুড়ি পরিধান করতে খুবই চেষ্টা করে। কিন্তু না পেরে আমাকে বলল, দয়া করে চুড়িটা একটু পরিয়ে দিন। আমি তাকে চুড়ি পরাতে গেলে তার কোমল হাত আমার খুব ভালো লাগল। ফলে আমি তার হাত যৌনকামনায় টিপে ধরি। আমি মনে করি, আমি অন্য মহিলার হাত চেপে ধরার কারণে আমার চাকর আমার স্ত্রীর হাত টিপে ধরেছে। অতএব এটা আমার গুনাহের ফল; তার কোনো দোষ নেই।

জান্নাতের গ্যারান্টি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেব্যক্তি গায়রে মাহরাম মহিলার সঙ্গে যিনা করার সুযোগ পেয়েও যিনা করে না, আমি তার জান্নাতের গ্যারান্টি প্রদান করছি। অর্থাৎ যদি কেউ যিনা করার সুযোগ পেয়ে শুধু আল্লাহর ভয়ে কুকর্ম হতে বেঁচে থাকে, তাহলে তার পুরস্কার হলো জান্নাত।

সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রহ.)-এর তাকওয়া

আলহামদুলিল্লাহ! এই উম্মতের মধ্যে এমন-এমন বুযুর্গ ছিলেন, যারা সচ্চরিত্রের নজির রেখে গেছেন। সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রহ.) ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর ছাত্রদের একজন ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের কাছে বেশি আসা-যাওয়া করতেন। তিনি সে যুগের বড় মুহাদ্দিছ ও সূফী-সাধক হিসেবে গণ্য ছিলেন। তিনি খুবই সুদর্শন ছিলেন।

একবার জনৈক মহিলা তার কাছে কুপ্রস্তাব পাঠাল এবং বলল, আমি আপনার সৌন্দর্যের কারণে আপনার প্রতি আসক্ত। এখন সুযোগ এসেছে, তাই আপনি আমার বাড়িতে চলে আসুন, যাতে আমি সুপ্ত ইচ্ছা চরিতার্থ করতে পারি। তিনি জবাবে বললেন, معاذالله আমি আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি।

রাতে যখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন, তখন স্বপ্নে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, সুলাইমান! আমি তো আল্লাহর নবী ছিলাম, আমার সঙ্গে আল্লাহর হেফাযত ছিল। তাই আমি কুপ্রস্তাবের মুখোমুখি হয়ে বলেছিলাম, معاذ الله এটা তো আমি বলেছিলাম নবুওয়াতের হেফাযতের কারণে। এখানে আমার ব্যক্তিগত কোনো কৃতিত্ব ছিল না। কিন্তু তুমি নৈপুণ্যের সঙ্গে ওই কৃতিত্বের নজির স্থাপন করেছ, যা নবীগণ করে থাকেন।

এক ছাত্রের শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)-এর ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিল তরুণ। ছাত্রটি বড়ই সুদর্শন ও চরিত্রবান ছিল। সে প্রতিদিন একটি রাস্তা দিয়ে মাদরাসায় যেত। একটি মেয়ে প্রতিদিন তাকে যেতে দেখত। মেয়েটির মনে মন্দ ইচ্ছা জাগল। সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না।

একদিন মেয়েটি তার বাড়ির চাকরানীকে বলল, যেভাবেই হোক ওই ছেলেটিকে আমার ঘরে নিয়ে আসবে। ছেলেটি সেদিন ওই রাস্তা দিয়ে গমনকালে চাকরানী তার সামনে এসে বলল, এই ঘরে একজন রোগী আছে, তুমি তাকে একটু ফুঁ দিয়ে যাও। ছাত্রটি ষড়যন্ত্র ধরতে পারল না। সে উপকারের নিয়তে চাকরানীর সঙ্গে মেয়েটির বাড়িতে এল। ঘরে ঢুকতেই চাকরানী বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিল। মেয়েটি এবার ছেলেটির সামনে এল এবং বলল, আমি আপনাকে বহু দিন যাবত আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে দেখে আসছি। আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। চিন্তা করছিলাম, কীভাবে আপনাকে ঘরে ডেকে এনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করি।

যখন মেয়েটি বেপর্দার সঙ্গে সামনে এল এবং এভাবে কথা বলল, তখন ছেলেটি ঘাবড়ে গেল। তাকে ঘাবড়াতে দেখে মেয়েটি অভয় দিয়ে বলল, ভয় পাবেন না; আজ ঘরে কেউ নেই। আজ মন ভরে আমাকে উপভোগ করুন।

ছেলেটি যখন দেখল, অবস্থা বেগতিক, তখন সে মেয়েটিকে বলল, ঠিক আছে, আমি তোমার কামনা পূরণ করব। তবে তার আগে আমাকে একটু

বাথরুমে যেতে হবে। ছেলেটি একথা বলে বাথরুমে চলে গেল। তখনকার যুগে বাথরুম বর্তমান যুগের মতো এত পরিষ্কার থাকত না; বরং কাঁচা ময়লা যত্রতত্র পড়ে থাকত। ছেলেটি বাথরুমে গিয়ে দেখল, সেখানে ময়লা জমে আছে। ছেলেটি ময়লা উঠিয়ে হাত-পাসহ সারা শরীরে মাখাল। পায়খানা গায়ে মেখে যখন সে বের হলো, তখন সারা শরীর দিয়ে দুর্গন্ধ বের হতে থাকল। তার গায়ের দুর্গন্ধ মেয়েটির নাকে গেলে ছেলেটির প্রতি তার ঘৃণা জন্মে গেল এবং বলল, আমার জানা ছিল না, তুমি এমন ইতর ও নোংরা। দূর হয়ে যাও এখান থেকে। মেয়েটি ভাগিয়ে দিলে ছেলেটি এ যাত্রা ঈমান বাঁচিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ছেলেটি বাইরে এসে দেখল, ময়লা কাপড়েও লেগে রয়েছে। সে চিন্তা করল, এবার তো মানুষের নাকেও দুর্গন্ধ লাগবে। ফলে সে দ্রুত মাদরাসায় এসে কাপড় ও শরীর পাক-পবিত্র করল। ভালো করে গোসল করল এবং পরিধেয় কাপড় ধৌত করল। তারপর ভিজা কাপড় পরেই ক্লাসে গেল। সে মনে-মনে চিন্তিত ছিল, জীবনে কখনো সবক কামাই যায়নি, কিন্তু আজ তো সবকে দেরি হয়ে গেল! তাই সে আস্তে করে চুপিসারে ক্লাশরুমে ঢুকল এবং সকলের পিছনে বসল।

একটু সময় পরেই হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) বললেন, ভাই! তোমাদের মধ্যে কে এমন আতর মেখে এসেছ যে, পুরো দরসগাহ সুগন্ধিতে ভরে যাচ্ছে? শাহ সাহেবের কথা শুনে ছাত্ররা অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। ওই ছেলেটির কাছে বসা এক ছাত্র বলল, হযরত! এর কাপড় থেকে খোশবু বের হচ্ছে।

ছেলেটি আগে থেকেই শঙ্কিত ছিল। এবার ওস্তাদ ডাকলে তার উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল। শাহ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আজ এসেছ দেরিতে আবার খোশবুও মেখেছ বেশ; ব্যাপারটা কী বলো তো? শাহ সাহেবের কথায় ছাত্রের চোখে পানি এসে গেল। পরিশেষে সে বলল, হযরত! আমার সঙ্গে আজ এমন-এমন ঘটনা ঘটেছে। আমি সারা গায়ে পায়খানা মেখেছিলাম; যাতে আমার শরীর দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয় এবং আমি গুনাহ থেকে বেঁচে যাই। আমি মাদরাসায় এসে ময়লা ধুয়ে ফেলি। কিন্তু আল্লাহপাকের মেহেরবানি দেখে আমি অবাক যে, আমি শরীরের যেসব স্থানে ময়লা লাগিয়েছিলাম, সেসব স্থান থেকে খোশবু বের হচ্ছে।

আল্লাহু আকবার!

এই ছেলেটি যতদিন জীবিত ছিল, তার শরীর দিয়ে খোশবু বের হতে থাকে। এ কারণে তার নাম প্রসিদ্ধ হয়েছিল 'খাজা মেশকী'।

এ ঘটনা প্রমাণ করে, যেব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশকে সম্মান করে, পালন করে এবং তাঁকে ভয় করে, আল্লাহপাক তার মান-মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

মাখলুকের মহব্বতের চিকিৎসা

আল্লাহ ছাড়া অন্যের মহব্বত বিশেষত কোনো-কোনো নারী বা সুশ্রী বালকের মহব্বত মারাত্মক বিপদ। এই বিপদে যে নিপতিত তার চিকিৎসা কী? এ বিষয়ে কয়েকটি চিকিৎসা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রথম চিকিৎসা : প্রথম কথা হলো, আমাদের বুযুর্গানে কেরাম এই মসিবত হতে মুক্তির জন্য একটি যিকিরের কথা বলেছেন। এটি আমরা অনেক লোকের ব্যাপারে পরীক্ষা করেছি এবং শতভাগ সফলতা পেয়েছি। মহব্বতের রোগীকে আপনিও এই চিকিৎসা দিতে পারেন। সবাইকে আমার পক্ষ হতে এই চিকিৎসা প্রদানের অনুমতি আছে। যেহেতু এই গুনাহ ব্যাপক হয়ে গেছে, তাই এর প্রতিবিধানও ব্যাপকভাবে করা দরকার। উল্লেখিত যিকিরটি এমন–

(١) لَامَرْغُوْبِيْ اِلَّا اللّٰهُ.

(১) আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো বাসনা নেই।

(٢) لَا مَطْلُوْبِيْ اِلَّا اللّٰهُ.

(২) আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।

(٣) لَا مَحْبُوْبِيْ اِلَّا اللّٰهُ.

(৩) আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো বন্ধু নেই।

(٤) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

(৪) আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।

এই চারটি বাক্য একত্রে সকালে ১০০ বার এবং সন্ধ্যায় ১০০ বার পড়বে। আল্লাহ এর বরকতে পাঠকারীর দিল হতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাপাক ও নাজায়েয মহব্বত দূর করে দিবেন।

দ্বিতীয় চিকিৎসা : দ্বিতীয়ত মনে রাখতে হবে, আমি অস্থায়ী মহব্বতের শিকার। আমি এই মহব্বতের কারণে আল্লাহর মহব্বত হতে বঞ্চিত।

কেননা, প্রেমাস্পদ যে-ই হোক-না কেন সে তো একজন মানুষই। আজ সে সুশ্রী থাকলেও কাল কুশ্রী হয়ে যাবে। দেখতেও মন চাইবে না।

এক হেদায়াতপ্রার্থীর ইসলাহের ঘটনা

হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) ঘটনা লিখেছেন যে, একলোক তার শায়েখের কাছে যিকির শিখতে এল। খানকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য এক মহিলা নিয়োজিত ছিল। মহিলা ছিল খুবই সুন্দরী। মহিলা প্রতিদিন এলে ওই লোক তাকে মন ভরে দেখত। এভাবে দেখতে-দেখতে সে তার আশেক হয়ে গেল। একদিন মহিলা শায়েখকে জানিয়ে দিল, নতুন আগন্তুকের অবস্থা ভালো নয়। তার দৃষ্টিতে কামনার আগুন দেখি। শায়েখকে এ সংবাদ দেওয়ার পর মহিলা ঘটনাক্রমে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলো। কয়েকদিন যাবত ঘন-ঘন পাতলা পায়খানা হলো, যার ফলে তার শরীর ভেঙে গেল এবং দেহের জৌলুস ফিঁকে হয়ে গেল। যেহেতু তার ডিউটি ছিল প্রতিদিনের, তাই সে অসুস্থতা সত্ত্বেও খানকায় কাজ করতে এল। এদিনও ওই লোক তার জন্য অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু আজ মহিলার ভাঙা চেহারা ও জৌলুসহীন অবস্থা দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও। মহিলা একথাও তার শায়েখকে জানিয়ে দিল। শায়েখ বললেন, তুমি ঘরে চলে যাও; আমি ব্যাপারটা দেখছি।

তারপর শায়েখ মুরিদকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে শায়েখ তাকে বললেন, আমি তোমাকে এজন্য ডেকেছি যে, তুমি তোমার প্রেমাস্পদের সাথে গিয়ে মিলিত হও। লোকটি বলল, হযরত! সে কোথায়? শায়েখ বললেন, পায়খানায়। লোকটি সেখানে গিয়ে মল-মূত্র ছাড়া আর কিছুই দেখল না। ফিরে এসে বলল, হযরত! সেখানে আমার প্রেমাস্পদ কই? সবই তো নাপাক, যা হতে দুর্গন্ধ আসছে। শায়েখ বললেন, কাল যে মহিলাকে তুমি নেশার চোখে দেখেছিলে, আজ তুমি তাকে সেই দৃষ্টিতে দেখনি। এর অর্থ হলো, তুমি যার প্রতি আগ্রহী তা তার থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আর সেটাই হলো এই নাপাক, যা তুমি বাথরুমে দেখছ। ফলে জানা গেল, তোমার যত ইশ্‌ক ও প্রেম, সবই ছিল এই নাপাকের প্রতি। তাই আমি চাইলাম, তোমার প্রেমাস্পদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাত করিয়ে দিই।

তৃতীয় চিকিৎসা : তৃতীয় চিকিৎসা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা মাখলুকের মহব্বতের রোগে আক্রান্ত, তাদের কর্তব্য হলো লাগাতার রোযা রাখা। কেননা, পেট খালি থাকলে সকল শক্তি নিস্তেজ

হয়ে যায়। তাই যারা অবিবাহিত যুবক এবং অপরদিকে শয়তানি, যৌনলালসা এবং বেপরোয়া চিন্তা-ভাবনা যাদের পেরেশান করে, তাদের কর্তব্য হলো, তারা রোযা রাখবে। রোযা রাখা ছাড়া তাদের জন্য গুনাহ থেকে বাঁচা দুষ্কর।

আমার নিজের মা'মুল

আলহামদুলিল্লাহ! রোযা রাখলে যে যৌনশক্তি হেফাযত থাকে, আমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমার ভালো মনে আছে, যৌবনের শুরু কাল থেকে নিয়ে বিবাহের দিন পর্যন্ত আমি ২৪ ঘণ্টায় মাত্র একবার খেতাম। দীর্ঘ ১৩ বছর এভাবে পার করি। রোযা রেখে মানুষ দুবেলা খায়। কিন্তু আমার রীতি ছিল মাত্র একবার খাওয়া। তাও এতটুকুই, যাতে কোমর সোজা থাকে। আর তা হলো মাত্র তিন লোকমা।

যৌবন হেফাযত করা এত সহজ নয়। আমি তো ভেবে অবাক হই যে, মানুষ তাদের যৌবন কীভাবে হেফাযত করে? যারা এটা পারে, তারা বড়ই বীর-বাহাদুর। সারা দিনে মাত্র তিন লোকমা খানা খাওয়ার ফায়দা এই হলো যে, আলহামদুলিল্লাহ! দৃষ্টি পাক হয়ে যায়, যার কারণে মনে কখনো এই খেয়াল পয়দা হত না যে, কে কালো, কে সাদা আর কে সুন্দর। যার চেহারা তার কাছে, এতে আমার মধ্যে কোনো আগ্রহ থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ আমি নির্লোভ ও নিরাকাঙ্ক্ষী হয়ে গিয়েছিলাম। যেদিন বিবাহ হলো, সেদিন থেকে দিনে দুবার খাওয়া শুরু করি।

চতুর্থ চিকিৎসা : ইশকে মাজাযী তথা গায়রুল্লাহর মহব্বত হতে নিষ্কৃতির আরেকটি উপায় হলো এমন রোগীকে আল্লাহর মহব্বতের শরবত পান করিয়ে দেওয়া। বুযুর্গানে কেরামের সাধারণ রীতি হলো, মানুষ তাদের কাছে এলে তাঁরা তাদের প্রতি গভীর মনোযোগ স্থাপন করেন। তাদের জন্য দু'আ করেন। তাদের পক্ষ হয়ে ইস্তেগফার করেন। তাদের দিলে আল্লাহর মহব্বত ভরে দেন। এতে তাদের মাঝে যখন আল্লাহর ইশকের নেশা ও মজা জেগে যায়, তখন তারা 'লায়লার ইশ্‌ক' ভুলে যায়। কবি সুন্দর বলেছেন–

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذت آشنائی

সব কিছু হতে করো খালি তোমার দিলখানি,
প্রভুপ্রেমে সিক্ত হবে তুমি মজা হবে আমদানি।

এক যুবকের ঘটনা

হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন। এক শাহজাদী ছিল। এক যুবক তার সঙ্গে সম্পর্ক করতে চেষ্টা করল। শাহজাদী তাকে বলল, মিয়া! এ কাজ এত সহজ নয়। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে একটি সহজ পন্থা বলে দিচ্ছি। আর তা হলো, আমার পিতা আল্লাহওয়ালা ও বুযুর্গদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন এবং তাদের কাছে আসা-যাওয়া করেন। আপনিও কোথাও গিয়ে বুযুর্গের বেশ ধরুন। এতে হতে পারে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাত করার সুযোগ হয়ে যাবে। যুবক বলল, ঠিক আছে, তা-ই হবে। তারপর যুবক শহরের বাইরে গিয়ে এক নিরিবিলি স্থানে আস্তানা গাড়ল এবং আল্লাহ আল্লাহ যিকির শুরু করল।

কিছুদিন পর মানুষের মাঝে যুবকের ব্যাপক চর্চা শুরু হলো। মানুষ তার কাছে দু'আ নিতে যেত আর সে দু'আ করে দিত। মানুষ তাকে এর জন্য হাদিয়া দিত, কিন্তু সে হাদিয়া নিত না। এতে তার প্রসিদ্ধি ও সুখ্যাতি আরও বেড়ে গেল। মানুষের মুখে-মুখে এই খবর সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল যে, এই বুযুর্গ হাদিয়াও নেন না। খবর উড়তে-উড়তে বাদশারও কানে গিয়ে পৌঁছল। বাদশা বললেন, তিনি সত্যিকার অর্থেই বুযুর্গ হন, তাহলে আমি তার সাথে গিয়ে সাক্ষাত করব। বাদশা একদিন তার খানকায় গেলেন এবং যুবকের কাছে দু'আর দরখাস্ত করলে যুবক তার জন্য দু'আ করেন। বাদশা তাকে হাদিয়া দিতে গেলে যুবক বলল, আমি ফকীর মানুষ, হাদিয়া নিয়ে কী করব? তার চেয়ে আপনি নিয়ে অন্যখানে ব্যয় করুন। যুবক বাদশার হাদিয়াও প্রত্যাখ্যান করলে বাদশার বিশ্বাস হয়ে গেল, ইনি একজন পাক্কা বুযুর্গ; কোনো দোকানদার নন। তারপর বাদশা তার ভক্ত হয়ে গেলেন এবং তার কাছে নিয়মিত আসতে থাকেন।

এদিকে শাহজাদীও গোপনে খবর পেয়ে গেল, তার পিতা যুবকের কাছে যাওয়া শুরু করেছেন। কিছুদিন পর শাহজাদী তার পিতাকে বলল, আব্বু! আপনি তো ওই বুযুর্গের কাছে যান; আমিও কী তার কাছে একটু যেতে পারি? অর্থাৎ আমিও চাই, ওই বুযুর্গের কাছে গিয়ে তার থেকে আমার রোগমুক্তির জন্য দু'আ করাব। বাদশা অনুমতি দিয়ে দিলেন।

শাহজাদী ভালো করে সাজ-সজ্জা করে যুবকের খানকায় চলে গেল। গিয়ে দেখল, যুবক নামায, তেলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদাতে নিমগ্ন। শাহজাদী যুবকের কাছে গিয়ে বসে পড়ল এবং তাকে বলল, আমি অমুক শাহজাদী।

আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু যুবক সাড়া দিল না। সে নামায পড়তেই থাকল। যখন সালাম ফেরাল, তখন শাহজাদী বলল, আমি বাদশার কন্যা। আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছি। আপনাকে এই পলিসি আমিই তো বলে দিয়েছিলাম।

কিন্তু যুবক আবার ইবাদাতে লেগে গেল। এভাবে বেশ সময় পার হলে পরে শাহজাদী বিচলিত হয়ে ওঠল। সে বলল, আপনি আমার দিকে ফিরছেন না কেন? যুবক এবার মুখ খুলল। বলল, আমি যখন তোমার খেদমতের যোগ্য ছিলাম, তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাতরে সুযোগ ঘটেনি। এখন আমি তোমার খেদমতের যোগ্য নই। এখন আল্লাহর খেদমতের মজা আমি পেয়ে গেছি। তোমার মতো হাজারো শাহজাদী এলেও সেই মজা পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুবহানাল্লাহ!

মূলত যুবক শাহজাদীকে পাওয়ার কৌশল হিসেবে বুযুর্গের বেশ ধরে খানকা স্থাপন করেছিল এবং মেকি যিকির শুরু করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাকে প্রকৃত মহব্বতের মজা আস্বাদন করান। এমনিভাবে আল্লাহওয়ালারাও এই কাজ করেন যে, যাদের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত থাকে, তাদেরকে আল্লাহর মহব্বত দ্বারা সিক্ত করেন, যার ফলে তারা দুনিয়ার মহব্বত ভুলে যায়।

দিল মুসিবতগ্রস্ত হওয়ার কারণ

সঠিক কথা হলো, কুকর্ম হতে বাঁচার জন্য মানুষ স্বীয় চোখ হেফাযত করবে। এর বিকল্প নেই। চোখের দ্বারাই সমস্ত গুনাহের সূত্রপাত হয়। মনে রাখবেন-

* যদি মা হাওয়া ফল না দেখতেন, তাহলে পরীক্ষায় নিপতিত হতেন না।

* যদি কাবীল হাবীলের স্ত্রীকে না দেখত, তাহলে সে আপন ভাইকে হত্যার মতো জঘন্য কাজ করত না।

* যদি যুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.)কে না দেখতেন, তাহলে তার ব্যাপারে এমন সমালোচনা হতো না।

এ সমস্ত অপরাধের সূত্রপাত হয় চোখের দেখা হতে। এ কারণে আমাদের বুযুর্গগণও একথাই বলেন যে, মানুষের দৃষ্টির কারণে তার দিল মসিবতগ্রস্ত হয়। সুতরাং আসল কথা হলো, চোখকে বাঁচাতে হবে।

আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধকে ভয় করতে থাকুন

মানুষ যখন কাউকে মহব্বতের (ইশকের) নজরে দেখে, তখন আল্লাহর মাঝে তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। বস্তুত এ কারণেই এই অপরাধের এত শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَنَا اَغْيَرُ وُلْدِ اٰدَمَ وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّىْ

'বনী আদমের মধ্যে আমার আত্মমর্যাদাবোধ সবচেয়ে বেশি। আর আমার থেকেও বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হলেন আল্লাহ তা'আলা।'

যেহেতু আল্লাহপাকের আত্মমর্যাদাবোধ বেশি, তাই তাঁর বান্দা যখন তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মহব্বত ও ইশকের নজরে দেখে, তখন এমনিতেই আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ তীব্র হয়ে ওঠে। তখন বান্দা স্বাভাবিকভাবেই তার কোপানলে পড়ে। এজন্য মনে-মনে ভয় ও আতঙ্ক থাকা যে, হতে পারে এটাই সেই ক্ষণ, যখন আমার মালিকের রাগ উঠবে আর আমাকে ঈমানের দৌলত হতে বঞ্চিত করে দেওয়া হবে। আর ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে সব কিছু শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

কুদৃষ্টির কুফল

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)-এর এক মুরিদ ছিল। লোকটি এক সুদর্শন বালককে দেখে বলল, হযরত! এই বালকটি অমুসলিম। সেও কি জাহান্নামে যাবে? হযরত বললেন, মনে হচ্ছে তুমি তাকে কুদৃষ্টি দিয়ে দেখেছ? এখন তুমি এর পরিণতি অবশ্যই ভোগ করবে। লোকটি কুরআনের হাফেয ছিল। শুধু ওই একবারের কুদৃষ্টির কারণে সে কুরআন ভুলে গেল।

আল্লাহপাকের দরবারে দরখাস্ত, যেন তিনি আমাদের জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেন এবং ভবিষ্যতের গুনাহ থেকে হেফাযত করেন। হে মালিক! আমরা দুর্বল। আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং নফ্স এবং শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের জয়যুক্ত করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

'সফলতা অর্জন করেছে সেই, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজ প্রতিপালকের নাম নিয়েছে ও নামায পড়েছে।' –সূরা আ'লা : ১৪, ১৫

আত্মশুদ্ধি

[১৪২২ হিজরীর ২৫ শে রমযান মোতাবেক ২০০১ সনের ১১ই ডিসেম্বর মসজিদে নূর লোসাকায় (জাম্বিয়া) এ বয়ান হয়। এতে অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।]

'মানুষের সঙ্গে নফ্স থাকা অবস্থায় খামোখা শয়তানের পিছে পড়ে লাভ নেই। যদি আমরা কষ্ট করে নফ্সকে ঠিক করতে পারি এবং নফ্স শয়তানের সহযোগিতা করা ছেড়ে দেই, তাহলে শয়তান আমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।

অতএব নফ্স ও শয়তান এ দুয়ের মধ্যে মানুষের জন্য বেশি ভয়ংকর হলো মানুষের নফ্স। যেমন বলা হয় 'ধোপার আছাড়'। অর্থাৎ ধোপা যেভাবে পাটে আছড়িয়ে কাপড় ধোয়, তেমনি নফ্সও এমনভাবে ধোপার ভূমিকা পালন করে যে, সে মানুষকে আছাড় দেয়। এ কারণে নফ্স হতে অধিক সতর্ক থাকা জরুরি।'

আত্মশুদ্ধি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

وَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ: وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا وَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ:

وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

وَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ: فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

وَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَشَاءُ

وَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ: وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

চতুর্থ বড় দুশমন

মানুষের চার নম্বর মারাত্মক দুশমন হলো নফ্স বা মন। এটা বড়ই ভয়ানক ও বিপজ্জনক; বরং খুবই পিশাচ ও বদমাশ। আজকের মজলিসে নফসের অনিষ্টতা ও তা থেকে বাঁচার উপায় আলোচনা করা হবে। সকল কুকীর্তির হোতা এই নফ্স। এই নফ্সই আযাযিলকে ফেরেশতাদের নেতা হতে ইবলিস ও শয়তান বানিয়েছে। এই নফ্সই কাবীলকে আপন ভাই হাবীলকে হত্যা করতে উস্কে দেয়।

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে কোনো কথা বলতে এত কসম করা হয়নি, যত কসম করা হয়েছে আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে। আল্লাহর জন্য তো সাধারণভাবে বলাই যথেষ্ট। তারপরও যদি তিনি কোনো কথা কসম দিয়ে বলেন, তবে তার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। কথা যখন আল্লাহর, তখন একবার বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহপাক এ ব্যাপারে সাতটি কসম করেছেন। তিনি বলেন–

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا (١)

(১) শপথ সূর্যের ও তার বিস্তৃত রোদের।

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا (٢)

(২) এবং চাঁদের, যখন তা সূর্যের পেছনে আসে।

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا (٣)

(৩) এবং দিনের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে।

وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا (٤)

(৪) এবং রাতের, যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে।

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا (٥)

(৫) শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا (٦)

(৬) এবং পৃথিবীর ও যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন, তাঁর

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا (٧)

(৭) এবং মানবাত্মার ও তাঁর, যিনি তাকে পরিপাটি করেছেন।

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا (٨)

(৮) তারপর তার জন্য যা পাপ এবং তার জন্য যা পরহেযগারী, তার অন্তরে সেই বিষয়ক জ্ঞানের উন্মেষ ঘটিয়েছেন।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا (٩)

(৯) সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে।

(١٠) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

(১০) আর ব্যর্থকাম হবে সে, যে তাকে (গোনাহের মধ্যে) ধসিয়ে দেবে।[১]

এসব আয়াতে আল্লাহপাক পরপর সাত বস্তুর শপথ করে ইরশাদ করেছেন, যে বান্দা আত্মশুদ্ধি করেছে, সে সফলকাম হয়েছে। পক্ষান্তরে যে বান্দা পরিশুদ্ধ হয়নি, সে বিফল হয়ে গেছে।

আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ

আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ হলো, অন্তরে যে ভালো-ভালো কাজের আগ্রহ ও প্রেরণা জাগে মানুষ তাকে আরো উজ্জীবিত করে সে অনুযায়ী কাজ করবে আর যেসব মন্দ চাহিদা দেখা দেয়, তা দমন করে চলবে। এভাবে সর্বদা সাধনা অব্যাহত থাকলে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যায়।

ইল্‌মি তথ্য

সূরা শামসের মৌলিক কথা হলো, মানুষের ভেতর সৃষ্টিগতভাবে পাপ ও পুণ্য উভয়ের আগ্রহ রাখা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে কোনটা পাপ ও কোনটা পুণ্য সেই জ্ঞানও তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন মানুষের কাজ হলো, পুণ্যের আগ্রহকে বাস্তবায়িত করা ও পাপের চাহিদাকে দমন করা। এ বিষয়টা বলার জন্য আল্লাহ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাতের শপথ করেছেন। সম্ভবত এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে সূর্য ও চন্দ্রের আলো এবং রাতের অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি মানুষকে ভালো কাজেরও যোগ্যতা দিয়েছেন এবং মন্দ কাজেরও, যা তার আত্মার জন্য আলো ও অন্ধকারতুল্য।[২]

সফলতা দ্বারা উদ্দেশ্য

আরবী ভাষায় فلاح এর অর্থ হলো গোপন বস্তুর সুযোগ উন্মোচন হওয়া। এ কারণে কৃষাণকে فلاح 'উন্মোচনকারী' বলা হয়। এমনিভাবে যার নিচের ঠোঁট খোলা থাকে, আরবীতে তাকে افلح رجل বলে। কুরআন শরীফের আলোকে فلاح এর মর্ম হলো, সেই বান্দা, যার বদলা ও প্রতিদান কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে খুলবে। অতএব فلاح বা সফলতার সারকথা হলো–

---

১. সূরা শামস : আয়াত ১-১০
২. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন ৩ : আয়াত ৭১৭

*এমন সফলতা, যার পরে ব্যর্থতা থাকে না।
*এমন সম্মান, যার পরে অপমান থাকে না।
*আল্লাহপাকের এমন নৈকট্য, যার পরে আর দূরত্ব থাকে না।

সফলতার জন্য ৩টি জিনিসের প্রয়োজন

প্রথম জিনিস হলো তাওবা।

এ ব্যাপারে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন–

وَتُوبُوٓا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফল হও।'[১]

দ্বিতীয় জিনিস হলো আত্মশুদ্ধি।

আল্লাহপাক এ ব্যাপারে বলেন–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

'যে আত্মশুদ্ধি অবলম্বন করেছে, সে সফলতা লাভ করেছে।'[২]

তৃতীয় জিনিস নামায। আল্লাহপাক এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ

'নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে মুমিনরা, যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত।'[৩]

এ তিন আয়াতের সারমর্ম হলো, সফলতার শীর্ষে পদার্পণ করতে হলে উল্লিখিত ৩টি জিনিস অর্জন করা জরুরি। এর ধারাবাহিকতা এভাবে যে, মানুষ প্রথমে স্বীয় গুনাহের জন্য তাওবা করবে। তারপর আত্মাশুদ্ধির জন্য চেষ্টা চালাবে। তারপর পরিশুদ্ধ মন নিয়ে যখন নামায পড়বে, তখন সে সর্বোচ্চ সফলকাম হয়ে যাবে। এ কারণেই জান্নাতে যারা যাবে, সকলেই সফলতা অর্জনকারী হবে। জান্নাতে কেবল তারাই যাবে, যাদের আত্মশুদ্ধি অর্জিত হবে। আল্লাহপাক এক আয়াতে জান্নাতের আলোচনা করে তার সারনির্যাস বের করেছেন–

---

১. সূরা নূর : আয়াত ৩১
২. সূরা আ'লা : আয়াত ১৪
৩. সূরা মুমিনুন : আয়াত ১, ২

وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُهٗ مَنْ تَزَكّٰى

'এটি সেই বান্দার বদলা, যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে।'[১]

মানবসৃষ্টি এবং উপাদান চতুষ্টয়ের প্রভাব

আমাদের বুযুর্গগণ বলেন–

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ مِنْ مَاءٍ وَنَارٍ وَطِيْنٍ وَرِيْحٍ.

'মানুষকে চার উপাদানযোগে সৃষ্টি করা হয়েছে। (১) পানি (২) আগুন (৩) মাটি ও (৪) বাতাস।'

মানুষের মাঝে এই চার উপাদানের প্রভাব বিদ্যমান। কারো মধ্যে একটি দিক প্রাধান্য পেলে আরেকজনের মাঝে আরেকটি দিক প্রাধান্য পায়। তবে সকলের পরিচয় ও আলামত বলে দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো-

(১) فَاِنْ كَثُرَ مَاءُهٗ فَهُوَ بِيتٌ

'পানির উপাদান প্রাধান্য পেলে সে ব্যক্তি বড় জ্ঞানী হবে।'

এমন লোক ভবঘুরে স্বভাবের হয়। ভবঘুরে স্বভাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে বড়ই শৌখিন ও বিলাসী হয়। তার মধ্যে ধূর্তামি ও চতুরতার প্রবণতা বেশি থাকে। ফলে সে নিজেকে বড় জ্ঞানী মনে করে।

(২) وَاِنْ كَانَ كَثُرَ نَارُهٗ فَهُوَ حَرِيْصٌ.

'যদি বান্দার মধ্যে আগুনের উপাদান প্রবল থাকে, তবে সে লোভী হয়।'

লোভী ও আগুনের মধ্যে কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে। লোভীও তা-ই চায়, যা আগুন চায়। আগুন চায় সব কিছুকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে অর্থাৎ খেয়ে ফেলবে। এমনিভাবে লোভী বান্দার পেটও কখনও ভরে না। তারও মনে চায়, অন্যের কাছেও যা আছে, তা আমার হয়ে যাক।

(৩) وَاِنْ كَثُرَ طِيْنُهٗ فَهُوَ مُتَوَاضِعٌ

'যদি মাটির উপাদান প্রবল হয়, তাহলে সে বিনয়ী হয়।'

এমন স্বভাবের লোক অন্যের সামনে নত হয়ে চলে। নিজেকে নিজে লুকিয়ে রাখে। জমিনের বিনয় সবচেয়ে বেশি। কেননা, আমরা সকলে

---

১. সূরা ত্বোয়াহা : আয়াত ৭৬

সবসময় জমিনকে পদতলে পিষ্ট করি। কিন্তু জমিন এত ভালো যে, তারপরও সে আমাদের ফল-মূল উপহার দেয়। যেমনিভাবে মা বাচ্চাকে লালন-পালন করে, তেমনি জমিনও মায়ের মতো মানুষের সঙ্গে নম্র ও মায়া-মমতার আচরণ করে।

আল্লাহপাকের কাছে বিনয়ের দাম ও মূল্য এত বেশি যে, আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

'যেব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হবে, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।'

(٤) وَاِنْ كَثُرَ رِيْحُهُ فَهُوَ مُتَكَبِّرٌ

'আর যার মধ্যে বাতাসের উপাদান প্রবল হয়, সে দেমাগী হয়।'

দেমাগী লোক বাতাসে উড়তে থাকে। তার পা যেন মাটিতে লাগে না। ফুটবলের মতো লাফিয়ে বেড়ায়। ফুটবলে হাওয়া বেশি দিলে বেশি লাফায়। এমনিভাবে সামান্য-সামান্য কারণেই দেমাগী ব্যক্তি তার গর্ব-অহংকার প্রকাশ করা শুরু করে। এমনিতে সে সাধারণভাবেই থাকে; কিন্তু কেউ যদি তাকে টার্গেট করে কিছু বলে, অমনি তার স্বরূপ জাহির হয়ে যায়। নোংরা মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মনে যা আসে তা-ই বলতে থাকে এবং গালি-গালাজ শুরু করে। তখন তাকে মানুষ বলে মনে হয় না; বরং জানোয়ার মনে হয়।

যেব্যক্তি তার জীবনের ব্যালেন্স (ভারসাম্য) ঠিক রাখতে চায়, তার উচিৎ হলো কোনো আত্মিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। কারণ, চার উপাদানের মধ্যে কম-বেশি হলে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক ও আত্মিক ব্যাধি জন্ম নেয়।

বাতেনি রোগ-বালাই ও নফ্‌স

সমস্ত বাতেনি রোগের সম্পর্কে নফসের সঙ্গে। এর প্রমাণ কুরআন দ্বারা মিলে। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ–

(১) কামনা-বাসনার সম্পর্ক নফসের সঙ্গে। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেন–

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ.

'জান্নাতে তোমাদের জন্য আছে এমন সব কিছু, যা তোমাদের অন্তর চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে এমন সব কিছু, যার ফরমায়েশ তোমরা করবে।'[১]

(২) কুপ্রবৃত্তিও মানুষের নফসের মধ্যে জন্মলাভ করে। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন–

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى

'এবং নফ্সকে কুপ্রবৃত্তি হতে বিরত রাখত।'[২]

(৩) নির্বুদ্ধিতার সম্পর্ক মানুষের নফসের সঙ্গে। আল্লাহ বলেন–

اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ

'তবে যেব্যক্তি নিজেকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে।'[৩]

(৪) কৃপণতার সম্পর্কও মানুষের নফসের সঙ্গে। আল্লাহ বলেন–

وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ

'মানুষের অন্তরে (কিছু-না-কিছু) কৃপণতা তো নিহিত রাখাই হয়েছে।'[৪]

(৫) হিংসার সম্পর্কও মানুষের নফসের সঙ্গে। কুরআনে আল্লাহ বলেন–

حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ

'তাদের অন্তরের হিংসাবশত...।'[৫]

(৬) অহংকারের সম্পর্কও নফসের সঙ্গে। কুরআনে আল্লাহ বলেন–

لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ

'বস্তুত তারা মনে-মনে নিজেদের অনেক বড় মনে করে।'[৬]

চিন্তা করুন, এখানে সমস্ত বাতেনি রোগের সাথে نفس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, قلب শব্দ নয়। এ থেকে জানা যায়, এসব বাতেনি রোগ-ব্যাধির সম্পর্ক মানুষের নফসের সঙ্গে।

---

১. সূরা হা-মীম-সাজদা : আয়াত ৩১
২. সূরা নাযি'আত : আয়াত ৪০
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ১৩০
৪. সূরা নিসা : আয়াত ১২৮
৫. সূরা বাকারা : আয়াত ১০৯
৬. সূরা ফুরকান : আয়াত ২১

রূহানী উন্নতি ও অবনতি

একথা স্মরণযোগ্য যে, যে বস্তুর মধ্যে নফসের জীবন, তার মধ্যে রয়েছে দিলের মরণ। আর যে বস্তুর মধ্যে দিলের জীবন, তার মধ্যে রয়েছে নফসের মরণ। অর্থাৎ যার কারণে নফসের উপর চোট লাগে, তাতে রূহের উন্নতি হয় আর যে জিনিসে নফ্স মজা পায়, তাতে রূহের অবনতি হয়। এ কারণে যেব্যক্তি স্বীয় নফসের পূজা করে এবং নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে, সে বাতেনীভাবে মনুষ্যত্বের স্তর হতে নেমে অধঃপতিত হতে-হতে কখনো জানোয়ারের সমপর্যায় হয়ে যায়। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের। আমরা রূহানী উন্নতি চাই, না রূহানী অবনতি চাই?

অসুস্থ দিলের আলামত

মানুষ কীভাবে বুঝবে, তার দিল অসুস্থ? এ ব্যাপারে হাফেয ইবনুল কায়্যেম (রহ.) কিছু আলামত তুলে ধরেছেন। চারটি আলামত নিম্নরূপ–

প্রথম আলামত : প্রথম আলামত হলো, যখন মানুষের মন স্থায়ী বস্তুর উপর অস্থায়ী বস্তুকে প্রাধান্য দিবে, তখন বুঝবে, তার অন্তর অসুস্থ। যেমন– দুনিয়া খুব ভালো লাগে; কিন্তু আখেরাতে ঘর বানানোর ফিকির নেই। দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মানের প্রতি আগ্রহী থাকে; কিন্তু অন্তরে আখেরাতের অসম্মান-সম্মানের ফিকির নেই। দুনিয়াতে আরাম ও শান্তি চায়, কিন্তু আখেরাতের আযাব হতে নিষ্কৃতির কোনো চিন্তা নেই।

দ্বিতীয় আলামত : দ্বিতীয় আলামত হলো, যখন মানুষের মন কান্নাকাটি ছেড়ে দেয়, তখন বুঝবে, তার অন্তর কঠোর হয়ে গেছে। কখনো-কখনো মানুষের চোখ কাঁদে আর কখনও কাঁদে তার দিল। চোখের কান্নার তুলনায় দিলের কান্নার দাম বেশি। এটা জরুরি নয় যে, চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লেই কেবল কাঁদা বলা হবে; বরং আল্লাহর কতক বান্দা এমনও হয় যে, তাদের দিল কেঁদে-কেঁদে অস্থির হয়ে যায়; কিন্তু তাদের চোখ থেকে এক ফোঁটাও পানি বের হয় না। তাদের এই 'দিলী কান্না' আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় এবং তাদের তাওবার জন্য কবুলিয়াতের দরজা খুলে যায়। অতএব, দিল ও চোখের মধ্য হতে একটি-না-একটির অবশ্যই কাঁদা চাই। অনেকের তো উভয়টিই কাঁদে। চোখও কাঁদে, দিলও কাঁদে।

তৃতীয় আলামত : তৃতীয় আলামত হলো, মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মন ব্যস্ত হয়; কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা একবারও মনে পড়ে না। এমন হলে বুঝতে হবে, আমার দিল মৃত। মানুষের পরস্পরের সঙ্গে এমন

সম্পর্ক হয় যে, তাদের অন্তরে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আশা ও আগ্রহ থাকে। কখনও মানুষ বিষণ্ন হয়ে একান্তজনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুণে। কিন্তু আল্লাহর সঙ্গেও যে একদিন মিলতে হবে এ ব্যাপারে মন সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে।

চতুর্থ আলামত : চতুর্থ আলামত হলো, মন মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা ও কথাবার্তায় চাঙ্গা ও খুশি হয়; কিন্তু আল্লাহর কথা স্মরণ পড়লে মন ঘাবড়ে যায়। এমনটি হলে বুঝতে হবে, মন মরে গেছে। আল্লাহর স্মরণে ঘাবড়ানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যখন মানুষের অন্তর তাসবীহ পাঠ এবং মুরাকাবা করতে ইতস্তত বোধ করে, জায়নামাযে বসা তার কাছে বোঝা মনে হয়। এই আলামতও কতক মানুষের মাঝে পাওয়া যায়।

একটি সাধারণ মুলনীতি হলো, আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক বুঝতে হলে জায়নামাযে তার অবস্থান দেখতে হবে। আল্লাহমুখী বান্দা জায়নামাযে এমন প্রশান্তির সঙ্গে বসে, যেমন মা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে প্রশান্তভাবে বসে। পক্ষান্তরে যার অন্তর রোগাক্রান্ত, তার জন্য জায়নামাযে বসা বড়ই কষ্টকর ও বিব্রতকর হয়। সে সালাম ফিরিয়েই মসজিদ ছেড়ে দ্রুত পালায়। অনেকের অবস্থা এমনও হয় যে, তাদের মন মসজিদে যেতে মোটেও চায় না। মসজিদের মার্কেটে দোকানদারি করেও জামাতের সঙ্গে মসজিদে নামায পড়ে না। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রতিদিন মোরাকাবা করেন? জবাবে বলে, সামান্য কিছু করি, পাঁচ মিনিট করি। অথবা বলে, আমার সময় হয় না। এটা এমনই যেমন কেউ বলে, আমি খাওয়ার সময় পাই না। যেব্যক্তি খাওয়ার সময় পায় না, সে কতদিন জীবিত থাকবে? এমনিভাবে যার মোরাকাবা করার সময় হয় না, তারও অতি দ্রুত রূহানী মৃত্যু ঘটে।

আমাদের মাশায়েখগণ মোরাকাবার জন্য সময় খুঁজতেন এবং এভাবে দু'আ করতেন যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার স্মরণে একান্তভাবে বসার তাওফীক দাও।

হযরত মাওলানা হুসাইন আলী (রহ.) সম্পর্কে শুনেছি, তার খানকায় যখন ইশার পরে মোরাকাবার মজলিস বসত, তখন তাতে সমাপ্তি দু'আ হতো না। একথার মানে কী? মানে হলো, হযরতের পক্ষ হতে অনুমতি ছিল, মোরাকাবা করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিংবা বেশি ঘুম এলে পরে সে উঠে চলে যেতে পারে। এতে কেউ আধা ঘণ্টা পরে, কেউ এক ঘণ্টা পরে এবং কেউ দুঘণ্টা পরে চলে যেত। এভাবে মানুষ পর্যায়ক্রমে চলে যেত। এভাবে যেতে-যেতে যখন সবাই চলে যেত, তখন হযরত উঠে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যেতেন। এভাবে সেখানে সমাপ্তি দু'আ আর হতো না।

جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن

بیٹھے رہیں تصور جاناں کئے ہوئے

অন্তর খুঁজে ফেরে রাত-দিন সেই মোক্ষম সময়,
মন ভরে দেখব তোমায় তাই রয়েছি অপেক্ষায়।

নফ্‌স ও শয়তানের চাল

মানুষ দুই শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। এক. নফ্‌স, দুই. শয়তান। শয়তান বাইরের শত্রু আর নফ্‌স ভেতরের শত্রু। শয়তান বিজ্ঞ শত্রু আর নফ্‌স অজ্ঞ ও জেদী শত্রু। এ কারণে আল্লাহপাক কুরআন শরীফে শয়তানের চালকে 'দুর্বল' এবং নফসের চালকে 'মারাত্মক' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি শয়তানের চাল সম্পর্কে বলেন–

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا

'নিশ্চয় শয়তানের চাল দুর্বল।'[১]

পক্ষান্তরে নফসের চাল সম্পর্কে বলেন–

اِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ

'নিঃসন্দেহে তোমাদের চাল বড়ই মারাত্মক।'[২]

প্রথম আয়াতে শয়তানের চালকে দুর্বল এবং দ্বিতীয় আয়াতে নফসের চালকে মারাত্মক অভিহিত করা হয়েছে। এর থেকে জানা যায়, মানুষের নফসের চাল অতি মারাত্মক। এই পার্থক্যের কারণ হলো, শয়তান মানুষকে যেকোনো গুনাহ করায়। কিন্তু মানুষের নফ্‌স মানুষকে এক বিশেষ ধরনের গুনাহ করায়। বুযুর্গানে কেরাম দুই চালের পার্থক্য এভাবে করেন যে, যখন মানুষের দিলে গুনাহের ইচ্ছা জাগে এবং মানুষ স্বীয় মনোভাবকে অন্য দিকে ফেরায়; কিন্তু তারপরও ঘুরে-ফিরে ওই গুনাহের চাহিদা ও দাবি অব্যাহত থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, এই চাহিদা মানুষের নফসের পক্ষ হতে। পক্ষান্তরে মন ঘুরিয়ে নিলে যদি ঘুরে যায় এবং পূর্বের খেয়াল দূর হয়ে নতুন খেয়াল আসে; অর্থাৎ যদি এমন হয় যে, হয়ত এটা কর না হয় ওটা কর- তাহলে বুঝতে হবে এটা শয়তানের পক্ষ হতে।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৭৬
২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৮

সারকথা হলো, শয়তানের চেষ্টা থাকে, বান্দাকে যেকোনো গুনাহে লিপ্ত করাতে। কিন্তু নফসের চেষ্টা থাকে নির্দিষ্ট গুনাহে ডুবিয়ে রাখতে। তাই বান্দা খেয়াল পরিবর্তন করলেও নফ্স বারবার গুনাহের নির্দিষ্ট প্রসঙ্গটি বান্দার সামনে এনে তুলে ধরে বান্দাকে একই গুনাহে নিপতিত করতে চেষ্টা করে।

ভালো ও মন্দ কামনা

আল্লাহ তা'আলা মানুষের নফ্সকে বিভিন্ন চাহিদা ও লালসা দ্বারা ভরে দিয়েছেন। চাই তা ভালো হোক বা মন্দ। যেমন ভালো চাহিদা হলো, আমি তাহাজ্জুদগুযার হব। হাফেযে কুরআন হব। আল্লাহর ওলী হব। মাকবুল দু'আওয়ালা হব। এগুলোও চাহিদা; তবে ভালো চাহিদা। আরেক প্রকার মন্দ চাহিদাও আছে। যেমন– আমার হাতে সকল কর্তৃত্ব এসে যাক। মানুষের মাঝে আমার সুনাম হোক। সকলে আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোক। আমার শাসনের অধীনে সবাই চলে আসুক। এগুলোকে বলে মন্দ চাহিদা। সুতরাং নফ্স থেকে মন্দ চাহিদার বন্যা বয়ে যায় এবং গুনাহের বীজ এর থেকেই চারা গজায়।

কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পুরো খামিরে

পানিতে আটা গোলার সময় যেমন তাতে লবণ মিলিয়ে দেওয়া হয় আর সেই লবণ গলে পুরো আটার মধ্যে মিশে যায়, তেমনিভাবে যখন আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা মানুষের মাটি ছেনে, তখন কুপ্রবৃত্তিকে সে মাটির মধ্যে মিলিয়ে দেয়। বস্তুত এ কারণেই মানুষের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি তার শিরা-উপশিরায় থাকে। তবে মনে রাখতে হবে, লবণের কারণেই রুটি মজাদার লাগে। সুতরাং যদি নফসের উপর মেহনত করা হয়, তাহলে তখন এই নফসের সুবাদেই মানুষ উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করতে পারে। যদি নফ্স বিগড়ে যায়, তবে তা মানুষকে জানোয়ার বানিয়ে দেয়। আর নফ্স যদি পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তা মানুষকে ফেরেশতার চেয়েও উপরে তুলে দেয়।

অনাদি অবাধ্যতায় নফসের ভূমিকা

পৃথিবীর সূচনা হতে যত অবাধ্যতা হয়েছে, হয়ত তার সবই একলা নফ্সই করেছে অথবা অন্যের সঙ্গে শরীক হয়ে করিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার প্রথম অবাধ্যতার ঘটনা ঘটেছে আরশের উপর। সেই অবাধ্যতা করেছে শয়তান। আল্লাহপাক তাকে নির্দেশ দেন–

اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ

'আদমকে সেজদা করো।'

এই নির্দেশ শুনে সমস্ত ফেরেশতা সেজদায় চলে যায়। কিন্তু শয়তান অস্বীকার করে। অহংকার করে এবং এর পরিণতিতে সে কাফেরদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়।

প্রশ্ন হলো, শয়তান এমনটি করল কেন? সে সময় তো কোনো শয়তান ছিল না। সে কাকে দূষবে, সে আমাকে গুনাহ করিয়েছে? সে কি একথা বলবে যে, আমাকে অমুক শয়তান এই অবাধ্যতা করিয়েছে? আসল কথা হলো, শয়তানকেও এমন জঘন্যভাবে ফাঁসিয়েছিল তার নফ্স। শয়তানও শয়তানি করেছে নফসের চক্রান্তে পড়েই। তার নফ্সই তাকে খোদার অবাধ্যতা করতে প্ররোচিত করেছিল। এ কারণে বলা হয়, নফ্স মহাবদমাশ। কেননা, সে ফেরেশতাদের দলপতিকেও ইবলিস এবং অভিশপ্ত বানিয়ে দিয়েছে। কোনো-কোনো কিতাবে লেখা আছে, শয়তান ৮০ হাজার বছর আল্লাহর ইবাদাত করেছে; কিন্তু নফসের চক্রান্তে ফেঁসে এক মুহূর্তেই সকল অর্জন বিসর্জন চলে গেছে। সে আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করলে আল্লাহ তার ব্যাপারে দুটি ঘোষণা দেন। যথা–

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ.

'তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা; তুই বিতাড়িত।'

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ.

'তোর উপর কেয়ামত পর্যন্ত আমার অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে।'[১]

৮০ হাজার বছর ধরে ইবাদাত করে শয়তান হিরো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নফসের প্ররোচনায় পড়ে নির্দেশ লংঘন করে এক মুহূর্তেই জিরো হয়ে গেল। ইবাদাত করে যত উপরে উঠেছিল নফসের কথা শুনে তত নিচে নেমে গেল। প্রায় লক্ষ বছর রহমতের কাজ করার পর তারই নফ্স তাকে কেয়ামত পর্যন্ত অভিশাপের পাত্র বানিয়ে দিল।

আল্লাহপাকের দ্বিতীয় অবাধ্যতা হয় জান্নাতে। শয়তান আম্মা হাওয়া (আ.)কে কৌশলে একথা বিশ্বাস করাতে প্ররোচিত করে যে, যদি আপনি এই বৃক্ষের ফল খান, তবে আপনি চিরকাল জান্নাতে থাকতে পারবেন। বাবা আদম (আ.)কেও শয়তান এভাবে বিভ্রান্ত করেছিল। পবিত্র কুরআনে আছে–

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.

---

১. সূরা হিজর : আয়াত ৩৪, ৩৫

'শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল, যাতে তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন রাখা হয়েছিল, তাদের পরস্পরের সামনে প্রকাশ করতে পারে। সে বলতে লাগল, তোমাদের প্রতিপালক অন্য কোনো কারণে নয়; বরং কেবল এ কারণেই এই গাছ থেকে তোমাদের বারণ করেছিলেন, পাছে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী জীবন লাভ করো।'[১]

অপর আয়াতে এসেছে–

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ.

'তারপর শয়তান তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, হে আদম! তোমাকে কি এমন একটা গাছের সন্ধান দেব, যা দ্বারা অনন্ত জীবন ও এমন রাজত্ব লাভ হয়, যা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।'[২]

এক আয়াতে এসেছে, শয়তান তাদের এ ব্যাপারে কসম দিয়েছিল–

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.

'সে তাদের সামনে কসম করে বলল, বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের কল্যাণকামীদের একজন।'[৩]

শয়তান বারবার এভাবে কসম করে বলার একপর্যায়ে আম্মা হাওয়া (আ.)-এর মনে জান্নাতে স্থায়ীভাবে থাকার লোভ জাগ্রত হয়। এর থেকে জানা গেল, শয়তান আম্মা হাওয়া (আ.)-এর অন্তরে বৃক্ষের পাতা খাওয়ার চাহিদা সৃষ্টি করার ব্যাপারে সফল হয়ে যায়। ফলে আম্মা নিজের জন্য দুটি পাতা ছিঁড়েন এবং হযরত আদম (আ.)-এর জন্য একটি পাতা ছিঁড়েন। এটিই সেই রহস্যের সূত্র, যার কারণে মীরাস উল্টো হয়। আল্লাহ ছেলেকে ডাবল দেওয়ার বিধান রেখেছেন এবং মেয়ের জন্য ছেলের অর্ধেক।

যাহোক, ইবলিসের কথায় আম্মার লোভ পয়দা হওয়ায় তার থেকে ভুল হয়ে যায় এবং তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। এখানে খেয়াল করুন, তার ভুলের কারণ কী হয়? নফসের চাহিদার কারণেই তিনি ভুল করে বসেন।

আল্লাহপাকের তৃতীয় অবাধ্যতা হয় জমিনে। এটাই ছিলো পৃথিবীর মাটিতে সর্বপ্রথম অবাধ্যতা।

---

১. সূরা আরাফ : আয়াত ২০

২. সূরা তোয়াহা : আয়াত ১২০

৩. সূরা আরাফ : আয়াত ২১

হযরত আদম (আ.)-এর দুই পুত্র ছিল। হাবীল ও কাবীল। হাবীলের স্ত্রী ছিল সুন্দরী, রূপসী। কাবীলের চোখ তার উপর পড়লে সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। ফলে কাবীলের মনে আগ্রহ জাগে, সে তাকে বিবাহ করবে। মনের এই চাহিদায় প্ররোচিত হয়ে কাবীল তার সহোদর ভাই হাবীলকে বলল, আমি তোকে খুন করব। একপর্যায়ে কাবীল তার মনের লালসা পূরণ করে হাবীলকে হত্যা করল। কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে যত খুনের ঘটনা ঘটবে, সবগুলোর দায়ভার ও পাপভার কাবীলের উপর বর্তাবে। নবীর পুত্র হলেও তার নফ্স তাকে আল্লাহর জমিনে সর্বপ্রথম আল্লাহর অবাধ্য বানিয়ে দেয়।

স্বাদের পাগল

আমাদের বুযুর্গগণ বলেন–

اَلنَّفْسُ كَالطِّفْلِ

'নফ্স হলো শিশুর মতো।'

অর্থাৎ শিশুর মন যখন যা চায় তা পেতে সে জিদ ধরে। সে এর জন্য কাঁদে এবং হাত-পা ছুড়ে ফেরে। এসব করে সে এটাই চায় যে, তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাক। যদি শিশুর অন্তরে এই খেয়াল জাগে, এই খেলনা নিব, তাহলে সেটি পাওয়া পর্যন্ত জিদ করতেই থাকে। বাচ্চারা হয়ও আদুরে, তাই জিদও ধরে খুব। এভাবে মানুষ বাচ্চার জিদ পূরণে হিমশিম খেয়ে যায়। অনেক সময় মানুষ বাচ্চার ইচ্ছা পূরণ করে। কিন্তু তার সকল সাধ পূরণ করা যায় না।

এক বাদশার বিব্রতবোধ করা

এক বাদশার কোনো ছেলে ছিল না। তিনি তার উজিরকে বললেন, আপনার ছেলেটাকে নিয়ে আসবেন। পরদিন উজির তার ছেলেকে নিয়ে আসেন। বাদশাহ তাকে দেখলেন এবং আদর করতে থাকেন। বাদশা বললেন, এই বাচ্চাকে কখনো কাঁদতে দিবেন না। মন্ত্রী বললেন, সম্মানিত বাদশা! তার সব আব্দার পূরণ করা সম্ভব নয়। বাদশা বললেন, কেন সম্ভব নয়? আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি, বাচ্চা যা চায়, তা-ই যেন দেওয়া হয়। মন্ত্রী বললেন, ঠিক আছে, তা-ই হবে; আপনি বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কী চায়? বাদশা বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা! তুমি কী চাও? বাচ্চা বলল, হাতি চাই। বাদশা বললেন, এটা তো খুব সহজ আব্দার। তারপর তিনি

একলোককে নির্দেশ দিলেন হাতি এনে বাচ্চাকে দেখানোর জন্য। লোকটি হাতি নিয়ে এল। বাচ্চা হাতি নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করে তারপর কাঁদতে শুরু করল। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁদছ কেন? বাচ্চা বলল, একটা সূঁচ চাই। বাদশা বললেন, এটা সাধারণ কথা। তিনি একটা সূঁচ আনিয়ে ছেলেকে দিলেন। বাচ্চা সূঁচ নিয়ে খেলা করল। খানিক পরে আবার কান্না শুরু করল। বাদশা জানতে চাইলেন, কী হলো; আবার কান্না কেন? বাচ্চা বলল, সূঁচের ছিদ্র দিয়ে এই হাতিটা ঢুকিয়ে দিন।

যেভাবে বাচ্চার সমস্ত কথা পূরণ করা যায় না, তেমনি নফসেরও সমস্ত চাহিদা পূরণীয় নয়। তাই এর চিকিৎসা দরকার, যাতে সে অসম্ভব দাবি না করে এবং তার ইসলাহ হয়ে যায়।

সবচেয়ে দুর্দান্ত ও ভয়ঙ্কর শত্রু

শয়তান আমাদের বাইরের শত্রু। সে সর্বদা আমাদের পিছে লেগে আছে। তার না খাওয়া আছে, না ঘুম-বিশ্রাম আছে। আমরা তার কথা ভুলে যাই, কিন্তু সে আমাদের কথা ভোলে না। তার প্রজেক্ট একটিই। আর তা হলো মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করা। কখনও শয়তানের সঙ্গে তার দোসর হিসেবে তার চেলারাও থাকে। সুতরাং কেমন যেন মানুষের পিছনে একটি টিম কাজ করতে থাকে। আর ভিতর থেকে নফ্স তাদের খবরাখবর আদান-প্রদান করে। তাহলে কেমন যেন নফসের দায়িত্ব হলো গুপ্তচরবৃত্তি করা। এবার বলুন, এই সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা কত কঠিন ব্যাপার!

যখন এটা প্রমাণিত হলো, বাইরের শত্রু শয়তানের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চলছে; কিন্তু তার গুপ্তচর আমাদের ভেতরেই লুকিয়ে আছে, তখন প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই একথা বলবেন যে, ঘরের শত্রু বিভীষণ; তাকেই আগে খুঁজে গ্রেফতার করা হোক, যাতে সে বাইরের শত্রুকে কোনো স্পর্শকাতর তথ্য পাচার করতে না পারে। যখন নফ্স বন্দী হওয়ায় কোনো খবর দিতে পারবে না, তখন শয়তানের মোকাবেলা করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

এজন্য আমাদের বুযুর্গগণ বলেছেন, শয়তানের পিছনে দৌড়ে কোনো লাভ নেই; যখন নফ্স তার সঙ্গেই আছে। যদি আমরা নফ্সকে ঠিক করতে পারি, তাহলে সে শয়তানের মদদ ছেড়ে দিবে। তখন আমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব নফ্স ও শয়তানের মধ্যে মানুষের জন্য বেশি মারাত্মক হলো নফ্স। এ কারণে নফসের ব্যাপারে অধিক সতর্কতার

প্রয়োজন। ইমাম গাযযালি (রহ.) বলেন, যখন মানুষের নফ্স আল্লাহর স্মরণ হতে অনীহা ভাব দেখায় পক্ষান্তরে মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রসন্ন বোধ করে, তাহলে বুঝতে হবে, তার নফ্স অসুস্থ; দ্রুত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মানুষের নফ্স এত ভয়ঙ্কর কেন?

মানুষের নফ্স ভয়ঙ্কর হওয়ার কারণ ২টি।

প্রথম কারণ হলো, নফ্স হলো ঘরের চোর। চোর ঘরের মধ্যে থাকলে সে বাইরের চোরের তুলনায় ভয়ঙ্করই হয়ে থাকে। সে চান্সে থাকে। যখনই সুযোগ পাবে, ক্ষতি করবে। এজন্যই বলা হয় 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'।

দ্বিতীয় কারণ হলো, নফ্স মানুষের প্রিয় শত্রু। অর্থাৎ নফ্স এমন এক শত্রু, যার সঙ্গে মানুষের হৃদ্যতা থাকে। যখন কেউ তার শত্রুকে মহব্বত করে, তখন মানুষ অতি সহজ আক্রমণের শিকার হয়। বিস্ময়ের কথা হলো, যে প্রিয়ভাজন হয়, তার দোষ চোখে পড়ে না। কারণ, মহব্বত মানেই হলো প্রেমাস্পদের দোষ চোখে না পড়া এবং তার সব কিছু ভালো লাগা।

যেহেতু নফ্স হলো ঘরের লোক এবং মানুষের প্রিয় শত্রু, তাই শয়তানের তুলনায় সে বেশি মারাত্মক। এ কারণে আমাদের শায়েখগণ বলেছেন–

نہنگ واژدہا وشیر نرمارا تو کیا مارا

بڑے موذی کومارا نفس امارہ کو گرمارا

কুমির, অজগর, সিংহ মারা আসল মারা নয়,

বড় শত্রু মারা হবে নফ্সকে যদি মারা যায়।

নফ্সকে মারার অর্থ এই নয় যে, নফ্সকে নিঃশেষ করে দেওয়া হবে। এমন তো কখনো হবে না; বরং নফ্সকে মারার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরীয়তের লাগাম পরিয়ে তাকে কাবুতে রাখা। একেই বলে আত্মনিয়ন্ত্রণ।

বিষয়টি কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। কেননা, একদিকে নফসের মধ্যে এতটুকু শক্তি থাকা জরুরি, যাতে সে নেক কাজ করতে পারে, অপরদিকে নফ্সকেই এত দুর্বল বানিয়ে রাখতে হবে যে, যেন সে বিলকুল গুনাহ না করে। এই ব্যালেন্স ঠিক রাখার নামই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি। এটি বড়ই কঠিন কাজ। নফসের শক্তিও দরকার, যাতে সে নেক কাজ করতে পারে। কিন্তু যদি সামান্যও শক্তি পেয়ে যায়, তাহলে গুনাহ করে বসবে। তাই জরুরি হলো, তাকে এভাবে দাবিয়েও রাখতে হবে, যেন গুনাহ না করতে পারে।

নফ্স কন্ট্রোল করার উপায়

আমাদের বুযুর্গানে কেরাম নফ্সকে কন্ট্রোল করার ৩টি উপায় বলেছেন।

প্রথম উপায় : নফ্স কন্ট্রোল ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রথম উপায় হলো কুপ্রবৃত্তি হতে তাকে বিরত রাখা। যুবকরা সাধারণত বোঝে, 'কুপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি' মানে শুধু যৌনশাসন। কিন্তু ব্যাপারটি এমন নয়। আরবী ভাষায় এর প্রতিশব্দ হলো شهوت (শাহওয়াত)। এটি اشتهاء থেকে নির্গত। আর اشتهاء তথা প্রবৃত্তি বা মনোচাহিদা যেকোনো বস্তু বা বিষয়ের হতে পারে। যেমন– কতক লোক খানাপিনার প্রতি বেশি আসক্ত হয়। তাদের মন সর্বক্ষণ চায়, এটা খাই, ওটা খাই। এটা বানাই, ওটা বানাই। এমনিভাবে কিছু লোকের মাঝে পোশাকের আসক্তি বেশিমাত্রায় থাকে। তারা চায় সর্বক্ষণ সেজে-গুজে থাকব, দামী গাড়িতে চড়ব, নফসের চাহিদামতো ঘুরব। আর কতক লোকের মাঝে রিপুর দাবি পূরণের প্রচণ্ড চাপ থাকে।

যাহোক, প্রথম কাজ হলো কুপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত করা। অর্থাৎ মানুষ যখন অনুভব করবে, আমার অমুক বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বেশি বোধ হচ্ছে এবং তা শরীয়তের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে, তাহলে ওই আকর্ষণের গলায় লাগাম পরিয়ে দিবে। আমরা যতই প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করব, নফ্স ততই মোটা হয়ে যাবে। এর বিপরীতে প্রবৃত্তি যত নিয়ন্ত্রণ করব, নফ্স তত দুর্বল হয়ে যাবে। এর উদাহরণ এমন যে, যে ঘোড়া কাবুতে আসে না, মানুষ তার আহার কমিয়ে দেয়। এতে কয়েকদিন যাবত ক্ষুধার্ত থাকলে ঘোড়া ক্রমেই দুর্বল হয়ে যায়। ফলে তখন সে আরোহীকে তার পিঠে বসতে দেয়। ঠিক এমনিভাবে নফসের ঘোড়ায় চড়ায় জন্য জরুরি হলো তার প্রবৃত্তির আহার কমিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয় উপায় : নফ্স কন্ট্রোলের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, নফসের ঘাড়ে অধিক ইবাদাতের ভার চাপিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ যার নফ্স বাগে আসতে চায় না, সে নিজেকে নেক কাজে বেশি-বেশি নিয়োজিত করবে। কেননা, জনশ্রুতি আছে–

An idle man's brain is devil's workshop.

'অলস ব্যক্তির মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।'

তাই নফ্সকে অবসর দেওয়া যাবে না। কোনো গাধা বশে না এলে প্রথমে তার দানা-পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে সে বশে চলে আসে। তারপর তার পিঠে বোঝা চাপানো হয়। সে বোঝা নিয়ে দিব্যি চলতে থাকে।

এমনিভাবে যখন নফসের ঘাড়ে ইবাদাতের বোঝা তুলে দেওয়া হবে, তখন সে আপনা-আপনিই দীনের পথের পথিক হবে। আর তা এভাবে যে–

* আগে থেকে ফরজ নামায পড়লে এখন তাহাজ্জুদ পড়তে শুরু করবে।
* ইশরাক পড়া শুরু করবে।
* চাশতের নামায পড়বে।
* আওয়াবীন নামায পড়বে।
* আগে কুরআন এক পারা পড়লে এখন থেকে দুই পারা পড়বে।
* তাসবীহ পড়ার সময় বাড়িয়ে দিবে।
* মোরাকাবা করার সময় বৃদ্ধি করবে।

তৃতীয় উপায় : নফ্স কন্ট্রোলের তৃতীয় পদ্ধতি হলো, আল্লাহপাকের কাছে বেশি-বেশি দু'আ করতে থাকা। কেননা, নফসের ইসলাহ আল্লাহর মর্জি ও রহমত ছাড়া সম্ভব নয়। এমনটিই বলেছেন পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক। ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'আমি এ দাবি করি না যে, আমার নফ্স সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র। বস্তুত নফ্স সর্বদা মন্দ কাজেরই আদেশ করে। অবশ্য আমার রব যদি দয়া করেন সেটা ভিন্ন কথা (সে অবস্থায় নফসের কোনো চাতুর্য চলে না)। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১]

এ আয়াতে مَا رَحِمَ رَبِّيْ বাক্যটি মানবতার প্রতি আল্লাহপাকের এক বিরাট বার্তা যে, যার উপর আল্লাহর রহম হবে, তার নফ্স কাবুতে চলে আসবে।

অতএব, জানা গেল, প্রথম পদক্ষেপ দুটি অবলম্বন করার পরে মানুষ হাত উঠাবে এবং এভাবে দু'আ করবে যে–

'হে আমার মাওলা! আমার সাধ্যে যতটুকু ছিল আমি তা করতে চেষ্টা করেছি। এবার আপনি দয়া করুন এবং আমার নফ্সকে 'নফসে মুতমায়িন্না' – পাপের চাহিদামুক্ত অন্তর – বানিয়ে দিন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অপূর্ব বিনয় ও আত্মরক্ষা

হযরত ইউসুফ (আ.) কোন পর্যায়ের বিনয়ী ছিলেন এবং কেমন ছিল তাঁর আবদিয়াত বা আল্লাহর প্রতি দাসত্ব-চেতনার মাত্রা, তা লক্ষ্য করুন। খোদ

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৫৩

অপবাদদাতা নারীদের স্বীকারোক্তি দ্বারা যখন তার নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে গেছে, তখনও তিনি বিন্দুমাত্র নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেননি; বরং কেমন বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন, আমি যে এই কঠিন নারীফাঁদ থেকে বেচেঁ গেছি এটি আমার কৃতিত্ব নয়। নফ্স তো আমারও আছে। আর নফ্স সর্বদা মন্দ কাজেরই উস্কানি দেয়। তারপরও নফসের আক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া একমাত্র আল্লাহরই দয়া। তিনি যাকে চান তাকে নফসের ছলনা থেকে রক্ষা করেন।'

অবশ্য অন্যান্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার এ দয়া ও রহমত কেবল সেই ব্যক্তির উপরই হয়, যে গুনাহ হতে আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালায় যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) চালিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট জানতেন, দরজা তালাবদ্ধ; কিন্তু তারপরও বসে থাকেননি। আত্মরক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তিনি দৌড় দিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। সেই সঙ্গে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে তাঁর আশ্রয়ও প্রার্থনা করেছিলেন।

হযরত থানবী (রহ.) ও ইসলাহে নফ্স

হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন, নফসের ইসলাহের জন্য তিন কাজ করা জরুরি। যথা–

প্রথম কাজ : ইসলাহের জন্য সর্বপ্রথম করণীয় হলো মুরশিদে কামেল তথা হক্কানী পীরের দরবারে থাকা। কেননা, তিনি জানেন, মানুষের নফ্সকে কীভাবে বাগে আনতে হয়। মানুষ নিজেকে শায়েখের কাছে এভাবে সমর্পণ করবে, যেভাবে মুর্দা গোসলদাতার হাতে থাকে। মুরীদ বলবে, হযরত! আপনি যা বলবেন, আমি তা মানতে প্রস্তুত। অথবা অন্ধ ব্যক্তি যেভাবে তার লাঠি অন্যের হাতে তুলে দিয়ে বলে, তুমি আমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দাও, এমনিভাবে মানুষ বাতেনিভাবে নিজেকে অন্ধ মনে করবে এবং তার লাঠি পীর সাহেবের হাতে তুলে দিবে। কেননা, পীর সাহেব এমন ব্যক্তিত্ব হন, যিনি স্বীয় জীবন-যৌবন আল্লাহর ইবাদাতে উৎসর্গ করেছেন। তিনি জানেন, পথের কোথায়-কোথায় গর্ত ও খাদ রয়েছে। ফলে তিনি সহজে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিবেন।

বহুবার পরীক্ষিত সত্য যে, যদি কেউ তার বন্ধুর বাড়িতে যেতে চায় এবং বন্ধু তাকে লোকেশন লিখে দেয়, তাহলে তাকে গন্তব্যে পৌঁছতে বহুবার থামতে হয় এবং স্থানে-স্থানে জিজ্ঞাসা করতে হয়। ঠিকানা স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও পথ না চেনার কারণে অনেক সময় হারিয়ে যেতে হয়। আর না হারালেও

গন্তব্যে পৌঁছতে বেশ বেগ পেতে হয়। অনেক সময় চিনে-চিনে যেতে-যেতে এত দেরি হয়ে যায় যে, অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়।

আর কখনো এমন হয় যে, আপনার সঙ্গে যদি কোনো গাইড থাকে, যে গন্তব্যস্থল চিনে, তাহলে তখন কোনো চিন্তা থাকে না। কাউকে জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন হয় না। দেরি হওয়ার ভয় থাকে না। গাইডের সাহায্যে আপনি অনায়াসে গন্তব্যে পৌঁছে যান।

খাঁটি পীর সাহেবও মুরীদের আখেরাতের রাস্তার এমন প্রত্যক্ষ গাইড হন। যেহেতু তিনি আল্লাহর মারেফাতের রাস্তা কোনো শায়েখে কামেলের খেদমতে থেকে পেরিয়ে এসেছেন এবং তিনি সে রাস্তার প্রতিটি স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চেনেন। তাই তিনি মুরীদকে উভয় শত্রু (নফ্স ও দুশমন) থেকে বাঁচিয়ে চলেন এবং তাকে মনযিলে মাকসুদে পৌঁছে দেন।

বিষয়টি কিছুলোকের বুঝে আসে না। তারা বলে, পীর-মুরশিদের কী প্রয়োজন? মনে রাখবেন, যেভাবে বই-পুস্তক থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তেমনি কুরআন-হাদীছ থাকলেও পীর-মুরশিদের প্রয়োজন রয়েছে। হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) সুন্দর বলেছেন–

ہر آں کارے کہ بے استاد باشد

یقین دانی کہ بے بنیاد باشد

'যে কাজই ওস্তাদবিহীন হয়,

মনে রাখবে তা ভিত্তিহীন হয়।'

এর আরেকটি উদাহরণ নিন। যে ছাত্র পরীক্ষা দেয়, সে উত্তরপত্রে তার ধারণায় যেটা একশ ভাগ ঠিক সেটাই লিখে। যদি তার কাছে সেটা ভুল মনে হত, তাহলে ভুল লিখতে যাবে কেন? সে তো পরীক্ষা দিয়ে ভালো নম্বর পেতে চায়। আর ভালো নম্বরের জন্য সঠিক উত্তরই কাম্য হয়। অতএব, প্রশ্নের উত্তর লিখে ছাত্র যখন পরীক্ষকের হাতে তার উত্তরপত্র তুলে দেয়, তখন তার ভাবনায় থাকে, এখানে যা কিছু লেখা হয়েছে শতভাগই নির্ভুল ও সঠিক। কিন্তু শিক্ষকের হাতে উত্তরপত্র যাওয়ার পরে শিক্ষক তাতে ভুল চিহ্নিত করতে শুরু করেন এবং বলেন, তুমি এটা ভুল লিখেছ, এখানে এই ভুল হয়েছে, এটা ঠিক হয়নি। ওস্তাদের যুক্তি শুনে ছাত্র তা অবলীলায় মেনেও নেয়। সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, বাস্তবিকই আমার এই এই ভুল হয়েছে।

ঠিক এমনিভাবে মানুষ যখন স্বীয় আমল দেখে, তখন তার আমল একশভাগ সঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু যখন সে শায়েখের কাছে যায়, তখন

শায়েখ তাকে জানান, মিয়া! তোমার এই আমলে আত্মশ্লাঘা ছিল। এতে অহংকার ছিল। এতে রিয়া ছিল। পরে মানুষ তা স্বীকারও করে যে, বাস্তবিকই আমার মাঝে এসব মন্দ ছিল।

বস্তুত এ কারণেই ডাক্তার অসুস্থ হলে তিনি নিজেই নিজের চিকিৎসা করেন না। বরং অন্য ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করান। কারণ, মানুষ নিজেই নিজের চিকিৎসা করলে সেখানে গড়বড় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে একজন মুরশিদের দরকার হয়, যিনি তাকে বোঝান। কেননা, নফ্স নিজের প্রত্যেক কাজকে সমর্থন ও সত্যায়ন করে। মানুষ উল্টা-পাল্টা করলেও নফ্স তাকে সঠিক প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা চালায়। কিন্তু শায়েখ তাকে শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক পরামর্শ দিবেন, তার হালাতের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং তার ভুল-ত্রুটি ধরতে থাকবেন, যার সুবাদে সে মারেফাতের সিঁড়ি অতিক্রম করতে থাকবে।

কতক লোক মনে করে, আমরা শুধু বরকত লাভের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেছি। এটা ঠিক নয়; বরং এই বাইয়াতের উদ্দেশ্য হলো, শায়েখ তাকে প্রশিক্ষণ দিবেন ও তার ইসলাহ করবেন। সুতরাং বাইয়াত করার অর্থ হলো মুরীদের তরবিয়ত ও ইসলাহের দায়িত্ব গ্রহণ করা। তাই মানুষ যদি শুধু বাইয়াত হয় এবং পরে কোনো যোগাযোগ না রাখে, নিজের হালাত শায়েখকে না জানায়, তার ইসলাহ কীভাবে হবে? তাই শায়েখের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। শায়েখের সামনে নিজেকে সঁপে দিতে হবে, যাতে তিনি ঠিকমত দিকনির্দেশনা দিয়ে গড়তে পারেন।

আজকালকার অবস্থা হলো, মুরীদরা শায়েখকে স্বপ্নের কথা শোনায়। তাও শোনায় ওই অংশ যেটুকু ভালো হয়। মন্দ অংশ প্রকাশ করে না। যদি রোগী ডাক্তার হতে নিজের রোগ গোপন রেখে এই ভেবে খুশি হয় যে, আমি ডাক্তারকে আমার মূল সমস্যা বুঝতেই দিইনি, তবে এতে ক্ষতি কার হবে? ক্ষতি রোগীরই হবে এবং সে অল্পদিনেই মারা যাবে। ডাক্তারের কোনোই ক্ষতি হবে না।

এ কারণে মুরীদের কর্তব্য হলো, নিজের সকল বৃত্তান্ত – চাই ভালো হোক বা মন্দ – স্বীয় শায়েখের সামনে হুবহু তুলে ধরতে হবে। আমার শায়েখ বলেছেন, মেয়ের কোনো ভুল হলে সে যেমন সবকিছু মায়ের কাছে খুলে বলে, ঠিক তেমনি মুরীদেরও কর্তব্য নিজের পুরো অবস্থা শায়েখকে জানাবে। এতে লাভ এই হবে যে, শায়েখ তাকে তার কর্তব্য সম্পর্কে জানাবেন। পাশাপাশি শায়েখের দু'আর বরকতে আল্লাহপাক তাকে হেফাযত করবেন।

এ কারণে শায়েখ ভুল-ত্রুটি ধরে দিলে তাতে মন খারাপ করা উচিৎ নয়। কেননা, তিনিও কখনো-কখনো এন্টিবায়োটিক প্রদান করেন– সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়। এ ছাড়া জ্বর নামে না।

আমাদের শায়েখ একথাও লিখেছেন যে, যদি কোনো অন্যায় ছাড়াও শায়েখ কাউকে চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে জুতা মারেন, তারপরও প্রকৃত মুরীদের কর্তব্য হলো ওই জুতা উঠিয়ে শায়েখের পায়ে পরিয়ে দেওয়া। এভাবে শায়েখের কাছে নিজেকে সোপর্দ করুন। দেখবেন ইসলাহ হয় কিনা। পূর্বে যত বড়-বড় বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন, সকলেই স্বীয় শায়েখের সোহবতে থেকে দীক্ষা লাভ করেছেন।

দীক্ষার সূচনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীক্ষা দান করেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। সাহাবায়ে কেরামের তরবিয়ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এর থেকে জানা গেল, তরবিয়ত তথা আত্মিক দীক্ষার এই মহান ধারা উপর হতে চলে আসছে।

হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কাছে এক মহিলা এল। মহিলা একটু বেঁটে আকৃতির ছিল। সে চলে গেলে তার ক্ষুদ্রাকৃতি বোঝাতে তিনি হাত দ্বারা ইশারা করলেন। এতে নবীজি হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর সংশোধনকল্পে বললেন, আয়েশা! তুমি এমন একটা কথা বলেছ, যদি কথাটা সমুদ্রের পানিতে ফেলা হয়, তবে তাতে সমুদ্রের সমস্ত পানি তিক্ত হয়ে যাবে। এর নাম তরবিয়ত বা চরিত্র গঠন। পীর-বুযুর্গরাও এভাবে মুরীদদের সংশোধন করেন। অতএব. এটি কোনো সাধারণ কাজ নয়; বরং নবীয়ানা কাজ। নবীরা যে কাজ করে গেছেন, পীর-মাশায়েখগণ সেই কাজই আঞ্জাম দিচ্ছেন।

আমার পীর ও মুরশিদের তরবিয়তের এক ঝলক

কোনো-কোনো স্থানে পীর সাহেব হন 'চুপ শাহ'। তারা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন। তাদের মুরীদরা তাদের সামনে জায়েয-নাজায়েয যা-ই করুক না কেন তারা মুখ খোলেন না। পক্ষান্তরে আমাদের মাশায়েখ 'চুপ শাহ' হন না। বরং তাদের হাতে ডান্ডা থাকে। উল্টা-পাল্টা দেখলেই শুরু হয়ে যায় উত্তম-মধ্যম। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা শুনুন।

একবার আমার শায়েখ মক্কায় ছিলেন। সেখানে তিনি এক ইঞ্জিনিয়ারের বাসায় থাকতেন। একদিন হযরত হারাম শরীফ থেকে বের হয়ে বাসায়

যাবেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বললেন, তুমি আগে যাও এবং বলো, কোন দিকে যাব। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, হযরত! আপনিই আগে-আগে চলুন; আমি পিছে আছি। হযরত চলতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর দ্বিমুখী রাস্তা সামনে এল। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! বলো, কোন রাস্তায় যাব? পেছন থেকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, হযরত! এদিকে চলুন। হযরত বললেন, তুমি আগে-আগে চলো। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, তা হয় না হযরত! আমি পেছনেই আছি। আপনি সামনে-সামনে চলুন। এবারও হযরত তার কথা মেনে নিলেন। একটু পর আবার দ্বিমুখী রাস্তা সামনে এল। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! কোন দিকে যাব? ইঞ্জিনিয়ার বললেন, হযরত! বাম রাস্তায় চলুন। হযরত বললেন, ভাই! তুমি আগে যাও। তিনি বললেন, না-না হযরত! আমি আপনার পিছেই আছি। আপনি সামনে চলুন। হযরতের হাতে লাঠি ছিল। তিনি এবার ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে লাঠিটা দেখিয়ে বললেন–

تو میرا پیر ایں یا میں تیرا پیر آں

'তুমি আমার শায়েখ, নাকি আমি তোমার শায়েখ?'

এবার লাঠি দেখে এবং বকুনি শুনে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের হুশ ফিরে এল। পরে হযরত তাকে বোঝালেন, কতক সময় পিছে চলাই হয় আদব। তবে কখনো সামনে-সামনে চলাও আদব হয়।

দ্বিতীয় কাজ : ইসলাহের জন্য দ্বিতীয় কাজ হলো, মানুষ তার শত্রু ও হিংসুক থেকে শিক্ষা লাভ করবে। অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর সমালোচক নিয়োগ করেন। সেই সমালোচক সর্বক্ষণ তার দোষ ধরতে থাকে যে, এটা ঠিক হয়নি। এটা উচিৎ হয়নি। এটা এমন না হয়ে এমন হলে ভালো হতো। সমালোচনা মানুষের খারাপ লাগলেও এটা তাকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। সমালোচক না থাকলে মানুষ বিপথগামী হয়ে যেত। অতএব, এটা আল্লাহর এক প্রকার রহমত। মানুষ যত বড় ও মর্যাদাসম্পন্ন হয়, তার হিংসুক তত বেশি হয়। হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) কেমন উচ্চ তবকার মানুষ ছিলেন। কিন্তু তারপরও মানুষ তার সমালোচনা করত। আল্লাহ তা'আলা ইমাম আজম আবুহানীফা (রহ.)কে অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। তারপরও কিছু মানুষ তার সমালোচনা করত। দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা ও সম্মানের পাত্র হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু তাঁর হিংসুকের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। এত হিংসুক ছিল যে, আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় মাহবুবকে হিংসুকদের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনার তরিকাও শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন, বলুন–

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

'(আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি) হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।'[১]

মানুষের কর্তব্য হলো তার হিংসুকদের থেকে সবক গ্রহণ করা। হিংসুকরা সমালোচনা করলে সে তার থেকে শিখবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে। আর তা এভাবে যে, হিংসুক যখন সমালোচনা করবে, তখন সে ভাববে, সে যে অভিযোগ তুলেছে সত্যিই তা আমার মধ্যে আছে কিনা। যদি থাকে, তবে তা সংশোধন করবে। এভাবেও ইসলাহ হতে পারে। কিন্তু আমাদের অবস্থা হলো এমন যে, আমরা যেসব লোক পছন্দ করি, যারা আমাদের প্রত্যেক কথায় 'হা' যোগ করে, যারা 'ইয়েসম্যানষ্ট হয় আমরা তাদের সমাদর করি। পক্ষান্তরে যারা বলে, এটা ঠিক হয়নি, বরং এভাবে করার দরকার ছিল, আমরা তাদের উপর রেগে যাই। তাদেরকে শত্রু জ্ঞান করি। তাদের কথার বাস্তবতা যাচাই করার প্রয়োজনও আমরা বোধ করি না।

তৃতীয় কাজ : ইসলাহের জন্য তৃতীয় কাজ হলো, মানুষ অন্যকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করবে। যেমন– কেউ একটা ভুল করেছে এবং সে কারণে অপমানিত ও লজ্জিত হয়েছে। এর থেকে মানুষ এই শিক্ষা নিবে যে, যখন অমুক এই কাজ করে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, তখন এ কাজ কখনও আমি করব না। যেব্যক্তি অন্যকে দেখে শিখে, তার ইসলাহ দ্রুত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে অন্যের ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে না, অল্প সময়ের ব্যবধানে সে নিজেই ঘটনার নায়ক হয়ে যায়।

আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, যখন মানুষ ইসলাহের এই চার তরিকা অবলম্বন করবে, তখন আল্লাহপাক তার নফসের ইসলাহ করে দিবেন।

রূহানী পাহলোয়ান হওয়ার জন্য করণীয়

এটি একটি পাক্কা ও সর্বজনস্বীকৃত কথা যে, মায়ের পেট হলো মানুষের দেহ তৈরি হওয়ার স্থান। যদি মায়ের পেটে থাকতে মানুষের শরীরের কোনো অংশ ত্রুটিপূর্ণ হয় আর বাচ্চা ওই ত্রুটি নিয়েই জন্মলাভ করে, তাহলে বিশ্বে সমস্ত ডাক্তার মিলেও ওই ত্রুটি দূর করতে পারে না। যেমন– বাচ্চা মাতৃগর্ভ হতে অন্ধ হয়ে জন্মাল, তাহলে দুনিয়ার কোনো ডাক্তার তার অন্ধত্ব দূর করতে পারে না। মায়ের পেটে যদি বাচ্চার আঙুল তৈরি না হয়, তাহলে কোনো ডাক্তার আঙুল বানিয়ে দিতে পারে না।

---

১. সূরা ফালাক : আয়াত ৫

ঠিক এমনিভাবে আসমান ও জমিনের পেট হলো মানুষের মধ্যে রূহানিয়্যাত তথা আধ্যাত্মিক গুণ সৃষ্টি হওয়ার জায়গা। এখানে যদি কোনো কমতি রয়ে যায়, তবে কেয়ামতে তা পূরণ হবে না। এ কারণেই যখন হাশরের ময়দানে মুনাফিক পুরুষ-নারী দেখবে, মুমিনদের মাথার উপর ঈমানের নূর, তখন তারা তাদের থেকে নূর চাইবে। আল্লাহপাক কেয়ামতের দিনের এ দৃশ্য পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ

'সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদের বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো, যাতে তোমাদের নূর থেকে আমরাও কিছু আলো গ্রহণ করতে পারি।'[১]

তখন তাদের জবাব প্রদান করা হবে–

قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا.

'তাদের বলা হবে, তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও, তারপর নূর তালাশ করো।'[২]

অর্থাৎ কে আলো পাবে আর কে পাবে না, সেই ফয়সালা পেছনে হয়ে গেছে। কাজেই পেছনে গিয়ে আলোর জন্য আবেদন করো।

পরের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন–

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

'তারপর তাদের মাঝখানে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর। তার মধ্যে থাকবে একটি দরজা, যার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে শাস্তি।'[৩]

অতএব, প্রমাণিত হলো, যেভাবে দৈহিক কমতি দুনিয়ায় এসে পূরণ হয় না, ঠিক তেমনি দুনিয়াতে আত্মিক কমতি রয়ে গেলে তা আখেরাতে পূরণ হবে না।

বর্তমানে আমরা আসমান ও জমিনের মধ্যে আছি। এটাই আমাদের ব্যক্তিত্ব ও রূহানিয়াত সৃষ্টির জায়গা। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে, যেন

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩

২. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩

৩. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩

এখানে থাকতেই আমাদের ভেতর হতে অসৎ চরিত্র দূর হয়ে যায় এবং তার স্থানে সৎ চরিত্র সৃষ্টি হয়। এর উদাহরণ এমন, যেমন কেউ চাইল, সে পাহলোয়ান হবে। সে এর জন্য সময় বের করে। প্রতিদিন ব্যায়াম করে। ভালো-ভালো খায়। তাহলে প্রতিদিন এমনটি করতে থাকলে দুবছর পর সে পূর্বের চেয়ে বেশি সুঠামদেহী ও স্বাস্থ্যবান হবে। মানুষ যদি মেহনত করে পাহলোয়ান হতে পারে, তাহলে সে মেহনত করলে বেলায়েতও অর্জন করতে পারে। যদি মানুষ নিয়ত করে, আমি আল্লাহর ওলী হব এবং তারপর সে সমস্ত গুনাহ ছেড়ে দেয়, বিশেষত

* লজ্জাস্থান হেফাযত করে।
* জবান হেফাযত করে।
* চোখ হেফাযত করে।
* মন-মস্তিষ্ক হেফাযত করে।
* যেসব অঙ্গ হতে গুনাহ প্রকাশ পায় সবগুলো হেফাযত করে।

তবে নিঃসন্দেহে কিছু দিন পরই সে আত্মিকভাবে পাহলোয়ান হয়ে যাবে। বরং অন্যভাবে এভাবে বলা চলে যে, সে আল্লাহর ওলী হয়ে যাবে।

বেলায়েতের প্রকার

মনে রাখবেন, বেলায়েত অর্জনযোগ্য বিষয় আর নবুওয়াত আল্লাহপ্রদত্ত বিষয়। অর্জনযোগ্য বিষয় বলা হয়, যা মেহনত করে অর্জন করা যায়। আর আল্লাহপ্রদত্ত বিষয় বলে, যা আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে বিশেষভাবে প্রদান করেন। 'ওলী' হওয়া ইচ্ছাধীন বিষয়। কেউ চাইলে সে চেষ্টা-মেহনত করে আল্লাহর ওলী হতে পারে।

বেলায়েত দুই প্রকার। (১) সাধারণ বেলায়েত ও (২) বিশেষ বেলায়েত। সাধারণ বেলায়েত কালেমা পাঠকারী সকল মুসলমানের অর্জিত হয়। অর্থাৎ যে-ই কালেমা পড়ে, সেই আল্লাহর বন্ধুর তালিকায় শামিল হয়ে যায়। সুতরাং কুরআনের সিদ্ধান্ত দেখুন–

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'আল্লাহ মুমিনদের বন্ধু।'[১]

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৭

উদাহরণস্বরূপ, যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এই সমাবেশে আল্লাহর শত্রু কে-কে আছেন, তাহলে কেউ দাঁড়াবে না। অতএব জানা গেল, এখানে আল্লাহর দুশমন কেউ নেই; বরং সবাই আল্লাহর বন্ধু।

বিশেষ বেলায়েত

বিশেষ বেলায়েত হলো, মানুষের দেহ হতে গুনাহ প্রকাশ না পাওয়া এবং তার মাথার চুল হতে পায়ের নখ পর্যন্ত পুরো শরীর আল্লাহর বিধিবিধানে ডুবে থাকা। যেব্যক্তি এমন মুত্তাকী হয়, তার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ফয়সালা হলো–

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ

'আল্লাহর ওলী সে-ই হয়, যে মুত্তাকী হয়।'[১]

এমন লোকদের আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বেলায়েত দান করেন। যেমন– মানুষের চেনা-জানা লোক অনেক হয়ে থাকে; কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু খুব কমই হয়। এমনিভাবে কালেমা পড়ে তারা সকলেই আল্লাহর নেক বান্দার কাতারে শামিল হয়ে যায়। কিন্তু যারা মুত্তাকী ও পরহেযগার হয়, তারা বিশেষ বেলায়েত লাভ করেন। এটা অর্জন করতে বিশেষ মেহনত করতে হয়। আর সেই মেহনতেরই নাম তাযকিয়ায়ে নফ্স তথা আত্মশুদ্ধি।

ইসলাহে নফসের জন্য সর্বোত্তম উপায়

আমার একথাটি নোট করে রাখুন যে, যত মুজাহাদা আছে এবং হতে পারে সমস্ত মুজাহাদার মধ্যে সবচেয়ে বড় মুজাহাদা হলো সর্বাবস্থায় শরীয়ত মোতাবেক চলা। মানুষ যে মুজাহাদা নিজের মর্জিমতো করে, সেটা তার নফসের জন্য খুবই সহনীয় হয়। কিন্তু সর্বাবস্থায় শরীয়তের পাবন্দি করাতে নফসের উপর বিরাট ভার চেপে বসে, নফসের গলায় ছুরি পড়ে। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা শুনুন।

একলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এল। সে বয়সে যুবক ছিল। সে দীর্ঘ ২২ বছর যাবত সারা বছর রোযা রেখে আসছিল। যুবক আমাকে এটা শোনালে সেখানে যারা বসা ছিল তারা অবাক হয়ে যায়। আমি বললাম, এটা অতি সহজ কাজ। তারা জানতে চাইল, কীভাবে? আমি বললাম, তাকে বলো, একদিন পরপর রোযা রাখতে। তারা যখন যুবককে এটা বলল, তখন

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৪

যুবক বলল, এ কাজটি বড়ই কঠিন। তারপর আমি বিষয়টি তাদের বোঝালাম যে, একদিন বিরতি দিয়ে রোযা রাখা সুন্নত। এ কারণেই কাজটি কঠিন প্রতিভাত হয়। কেননা, সারা বছর রোযা রাখা সহজ আর এর বিপরীত একদিন পরপর রোযা রাখা বড়ই কঠিন কাজ। যেভাবে মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় খাওয়ার অভ্যাস বানিয়ে নেয়, এমনিভাবে সাহরী ও-ইফতারের সময় খাওয়ার অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছিল। যার ফলে এটা তার জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। অতএব মূলনীতি মনে গেঁথে রাখুন যে, সর্বাবস্থায় সুন্নত মোতাবেক আমল করার চেয়ে অধিক কষ্টকর কাজ নফসের জন্য আর কিছুই নেই। এতে নফসের যে পরিমাণ ইসলাহ হয়, এমনটি আর কিছুতে হয় না। এ কারণে ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) লিখেছেন, দুপুরে সুন্নতের নিয়তে সামান্য সময়ের কায়লুলায় (বিশ্রামে) ওই ছাওয়াব হয়, যা রাতে জেগে হাজার-হাজার রাকাত নামায পড়ায় হয় না।

সারকথা, আল্লাহর ওলী তিনিই হন, যিনি সর্বাবস্থায় সুন্নত মোতাবেক চলেন। নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তির তবিয়ত শরীয়ত মোতাবেক হয়ে যায়। সুন্নতের উপর আমল করতে সাধারণ মানুষের খুব কষ্ট হয়। কিন্তু আল্লাহওয়ালাদের কোনোই কষ্ট অনুভূত হয় না।

স্বতন্ত্র রুচির এক ঝলক

একলোক জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি মিষ্টি খান না? আমি বললাম, ভাই! আমি বেশি দৌড়-ঝাঁপ করতে পারি না, ব্যায়াম করতে পারি না। এ কারণে ডাক্তাররা বলেছেন, আপনি মিষ্টি খাবেন না। তাই আমি মিষ্টি জিনিস এড়িয়ে চলি। লোকটি বলল, তবে তো আপনার বেশ কষ্ট হয়।

আমি বললাম, আমাদের মাশায়েখদের আল্লাহপাক উত্তম বদলা দান করুন। তারা এমন মেহনতের কলাকৌশল শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন থেকে ডাক্তাররা মিষ্টি খেতে বারণ করেছেন, তখন থেকে মিষ্টির প্রতি দিলে কখনও আগ্রহ জন্মেনি।

তাসাওউফ ও সুলুকের মেহনত মানুষকে এমন স্বতন্ত্র রুচিসম্পন্ন বানিয়ে দেয়। মূলত যিকিরের মেহনত দ্বারা মাশায়েখগণ নফসের মুখে লাগাম পরিয়ে দেন। ফলে মানুষ আর স্বাদের পাগল হয় না; বরং সদা-সর্বদা সুন্নতই থাকে তার দৃষ্টির সামনে। তার ওঠা-বসা, চলা-ফেরা সবকিছু সুন্নত মোতাবেক হয়। এমন পরিশুদ্ধ ও সুন্নতশোভিত ব্যক্তিকেই আল্লাহর ওলী বলে। অথচ আমরা বুঝি, আল্লাহর ওলী কেবল তিনি, যিনি কারামত দেখাতে পারেন। অথচ কারামত প্রকাশ পাওয়া অতি সহজ কাজ। এমন কারামত তো হিন্দু

যোগীরাও দেখাতে পারে। এমনিভাবে ম্যাজিমিয়ানরা কত-শত ম্যাজিক দেখিয়ে থাকে। এসব দেখানো সহজ। কিন্তু এতে গুনাহ হয় এবং ঈমানের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। যখন তারা ফেঁসে যায়, তখন আমাদের কাছে আসে। আজ পর্যন্ত কখনো জিনের আমল করার প্রয়োজন আমার হয়নি। বরং আমি ঠিকমত জানিই না, তা কীভাবে করে। জিনের আমল ও তদবির যারা করে, তারা শেষ পর্যন্ত ধরা খেয়ে আমাদের কাছে আসে। আল্লাহর শান দেখুন, আমরা জানি না, জিন আমাদের কাছে কখন আসে আর কখন চলে যায়। আমার পীর ও মুরশিদ বলতেন,

کامل بننا , عامل نہ بننا

'আল্লাহওয়ালা হবে, জিনের তদবিরকারী হবে না।'

এসব বিষয় হলো তাসাওউফ ও সুলুকের রাস্তায় পড়ে পাওয়া জিনিস। আসল কথা হলো সর্বদা সুন্নত ও শরীয়ত মোতাবেক জীবন পরিলক্ষিত হওয়া। এটাই জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

শরীয়তের লাগাম

যিকির ও সুলুকের উদ্দেশ্য যিকিরের মজা লাভ করা নয়। আমাদের শায়েখগণ আমাদেরকে عبد اللطف 'মজার গোলাম' বানান না; বরং عبد اللطيف 'আল্লাহর গোলাম' বানান। তারা আমাদেরকে স্বাদের পাগল বানান না; বরং সুন্নতের আশেক বানান। কেমন যেন তারা আমাদের শেখান, নফ্‌স একটি বিষাক্ত ঘোড়া। তার মুখে শরীয়তের লাগাম পরিয়ে দাও। যখন তার মুখে শরীয়তের লাগাম উঠবে, তখন বুঝবে, সে কাবুতে চলে এসেছে। তারপর তার পিঠে সওয়ার হও এবং আল্লাহর নৈকট্যের স্তর অতিক্রম করতে থাক।

শরীয়তের খাদেমা-সেবিকা

যারা এটা মনে করে, শরীয়ত এক জিনিস আর তরিকত আরেক জিনিস, তারা গণ্ড মূর্খ। দিলের কান খুলে শুনুন, সবকিছুই শরীয়তের অধীন এবং শরীয়তের অন্তর্গত। তরীকত তো শরীয়তের খাদেম। যারা এখনও ভুলের মধ্যে আছে, তাদের ভুল দূর করা উচিৎ। বর্তমানে মানুষ তাদের ওলী মনে করে, যারা উল্টা-পাল্টা কাজ করে দেখায়।

অবস্থার বিবর্তন

একজন সাধারণ মানুষ আর একজন আল্লাহর ওলীর মাঝে বিস্তর পার্থক্য থাকে। তা হলো, সাধারণ লোকও বড় কাজ করে। কিন্তু তার মাঝে

অবিচলতা ও স্থায়িত্ব থাকে না। কখনো সে এমন নামায পড়ে যে, দেখলে মনে হবে, সময়ের কুতুব নামায পড়ছেন। আবার এই লোকই কখনও এমন নামায পড়ে, দেখলে মনে হবে, কোনো দাগী পাপী নামায পড়ছে। তার অবস্থা দ্রুত ওঠানামা করে। কখনো আল্লাহর সঙ্গে তার এমন ভাব পয়দা হয় যে, সে আল্লাহর সামনে কেঁদে-কেটে একাকার হয়ে যায় এবং তাকে যে-ই দেখে তার ঈর্ষা লাগে। পরক্ষণে এই লোকই আবার কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়।

সারকথা হলো, প্রাথমিক মুরীদ তারা। তাদের মনোজাগতিক অবস্থার অদল-বদল হয়। সবসময় এক অবস্থায় থাকে না। একেই 'অবস্থার বিবর্তন' বলে। কিন্তু যারা আল্লাহওয়ালা, তারা স্থিরচিত্ত ও অবিচল হন। তাদের মাঝে ধৈর্য ও অটলতা থাকে। তারা সদা একই অবস্থানে অবস্থান করেন। দেশে-বিদেশে, সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় তাদের মামুল একই থাকে এবং তাতে কোনো প্রভেদ বা বাধা সৃষ্টি হয় না। এ কারণেই আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.

'অপরদিকে যারা বলেছে, আমাদের রব আল্লাহ! তারপর তারা তাতে থাকে অটল-অবিচল, নিশ্চয়ই তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে (এবং বলবে) যে, তোমরা কোনো ভয় করো না এবং কোনো কিছুর জন্য চিন্তিত হয়ো না আর সুসংবাদ গ্রহণ করো সেই জান্নাতের জন্য, যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হতো।'[১]

ইস্তেকামাত তথা দীনের উপর অটল-অবিচলতা আল্লাহর খুব প্রিয় বস্তু। এটা অর্জন হয় ইসলাহে নফ্স তথা আত্মশুদ্ধির পরে।

নফসের চাল ও ছল

নফসের ইসলাহ্ না করা হলে এই নফ্স মানুষকে নিয়ে এমনভাবে খেলে যেভাবে বাচ্চারা বল নিয়ে খেলে। নফ্স মানুষ থেকে উল্টা-পাল্টা কাজ করিয়ে নিজেই তাকে আবার সমর্থন ও সত্যয়ন করে। একলোক ঘুষ নিত। আরেক লোক তাকে বলল, ভাই! ঘুষ নাও কেন? সে জবাবে বলল, আমি নিজের জন্য নেই না। আমার তো মাত্র দুটি রুটি হলেই চলে যায়। আমি

---

১. সূরা হা-মীম-সাজদা : আয়াত ৩০

এসব নেই বাচ্চাদের জন্য। কেননা, তাদের জন্যও তো কিছু করা ফরজ। চিন্তা করুন, নফ্স তাকে কিভাবে বিভ্রান্ত করেছে।

ব্যাপার যদি শুধু নফসের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে মানুষ যত বড়ই গুনাহ্ করুক না কেন নফ্স তার সমর্থনে দলীল পেশ করবে। স্বয়ং চোরকেও বলতে শুনেছি, আমরা সারা রাত জেগে অত্যন্ত ভয় নিয়ে চুরি করি। অতএব, এটাও আমাদের মেহনতের কামাই।

দুজন ছাত্র ছিল। একজন বড় ও অপরজন ছোট। শিক্ষক বড় ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কে সৃষ্টি করেছেন? সে জবাব দিল, পিতামাতা। তারপর একই প্রশ্ন করলেন ছোট ছাত্রকে। সে উত্তর দিল, আল্লাহ। ওস্তাদ তার এ উত্তরে খুব খুশি হন এবং বড় ছাত্রকে শরম দেন যে, তুমি বড় হয়েও সঠিক জবাব দিতে পারলে না; অথচ সে ছোট কেমন সুন্দর ও সঠিক জবাব দিল। বড় ছাত্রটি বলল, আসল কথা হলো, আমি অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেছি আর এ সদ্য জন্ম নিয়েছে। এ কারণে বিষয়টি তার মনে আছে আর আমি ভুলে গেছি।

ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হলো, নফ্স মানুষের সামনে কোনো-না-কোনো দলীল অবশ্যই পেশ করে, যাতে তার মধ্যে অন্যায় করে অস্বস্তি বা পেরেশানি জাগ্রত না হয়। এমনকি যদি মানুষ কবীরা গুনাহও করে, তবুও নফ্স তাকে আশ্বস্ত করে যে, তুমি ঠিক কাজই করছ। যুবকরা তাওবা করে থাকে। তারা নিজেরা এসে জানায়, আমরা কবীরা গুনাহ করি এবং একে অপরকে বলি, দুনিয়ার মহব্বত ভালো নয়; তবে আমাদের মহব্বত সত্য ও নিখাদ।

এটি একটি মন্দ দৃষ্টান্ত যদিও, তারপরও বোঝাবার জন্য বলছি। কলেজের এক প্রফেসর ছিলেন। সহশিক্ষার কারণে কলেজের এক মেয়ের সাথে তার ভাব হয়ে যায় এবং একপর্যায়ে তাদের মধ্যে দেহবিনিময়ও হয়। ফলে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এতে প্রফেসরের বিরাট বদনাম হয়ে যায়। অন্যান্য প্রফেসররা তাকে শরম দিয়ে বলে, অঘটন যখন ঘটালেই তখন সতর্কতা অবলম্বন করলে না কেন? বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাতে গর্ভসঞ্চার না হয়। অভিযুক্ত প্রফেসর জবাবে বললেন, বিষয়টি আমারও মনে ছিল, কিন্তু কী করব বলো, কতিপয় আলেম তো 'পরিবার পরিকল্পনা'কে মাকরূহ মনে করেন!

বাইয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

নফসের ছল-চাতুরি হতে বাঁচতে তার ইসলাহ খুবই জরুরি। আর এই ইসলাহের জন্য মানুষকে কোনো-না-কোনো শায়েখের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হয়। এই সম্পর্ক স্থাপনের নামই বাইয়াত।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে لِمَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হলো কেন? আল্লাহ তা'আলা বারবার এশব্দ ব্যবহার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবিয়ত করেছেন ও গড়েছেন। যেখানে-যেখানে নবীজির জন্য لِمَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে ওই শব্দের হয়ত আগে অথবা পরে নবীজির ক্ষমার ঘোষণা প্রদান করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

'হে নবী! আল্লাহ যে জিনিস তোমার জন্য হালাল করেছেন, তুমি নিজ স্ত্রীদের খুশী করার জন্য তা হারাম করছ কেন? আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১]

এখানে والله غفور رحيم শব্দের মাধ্যমে ক্ষমার ঘোষণাও সঙ্গে-সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কোথাও আগে ক্ষমার ঘোষণা এবং পরে لم শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহপাক বলেন–

عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ.

'(হে নবী!) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারা সত্যবাদী তোমার কাছে তা স্পষ্ট হওয়া এবং কারা মিথ্যাবাদী তা ভালোভাবে জানার আগে তুমি তাদের (জিহাদে শরীক না হওয়ার) অনুমতি কেন দিলে?[২]

আগে বা পরে ক্ষমার ঘোষণা দেওয়ার কারণ হলো, আল্লাহপাক জানতেন, তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আল্লাহর মর্যাদাবোধ ও ভীতি এত প্রচুর যে, যদি ক্ষমার ঘোষণা ছাড়াই لم শব্দ দ্বারা শাসন করা হয়, তবে হয়ত নবীজির জন্য বরদাশত করা কঠিন হয়ে যাবে, তিনি ভেঙে পড়বেন। এজন্য যেন নবীজি পেরেশানও না হন আবার ইসলাহও হয়ে যায়, তাই আল্লাহপাক এ রীতি অবলম্বন করেছেন।

---

১. সূরা তাহরীম : আয়াত ০১
২. সূরা তাওবা : আয়াত ৪৩

পক্ষান্তরে যেখানে ঈমানদারদের তরবিয়তের জন্য কুরআন শরীফে لِمَ শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেখানে ক্ষমার ঘোষণা দেননি। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা কর না? আল্লাহর কাছে এ বিষয়টা অতি অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলবে, যা তোমরা কর না।'[১]

এখানে ক্ষমার ঘোষণা দেওয়া হয়নি কেন? এ কারণে যে, যদি তোমরা কথাটি মান, তাহলে রহমত পাবে। আর না মানলে তোমরা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

এ আয়াতের মধ্যে আমাদের জন্য এই সবক রয়েছে যে, মানুষকে তরবিয়ত হাসিল করতে হবে। নতুবা কুপ্রবৃত্তি মানুষের উপর প্রবল হয়ে যায়। এমনকি মানুষ তখন নিজের আয়ত্বে থাকে না।

কুপ্রবৃত্তির কেন্দ্র ও অফিস

আমি একটি কিতাবে পড়েছি, একলোককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তোমার অতি পছন্দের আয়াত কোনটি? লোকটি তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়–

كُلُوا وَاشْرَبُوا

'খাও এবং পান করো।'[২]

লোকটি এবার প্রশ্নকারীকে পাল্টা প্রশ্ন করল, ভাই! তোমার প্রিয় দু'আ কোনটি? সে জবাবে বলল–

رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ

'হে আমাদের রব! আমাদের উপর আসমানী দস্তারখানা নাযিল করুন।'[৩]

লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বলো তো, তোমার পছন্দের সুন্নত কোনটি? সে জবাবে বলল, খানার প্লেট ভালো করে চেটে খাওয়া।

---

১. সূরা সফ : আয়াত ২,৩
২. সূরা মুরসালাত : আয়াত ৪৩
৩. সূরা মায়েদা : আয়াত ১১৪

বলা হলো, আল্লাহর ওই হুকুমটি শোনাও, যেটি তোমার কাছে খুব ভালো লাগে। সে বলল, আমার কাছে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় নির্দেশটি হলো–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

'যে মেয়েদের ভালো লাগে তোমরা তাদের বিবাহ করো।'[১]

কিতাবের গল্প শতভাগ ঠিক। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন নফসের হাতের খেলনায় পরিণত হয়, তখন তার চাওয়া-পাওয়াও এ ধরনেরই হয়ে থাকে। দুনিয়াবি স্বাদ-উপভোগই হয় তার প্রবৃত্তির কেন্দ্রবিন্দু।

মুফতী তকী উসমানী (দা.বা) তাঁর 'তারাশে' কিতাবে 'আশআব তামে' নামক একব্যক্তির ব্যাপারে লিখেছেন যে, সে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর গোলাম ছিল। সে ওই যুগের নামকরা লোভী ছিল।

তার লোভের অবস্থা এতটা নীচে নেমে গিয়েছিল যে, তার সামনে কেউ পোশাক উর্চিয়ে শরীর চুলকালে সে ভাবত, হয়ত সে তাকে কিছু টাকা বের করে দিবে। সে নিজেই বলত, দুজন লোক মিলে কানাঘুষা করলে আমি সদা এটাই ভাবতাম যে, তাদের একজন হয়ত এই ওসিয়তই করছে যে, আমার মৃত্যুর পরে আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি আশআবকে দিবে।

যখন সে বাজারে ঘুরত এবং মিষ্টান্ন বানাতে দেখত, তখন কারিগরদের বলত, বড়-বড় লাড্ডু-মিঠাই বানাও। তারা জিজ্ঞাসা করত, আমরা বড় লাড্ডু বানাব কেন? সে বলত, হতে পারে কেউ তা কিনে আমাকে হাদিয়া দিবে।

একবার আশআবকে দুষ্টু ছেলেরা ঘিরে ধরল। এতে তার জীবন সংকটাপন্ন হয়ে ওঠল। পরিশেষে সে একটা বুদ্ধি আঁটল। ছেলেদের বলল, তোমরা কি জান না, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ মিষ্টি বিতরণ করছেন? তোমরাও যাও, হয়ত কিছু পেয়ে যাবে। ছেলেরা তাকে ছেড়ে সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর বাড়িতে গেল। ছেলেদের যেতে দেখে তাদের পিছে পিছে আশআবও গেল। গিয়ে দেখল, তিনি কিছুই বিতরণ করছেন না। ছেলেরা আশআবকে অভিযোগের সুরে বলল, আপনি তো আমাদের ভুল তথ্য দিয়েছেন। সে বলল, আমি তো নিজেকে তোমাদের থেকে মুক্ত করতে ওই কথা বলেছিলাম। ছেলেরা বলল, তাহলে আপনিও আমাদের সঙ্গে এলেন কেন? সে বলল, তোমাদের যেতে দেখে আমার মনে জাগল, হয়তবা বাস্তবেই তিনি কিছু বিতরণ করছেন।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৩

কমিউনিজম ও নফসের প্রেরণা

কমিউনিজমের আগমনের পেছনে মানুষের নফসের ভূমিকা ছিল। স্লোগান ওঠল, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান গরীবদের প্রদান করব। এই স্লোগানের আদলে একটি পলিসি তৈরি করা হলো, যার মূল লক্ষ্য ছিল, আমরা চিরকালের জন্য শাসক হব, আর তোমরা হবে শাসিত। তাদের টার্গেট ছিল ধনী-গরীবের ভেদাভেদ তুলে দেওয়া। মানুষের মাঝে কোনো উঁচু-নিচু স্তর থাকবে না। সবাই হবে সমমর্যাদার ও সমশ্রেণীর। কিন্তু গোড়ায় গলদ হয়ে গেল। এভাবে আইন তৈরি করল যে, তাতে নিজেরাই সারাজীবন শাসক হওয়ার দাবি সুসংহত থাকল।

দেখুন! নফ্স তাদেরকে কেমন ধোঁকা দিয়েছে। ফলাফল এই হয়েছে যে, মাত্র ৭০ বছরের মাথায় কমিউনিজমের উদ্যোক্তারা নিজেরাই কমিউনিজমকে দুনিয়া হতে বিদায় করে দিল।

প্রকৃত মুজাহিদ

হাদীছে এসেছে, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুযুর! মুজাহিদ কে? নবীজি জবাবে বললেন–

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ طَاعَةِ اللهِ.

'আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে যে স্বীয় নফসের সঙ্গে বিবাদ করে, সে-ই প্রকৃত মুজাহিদ।'

এই মুজাহাদার দায়িত্ব সকলের। নফসের চাহিদাকে দাবিয়ে রেখে সর্বাবস্থায় শরীয়ত ও সুন্নতের উপর চলা সকলের উপর জরুরি। মেহনত-মুজাহাদা করে দিলের অবস্থা এমন করতে হবে যে, শরীয়তের উপর পূর্ণাঙ্গভাবে চলতে দিলে কোনো বাঁধার সৃষ্টি হবে না।

বিষয়টি একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাই। যারা নামাযী হয় এবং নিয়মিত মসজিদে আসা-যাওয়া করে, তাদেরকে যদি বলা হয়, মাটিতে বসুন, তাহলে তাদের জন্য এটা মান্য করা কঠিন হয় না। তারা এতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। এমনকি যদি তাদের সোফায় বসতে দেওয়া হয়, তবে তারা বলে, দরকার নেই। মাটিতে বসতেই আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু যদি কোনো বিধর্মী ইংরেজকে বলেন, ভাই! মাটিতে বসুন। তাহলে এতে তাদের জীবনের বারটা বেজে যায়। তাদের অহংবোধে এত বাঁধবে যে, তারা মাটিতে বসতেই পারবে না।

এ ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার অনেকবার হয়েছে। একবার কিছু লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এল। আমি তাদের প্রস্তাব দিই, আসুন! আমি নিজেও নীচে বসছি, আপনারাও নীচে এসে বসুন। তারা বলল, হযরত! আমরা নীচে বসতেই পারি না। কারণ, আমাদের পা এভাবে নীচে বসতে অভ্যস্ত নয়। এ থেকে আমার দিলে একথা এল যে, আল্লাহওয়ালাগণ শরীয়তের উপর আমল করে-করে এমন হয়ে যান যে, শরীয়ত মোতাবেক আমল করার মাঝেই তারা মজা ও স্বাদ অনুভব করেন। দৈহিক ও মানসিক প্রশান্তিও তারা এর মধ্যেই পান।

প্রশংসা মূলত সাত্তারেরই

আমার বন্ধুগণ! যদি গুনাহ হতে দুর্গন্ধ বের হত, তাহলে কেউ হয়তবা আমাদের কাছে এসে বসত না। এটা তো আল্লাহর পক্ষ হতে গোপনীয়তা যে, তিনি আমাদের প্রকৃত অবস্থা ঢেকে রেখেছেন। একবুযুর্গ খুবই দামী কথা বলতেন। তাঁর কথা আমার খুব ভালো লাগত। তিনি বলতেন, বন্ধুগণ! কেউ তোমাদের প্রশংসা করলে সে মূলত আল্লাহ তা'আলার সাত্তার গুণের প্রশংসা করে। যিনি তোমার প্রকৃত অবস্থা চেপে রেখেছেন এবং তোমার নোংরামি সত্ত্বেও মানুষ তোমার প্রশংসা করে। তাই বলি, যারা আমাদের প্রশংসা করে, তারা মূলত আমাদের প্রশংসা করে না, বরং আল্লাহ তা'আলার সাত্তারী গুণের প্রশংসা করে। এটা তো আল্লাহর অপার দয়া যে, তিনি আমাদের গুনাহের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন, যার ফলে মানুষের চোখে তা না পড়ায় মানুষ বাহ্যিক কিছু ভালো দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। আমাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহর রহমত দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং এই সুযোগ শেষ হওয়ার পূর্বেই নিজের নফসের ইসলাহ করা। নতুবা যারা অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হন, মানুষের ভেতরগত নোংরামি তারা অবগত হয়ে যান।

হযরত উসমান (রাযি.)-এর ঈমানি বিচক্ষণতা

একবার হযরত উসমান (রাযি.) তাশরীফ আনেন। ইতোমধ্যে একলোক তাঁর কাছে এল। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, মানুষের কী হলো যে, তারা নির্ভীকচিত্তে আমাদের কাছে চলে আসে অথচ তাদের চোখ দিয়ে যিনা-ব্যভিচার করতে থাকে।

তাঁর এই মন্তব্য শুনে আগত ব্যক্তি স্বীকার করে নিল যে, হযরত! বাস্তবিকই আসার পথে আমার থেকে কুদৃষ্টির গুনাহ হয়ে গেছে। এজন্যই

বলি, আল্লাহওয়ালাগণ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখেই টের পেয়ে যান, এটা নাপাক। কেননা, কোনো অঙ্গ হতে গুনাহ প্রকাশ পেলে তা নাপাক হয়ে যায়।

যিনার ক্রিয়া

একবার হযরত ইমাম আজম আবুহানীফা (রহ.) এক যুবককে গোসল করতে দেখে অনুধাবন করলেন, তার ব্যবহৃত পানির মাঝে যিনার ক্রিয়া ধুয়ে চলে যাচ্ছে। যুবক কিছুক্ষণ পর এক প্রয়োজনে হযরত ইমাম সাহেবের কাছে গেল। ইমাম সাহেব তাকে সুন্দরভাবে বোঝালেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করলেন। যুবক স্বীকার করে বলল, হযরত! বাস্তবিকই আমার দ্বারা গুনাহ হয়ে গেছে। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আজ হতে খাঁটি তাওবা করছি। ওই দিন হতে ইমাম সাহেব ফতোয়া দেন, ব্যবহৃত পানি দ্বারা ওজু করা জায়েয নেই। কেননা, মানুষ ওজু করলে ওজুর পানির সঙ্গে গুনাহ ঝরে যায়। আল্লাহওয়ালাগণ ওজুর পানির সঙ্গে গুনাহের ক্রিয়া চলে যেতে দেখেন। এমনিভাবে মানুষ যখন ফরজ গোসল করে, তখন আল্লাহওয়ালাগণ বুঝতে পারেন, তাদের পানিতে গুনাহ বেয়ে যাচ্ছে কি-না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ

'হে আল্লাহ! আমাদের বস্তুসমূহের প্রকৃত হাকীকত দেখিয়ে দিন।'

এমনিভাবে আল্লাহওয়ালাগণকেও আল্লাহপাক বস্তুসমূহের গতি-প্রকৃতি ও বাস্তব অবস্থা দেখিয়ে দেন।

এক আজব অভ্যাস

কিতাবে লেখা আছে, আল্লামা ইবনে দাকীক (রহ.) ও শায়েখ তাজুদ্দীন সুবকী (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল, তারা যখন বাড়ি থেকে মসজিদে নামায পড়তে যেতেন, তখন চেহারা ঢেকে নিতেন। মানুষজন তাদের এই রীতি দেখে অবাক হতো। একদিন একলোক জিজ্ঞাসা করে বসল, হযরত! ব্যাপার কী? আপনি চেহারা ঢেকে ঘর হতে বের হন কেন? এই প্রশ্ন শুনে তিনি স্বীয় চাদরখানা প্রশ্নকারীর মাথায় ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর সে এদিক-ওদিক তাকালে পথচারী মানুষদের বিকৃত আকৃতিতে দেখতে পেল। কেউ কুকুরের মতো, কেউ বানরের মতো, কারো চেহারা শূকরের মতো।

প্রবৃত্তির পিপাসা

আমার বন্ধুগণ! মানুষের নফ্স স্বাদের পাগল। কেননা, মাশায়েখগণ বলেছেন, নফস বাচ্চার মতো। যেভাবে বাচ্চা এক জিনিসের পরে অন্য জিনিস চায় এবং দ্বিতীয়টা পেলে তৃতীয়টা চায়, সে চাইতেই থাকে, তার চাওয়ার কোনো শেষ হয় না, ঠিক তেমনি নফসেরও অবস্থা এমন। এ কারণে কোনো বান্দা যদি চিন্তা করে, যদি আমি নফসের সকল চাহিদা মিটিয়ে দেই, তাহলে একসময় সে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে; আর কোনো কিছুর দাবি ও তামান্না করবে না, তাহলে তার মনে রাখা উচিত, নফ্স কখনো তৃপ্ত হবে না। বরং তার এক চাহিদাই অপর চাহিদাকে সৃষ্টি করে দিবে। দ্বিতীয় চাহিদা তৃতীয় চাহিদাকে জন্ম দিবে। তৃতীয় চাহিদা চতুর্থ চাহিদার দ্বার খুলে দিবে। এটা অন্তহীন পিপাসা, যা কখনো মেটে না।

ইউরোপে ধর্ষণ

ইউরোপে যত্রতত্র অসংখ্য ক্লাব রয়েছে, যেখানে যিনা-ব্যভিচারের অবাধ সুযোগ রয়েছে। তারপরও বিস্ময়ের কথা হলো, সেখানেও ধর্ষণ হয়। যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা ধর্ষণ কর কেন; অথচ তোমাদের যৌনবৃত্তি চরিতার্থের বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে? তারা বলল, আমরা পারস্পারিক সম্মতিতে যৌনকামনা মিটিয়ে-মিটিয়ে নিরানন্দ ও বিরক্ত হয়ে গেছি। তাই আমরা ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, রুটিনের বাইরে কাজ করতে হবে। এজন্য জোরপূর্বক যিনার পথ বেছে নিয়েছি। এতে মজা পাই বেশি।

তাদের এই বক্তব্য হতে জানা যায়, মানুষের নফ্স নতুনত্ব খোঁজে। একঘেয়েঁমি তার বরদাশত হয় না। নফসের এই দুর্বৃত্তি ধ্বংসাত্মক। ইসলাহ ছাড়া নফসের ধ্বংসকারিতা হতে বাঁচা খুবই কঠিন ও দুষ্কর।

আপন বোনকে বিবাহ করা

নফ্স মানুষকে বিরাট ধোঁকা দেয়। 'কারামিতিয়া' নামে একটি সম্প্রদায় ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল আব্দুর রহমান। তার মাথা এমনভাবে নষ্ট হয় যে, সে তার অনুসারীদের বলে, তোমরা সহোদরা বোনকে বিবাহ করতে পার। সে এর পেছনে এই দলিল দেখায় যে, বোন যেহেতু ছোট হতে বড় হওয়া পর্যন্ত একই সাথে থাকে এবং সে যেভাবে ভাইয়ের জীবন সম্পর্কে জানে এভাবে আর কেউ জানে না, এজন্য জীবনসঙ্গিনী হওয়ার জন্য সে-ই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত।

কেমন মজবুত দলীল! আপনি যুক্তি দিয়ে তার দলীল রদ করেন তো দেখি! রদ করতে পারবেন না। কিন্তু যদি শরীয়তের আলোকে তার ভ্রান্ত দলীল খণ্ডন করতে চান, তাহলে শরীয়ত বলে দিবে, কতক আত্মীয় এমন হয় যে, সেখানে মানুষের পশুত্ব শেষ হয়ে শুধু মানুষের মনুষত্ব বাকি থাকে। মা ও বোনের সম্পর্ক এমনই সম্পর্ক, যেখানে মানুষের দৃষ্টি পাক থাকে। যদি সকলের প্রতি একই নজর পড়ে, তাহলে দুনিয়াতে লজ্জা-শরম বলতে আর কিছুই থাকবে না।

সমকামিতা নফসেরই ধোঁকার ফল

যেসব দেশে সমকামিতার বিল পাশ হয়েছে এবং মানুষ উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এমন জঘন্য বিল পাশ করে দেয়, তাদের মাথা কীভাবে ধোঁকার শিকার হয়েছে যে, তারা এক জঘন্য অস্বাভাবিক কুকর্মকে আইনের অধীন বানিয়ে দিয়েছে। তাদের নফ্সই তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে এমন কুকর্মের লাইসেন্স দিতে প্ররোচিত করেছে।

এগুলো সবই একথার বিক্ষিপ্ত উদাহরণ যে, নফ্স স্বাদের পাগল হওয়ায় মানুষকে বিভিন্নভাবে ধোঁকা দেয়। এসব ধোঁকা হতে বাঁচতে আমাদের সামনে শরীয়তের রাস্তা বিদ্যমান। আমাদেরকে আল্লাহপাকের প্রিয় হাবীবের তরিকা মোতাবেক জীবনযাপন করতে হবে। নববী আদর্শকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টাকেই মুজাহাদা বলে। যারা নফসের সঙ্গে মুজাহাদা করে আল্লাহপাক তাদের জন্য রাস্তা খুলে দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

'যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।'[১]

যারা নিজেরা দীনের উপর চলে ও অন্যকে চালানোর চেষ্টা করে, তাদের জন্য এটি একটি মহাসুসংবাদ। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে ওয়াদা দিয়েছেন, যারা দীনের পথে চেষ্টারত থাকবে এবং কখনো হতাশ হয়ে পিছিয়ে যাবে না, তিনি অবশ্যই তাদের গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিবেন। সুতরাং পথের কষ্ট–ক্লেশের কাছে হার না মেনে প্রতিটি বাঁক থেকে নয়া উদ্যম ও

---

১. সূরা আনকাবুত : আয়াত ৬৯

প্রত্যেক সঙ্কট থেকে নতুন হিম্মতের রসদ নিয়ে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা চাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসলাহে নফসের সহজ উপায়

আমাদের মাশায়েখ বলেন, আত্মশুদ্ধির সহজ উপায় হলো, যেহেতু নফ্স স্বাদের পাগল, তাই তোমরা স্বীয় নফ্সকে ইবাদাতের মজা আস্বাদন করাও। তাহলে নফ্স আপনা-আপনিই সংশোধিত হয়ে যাবে।

শায়েখের কথাটি একদম সত্য। ইবাদাতের মধ্যেও এক ধরনের মজা থাকে। যদিও আমরা বিষয়টি জানি না বা অনুধাবন করি না। যেভাবে দস্তরখানে থাকা খাবারের ভিন্ন-ভিন্ন স্বাদ থাকে, তেমনি যিকিরের মজা এক ধরনের, কুরআন তেলাওয়াতের মজা আরেক ধরনের, তাহাজ্জুদের মজা ভিন্ন, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার মজা আলাদা, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে দাওয়াত দেওয়ার একটি মজা রয়েছে। নবীজির প্রতি দুরুদ পাঠের রয়েছে এক মজা। রাতের শেষ প্রহরে ঘুম থেকে জেগে স্বীয় গুনাহের কথা স্মরণ করে-করে কান্নাকাটির মধ্যেও মজা রয়েছে। একেক ইবাদাতের মজা একেক ধরনের। কিন্তু সকলের এই মজা অনুভূত হয় না। যারা মজা পায় এবং তা অনুভব করে, তারা ইশার ওজু দ্বারা ফজরের নামায পড়েন। অন্যরা ঘুমিয়ে যে মজা পায়, তারা সারা রাত না ঘুমিয়ে সেই মজা পান। মজা পান বলেই তাদের পক্ষে এভাবে রাত জাগা সহজ হয়ে যায়। সাহস হলে এভাবে রাত জেগে দেখান তো কেমন লাগে!

আল্লাহর মহব্বতের কষ্টিপাথর

রাতের পর রাত জেগে জায়নামাযে বসে থাকা কি এতই সহজ? জায়নামাযে বসে রাত পার করা সহজ কাজ নয়। সে-ই এভাবে বসতে পারে, যার দিল আল্লাহর সঙ্গে মিলিত। নতুবা জায়নামাযে বসে থাকা বড়ই কঠিন কাজ। আপনি কি যুবকদের দেখেন না, ধরে-বেঁধে তাদের মসজিদে আনা হয় আর সালাম ফিরাতেই তারা উঠে দৌড় দেয় এবং জামা-প্যান্ট ঠিক করতে করতে এমন খুশি হয়, যেন জেলখানা হতে সদ্য মুক্তি পেয়েছে। তাদের এই অবস্থা-ই বলে দেয়, জায়নামাযে বসা কোনো সহজ কাজ নয়।

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) বলতেন, জায়নামাযে বসা একথার কষ্টিপাথর যে, আমাদের দিলে আল্লাহর মহব্বত অনেক। যেলোক শান্তভাবে নামায পড়ে, শান্তভাবে তেলাওয়াত করে, শান্তভাবে তাসবীহ পড়ে এবং

মসজিদের সঙ্গে তার সখ্য প্রগাঢ়, এগুলো এরই প্রমাণ যে, তার দিলে আল্লাহর মহব্বত বিদ্যমান।

ভাঙ্গা মনের ফযিলত

আমার বন্ধুগণ! স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশীভূত করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) বলতেন, তাসাওউফ ও সুলুকের সারনির্যাস হলো মনোবৃত্তিকে দলিত-মথিত করা। মানুষ যখন তার মনোবৃত্তিকে পদদলিত করে, তখন তার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। মন ভেঙে চুরমার হলে আল্লাহর পক্ষ হতে রহমতের দরজা খুলে যায়। এ কারণেই আল্লাহপাক বলেছেন–

اَنَا عِنْدَ مُنْكَسِرَةِ الْقُلُوْبِ

'আমি ভাঙা মনের কাছে থাকি।'

অর্থাৎ আমাকে যদি খুঁজতে হয়, তাহলে ভাঙা হৃদয়ে খুঁজে ফিরবে। তাহলে আমাকে পেয়ে যাবে। কারণ, মানুষের দিল যখন ভেঙে গুড়িয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলার মনে দয়া জাগে।

একটি মজার ঘটনা

কিতাবে একটি আজব ঘটনা লেখা আছে। ঘটনাটি হলো–

এক মহিলা অত্যন্ত চরিত্রবতী ও নেককার ছিলেন। তার মনের একান্ত আগ্রহ ছিল স্বপ্নে নবীজির দর্শন লাভ। তিনি দুরুদ শরীফও বেশি-বেশি পড়তেন। কিন্তু দীর্ঘদিনেও যেয়ারত লাভ হয় না। তার স্বামী আল্লাহওয়ালা ছিলেন। একদিন মহিলা তার স্বামীর কাছে তার বাসনার কথা প্রকাশ করলেন যে, নবীজিকে দেখতে আমার খুব মন চায়। কিন্তু দীর্ঘদিনেও আমার আশা পূরণ হচ্ছে না। আপনি আমাকে কোনো আমল বাতলে দিন, যা পালন করে আমি স্বপ্নে নবীজির দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করব।

স্বামী বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাকে আমল তো বলে দেব, কিন্তু তোমাকে আমার কথা মানতে হবে। মহিলা বললেন, ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন, আমি তা মানর। স্বামী বলল, তুমি সুন্দর করে সাজ-সজ্জা করে নববধূর মতো হয়ে যাও। মহিলা বলল, ঠিক আছে, তাই-ই করছি। মহিলা গোসল করলেন। নববধূর মতো পোশাক পরলেন। অলঙ্কার পরলেন। তারপর ঘরে বসে থাকলেন।

যখন মহিলা নববধূর মতো সেজে ঘরে বসে থাকল, তখন তার স্বামী মহিলার ভাইয়ের বাড়িতে গেল এবং তাকে বলল, দেখে এসো, আমার বয়স কত হয়েছে আর তোমার বোন এ বয়সে কেমন করে সেজেছে! মহিলার ভাই এসে দেখল। ঘটনা তো সত্য। তার বোন বুড়ো বয়সে নববধূর মতো সেজে বসে আছে।

বোনকে এই অবস্থায় দেখে ভাই ধমকাতে শুরু করল যে, তোর লজ্জা লাগে না, বুড়ো বয়সে নববধূর মতো সেজেছিস! তোর চুল পেকে গেছে, কোমর বেঁকে গেছে, অথচ বিশ বছরের মেয়ের মতো সেজেছিস?

মহিলা ভাইয়ের ধমক ও শাসনে চুপসে গেল। তার হৃদয় ভেঙে খান-খান হয়ে গেল। মহিলা কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে-কাঁদতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

এবার আল্লাহর শান দেখুন। আল্লাহপাক ওই ঘুমের মধ্যে নবীজির সঙ্গে মহিলার সাক্ষাত করিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ! স্বপ্নে নবীজিকে দেখে মহিলা খুবই খুশি হলেন। স্বামীকে জানালেন, আপনি আমাকে কী যেন আমলের কথা বলতে চাইলেন, অথচ তার আগেই আমি নবীজির দর্শন লাভ করেছি।

স্বামী বলল, আল্লাহর বান্দী! এটাই ছিল আমার আমল। কেননা, আমি তোমার জীবনের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিয়েছি। তোমার ভালো দিকসমূহ আমার নজর পড়েছে। তোমার জীবন সুন্নত ও শরীয়ত মোতাবেক দেখেছি। অবশ্য আমি অনুভব করেছি, আমি যেহেতু তোমার সঙ্গে হৃদ্যতামূলক জীবন যাপন করি, তাই তোমার দিল কখনো ভাঙেনি। এ কারণে আমি চিন্তা করলাম, তোমার দিল যদি কোনো কারণে ভাঙে, তাহলে তখন তাতে আল্লাহর রহমত নাযিল হবে এবং তোমার মনোবাসনা পূরণ হবে। এজন্য আমি একদিকে তোমাকে নববধূর মতো সাজতে বলেছি আর অপরদিকে তোমার ভাইকে ডেকে এনেছি; যাতে সে এসে তোমাকে বকাঝকা করে আর তাতে তোমার মনটা ভেঙে খানখান হয়ে যায়। আর বাস্তবেও হয়েছে তা-ই। তোমার ভাই তোমাকে বকা দিলে তাতে তুমি দুঃখ পেয়েছ এবং সে দুঃখে কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছ। ফলে তোমার ভাঙা হৃদয়ের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হয়েছে, যার কারণে আল্লাহ তোমাকে নবীজির দর্শন লাভের সৌভাগ্য লাভে ধন্য করেছেন।

আল্লাহু আকবার!

কুরআনী ফয়সালা

আমার বন্ধুগণ! মনোবৃত্তি ধ্বংস করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা নিছক ফযীলতের কাজ নয়; বরং ফরজ কাজ। একেই বলে আত্মশুদ্ধি।

এ ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেন–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

'সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে। আর ব্যর্থকাম হবে সেই। যে তাকে (গুনাহের মধ্যে) ধসিয়ে দেবে।'[১]

এ আয়াতে আত্মশুদ্ধি ফরজ হওয়ার ব্যাপারে কুরআনী ফয়সালা অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য একাজ প্রত্যেকের জন্য জরুরি।

ঈমানের হেফাযত

মানুষ যে জিনিসের গুরুত্ব দেয়, তা হেফাযত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কেননা, সে জানে, এটি আমার দরকারি জিনিস। এমনিভাবে ঈমান বাঁচানো আমাদের জন্য জরুরি। আমাদের চেয়ে সেই অন্ধ অনেক গুণ ভালো ছিল। একটি ঘটনা শুনে নিন।

একলোক অন্ধ ছিল। সে তার মাথায় পানির কলসি রেখে চলছিল। রাতের বেলা ছিল। কিন্তু আজব কথা হলো, অন্ধ রাতের আঁধারে তার হাতে একটি বাতি নিয়ে পথ চলছিল। পথের লোকজন তার এই অবস্থা দেখে বিস্মিত হলো। একলোক তাকে বলল, তুমি তো পা মেপে-মেপে পথ চলছ, তোমার পথ চলতে আলোর তো কোনো প্রয়োজন নেই, তাহলে তুমি আলো নিয়ে চলছ কেন? অন্ধ লোকটি বলল, আপনি সত্যই বলেছেন। বাস্তবিকই আমার আলোর প্রয়োজন নেই। কেননা, আমি রাস্তায় চলতে-চলতে এভাবে তা মেপে ফেলেছি যে, মাপা পথ মাড়িয়ে সোজা গন্তব্যে গিয়ে পৌছব। তবে আমি যে চেরাগ বা বাতি সঙ্গে নিয়েছি, এটা চক্ষুষ্মানদের জন্য, যাতে এমনটি না হয় যে, কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অন্ধকারে পথ চলছে আর সে অন্ধকারে আমাকে না দেখে আমাকে ধাক্কা দিবে এবং আমার কলসিটা ভেঙে যাবে। তাই আমি কলসি হেফাযত করার স্বার্থে চক্ষুষ্মানদের আলো সরবরাহ করে চলেছি।

---

১. সূরা শামস : আয়াত ৯, ১০

ওই অন্ধের মতো আমাদেরও কর্তব্য হলো, নিজ-নিজ ঈমানের হেফাযত করা। আল্লাহপাক আমাদেরকে ঈমান হেফাযত করার তাওফীক দিন, যাতে আমরা নফ্সকে শরীয়তের লাগাম বেঁধে তাকে আল্লাহর অনুগত ও ভক্ত বানাতে পারি।

জান্নাত দু-কদমের ব্যাপার মাত্র

হযরত বায়েযিদ বোস্তামী (রহ.) স্বপ্নে আল্লাহর দীদার লাভ করে নিবেদন করলেন–

يَا اللّٰهُ! كَيْفَ أَصِلُ إِلَيْكَ

'মাওলা গো! আমি তোমার কাছে কীভাবে পৌঁছব?'

আল্লাহপাক জবাবে বললেন, হে আমার প্রিয়–

دَعْ نَفْسَكَ وَتَعَالَ

'নফ্সকে বর্জন করো আর চলে এসো।'

অর্থাৎ তুমি যদি তোমার একটা পা নফসের উপর রাখতে পার, তবে দ্বিতীয় পা আমার কাছে পৌঁছে যাবে।

বস্তুত এ কারণেই হযরত বায়েযিদ বোস্তামী (রহ.) বলতেন, জান্নাত দু' কদমের ব্যাপার মাত্র। এক মুরীদ জিজ্ঞাসা করল, হযরত! দুই কদম দ্বারা উদ্দেশ্য কী? তিনি বললেন, তুমি একটা পা নফসের উপর রাখো, তাহলে তোমার অপর পা জান্নাতে চলে যাবে।

'লা-হাওলা- এর উপযোগী পরিবেশ

বর্তমানের পরিবেশ আমলী দিক দিয়ে বড়ই করুণ। বরং সত্য কথা হলো, বর্তমানের পরিবেশ মূলত 'লা হাওলা' বলার যোগ্য। অর্থাৎ এমন পরিবেশ, যার থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া উচিৎ।

ঘরের পরিবেশ ভালো হলেও স্কুল-কলেজে যাওয়ার কারণে ওই ভালো আর ভালো থাকে না। ভালোর স্থান মন্দ দখল করে নেয়। স্কুলে যাওয়া পর্যন্ত বাচ্চা ছোট থাকার কারণে ভালো থাকে। কিন্তু যখন কলেজে যায়, তখন তারা রূহানীভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেখানে তাদের পরিশুদ্ধ চিন্তা চেতনা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়। এ কারণেই ছাত্ররা এসে জিজ্ঞাসা করে, হযরত! কী করব বলুন, যখন বই খুলে পড়তে বসি, তখন বইতে অক্ষরের পরিবর্তে (সারাদিনের দেখা মেয়েদের) ছবি দেখা যায়।

এক কবি অতি সুন্দর বলেছেন–

کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے

ورق ورق پر تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے

বই খুলে বসি যখন চোখ ভিজে যায়,
চেহারা তোমার দেখি শুধু প্রতি পাতায়-পাতায়।

অসৎ চিন্তার কারণে শাস্তি

মনে রাখবেন, মাথায় পয়দা হওয়া এসব নোংরা খেয়ালের কারণেও মানুষকে সাজা ভোগ করতে হবে। এ কারণে পবিত্র কুরআনে যে বিভিন্ন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে একটা শাস্তি এটাও যে, জাহান্নামীদের মাথায় ফেরেশতারা ফুটন্ত পানি ঢালবে। এ সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন–

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ

'তাদের মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে।'[১]

মাথায় গরম পানি এজন্য ঢালা হবে যে, মাথার মধ্যে মনোবৃত্তি, শয়তানি এবং যৌনবৃত্তির নোংরা ধ্যান-ধারণা গিজগিজ করত আর সে ওসব নষ্টামি ও নোংরামিকে মাথায় জমিয়ে রাখত।

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ

'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এই মর্মান্তিক পরিণতি থেকে হেফাযত করুন।'

ইসলাহে নফ্সের জন্য দু'আ

নফসের ইসলাহ তথা আত্মশুদ্ধি অতীব জরুরি। কেননা, নফসের ধর্মই হলো বেয়াড়া হওয়া, বাগে না আসা। তাই তাকে বাগে আনতে আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে হয়। আর মাথায় যদি এ চিন্তা থাকে, তাহলে শেষ রাতে চোখ আপনা-আপনিই খুলে যায় এবং সে আল্লাহর দরবারে দু'আ করে, হে আল্লাহ! নফ্সকে কাবু করতে আমাকে সাহায্য করুন!

মনে রাখবেন, যতদিন এই উম্মত রাতে উঠে কান্নাকাটি করার ধারা অব্যাহত রেখেছিল, ততদিন তাদের দিন ছিল আনন্দোজ্জ্বল। কিন্তু বর্তমানে

---

১. সূরা হজ : আয়াত ১৯

যেহেতু উম্মত রাত ঘুমিয়ে কাটায়, তাই সারা দিন তাদের কেঁদে-কেঁদে পার হয়।

তাহাজ্জুদের তাওফীক লাভের জন্য দু'আ

একটি ছোট্ট কথা মনে রাখবেন। তা হলো, যদি ক্লান্ত হন, ঘুম প্রবল হয় এবং শেষ রাতে উঠতে না পারেন, তবে রাতে তো অবশ্যই কয়েকবার জাগেন। কোনো কারণে পাশ বদল করতে চোখ খুলে যায়। যাদের তাহাজ্জুদের তাওফীক হয় না, তারা একটি কাজ করবেন যে, পাশ বদলের জন্য জাগ্রত হলে ওই মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে তাহাজ্জুদের তাওফীকের জন্য দু'আ করবেন। এটি ছোট কথা হলেও এর ফায়দা এই হবে যে, ক্ষণিকের এই দু'আও আপনাকে আল্লাহর দরবারে মকবুল বানিয়ে দিবে। আমার শায়েখ একথাও বলতেন, যে মহিলা ফজরের আজানের আগে উঠে ঘর ঝাড় দেয় অথবা রুটি বানায়, সেও আল্লাহর রহমত হতে ফায়দা লাভ করে থাকে।

আল্লাহপাকের মূল্যায়ন

আল্লাহপাক খুবই মূল্যায়নকারী। তিনি কারো আমল বিনষ্ট করেন না। এর প্রমাণ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। আল্লাহপাক নিজেই বলেন–

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى

'পুরুষ-মহিলা কারো আমল আমি নষ্ট করব না।'[১]

আল্লাহপাকের এই ঘোষণার বাস্তব প্রমাণ পবিত্র কুরআনেও বিদ্যমান। আর তা এভাবে যে, ফেরাউন আল্লাহপাকের এমন শত্রু ছিল যে, সে স্বয়ং খোদা হওয়ার দাবি করেছিল। সে বলত-

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

'আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'[২]

সে খোদায়ী দাবি করে আল্লাহর সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিল। বড় শত্রু হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর প্রাক্কালে নিজের চোখে করুণ পরিণতি দেখে বলেছিল–

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯৫

২. সূরা নাযি'আত : আয়াত ২৪

'আমি স্বীকার করলাম, বনী ইসরাঈল যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমিও অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।'[১]

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, আল্লাহপাক এত মূল্যায়নকারী যে, এত বড় দুশমন একটি বাহ্যিক অবস্থা দেখে বাহ্যিকভাবে ঈমান এনেছিল মাত্র, কিন্তু আল্লাহপাক এর বদলা হিসেবে তার দেহটা সংরক্ষণ করেন। কেমন যেন আল্লাহ বলছেন, যদি তুমি আরেকটু আগে ঈমান আনতে, তাহলে আমি তোমার ঈমানও হেফাযত করতাম। কিন্তু যেহেতু মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল আর দুচোখে মৃত্যুর আগমন দেখে তুমি ঈমান এনেছিলে, তাই তোমার ঈমান হেফাযত না করলেও আমি তোমার দেহটা হেফাযত করলাম।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

'সুতরাং আজ আমি তোমার (কেবল) দেহটা বাঁচাব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তী কালের মানুষের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক।'[২]

যে আল্লাহ এত বড় দুশমনের বাহ্যিক শব্দকে উপলক্ষ্য বানিয়ে দেহ হেফাযত করলেন, তিনি মুমিনদের আমলকে উপলক্ষ্য বানিয়ে তাদের ঈমানকে কেন হেফাযত করবেন না?

একটি ইল্‌মি তথ্য

নফ্‌স যেকোনো সময় মানুষের উপর আক্রমণ করতে পারে। তার হামলার সময় নির্দিষ্ট নেই। এ কারণে নফ্‌স সম্পর্কে সর্বক্ষণ সজাগ ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এরই নাম ইস্তেকামাত তথা অবিচলতা। মানুষের মাঝে দৃঢ়তা থাকা চাই। একটি ইল্‌মি তথ্য শুনুন।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে আবুতালেবের কাছে এসে নবীজির নামে একযোগে অভিযোগ তুলল। পরিশেষে তারা আবুতালেবকে নবীজিকে দাওয়াতি মিশন থেকে নিবৃত্ত করতে প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিল, যার কারণে আবুতালেব প্রিয় ভাতিজা নবীজিকে ডেকে দাওয়াতি মিশন স্থগিত রাখার কথা বললেন। তখন নবীজি কুরাইশদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় চাচাকে তার প্রত্যয়দীপ্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন।

---

১. সূরা ইউনুস : আয়াত ৯০

২. সূরা ইউনুস : আয়াত ৯২

তিনি বললেন–

'চাচাজান! যদি তারা আমার এক হাতে সূর্য আর অপর হাতে চাঁদও এনে দেয়, তবুও আমি ওই বার্তা পৌঁছানো হতে পিছু হটব না, যা নিয়ে আমি এসেছি।'

আমরা যারা সাধারণ বুদ্ধির মানুষ, তারা মনে করি, চন্দ্র, সূর্য যেহেতু অনেক ভারী জিনিস, তাই নবীজি উপমায় তাদের কথা টেনেছেন। কিন্তু আরেফীন ওলামায়ে কেরাম এ দৃষ্টান্তের আরও কিছু তাৎপর্যময় ব্যাখ্যা লিখেছেন। তারা বলেন, নবীজি চন্দ্র-সূর্যের উপমা দেওয়ার কারণ হলো-

* চাঁদ এমন জিনিস, যার থেকে দৃষ্টি সরে না এবং সূর্য এমন জিনিস, যার উপর নজর স্থির হয় না।

* চাঁদ থেকে শীতলতা লাভ হয় আর সূর্য থেকে লাভ হয় উত্তাপ।

* চাঁদে রয়েছে সৌন্দার্যাকর্ষণ আর সূর্যে রয়েছে প্রতাপের বিকর্ষণ।

চাঁদ-সূর্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার পর ওলামায়ে কেরাম বলেন, নবীজির উক্তি 'যদি তারা আমার এক হাতে সূর্য আর অপর হাতে চাঁদ এনে দেয়' এমনটি বলার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই বার্তা দেওয়া যে-

'সম্মানিত চাচাজান! যদি তারা আমাকে ভয় দেখায়, ধমকায় তথা প্রতাপ-প্রভাব প্রদর্শন করে অথবা আমাকে সুন্দরী রমণীর প্রলোভন দেয় তথা সৌন্দর্যাকর্ষণ দেখায়, তাহলে আমি তাদের নরম-গরমের প্রতারণার কারণে আমার আনীত খোদায়ী পয়গাম মানুষের দ্বারে-দ্বারে পৌঁছানো হতে বিরত হব না।

সারকথা হলো, নবীজি উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে কুরাইশদের সকল প্রলোভন দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণা দেন। তার এই ঘোষণা চাচা আবুতালিব ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দের জন্য এই বার্তা বহন করে যে, তিনি যেকোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করার এবং দমবার পাত্র নন এবং স্বীয় গুরুদায়িত্ব পালন হতে তিনি এক চুলও পিছু হটবেন না।

একেই বলে দৃঢ়তা। এরই নাম অবিচলতা। আমাদেরও এমন দৃঢ়তা দেখাতে হবে নফসের বিরুদ্ধে। নফসের আগ্রাসন যেকোনো মূল্যে রুখে দাঁড়াবার ইস্পাতদৃঢ় শপথ নিতে হবে আমাদের। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

ইসলাহে নফসের অর্থ

নফসের ইসলাহ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, মানুষ হাওয়ায় ওড়া শুরু করবে। অথবা ক্ষুধা লাগা বন্ধ হয়ে যায়। সে তো পূর্ববৎ মানুষই থাকে। মানবিক প্রয়োজন তার সঙ্গেই থাকে। তবে প্রভেদ এই হয় যে, তার জীবন শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক হয়ে যায়। তার চিন্তা-চেতনা, ওঠা-বসা, আচার-ব্যবহার এমনকি তার প্রতিটি আমল নবীজির মোবারক তরিকায় সম্পাদিত হয়। এ কারণে সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রথম ধাপ ও শেষ ধাপের লোকদের মাঝে ফারাক করা কঠিন হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ ঘোরে কারামতের পিছনে। কোনো ম্যাজিশিয়ান ও জাদুকর যদি তাদের কোনো ম্যাজিক ও ভেল্কিবাজি দেখায়, তবে তাতে তারা বড় খুশি হয়।

প্রথম ও শেষ ধাপের সালেকদের মধ্যে পার্থক্য

সুলুকের লাইনের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, যেলোক নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সঁপে দিবে অথবা নিজেকে পূর্ণাঙ্গভাবে ফানা করে ফেলবে, তার বাহ্যিক জীবন মনে হবে অতি সাধারণ। কিন্তু তার বাতেন সর্বক্ষণ আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে থাকবে। সবসময় তার মধ্যে 'রুজু ইলাল্লাহ' তথা আল্লাহমুখিতার অবস্থা বিরাজ করবে। তার দিলে সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণ থাকে। তার একটি কাজও শরীয়ত ও সুন্নতের খেলাফ হয় না। তার বাহ্যিক জীবন দেখলে মনে হয় অতি সাধারণ মানুষ। এ কারণে সাধারণ মানুষ তাকে চিনতে না পারায় ধোঁকা খেয়ে যায়। এর থেকে জানা গেল, আল্লাহর ওলীদের সবাই চিনতে পারে না। এক বুযুর্গ বলতেন-

یااللہ! یہ راز کیا راز ہے کہ جس بندے سے تو خوش ہوتا ہے تو اس کو اپنے اولیاء کی پہچان دے دیتا ہے اور جس سے تو ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل سے اولیاء کی پہچاں نکال دیا کرتا ہے

'হে আল্লাহ! তোমার এই রহস্য ও ভেদ বুঝি না যে, যার প্রতি তুমি খুশি হও তার অন্তর থেকে ওলীদের পরিচয় জানিয়ে দাও। আর যার প্রতি তুমি নাখোশ হও তার অন্তর থেকে ওলীদের পরিচয় বের করে দাও।'

বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝুন। একটি নদীর দুটি কিনারা। প্রথম ধাপের সালেক প্রথম কিনারায় আছে। আর শেষ ধাপের সালেক নদী পেরিয়ে অপর কিনারায় আছে। এখানে যদি শুধু কিনারা বিবেচনা করা হয়, তাহলে

দুজনেই সমান। দুজন দুই কিনারায় আছে। কিন্তু যদি মর্তবার দিকে তাকানো হয়, তাহলে প্রভেদ অনেক। একজন দরিয়া এখনও পাড়ি দেয়নি আর অপরজন পাড়ি দিয়ে অপর পাড়ে চলে গেছে। এটাই হলো প্রথম স্তর ও শেষ স্তরের পার্থক্য। শেষ স্তরে যে থাকে, সে আত্মশুদ্ধি করে নফ্সকে শরীয়তের লাগামবন্দী করে ফেলেছে। অথচ প্রাথমিক সালেকের যাত্রা এখনও শুরুই হয়নি।

যারা কাফের, তারা এখানেই ভুলের শিকার হয় এবং প্রতারণায় পড়ে। তারা নবীজির মুবারক যিন্দেগী দেখে চিন্তায় পড়ে যায় যে, যিনি নবী হবেন তার সঙ্গে তো ফেরেশতা থাকবেন; তার গতি-প্রকৃতিই বলে দিবে, ইনি আল্লাহর নবী। মানুষ নবীজিকে দেখত আর হয়রান হয়ে বলত-

مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ؟

এ আবার কেমন নবী? খায়-দায় আবার বাজারেও যায়?[১]

নবীজির জীবন কাফেরদের দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের মতো মনে হতো। তাই বেচারাদের সন্দেহ সৃষ্টি হতো। নবীজির জীবন এত সাদামাটা হতো যে, আগন্তুকরা চিনতই না, নবী কোনজন? তাদের জিজ্ঞাসা করতে হতো–

مَنْ مِنْكُمْ مُحَمَّدٌ؟

'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কোনজন?'

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, নামাযে সাজদায়ে সাহু সব ধরনের লোকদের ক্ষেত্রে ঘটে। অবশ্য একেকজনের কারণ একেকটি হয়। যারা প্রথম স্তরের মুমিন, মনোবৃত্তি, শয়তানি ও যৌনবৃত্তিক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকার কারণে তাদের ভুল হয়ে যায়। আর যারা উচ্চ স্তরের সালেক হয়, তাদের বিস্মৃতি ঘটে আল্লাহতে ডুবে যাওয়ার কারণে। অর্থাৎ তাদের চিন্তা-চেতনায় আল্লাহর স্মরণ এত প্রবল হয়ে যায় যে, তারা রাকাতসংখ্যা ভুলে যান। বাহ্যিকভাবে তো উভয়েই সমান; কিন্তু বাতেনিভাবে কত বিশাল পার্থক্য!

নাম ও কাজের মধ্যে অমিল

এই মজলিস হতে আমরা পাক্কা ইরাদা করে নিই যে, আমরা অবশ্যই আমাদের নফসের চাহিদা জবাই করে দিব। ইবাদাতের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিব এবং তার মুখে শরীয়তের লাগাম পরিয়ে দিব।

---

১. সূরা ফুরকান : আয়াত ৭

নতুবা অনেক সময় এমন ঘটে যে–

* নাম হয় ইব্রাহীম অথচ কাজ করে নমরুদের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

* নাম হয় মূসা অথচ জুলুমে ফেরাউনকেও ছাড়িয়ে যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল

বর্তমান অবস্থা হলো, মানুষ স্বপ্ন দেখে নিজের ভক্ত হয়ে যায়। তারা মনে করে, আমরা যে স্বপ্ন দেখি, তার শতভাগই সত্য। কত বড় আজব কথা যে, মানুষ অপরের দোষ-ত্রুতির ব্যাপারে সন্দেহবশত তাদের খারাপ জ্ঞান করে এবং তাদের ঘৃণা করে আর নিজের মধ্যকার দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও নফ্সকে মহব্বত করে। এ কারণে নফসের শায়েস্তা করা সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ আমল।

আল্লাহপাক আমাদেরকে আত্মশুদ্ধি অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমাদের জীবনকে আদবের সঙ্গে, যিকির-আযকারের সঙ্গে এবং আল্লাহ-অভিমুখিতার মাধ্যমে কাটানোর তাওফীক দান করুন। এতক্ষণ বসে যে আলোচনা শুনলাম, তার উসিলায় আমাদের 'ইসলাহী জীবন' দান করে ধন্য করুন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ

'রমযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।'

–সূরা বাকারা : ১৮৫

মাহে রমজানের ফযিলত

[১৪২২ হিজরীর ২১ শে রমযান মোতাবেক ২০০১ সনের ৬ই ডিসেম্বর মসজিদে নূর লোসাকায় (জাম্বিয়া) এ বয়ান হয়। এতে অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।]

'হাদীছ শরীফে এসেছে, মাহে রমযান পুরো বছরের কলব। যদি রমযান মাস ঠিক থাকে, তাহলে সারা বছর ঠিক থাকবে। এ কারণেই ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) স্বীয় মাকতুবাতে বলেন, রমযান মাসে এত বরকত নাযিল হয় যে, এ মাসের বরকত সমুদ্রের মতো আর সারা বছরের বরকত সেই তুলনায় সমুদ্রের একটা ফোঁটারও সমান নয়।'

মাহে রমজানের ফযিলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

رمضان এর শাব্দিক অর্থ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

'রমযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।'[১]

رمضان শব্দটি উদ্ভুত হয়েছে رمض থেকে। এর শাব্দিক অর্থ তীব্রতা ও কাঠিন্য। যেমন আরবীতে বলা হয়–

رَمِضَ يَوْمُنَا اَىْ اِشْتَدَّ حَرُّهٗ

'আজকের গরম খুবই তীব্র।'

এমনিভাবে কোনো পাখি মারাত্মক পিপাসার্ত হওয়ায় যখন লম্বা-লম্বা শ্বাস নিতে থাকে, তখন আরবীতে বলা হয়–

رَمِضَ الطَّائِرُ

'পাখিটা খুবই তৃষ্ণার্ত।'

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৫

চাশতের নামায সাধারণত বেলা ১০টায় পড়া হয়। এ নামায সম্পর্কে এসেছে–

صَلَاةُ الضُّحٰى حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

'এটি সেই নামায, যা পড়ার সময় উটনীর বাচ্চার পা গরম হয়ে যায়।'

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম বলেন–

شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلٰوةُ فِيْ رَمْضَاءَ

'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুযোগ করলাম, নামাযের সময়ে তীব্র গরম পড়ে।'

মূলত জোহরের নামাযের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম এই অনুযোগ পেশ করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! জোহরের সময়ে তো তীব্র গরম পড়ে!

رمضان শব্দটি فعلان এর ওজনে اسم جنس কতক আলেম বলেন, رمضان শব্দের মধ্যেই এই বার্তা রয়েছে যে, মানুষ নিজের উপর শত-সহস্র জুলুম করেছে। যেসব গুনাহের তীব্রতার কারণে আগুন জ্বলছিল। রমযান মাসকে আগুনের ওই তীব্রতা প্রশমনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

রোযার শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

রোযাকে আরবীতে 'সাওম' বলে। এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা।

হযরত মারয়াম (আ.) কথা বলা বন্ধ করে দিলে লোকেরা তাকে কথা বলতে বললে তিনি ইশারায় বললেন–

إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا

'আজ আমি দয়াময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি রোযা মানত করেছি।'[১]

তাঁর এই রোযা পানাহার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে ছিল না; বরং কথা বলা হতে বিরত থাকাই ছিল তার রোযা। এমনিভাবে কোনো ঘোড়া যদি চলতে-চলতে থেমে যায় এবং ক্লান্তিতে চুর হওয়ায় আর চলতে না পারে, তখন আরবীতে এমন ঘোড়াকে বলা হয় صائم

আরবের লোকজন তাদের ঘোড়া জিহাদের জন্য প্রস্তুত করত। যেহেতু যুদ্ধের সময় ঘোড়ার জন্য দানা-পানির ব্যবস্থা হতো না, তাই তারা ঘোড়ার

---

১. সূরা মারয়াম : আয়াত ২৬

প্রশিক্ষণের জন্য গরমের মৌসুমে ঘোড়াকে দানা-পানি দেওয়া হতে বিরত থাকত। একেও আরবীতে صائم বলে।

শরীয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদেকের শুরুলগ্ন হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা ও যৌনমিলন থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলে।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) রোযার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন–

وَفِي الشَّرْعِ : اِمْسَاكٌ مَخْصُوْصٌ فِيْ زَمَنٍ مَخْصُوْصٍ عَنْ شَيْءٍ مَخْصُوْصٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ.

'নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট বস্তু হতে বিরত থাকার নাম রোযা।'

রোযার নিয়ত করার সময়

রোযার জন্য নিয়ত শর্ত। কেউ নিয়ত ছাড়া পানাহার বর্জন করলে সে রোযার ছাওয়াব পাবে না। যেহেতু মুসলমানরা নিয়ত করে, আমি রমযানের রোযা রাখছি, তাই এমন নিয়ত সারা রমযানের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, রোযার নিয়ত করার উত্তম সময় হলো, এক রোযার ইফতার করার সময়েই সামনের দিনের রোযার নিয়ত করে নেওয়া। অর্থাৎ ইফতারের সময়েই মনে-মনে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করা যে, আমি আগামীকালও রোযা রাখব। এই নিয়তের অর্থ এ নয় যে, এমন নিয়তের পরে আর খানাপিনা করা যাবে না; বরং সুবহে সাদেক পর্যন্ত পানাহার করা যাবে।

ইমাম জাফর সাদেক (রহ.)-এর তাহকীক

রমযান এমন একটি মাস, যার প্রথম রাতেই জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। কাযবীনী (রহ.)-এর কিতাব عجائب المخلوقات এ একটি আজব কথা লেখা আছে। তা হলো, ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) বলতেন, প্রত্যেক রমযানের পঞ্চম দিনটি পরবর্তী রমযানের প্রথম দিন হয়। তিনি এ রীতি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন, পঞ্চাশ বছর যাবত এ বিষয়টি পরীক্ষিত। ঠিকই এক রমযানের পঞ্চম দিন পরবর্তী রমযানের প্রথম দিন হয়। বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। অথচ এক হাজার বছর আগেই

আমাদের শায়েখগণ কেমন সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। এ যুগেও আপনি এই তত্ত্বটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। চলতি রমযানের পঞ্চম দিনটি ঠিকই আগামী বছর রমযানের প্রথম দিন হবে।

মাহে রমযান পাওয়ার মাসনুন দু'আ

হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দু'আ করতেন-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

'হে আল্লাহ! রজব ও শা'বান মাসে আমাদের বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে মাহে রমযানে পৌঁছিয়ে দিন।'

বর্তমানে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম, যারা রমযানের এক-দুই মাস পূর্ব হতে এই দু'আ করেন। তাই আফসোসের সঙ্গে বলতে হয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নতটি মুর্দা হতে চলেছে।

মাহে রমযানের জন্য অধিক গুরুত্বারোপ

ইবনুল ফজল একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। তিনি বলেন, আমাদের যুগে মাহে রমযানকে এত গুরুত্ব দেওয়া হতো যে-

كَانُوْا يَدْعُوْنَ اللّٰهَ سِتَّةَ اَشْهُرٍ اَنْ يُّبَلِّغَهُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ يَدْعُوْنَهُ سِتَّةَ اَشْهُرٍ اَنْ يَّتَقَبَّلَهُ مِنْهُمْ

'আমরা ছয় মাস যাবত দু'আ করতাম, আল্লাহ যেন আমাদেরকে রমযান মাসে পৌঁছিয়ে দেন। আর যখন রমযান মাস চলে যেত, তখন বাকি ছয় মাস দু'আ করতাম, হে আল্লাহ! আমাদের থেকে রমযান মাসকে কবুল করুন।'

সারা বছরের প্রাণ

হাদীছ শরীফে এসেছে, মাহে রমযান পুরো বছরের কলব। যদি রমযান মাস ঠিক থাকে, তাহলে সারা বছর ঠিক থাকবে। এ কারণেই ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) স্বীয় মাকতুবাতে বলেন–

'রমযান মাসে এত বরকত নাযিল হয় যে, তার বরকত সমুদ্রের মতো আর সারা বছরের বরকত সেই তুলনায় সমুদ্রের একটা ফোঁটারও সমান নয়।'

দু'আ কবুলের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হতে বর্ণিত–

إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عُتَقَاءُ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يَعْنِيْ فِيْ رَمَضَانَ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.

'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দিন ও রাতে জাহান্নামীদের জাহান্নাম হতে মুক্তি দেন এবং রমযান মাসের প্রত্যেক দিন ও প্রতি রাতে আল্লাহপাক মুমিনের কোনো-না-কোনো দু'আ অবশ্যই কবুল করেন।'

এখন আমাদের কাজ হলো, আমরা আল্লাহর কাছে চাইব। অনেক চাইব। দু'আ কবুলের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। যারা আল্লাহর কাছে চায়, তারা চাইতে-চাইতে ক্লান্ত হয়ে যায়; কিন্তু আল্লাহর খাযানা কখনো শেষ হয় না। প্রার্থীরা যতই নিক না কেন আল্লাহর খাযানা হতে মোটেও কমে না।

ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے

بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے

আত্মীয়তার সম্পর্ক করলে মুক্ত
আল্লাহ তা করেন যুক্ত।

اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے

لاکھو مانگو کروڑ دیتا ہے

তার দয়ার নেই কোনো জুড়ি
চাইলে লাখ দেন তিনি কোটি।

আল্লাহর রহমত চাওয়ার উপর নির্ভরশীল। যেমন চাওয়া হবে তেমন মিলবে। আল্লাহর বান্দাগণ! দুনিয়াদাররাও ফকীরের বেশ অবলম্বন করে। যদি রমযান মাসে কোনো লোক নেককারের বেশ অবলম্বন করে আল্লাহর কাছে চায়, তাহলে আল্লাহ তার আবেদনে কেন সাড়া দিবেন না? অবশ্যই দিবেন। দরকার হলো সেভাবে চাওয়ার।

ইবাদাতের মাস

ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يَحْرُمُ خَيْرَهَا اِلَّا مَحْرُوْمٌ

'এ মাসে একটি রাত আছে, যেটি হাজার মাস ইবাদাত করা হতে উত্তম। যে বান্দা এ রাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়, সে সমস্ত কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। আর এ রাতের কল্যাণ হতে ওই বান্দা-ই কেবল বঞ্চিত হয়, যে প্রকৃতপক্ষেই বঞ্চিত।'

একবার নবীজি বললেন–

اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكَةٍ يَغْشَاكُمُ اللهُ فِيْهِ فَيَنْزِلُ الرَّحْمَةُ وَ يَحُطُّ الْخَطَايَا وَ يَسْتَجِيْبُ فِيْهِ الدُّعَاءَ يَنْظُرُ اللهُ تَعَالٰى اِلٰى تَنَافُسِكُمْ فِيْهِ.

'তোমাদের সকাশে রমযান মাস এসে গেছে। সেটা বরকতময় মাস। এ মাসে আল্লাহ তোমাদের প্রতি মনোযোগী হন এবং তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন। তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করেন। দু'আ কবুল করেন এবং তিনি এ মাসে তোমাদের (সৎকাজের) প্রতিযোগিতা দেখেন।'[১]

تنافس বলে একে অন্যকে ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া। তাই প্রত্যেকের কর্তব্য হলো নেক কাজে পাল্লা দেওয়া, প্রতিযোগিতা করা। যেমন পরীক্ষার হলে প্রত্যেক ছাত্রের কামনা থাকে, আমি ফাস্ট হব। ঠিক এমনিভাবে আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে, যেন আমরা অধিক-থেকে-অধিকতর ইবাদাতকারী হতে পারি।

ইবাদাত কাকে বলে?

এক সাহাবী নবীজির কাছে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মন চায় সবচেয়ে বড় ইবাদাতকারী হতে। নবীজি বলেন, এর উপায় হলো, তুমি সব ধরনের গুনাহ ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি বড় ইবাদাতকারী হতে পারবে। বেশি-বেশি নফল নামায পড়ার ফায়দা তখন হবে, যখন মন হবে ফ্রেশ। যেন এমনটি না হয় যে, মুখে তো বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অথচ মনের ভেতরে থাকে 'কালী দুর্গা'। যে মুখে তাসবীহ পড়ে, সেই মুখে আবার মিথ্যাও বলে। মানুষের মনে কষ্ট দেয়। কোনো কথা বা কাজে মাথা গরম হলে ঘরে কেয়ামত সৃষ্টি করে তোলে।

---

১. তবরানী

মনে রাখবেন, ইবাদাত শুধু লম্বা-লম্বা নফল নামায পড়া এবং তাসবীহ জপার নাম নয়; বরং নিজেকে সম্পূর্ণ গুনাহমুক্ত রাখার নামও ইবাদাত। এমন বান্দা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়ে থাকে।

রোযাদারদের মর্যাদা

ইমাম বুখারী (রহ.) একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন–

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ رَيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ لَايَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَقُوْمُوْنَ لَايَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ وَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ وَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ.

'জান্নাতে রাইয়্যান নামে একটি দরজা আছে। সেই দরজা দিয়ে রোযাদাররা প্রবেশ করবে। অন্যরা তা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তাদের সঙ্গে আর কেউ প্রবেশ করবে না। যখন তারা প্রবেশ করবে, সেই দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।'[১]

কোনো-কোনো কিতাবে আছে, যখন মানুষ রাইয়্যান দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে এই আয়াত পড়ে শোনাবেন-

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ

'তোমরা বিগত জীবনে যেসব কাজ করেছিলে, তার বিনিময়ে খাও ও পান করো স্বাচ্ছন্দে।'[২]

উদ্দেশ্য হলো, তোমরা রমযান মাসে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকতে। এখন তোমরা এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করছ। তোমরা আল্লাহর নেয়ামত লাভ করবে। সুতরাং তোমরা এসব নেয়ামত প্রাণভরে উপভোগ করো। যা ইচ্ছা খাও, যত চাও পান করো।

রোযাদারদের জন্য দুটি খুশি

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

---

১. বুখারী

২. সূরা আল হাক্কাহ : আয়াত ২৪

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

'রোযাদারের জন্য দুটি খুশি রয়েছে। যখন সে ইফতার করে, তখন তার খুশি লাগে। কেয়ামতে যখন সে আল্লাহর সঙ্গে দেখা করবে, তখন সে রোযার কারণে আনন্দিত হবে।'

একটি গোপন চুক্তি

রোযা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে একটি গোপন চুক্তিবিশেষ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ

'রোযা আমার জন্য আর তার বদলা দেওয়ার দায়িত্বও আমার।'

অন্যান্য সকল ইবাদাতের ছাওয়াব ফেরেশতা লিখেন। কিন্তু রোযার ব্যাপারে ফেরেশতা লিখে যে, সে রোযা রেখেছে। তার বদলাও প্রতিদান কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা দিবেন।

এতে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব রয়েছে। আর তা এই যে, প্রত্যেক দাতা স্বীয় মর্তবা অনুযায়ী প্রদান করে থাকে। ধরুন, কোনো ভিক্ষুক আমার কাছে হাত পাতলে আমি তাকে আমার সঙ্গতি অনুযায়ী এক টাকা দেব। এই ভিক্ষুক যদি দেশের কোনো শাসকের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাকে এক টাকা দিতে লজ্জাবোধ করবেন। এটাই স্বাভাবিক যে, শাসক তাকে এক হাজার টাকা দিবেন। যদি এই ভিক্ষুক সৌদী আরবের বাদশার কাছে হাত পাতে, তাহলে তিনি তাকে এক হাজার টাকা দিতেও লজ্জাবোধ করবেন। বরং সৌদী বাদশা তাকে এক লাখ টাকা দিবেন। এমনকি আমরা শুনেছি, সৌদীতে কোনো-কোনো ভিক্ষুককে কোটি টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। এর কমে তারা দেন না। যখন দুনিয়াতেই মানুষ স্বীয় মর্তবা ও মর্যাদা হিসেবে দিয়ে থাকেন, তাহলে এর থেকে সহজেই অনুমিত হয়, কেয়ামতে যখন আল্লাহ তা'আলা রোযাদারদের রোযার বদলা দিবেন, তখন তিনিও স্বীয় শান মোতাবেক প্রদান করবেন।

কোনো-কোনো মুহাদ্দিছ লিখেন, হাদীছের শব্দ উক্তরূপ হলেও উচ্চারণ এভাবেও হতে পারে–

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ

'রোযা আমার জন্য এবং রোযার বদলা স্বয়ং আমিই হব।'

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা রোযার প্রতিদানস্বরূপ রোযাদারকে তাঁর দীদার দান করে ধন্য করবেন।

রিয়াহীন ও দৃষ্টান্তবিহীন ইবাদাত

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ

'তোমাদের উপর রোযা রাখা জরুরি। কেননা তার কোনো নজির নেই।'

রোযার ব্যাপারে দুটি কথা মনে রাখতে হবে যে, এটি একটি নজিরবিহীন ইবাদাত। দ্বিতীয়ত এটি একটি রিয়াহীন ইবাদাত। রোযায় রিয়া হয় না। বলতে পারেন, কীভাবে? আমি বলব, এটা এভাবে যে, রোযাদার যখন ওজু করে, তখন সে কুলি করতে মুখে পানি দেয়। এখন যদি সে অর্ধেক পানি গিলে ফেলে এবং বাকি অর্ধেক বাইরে ফেলে, তাহলে কেউ তা টের পায় না। চরম পিপাসার সময় যখন সেই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মুখের পানি না গিলে সবটুকু বাইরে ফেলে দেয়, তখন এটাই প্রমাণ করে যে, সে শুধু আল্লাহর জন্যই রোযা রেখেছে। এজন্য বলি, রোযাতে রিয়ার বিন্দুমাত্র দখল নেই। যেহেতু রোযায় রিয়া থাকে না, তাই আল্লাহ নিজেই তার বদলা হবেন।

রোযা ঢালস্বরূপ

এক হাদীছে বলা হয়েছে–

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ

'রোযা ঢালস্বরূপ।'

রোযা তিন জিনিস হতে ঢাল হয়। যথা–

(১) নফ্স ও শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা হতে ঢাল হয়। কুপ্রবৃত্তির তাড়না যাকে অস্থির করে তোলে, তার জন্য রোযা হলো মধ্যম চিকিৎসা। শয়তানি কুমন্ত্রণায় যেব্যক্তি হাবুডুবু খায়, সে রোযা রাখবে; তাহলে তার যৌননেশা ছুটে যাবে।

(২) দুনিয়াবি পেরেশানি ও বিপদাপদ হতে ঢাল হয়। তাই যেব্যক্তি বেশি-বেশি রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ার মসিবত ও পেরেশানি হতে নিরাপদ রাখবেন।

(৩) কেয়ামতের দিন দোযখের আজাব হতে ঢাল হবে।

রোযা ও কুরআনের শাফাআত

হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'রোযা ও কুরআন কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য শাফায়াত করবে।'

রোযা কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে এই সুপারিশ করবে যে, হে আল্লাহ! এ ব্যক্তির প্রতি আপনি রাজি হয়ে যান। কুরআন শরীফও সুপারিশ করে বলবে, হে আল্লাহ! এই লোক আমাকে তেলাওয়াত করত। তাই তার থেকে আজাব হটিয়ে দিন এবং তাকে জান্নাত দান করুন।

নেক আমলের মৌসুম

দুনিয়ায় বিভিন্ন পেশার এক-একটি মৌসুম রয়েছে। যখন যে পেশার মৌসুম আসে, তখন মানুষ অন্যান্য সকল কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায় এবং মৌসুমকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে তা থেকে ভরপুর উপকৃত হয়। কারণ, সে জানে, আমি যদি কয়েকটা মাস কাজে লাগাই, তাহলে পুরো বছর আরামে থাকতে পারব। রমযান মাসও নেক আমলের মৌসুম। এ কারণে এ মাসে আমাদের বুযুর্গগণ বেশি-বেশি ইবাদাত-বন্দেগী করতেন। দিন-রাত ইবাদাতে ডুবে থাকতেন।

মাগফিরাতের মৌসুম

ছয় ঋতুর মধ্যে একটি ঋতু হলো বসন্ত। বসন্তের মৌসুম এলে চারদিকের সব কিছু সবুজ আর সবুজ দেখা যায়। গাছে-গাছে থাকে শুধু ফুল আর ফুল। সেসব ফুলের গন্ধে চারদিক মৌ মৌ করে। এমনিভাবে রমযান মাস হলো মাগফিরাতের মৌসুম। এ মাসে আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য ক্ষমার ডালি সাজান। রোযাদারদের জন্য পানির মাছ, গর্তের পিপীলিকা এবং আকাশের পাখ-পাখালিরা ক্ষমার দু'আ করে। রোযাদাররা আল্লাহপাকের এত প্রিয় বান্দা যে, তাদের শয়নও হয় ইবাদাত। যখন তারা নিঃশ্বাস নেয়, তখন প্রতি নিঃশ্বাসে তাদের ছাওয়াব দেওয়া হয়। ইফতারের সময় রোযাদারের দু'আ কবুল হয়।

মনে করুন, একলোক খুবই নেককার ও বুযুর্গ। তিনি আপনাকে জানিয়ে দিলেন, আমি স্বপ্নে জেনেছি, অমুক সময়টি দু'আ কবুলের মুহূর্ত। এ সময়ে তুমি যা ইচ্ছা আল্লাহর থেকে চেয়ে নাও, তাহলে আপনি কীভাবে দু'আ

করবেন? অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সাথে কেঁদে-কেঁদে অবশ্যই দু'আ করবেন। কারণ, আপনার সামনে একথা থাকবে যে, এক আল্লাহর ওলী আমাকে জানিয়েছেন, এটা দু'আ কবুলের সময়। একজন ওলীর কথায় যদি আমরা এত আগ্রহ নিয়ে দু'আ করতে পারি, তাহলে এই যিনি ওলী ও নবীদের সর্দার তথা আমাদের নবীজি যখন বলেছেন, ইফতারের সময় রোযাদারের দু'আ কবুল হয়, তাহলে এই সময়টি কত বেশি আগ্রহ ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে আল্লাহর দরবারে দু'আ করা উচিত।

এমনিভাবে নিয়ম হলো, যদি আপনি কাজ করতে কাউকে নিয়োগ করেন আর সে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতে আপনার কাছে মজুরি চায়, তাহলে আপনি অবশ্যই তাকে মজুরি দিয়ে দিবেন। অথচ আমাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে। রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ, কৃপণতা আছে। তারপরও আমাদের মানবতায় বাধে যে, যেলোক সারাদিন কাজ করল, তাকে আমরা খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে পারি না। যদি আমরা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মানুষ হয়ে মজুরের সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণ করতে না পারি, তাহলে যে বান্দা আল্লাহর জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কষ্ট সহ্য করে এবং ইফতারের সময় তার মজুরি নিতে আল্লাহর দরবারে হাত পাতে, তাহলে আল্লাহ তার মজুরি না দিয়ে থাকতে পারেন? কখনো নয়।

আমলে দৃঢ়তা লাভের সোনালী সুযোগ

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, রমযান মাস মানুষের আগত বছরের জন্য নমুনাস্বরূপ হয়। তাই মাহে রমযান যার দৃঢ় আমলের মধ্যে কাটবে, পরবর্তী বছর তার আমলের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবে। পক্ষান্তরে মাহে রমযান যার ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটবে, পরবর্তী সারা বছরই সে ব্যস্ত সময় পার করবে।

যেমন– মনে করুন, কেউ যদি চায়, আমি তাহাজ্জুদের পাবন্দ হব, তাহলে সে যদি পুরো রমযান মাস নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ে, তাহলে পরবর্তী বছর আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন এবং তাকে তাহাজ্জুদে নিয়মিত হওয়ার তাওফীক দিবেন।

এমনিভাবে কেউ যদি কুদৃষ্টির রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে সে পরীক্ষা করে দেখতে পারে, সে যদি পুরো রমযান মাস চোখের হেফাযত করে, তাহলে আল্লাহপাক তাকে আগত বছর নজর হেফাজতের শক্তি দান করবেন।

এমনিভাবে যেলোক মিথ্যার রোগে আক্রান্ত, সে যদি পুরো রমযান মাস মিথ্যা হতে বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে সামনের বছরটায় মিথ্যাচার থেকে হেফাযত করবেন।

মোটকথা, আমরা যেভাবে রমযান কাটাব, আমাদের পরবর্তী বছর সেভাবেই কাটবে। রমযানে যদি নিয়মিত তেলাওয়াত করা হয়, তাহলে সারা বছর নিয়মিত তেলাওয়াত করার তাওফীক হবে।

ইতেকাফের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

اعتكاف শব্দটি عكوف থেকে উদ্ভুত হয়েছে। এর অর্থ লেগে থাকা, অবস্থান করা। শরীয়তের পরিভাষায় ইতেকাফ বলা হয়, রমযানের শেষ দশকে সুন্নত ইতেকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকে। অবশ্য এ সময়ে মু'তাকিফ মানবিক প্রয়োজন (ওজু, ইস্তেঞ্জা) সারতে মসজিদের বাইরে যেতে পারে।

ইতেকাফের মৌলিক উদ্দেশ্য

ইতেকাফের মূল লক্ষ্য হলো, আল্লাহর ঘরের দরজার চৌকাঠ ধরে নাছোড়বান্দা হয়ে অবস্থান করা। সকলেই জানে, ধনী লোকের ঘরের দরজা অনেক সময় বন্ধ থাকে। গরীব লোকেরা সেই দরজায় গিয়ে ভিড় জমায়। কারণ, তারা জানে, ঘরের মালিক এক সময় দরজা খুলবেই আর যখন খুলবে এবং আমাদেরকে সামনে দেখবে, তখন কিছু-না-কিছু অবশ্যই দিবেন। এমনিভাবে যারা ইতেকাফ করে, তারাও আল্লাহ তা'আলার রহমতের দরজার সামনে আশায় বুক বেঁধে বসে থাকে। ইতেকাফের রাতগুলোতে শবে কদর তালাশ করতে হয়। একথা মনে রাখতে হয় যে, আমরা দশদিন আল্লাহর মহব্বত, তার নৈকট্য ও রেজামন্দি লাভের জন্য এখানে এসেছি।

শেষ দশকে নবীজির মুজাহাদা

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهٖ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে এত মুজাহাদা করতেন, যা অন্য সময় করতেন না।'[১]

---

১. মুসলিম

বুখারী শরীফে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ الْاَوَ اخِرَ شَدَّ مِيْزَرَهٗ وَ اَحْيٰى لَيْلَهٗ وَ اَيْقَظَ اَهْلَهٗ.

'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে তাঁর লুঙ্গি মজবুতভাবে বাঁধতেন, রাত জেগে কাটাতেন এবং শেষ রাতে স্বীয় পরিবারকে (ইবাদাত করতে) জাগিয়ে দিতেন।'[১]

লায়লাতুল কদরের ফযিলত

নবীজি সব কিছু করেছেন উম্মতের শিক্ষার জন্য। এ কারণে হাদীছে এসেছে-

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ.

'যেব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সঙ্গে ছাওয়াবের নিয়তে (ইবাদাতের জন্য) দাঁড়ায়, তার পেছনের জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।'[২]

যেলোক চায়, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, তার কর্তব্য হলো স্বীয় দিল থেকে সব ধরনের হিংসা, রাগ, ক্রোধ বের করে ফেলবে। যার উপর যত রাগ-ক্রোধ থাকুক না কেন, সবাইকে মাফ করে দিবে। এটাই হলো ওই হীরা-মোতি-পান্না, যা আমি আল্লাহওয়ালাদের মজলিস থেকে লাভ করেছি। যেব্যক্তি শেষ রাতে জেগে ইবাদাত করবে এবং নিজের কলব থেকে যাবতীয় রাগ-ক্রোধ বের করে ফেলবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহপাক তাকে এই দুই আমলের উসিলায় মাফ করে দিবেন।

জীবনের সুবর্ণ সময়

শেষ রাত মানবজীবনের সবচেয়ে দামী ও শ্রেষ্ঠ সময়। এ সময়কে অপূর্ব সুযোগ মনে করে যিকির, ইবাদাত ও তেলাওয়াতে ব্যয় করুন। মসজিদে দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা এমনিতেই নিষিদ্ধ। তাই এতেকাফ অবস্থায় এ বিষয়ে অধিক সতর্কতা কাম্য। অনর্থক একটি কথাও যেন মুখ থেকে বের না হয়। প্রতিটি ক্ষণ এমনভাবে পার করতে হবে, যেন সবাই নিজ-নিজ ফিকিরে

---

১. বুখারী
২. বুখারী, মুসলিম

ব্যস্ত। এমনটি যেন না হয় যে, অন্যরা ইবাদাত করলে আমিও করি আর তারা ঘুমালে আমিও ঘুমিয়ে পড়ি। বরং প্রত্যেকের কর্তব্য হলো স্বীয় হিম্মত ও সামর্থানুযায়ী অধিক থেকে অধিক ইবাদাত করা। এতেকাফের সুযোগ মাত্র ১০ দিনের। ১০ দিন পর হাজারো চাইলেও এ সুযোগ পাওয়া যাবে না। যা কামাই করার তা এরই মধ্যে করে নিতে হবে। আমি মুতাকিফদের জন্য একটি রুটিন তৈরি করে দিয়েছি। আল্লাহ চাইলে মাহফিল শেষে তা হাতে-হাতে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেকে এই রুটিন কাছে রাখবেন এবং তদনুযায়ী আমল করে সময়ের হেফাযত করবেন। এমনটি যেন না হয় যে, বয়ানের সময় ঘুম পাড়লেন আর ঘুমের সময় হলে আপনি আলাপ-আলোচনায় মত্ত হয়ে গেলেন।

এ রুটিন মেনে চললে ইনশাল্লাহ সকলের উপকার হবে। কী ফায়দা হবে? এ ব্যাপারে সংক্ষেপ কথা হলো, এখনকার মনের অবস্থা যাচাই করুন। আর আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে ইতেকাফ শেষ করে যখন বাড়ি যাবেন, তখন আবার মনের অবস্থার খবর নিবেন। দেখবেন, কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য! বুযুর্গদের মজলিস, নেসবত ও সান্নিধ্য কোনো ঠুনকো বিষয় নয়; বরং অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত বিষয়। এখানে অবস্থান করলে এবং রুটিনমতো চললে ১০ দিন পর দিলের অবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন পাবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি অনুভব করবেন, যেন আপনি এ জগতের মানুষ নন; বরং কোনো ভিন্ন জগতের মানুষ। আপনি এ কটাদিন এক অন্যজগতে ছিলেন। অনেক দিন পর আবার এ ধরায় ফিরে এসেছেন।

আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যের ফল এই হয় যে, তা অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের করে দেয় এবং তদস্থলে আল্লাহর মহব্বত ভরে দেয়। মজলিসে গুরুত্ব দিয়ে উপস্থিত থাকবেন। অত্যন্ত সাদামাটা কথা হবে। কোনো গভীর তত্ত্ব ও আজব কথা আলোচনা হবে না। আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে, যাতে আমাদের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যে অতিবাহিত হয় এবং এখানে আসা উপকারী সাব্যস্ত হয়।

খোসনসিব সে, যে রমযানকে কাজে লাগায়

আজও এমন লোক আছে, যারা অনেক-অনেক ইবাদাত করে। আমি এক যুবক আলেমের কথা জানি। তার চুল-দাড়ি সবই কালো। আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। তিনি গত রমযানের পর বলেন, হযরত! আলহামদুলিল্লাহ!

আল্লাহর তাওফীকে এই রমযান এভাবে কেটেছে যে, প্রতিদিন পূর্ণ এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করেছি। সুতরাং তিনি ৩০ দিনে ৩০ বার কুরআন খতম করেছেন।

একলোক লিখেছেন, হযরত! এই রমযানে প্রতিদিন দশ হাজারবার কালেমায়ে তৈয়্যেবা পড়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

যদি আমি এক-এক করে মানুষের সেসব অবস্থা তুলে ধরি, যা তারা পত্রের মাধ্যমে আমাকে জানায়, তাহলে আপনাদের মনে হবে, তাদের তুলনায় আমরা করছি না কিছুই। এসব লোক এখনও দুনিয়ায় বিদ্যমান। তাদেরও দিন-রাত ২৪ ঘণ্টারই। তাদেরও স্ত্রী-সন্তান আছে। কায়-কারবার আছে। অভাব-অনটন আছে। রোগ-বালাই আছে। তারপরও তারা রমযান মাসকে কাজে লাগায়। যদি আমরা পেছনের ২০ দিন কাজে না লাগিয়ে থাকি, তাহলে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। এখনও ১০ দিনের সুবর্ণ সুযোগ আছে। এই ১০ দিনকে দামী বানাতে চেষ্টা করি। যেসব লোক্জন কায়-কারবার, অফিস-চাকরি অথবা অন্য কোনো কারণে সুন্নত ইতেকাফে বসতে পারেনি, তাদের কর্তব্য হলো নফল ইতেকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা। এখান থেকেই তারা পোশাক বদলে অফিসে যাবে এবং অফিস থেকে সোজা মসজিদে চলে আসবে। এভাবে তারাও রমযানের বরকতের অংশ পেয়ে যাবে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

অন্তরে মাহে রমযানের সম্মান-মর্যাদা রাখতে হবে। যারা মাহে রমযানকে সম্মান করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। নুযহাতুল মাজালিস গ্রন্থে একটি ঘটনা লেখা আছে। ঘটনাটি হলো–

একলোক অগ্নিপূজারী ছিল। সে যুগে মুসলমানদের জয়-জয়কার ছিল। তবে কাফেররাও তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করত। একবার ওই অগ্নিপূজারীর ছেলে রমযান মাসে দিনে আহার করে। ছেলে প্রকাশ্যে খানা-পিনা করলে অগ্নিপূজারী ভীষণ রাগান্বিত হয়। সে ছেলেকে ডেকে যাচ্ছেতাই বলে বকাঝকা করে এবং বলে, তোমার লজ্জা লাগে না, এটা মুসলমানদের পবিত্র মাস। তারা এ মাসে দিনে কিছু খায় না; অথচ তুমি প্রকাশ্যে পানাহার করছ! তারপর ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে যায়।

ঐ অগ্নিপূজারীর প্রতিবেশি ছিলেন এক বড় বুযুর্গ। অগ্নিপূজারী মারা গেলে ওই বুযুর্গ স্বপ্নে দেখেন, অগ্নিপূজারী জান্নাতে ঘোরাফেরা করছে। বুযুর্গ এতে

খুবই বিস্মিত হলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তো অগ্নিপূজারী ছিলে; জান্নাতে এলে কীভাবে? সে জবাবে বলল, একদা আমার ছেলে রমযান মাসে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে পানাহার করেছিল। আমি রমযান মাসের সম্মানের দিকে তাকিয়ে তাকে এ ব্যাপারে তিরস্কার করেছিলাম। আমার এই কাজটি আল্লাহর এত ভালো লাগে যে, তিনি এর উসিলায় মৃত্যুর সময় আমাকে কালেমা পড়ার তাওফীক দান করেন। এভাবে আমার মৃত্যু হয় মুসলমান অবস্থায়। আর তার সুবাদে আজ আমি জান্নাতের সুখ উপভোগ করছি।

এখানে চিন্তার বিষয় হলো, ইসলামের একটি বিধানের প্রতি এতটুকু আদব প্রদর্শনের কারণে যদি আল্লাহপাক একজন কাফেরের প্রতি এত দয়া করতে পারেন, তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যদি প্রকৃতপক্ষে রমযানের আদব রক্ষা করি, তাহলে আল্লাহ আমাদের উপর কেন দয়া করবেন না?

তাই এই ১০ রাতকে মূল্যবান মনে করুন এবং চিন্তা করুন, আল্লাহপাক অতি দয়া করে আমাদেরকে তার ঘরে জায়গা দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি আমাদের কিছু দিতে চান। তাই আমাদের যার যা চাওয়ার আছে তা এ সময়ে আল্লাহর কাছে অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে চাইতে হবে।

নেকীর চেক বই

মাহে রমযানের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ব্যাংকের চেক বইয়ের সাথে। কেমন যেন আল্লাহপাক আমাদেরকে ৩০ পাতাবিশিষ্ট একটি চেক বই প্রদান করেছেন যে, তোমরা এসব পাতায় যত ইচ্ছা জমার অংক লেখো। এখানে যা লিখবে তা আখেরাতের ব্যাংকে জমা হয়ে যাবে। কতক লোক এমন আছে, যারা খালি চেক বই ফিরিয়ে দেয়; তাতে কিছুই লেখে না। তাদের দিনগুলো অযথাই কেটেছে। আবার কেউ চেক বইয়ে এক লাখ লেখে, কেউ দুই লাখ, কেউ এক বিলিয়ন। প্রত্যেকে নিজ-নিজ সাধ্য ও ভাগ্য অনুযায়ী লিখে। রমযানের ২০ দিন চলে গেছে তো আমাদের প্রদত্ত চেক বইয়ের ২০টি পাতাও আল্লাহর দরবারে জমা হয়ে গেছে। এখন মাত্র ১০টি পাতা আমাদের হাতে আছে। এ ১০ পাতায় লেখা আমাদের দায়িত্ব। আমরা যা আমল করব, তা এসব পাতায় লিখিত হয়ে আখেরাতের ব্যাংকে আমাদের নামে জমা হবে। কেয়ামতের দিন আমরা তা অনেক গুণ বেশি লাভসহ পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

তাই এই ১০ দিন খুব বেশি ইবাদাত-বন্দেগী করুন। এটি নেকী কামাইয়ের সময়; ঘুমানোর সময় নয়। মনে-মনে সব সময় বলবেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে খোদ আপনাকেই চাই। শুধু আপনাকে আপন করে পেতেই সবকিছু ছেড়ে আপনার ঘরে এসে অবস্থান করছি। এমনটি বলতে থাকলে আল্লাহর রহমত ও দয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি হবে। আল্লাহ বড়ই দয়াবান। যখন মানুষ খাঁটি দিলে তাঁর চৌকাঠ আকড়ে ধরে, তখন আল্লাহ তার প্রতি অবশ্যই দয়া করেন। হযরত আলী (রাযি.) বলেন, যদি আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীকে আযাব দিতে চাইতেন, তাহলে এ উম্মতকে সূরা ইখলাস ও রমযান মাস প্রদান করতেন না।

মাহে রমযান ও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাঝে যোগসূত্র

আমার মুরশিদ বলেন, অন্যান্য মাসের সঙ্গে রমযান মাসের তেমন মিল, যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মিল ছিল তার ভাইদের সঙ্গে। হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর ১২জন পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ.)। আল্লাহ তাঁর উসিলায় বাকি ১১ ভাইয়ের অপরাধ মাফ করে দেন। আমার মুরশিদ বলেন, তেমনিভাবে বছর হয় ১২ মাসে। এর মধ্যে একটি মাস হলো রমযান মাস। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো এই এক মাসের বরকতে আল্লাহপাক বাকি ১১ মাসের পাপ-তাপ মাফ করে দেন।

মাজালিসে ইতেকাফের টার্গেট

এই ১০ দিনে বিভিন্ন মজলিসে প্রশিক্ষণের শিরোনামের কিছু কথা পেশ করা হবে। এর মূল লক্ষ্য হবে তরবিয়ত ও আত্মগঠন। সমস্ত আলোচনা হবে একমুখী, এককেন্দ্রিক। আর তা হলো, কীভাবে মানুষের মাঝে সৎকাজের প্রেরণা জাগে, আখলাক-চরিত্র ভালো হয়। মানুষ যেন গুনাহ হতে বিরত হয়। দুনিয়া ছেড়ে আমরা যেন আখেরাতমুখী হতে পারি। আপনারা অন্তরে আগ্রহ ও জ্বলন নিয়ে এসব মজলিসে বসবেন। এতে আল্লাহ আমাদের আসা-যাওয়া ও বসা কবুল করে নিবেন এবং আমাদের মতো হতদরিদ্রদের প্রতি দয়া করবেন।

এক বদদু'আয় নবীজির আমীন বলা

হাদীছে এসেছে, হযরত জিব্রাঈল (আ.) একবার নবীজির সামনে এভাবে বদদু'আ করলেন–

بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ

'ধ্বংস হোক সেই লোক, যে রমযান মাস পেয়েও নিজের পাপ মার্জনা করাতে পারল না।'[১]

এখানে চিন্তার বিষয় হলো, হযরত জিব্রাঈল (আ.) মূলত বদদু'আ করার মতো পাত্র নন। কেননা কুরআনের ফয়সালা হলো–

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

'তারা আল্লাহর নাফরমানি করে না ওই কাজে, যে বিষয়ে তিনি তাদের আদেশ দেন এবং তারা সেই কাজই করে, যা তাদের করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।'[২]

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর বদদু'আর পিছনে আল্লাহর নির্দেশ ছিল। আল্লাহপাক তাকে বদদু'আ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যাও, এই বদদু'আ করো যে, 'ধ্বংস হোক সেই লোক, যে রমযান মাস পেয়েও নিজের গুনাহ মাফ করাতে ব্যর্থ হয়।'

নবীজির সামনে হযরত জিব্রাঈল (আ.) বদদু'আ করলে তিনি তার প্রতিবাদ করলেন না; বরং তাকে পোক্ত করে বললেন, আমীন। আল্লাহ কবুল করুন। উম্মতের প্রতি বদদু'আয় নবীজির এভাবে আমীন বলা বড়ই আজব কথা। কেননা, কোনো মা এটা বরদাশত করতে পারে না যে, কেউ তার সন্তানকে বদদু'আ দিবে। বদদু'আ তো দূরে থাক, ভর্ৎসনা করাও সহ্য করে না। যখন মা সন্তানের প্রতি বদদু'আ ও ভর্ৎসনা মানতে পারে না, তাহলে তার পক্ষে কারো বদদু'আয় আমীন বলা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? যদি মাতৃত্বের সামান্য মহব্বতের কারণে মাতা বদদু'আয় আমীন বলতে না পারে, তাহলে নবীজি بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ মুমিনদের প্রতি অধিক দয়াশীল হয়ে কীভাবে হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর বদদু'আয় আমীন বললেন?

আমাদের শায়েখগণ এর সুন্দর জবাব দিয়েছেন। তারা বলেছেন, কারণ হলো, আল্লাহপাক রমযান মাসে বান্দার গুনাহ দ্রুত মাফ করে দেন। বান্দা ক্ষমার জন্য সামান্য একটু উদ্যোগ ও চেষ্টা করতেই আল্লাহ তা মাফ করে

---

১. মুস্তাদরাকে হাকেম

২. সূরা তাহরীম : আয়াত ৬

দেন। এই সুবর্ণ সুযোগেও যে এতটুকু চেষ্টা করে না, নিঃসন্দেহে সে দুর্ভাগা ও পোড়াকপালে। আল্লাহর নবী মূলত এটিই ব্যক্ত করেছেন যে, রমযান মাস পেয়েও যে হতভাগা এতটুকুও মূল্যায়ন করে না যে, একটু চেষ্টা করে নিজের সারা বছরের পাপ মাফ করিয়ে নিবে, সে বাস্তবেই হতভাগা ও বঞ্চিত। এমন ব্যক্তির ধ্বংস হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। এ কারণে নবীজি আমীন বলে বদদু'আকে মজবুত করেছেন, দৃঢ় করেছেন।

ঈদ, না অভিশাপ!

মাহে রমযান বিদায় নেওয়ার পর হয়ত আমাদের জন্য আনন্দের অবস্থা সৃষ্টি হবে অথবা নিরানন্দের অবস্থা। এই দুই অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। রমযান মাসে যাদের ক্ষমা লাভ হবে, রমযানের পরবর্তী সময়টা তাদের জন্য আনন্দের হবে। আর রমযানে যাদের ক্ষমা হয়নি, রমযানের পরবর্তী সময় তাদের জন্য বড়ই করুণ হবে। একবার ঈদের সময় সমাগত ছিল। এক বুযুর্গকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত ঈদ কবে হবে? তিনি বললেন, যখন দীদার হবে তখন ঈদ হবে। অর্থাৎ যখন প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলন হবে, তখনই মূলত আমাদের ঈদ হবে। কারণ, প্রেমিকের প্রকৃত ঈদ হয় প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের সময়। এ কারণে আপনারা ঈদের রাতে দু'আ করবেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার নৈকট্য দান করুন, যাতে আমাদের ঈদ সত্যিকার অর্থে ঈদ হয়।

সম্মিলিত আমলের ফযিলত

একটি রীতি মনে রাখবেন, যখন কোনো কাজ সম্মিলিতভাবে করা হয়, তখন পুরো দলের মধ্য হতে যদি একজনেরও আমল কবুল হয়, তাহলে আল্লাহ ওই একজনের বরকতে সকলের আমল কবুল করে নেন। এ কারণেই ফরজ নামাযের জামাতের মাসআলা হলো, নামাযে যত মানুষ শরীক হয়, তাদের কারো একজনের নামায যদি কবুল হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তার উসিলায় সকলের নামায কবুল করেন। কেননা, আল্লাহর রহমত এর পরিপন্থী যে, সম্মিলিতভাবে কোনো কাজ করা হলে তাদের মধ্যে একজনের আমল কবুল হবে আর অন্যদের আমল বাতিল হয়ে যাবে। বরং আল্লাহপাক এমন বলেন যে, যখন তাদের একজনের আমল কবুলের যোগ্য হয়েছে, তখন এই একজনের কারণে সকলের আমল কবুল করে নিলাম।

যখন নামায ও হজ এ প্রক্রিয়ায় কবুল হয়, তখন এতেকাফের বিষয়টিও এমনই হয়ে থাকবে। আমরা সকলে মিলে এখানে বসেছি। এত লোকের মধ্য হতে অন্তত একজন লোকের ফরিয়াদ আল্লাহর ভালো লাগবে, কারো কান্নাকাটি ভালো লাগবে, কারো তাহাজ্জুদ ভালো লাগবে। কারো সেজদা, কারো তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন। একজনেরও আমল যদি কবুল হয়, তাহলে তার বরকতে আল্লাহ আমাদের সকলের এতেকাফও কবুল করবেন। এ কারণে আপনারা সুধারণা পোষণ করে ইতেকাফ করে যাবেন। মনে-মনে ভাববেন, আমরা যে এখানে বসেছি আল্লাহপাক আমাদেরকে কিছু দিবেন বলেই এখানে এনেছেন। আমার কাজ হলো ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকা। আশা করা যায়, আল্লাহ আমার ইতেকাফ অবশ্যই কবুল করবেন এবং একে আমার আখেরাতের নাজাতের উসিলা বানাবেন।

আল্লাহর দরবারে সকরুণ প্রার্থনা হলো, তিনি যেন আমাদেরকে ইল্‌মি মজলিসসমূহে নিয়মিত বসার তাওফীক দান করেন এবং আমাদের ইসলাহ দান করেন। আমরা এখানে যে উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছি, তা হলো, আমরা নিজেদের ইসলাহ চাই। এজন্য অন্তরে ইসলাহের নিয়ত রাখুন। কেননা, মানুষ আল্লাহর থেকে যা আশা রাখে, আল্লাহ তার সেই আশা পূরণ করেন। আমাদের প্রার্থনা, আল্লাহ যেন আমাদের এই ইতেকাফকে আমাদের ইসলাহের কারণ বানান। আমাদের অন্তরে তার মহব্বত ঢেলে দেন এবং সর্বোপরি আমাদের সবাইকে শবে কদর লাভ করা ও তাতে পরিপূর্ণভাবে ইবাদাত করার সৌভাগ্য দান করেন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

– নবম খণ্ড সমাপ্ত –

খুতুবাতে যুলফিকার
দশম খণ্ড

وَالَّذِينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

'আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসে।' -সূরা বাকারা : ১৬৫

আল্লাহর মহব্বতের তাৎপর্য

[২০০১ সনের ৩০ অক্টোবর পাকিস্তানের জং শহরের জামে মসজিদে নবশবন্দীদের সপ্তম বার্ষিক সম্মেলনে হযরতওয়ালা দামাত বারাকাতুহুম এই গুরুত্বপূর্ণ বয়ানটি পেশ করেন। সম্মেলনে হযরতের দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত-সালেকীন ও ইসলামপ্রিয় জনতা উপস্থিত ছিলেন।]

'যখন মানুষের অন্তরে খোদাপ্রেম এসে যায়, তখন সে দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মানুষের দৃষ্টি আল্লাহর সত্ত্বার মাঝে আটকে যায়। তার সকল মনোযোগ এককেন্দিক হয়ে যায়। সে لا এর তরবারি দ্বারা গায়রুল্লাহকে মিসমার করে দেয়। তার দিলে আল্লাহ এসে যান। আল্লাহ কলবে ঢুকে পড়েন; বরং তার অন্তর্জগতে আল্লাহ ছেয়ে যান। এর নাম 'ফানাফিল্লাহ'। এই মাকাম অর্জনের জন্যই আমি-আপনি আল্লাহর দরবারে সাহায্যপ্রার্থী।'

আল্লাহর মহব্বতের তাৎপর্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ: وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

সৃষ্টিজগতে মহব্বতের বিভাজন

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসে।'[১]

খুতবায় যে হাদীছে কুদসী বর্ণিত হয়েছে, তাতেও আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

হাদীসের নামে জালিয়াতি পৃ: ২২৪

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

'আমি গোপন ভাণ্ডার ছিলাম। আমি নিজেকে পরিচিত করতে চাইলাম। ফলে আমি মাখলুক সৃষ্টি করলাম।'

সুতরাং মাখলুক সৃষ্টির প্রধান কারণ মহব্বত। যেহেতু মহব্বতই হলো মাখলুক সৃষ্টির প্রধান কারণ, তাই প্রত্যেক শ্রেণীর মাখলুকের মাঝে নিজ-নিজ

১. সূরা বারাকা : আয়াত ১৬৫

এসব হাদীস নয় ১/৭৩

যোগ্যতা অনুযায়ী মহব্বতের অংশ রয়ে গেছে। সৃষ্টিজগতের মাখলুকাতের মধ্যে আছে জড়পদার্থ, গাছপালা, প্রাণীকুল ও মানুষ। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টির মাঝে মহব্বতের একটি অংশ রেখেছেন। এর দৃষ্টান্ত সব ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। কেননা, মহব্বত প্রত্যেক জগৎ জুড়ে বিদ্যমান।

লোহার মধ্যে চুম্বকের মহব্বত

জড়জগতের মাঝে দেখুন। লোহা চুম্বকের পাগল। লোহা চুম্বকের দিকে ছোটে। চুম্বক দেখলে লোহা স্থির থাকতে পারে না; তার দিকে ধাবিত হবেই, তার কাছে যাবেই। লোহার মধ্যে চুম্বকের প্রতি এত আকর্ষণ যে, সে দিন-রাত চুম্বকের কাছেই থাকতে চায় এবং চুম্বকের সঙ্গে থেকে-থেকে চুম্বকের গুণ নিজের মাঝে ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ লোহা দীর্ঘদিন চুম্বকের সান্নিধ্যে থাকলে তার মাঝেও আকর্ষণের গুণ পয়দা হয়ে যায়। লোহা চুম্বকের সাথে থাকতে-থাকতে চুম্বকের গুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠে।

সূর্যমুখী ফুলের সূর্যের প্রতি মহব্বত

সূর্যমুখী একটি ফুল। সে সর্বক্ষণ সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে। কেমন যেন সে সূর্যের প্রেমিক। সূর্যের প্রতি তার টান এত বেশি যে, তার নামই হয়ে গেছে সূর্যমুখী। সূর্যের মুখ পূর্ব দিকে থাকলে তার মুখও থাকে পূর্বদিকে। সূর্য যতই উপরে উঠতে থাকে তার গতিও তত পরিবর্তিত হতে থাকে। এমনকি সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন এ ফুলের মুখও হয় পশ্চিম দিকে। সূর্যের সঙ্গে এই ফুলের এত টান ও আকর্ষণ যে, সূর্যের মুখ যেদিকেই থাকে, এই ফুলও সেদিকে ঘুরে যায়। যদি মানুষ এই ফুল হতে মহব্বতের শিক্ষা নিত এবং তার মনের সকল চাহিদা ও ইচ্ছা এককেন্দ্রিক তথা আল্লাহামুখী হয়ে যেত, তাহলে 'ইবরাহীমি ঈমান' তাদের নসিব হতো।

হযরত ইবরাহীম (আ.) সব কিছু হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এক আল্লাহর অভিমুখী হয়ে বলেছিলেন–

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا

'নিশ্চয় আমি স্বীয় মুখ একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তামুখী করছি, যিনি আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।'[১]

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ৭৯

মাছের মধ্যে পানির মহব্বত

প্রাণীজগৎ দেখুন, মাছের মধ্যে পানির মহব্বত প্রবল। পানি ব্যতীত মাছ শান্তি পায় না। এমনকি মাছ পানি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে পরে পানির বিরহে ছটফট করতে-করতে জীবন পর্যন্ত দিয়ে দেয়। কিন্তু এখানে আশ্চর্যের বিষয় হলো, মাছ কিন্তু পানাহার করে অন্য কিছু। তারপরও পানির সঙ্গে তার মহব্বত এত প্রবল যে, পানি থেকে তাকে বের করে আনা হলে মাছ পানির শোকে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয়। পানির সঙ্গে মাছের এই গভীর প্রীতি এখন প্রবাদতুল্য হয়ে গেছে। যেমন বলা হয়, অমুক পানিবিহীন মাছের মতো ছটফট করছে। পানির সঙ্গে মাছের সম্পর্কের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠেও ঘোষিত হয়েছে। নবীজী বলেন–

اَلْمُؤْمِنُ فِي الْمَسْجِدِ كَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ

'পানির মধ্যে মাছ যেমন, মসজিদের মধ্যে মুমিন তেমন।'

অর্থাৎ মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচে না; পানিই তার জীবন ও শান্তি, তেমনি প্রকৃত মুমিন মসজিদ ছাড়া থাকতে পারে না। মসজিদই হয় তার জীবন ও প্রশান্তি।

মাছের জীবন হলো পানি। হাজারো পানি পেলেও মাছের মন ভরে না। সমুদ্রভরা পানি পেলেও সে আরও চায়। পানিতে থেকে সে কখনও ক্লান্ত হয় না। কখনো এমন বলে না যে, অনেক দিন তো হলো পানিতে থাকলাম, এবার বিছুক্ষণের জন্য বাইরে থেকে ঘুরে আসি। পানি ছেড়ে সে ক্ষণিকের জন্যও থাকতে চায় না। পানির সান্নিধ্য ছাড়া মাছ একটা মুহূর্তের জন্যও শান্তি পায় না। মাছ পানির মহব্বতে এত বিভোর যে, যদি কোনো লোক বেশি-বেশি মাছ খায়, তাহলে তার মাঝেও পানির টান অনুভূত হয়। এ কারণেই যেলোক মাছের কাবাব খায়, সেও কিছুক্ষণ পর-পর পানি খেতে চায়।

পতঙ্গের মাঝে প্রদীপের মহব্বত

পতঙ্গ প্রদীপ ও বাতির প্রেমিক হয়। সে সর্বক্ষণ বাতির চারপাশে ঘুরতে থাকে এবং বাতির তাওয়াফ করতে থাকে। বাতিকে কেন্দ্র করে পতঙ্গের এই ওড়াউড়ি ও নাচানাচি কখনো শেষ হয় না। বাতি জ্বলানাগাদ তা অবিরতভাবে অব্যাহত থাকে। বাতির প্রতি পতঙ্গের গভীর মহব্বতের বিষয়টি ব্যাপক জনশ্রুতি অর্জন করেছে। বাতি জ্বলতে দেখলে পতঙ্গের নাওয়া-খাওয়া হারাম

হয়ে যায়। সে তখন গুণে-গুণে বাতির তাওয়াফ করে না যে, কবার হলো। বরং ২৪ ঘণ্টা বাতি জ্বললে ২৪ ঘণ্টা ধরে সে ঘুরতে থাকে, যেন বাতিকে কেন্দ্র করে ওড়াউড়ি করাই তার জীবন ও প্রাণ। বাতির মহব্বত তার মাঝে এত বেশি যে, যখন সে ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে যায়, তখনও বাতির সান্নিধ্য ছাড়তে চায় না; বরং বাতির আলোয় লাফ দিয়ে স্বীয় জীবন তার জন্য উৎসর্গ করে দেয়। বাতির প্রতি পতঙ্গের মহব্বত কত বেশি যে, যখন পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জ্বলে যায়, তখনও সে বিন্দুমাত্র আওয়াজ করে না। বাতির মহব্বতে এভাবে জীবন দিতে পারাকে সে গর্বের বিষয় মনে করে। এক কবি পতঙ্গের এই গভীর প্রেমের চিত্র এঁকেছেন শব্দের তুলিতে এভাবে-

کمال یہ ہے کہ آواز تک نہیں آتی

وفور شوق میں یوں جل رہے ہیں پروانے

আলোর প্রেমে মত্ত পতঙ্গ যায় আগুনে জ্বলে,
পুড়ে-পুড়ে শেষ হলেও কয় না কথা ভুলে।

আরবীতে একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ আছে। যার অর্থ হলো, অমুক লোক পতঙ্গের মতো নীরবে জীবন দান করেছে। এ কারণেই হয়ত শেখ সা'দী (রহ.) বলেন–

اے مرغ سحر عشق زپروانہ بیاموز

کاں سوختہ را جاں شد وآواز نیامد

ভোরের মোরগ! নিবে না তুমি পতঙ্গ হতে সবক?
আলোর প্রেমে জীবন দিলেও থাকে সে নির্বাক।

তিতির পাখির মাঝে চাঁদের মহব্বত

এক প্রকার পাখি আছে নাম 'তিতির পাখি'। এই পাখি চাঁদকে ভালোবাসে। এ কারণে চাঁদ ও তিতির প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তিতির পাখি চাঁদনী রাতে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। চাঁদের মহব্বতে সে কিচিরমিচির করতে শুরু করে। তার গান অতি সুরেলা। সে চাঁদের প্রেমে মত্ত হয়ে গীত গাইতে গাইতে চাঁদপানে উড়তে থাকে। তার মুখে গান কখনো ফুরায় না। সে কিচিরমিচির করলে চাঁদের প্রেমেই করে। সে নিরাশ হলে চাঁদের মহব্বতেই হয়। উদ্বেলিত-উদ্বিগ্ন হলে তা-ও চাঁদেরই জন্য হয়।

ফুলের প্রতি বুলবুলের মহব্বত

বুলবুলের হৃদয়ে ফুলের অনুরাগ বিরাট। বুলবুল ফুলের প্রেমে দেওয়ানা। মহব্বত প্রসঙ্গ এলে সেখানে অবশ্যই বুলবুল ও ফুলের আলোচনা করা হয়। কবি চমৎকার বলেছেন–

آ عندلیب مل کر کریں آہ وزاریاں

تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل

বুলবুলিরা সবে আহাজারি করছে মিলে ভাই,

ফুলের প্রার্থনায় করছ তুমি মন ব্যবহার হায়!

যেখানেই বাগিচা ও ফুলের নাম আসে, সেখানে বুলবুল পাখির নাম অবশ্যই আসে। বুলবুল ফুলের ঘ্রাণে উতলা থাকে। বাগিচার বিভিন্ন ফুলের শিয়রে বসা এবং তাদের প্রশংসা করাই হলো তার জীবনের একমাত্র কাজ। বুলবুল ও ফুলের প্রেমকাহিনীতে বই-পুস্তক ভরে আছে।

মানবমাঝে মহব্বতের প্রেরণা

সকল সৃষ্টির মাঝে যেভাবে মহব্বত নিহিত রয়েছে, তেমনি সৃষ্টির সেরা মাখলুক মানুষের অন্তরেও মহব্বতের প্রেরণা সুপ্ত রাখা হয়েছে। ফলে দুনিয়ায় কোনো মানুষ এমন নেই, যার অন্তরে মহব্বত নেই। কেউ একথা বলতে পারে না যে, আমার অন্তরে কারো প্রতি মহব্বত নেই। এর কারণ কবির কণ্ঠে নিম্নরূপ–

دل بحر محبت ہے محبت یہ کرے گا

لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا

মন মহব্বতের সমুদ্র, মহব্বত সে করবেই,

হাজারজন বেঁচে গেলেও কারো উপর সে মরবেই।

এটা ভিন্ন কথা যে, সেই মহব্বত খালিকের প্রতি হোক কিংবা মাখলুকের প্রতি। কবি সুন্দর বলেছেন–

پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو

اتنا نہیں ہے چین محبت کئے بغیر

পাথর হোক, খোদা হোক অথবা অন্য কিছু,
মহব্বত ছাড়া পাই না স্বস্তি জীবন লাগে মিছু।

এর উদাহরণ এভাবে দেওয়া যায় যে, মনে করুন, একটি কামরা। হয়ত তাতে আলো থাকবে নতুবা অন্ধকার। এমনিভাবে হৃদয়ে হয়ত আল্লাহর মহব্বতের আলো থাকবে। যদি আল্লাহর মহব্বতের আলো না থাকে, তাহলে অবশ্যই মাখলুকের মহব্বতের অন্ধকার থাকবেই।

মনে রাখবেন, মহব্বতের প্রেরণা অতি পবিত্র। এ কারণে এই যোগ্যতা মাখলুকের উপর প্রয়োগ করে তা বরবাদ করা কোনো জ্ঞানীর কাজ হতে পারে না। এ কারণে যুগে-যুগে নবীগণ আগমন করে একটি নীতিকথা শুনিয়েছেন–

'মানবসকল! অস্থায়ী প্রেমিকের প্রেমও অস্থায়ী। পক্ষান্তরে স্থায়ী প্রেমিকের প্রেমও স্থায়ী। যেব্যক্তি মাখলুককে মহব্বত করবে, সে একদিন না একদিন মাখলুক হতে বিচ্ছিন্ন হবেই। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসবে, সে একদিন না একদিন আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করবেই।'

শিক্ষণীয় কবিতা

যেবুন নিসা মাখফী নিজ বাক্যে বলেছেন–

مرغ دل را گلستاں بہتر زکوئے یار نیست
طالب دیدار را ذوق گل وگلزار نیست
گفت از عشق بتاں اے دل چہ حاصل کردہ ای
گفت مارا حاصل جز نالہائے زار نیست
چند قطرہ خون دل م خفی برائے مہوشا
ریختن برخاک دل ایں شیوۂ عطار نیست

'মনের পাখির জন্য বন্ধুর গলি হতে উত্তম বাগিচা নেই। আর যে আল্লাহর দীদারের প্রত্যাশী, ফুল ও ফুলবাগিচার প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। কেননা, প্রেমাস্পদের মিলন থেকে উত্তম আর কিছু নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে মন! তুমি এই অস্থায়ী প্রেমাস্পদের প্রেম থেকে কী পেয়েছ? সে জবাবে বলে, কান্নাকাটি আর দুঃখ ছাড়া কিছুই মেলেনি।

হে মাখফী! মনটা রক্তের কটা ফোঁটামাত্র, একে মাখলুকের জন্য বরবাদ করা মোটেই জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ নয়।'

অস্থায়ী প্রেমের শিক্ষণীয় পরিণতি

অস্থায়ী প্রেমের পরিণতি সর্বদা শিক্ষণীয় হয়ে থাকে। এর উদাহরণ অনেক। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তসমূহের উপর পুনর্বার নজর দেওয়া যেতে পারে।

লোহার পরিণতি

লোহা চুম্বকের প্রেমিক। তার এই পরপূজার পরিণতিতেই তার রং হয়েছে কালো। তাকে আগুনে বিগলিত করা হয়। এখানেই ক্ষান্ত নয়, যখন তাকে আগুন থেকে বের করা হয় এবং নরম হয়ে যায়, তখন তার মাথায় হাতুড়ি পেটানো হয়। এভাবে তাকে মাখলুকের প্রতি মহব্বত পোষণের মজা আস্বাদন করানো হয়। তার পরিণতি দুনিয়াতে মন্দ। আখেরাতেও তাকে জাহান্নামের আগুনের অংশ করা হবে। জাহান্নামীদের লোহার বেড়ি ও শিকল পরানো হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেন–

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝

'ওকে ধরো এবং গ্রেফতার করো। তারপর ওকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করো। তারপর ৭০ গজ লম্বা শিকলে তাকে বেঁধে ফেলো।'[১]

লোহার বেড়ি ও শিকল আখেরাতে কোথায় থাকবে? জাহান্নামে থাকবে। কোনো জান্নাতীকে লোহার শিকল পরানো হবে না। তাদের জন্য থাকবে স্বর্ণ, রৌপ্য, মোতি, হীরা ও জহরত।

এখানে একটি জ্ঞানের কথা পেশ করতে চাই। আর তা হলো, লোহা চুম্বককে ভালোবাসে। এখন যদি তার সামনে মণিমুক্তাও রেখে দেওয়া হয়, তবুও সে তার দিকে ঝুঁকবে না। হে মানব! লোহা একটি মাখলুক। যদি সে আরেক মাখলুককে এত ভালোবাসতে পারে, তার প্রতি এত অনুরক্ত হতে পারে যে, স্বীয় প্রেমাস্পদ ছাড়া অন্য কারো প্রতি মুখ তুলে পর্যন্ত চায় না, তাহলে তোমার স্বীয় রবের কেমন প্রেমিক হওয়া উচিত! কেননা, আল্লাহপাক জিন্দা ও বিদ্যমান, তিনি চিরঞ্জীব। তার পরও মানুষ স্বীয় রবকে বাদ দিয়ে অন্যের প্রতি মনোযোগী হয় এবং অন্যকে ভালোবাসে।

---

১. আল-হাক্কা : আয়াত ৩০-৩২

লোহাকে যদি কাচের বাক্সে বন্দী করা হয়, তবুও তার মহব্বতে মোটেই ভাটা পড়ে না। তার ঝোঁক সর্বক্ষণ চুম্বকের দিকেই থাকে। এর মধ্যে আমাদের জন্য এই শিক্ষা রয়েছে যে, দেখো, এটা একটা মাখলুকমাত্র। সে আরেক মাখলুককে মহব্বত করে। তার পরিণাম মন্দ হয়। কিন্তু তারপরও সে তার প্রেমে এত দেওয়ানা যে, কাচের বাক্সে বন্দী করে রাখা হলেও প্রেমাস্পদকে সে ভোলে না।

হে মানব! তুমি তোমার মালিকের কেমন বান্দা যে, যদি বালা-মুসিবত তোমকে ঘিরে নেয়, তাহলে তুমি স্বীয় রব থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও! পেশায় সামান্যতম পেরেশানি দেখা দিলেই মসজিদের দরজা ভুলে যাও এবং জামাতে নামায পড়া বাদ হয়ে যায়। আমাদের প্রেমাস্পদ তো প্রকৃত প্রেমাস্পদ। আমাদের কর্তব্য ছিল, আমরা বিপদে আল্লাহর পানে বেশি ধাবিত হব এবং তাঁর থেকেই বিপদমুক্তি কামনা করব।

মাছের পরিণাম

মাছ পানিকে ভালোবাসে। সে পানিকে এত ভালোবাসে যে, পানি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই পানির বিরহ-বেদনায় ছটফট করে নিজের জান পর্যন্ত দিয়ে দেয়। এ কারণে আল্লাহ তার থেকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পানিপূজার কারণে মাছের দেহে এত দুর্গন্ধ থাকে যে, কেউ মাছ ধরলে তার হাতকে পর্যন্ত দুর্গন্ধ বানিয়ে দেয়। যে পাত্রে মাছ রাখা হয়, তাও দুর্গন্ধ হয়ে যায়। যে মুখ দিয়ে তা খাওয়া হয়, তা থেকেও দুর্গন্ধ বের হয়। যে ঘরে মাছ রান্না করা হয়, সেখানেও দুর্গন্ধ হয়ে যায়। মাছে যেমন দুর্গন্ধ থাকে এমনটি অন্য কোনো প্রাণীতে হয় না। যদি মাছকে সমুদ্রের সমস্ত পানি দ্বারাও ধোওয়া হয়, তবুও তার দেহের দুর্গন্ধ যায় না, শেষ হয় না।

পতঙ্গের পরিণতি

পতঙ্গ বাতিকে ভালোবাসে। তার পরিণাম এই রয়েছে যে, এর জন্য তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। এ কারণে তার নাম 'নির্বোধ' হয়ে গেছে। আরবীতে পতঙ্গের জন্য একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ নির্বোধ। মানুষ বলে, সে তো পতঙ্গের মতো নির্বোধ মানুষ। পতঙ্গ বাতির প্রেমে ও তার আকর্ষণে বাতির চারদিকে ঘুরে-ঘুরে নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়; কিন্তু বাতি পতঙ্গের এই আত্মাহুতি ও প্রাণ বিসর্জনের কথা জানতেও পারে না। উর্দুতে বলা হয়–

اندھے کے سامنے روئے اپنے نین کھوئے

'সে অন্ধের সামনে কেঁদে-কেঁদে নিজের দৃষ্টিশক্তি খুইয়ে ফেলেছে।'

আল্লাহর মহব্বতে প্রতারণার শিকার

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যখন তিনি তাঁর কোনো গোলামকে সুন্দররূপে নামায পড়তে দেখতেন, তখন তাকে আযাদ করে দিতেন। গোলামরা তার এই অভ্যাসের কথা ক্রমে জানতে পেরে প্রত্যেক গোলাম আযাদ হওয়ার জন্য এই পলিসি অবলম্বন করল। গোলাম তার সামনে সুন্দরভাবে নামায পড়ত আর তিনি তাকে আযাদ করে দিতেন। একজন তাকে জানাল, হযরত! আপনার গোলামরা আপনাকে দেখানোর জন্য নামায পড়েমাত্র। আল্লাহর জন্য পড়ে না, তারা আপনাকে সুন্দর নামায পড়ে দেখায় আর আপনি তাদের আযাদ করে দেন। তারা মূলত এভাবে আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে। উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) বললেন–

میں اللہ کی محبت میں سچا کیسے ہو سکتا ہوں جب تک کہ اس کی محبت میں دھوکا نہ کھا جاؤں.

'আল্লাহর প্রকৃত প্রেমিক কীভাবে হব, যদি তার প্রেমে ধোঁকা না খাই?'

উঁইপোকার পরিণতি

উঁইপোকা চাঁদকে মহব্বত করে। উঁইপোকা চাঁদনী রাতে ওড়াউড়ি করে এবং পরিশেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ভূতলে আছড়ে পড়ে এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। এভাবে সে চাঁদের নাগাল পায় না এবং চাঁদের অজান্তে তার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়। এটাই হলো মাখলুকের মহব্বতের পরিণাম যে, তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হয় না এবং সে সর্বদা অধরাই রয়ে যায়। মানুষের অবস্থাও ঠিক এমন। যে কেউ স্বীয় প্রবৃত্তির টানে কোনো মাখলুককে মহব্বত করে। তার পরিণামও সর্বদা মন্দ হয়। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি এই পবিত্র প্রেরণা ও অনুভূতিকে আল্লাহর জন্য ব্যবহার করে অথবা আল্লাহর নেসবতে আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে নেকী ও তাকওয়ার সম্পর্ক রাখে, তার পরিণাম সর্বদা ভালো হয়। মহব্বতের এই প্রেরণা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে। আমাদের কর্তব্য হলো এই পবিত্র প্রেরণাকে আল্লাহর জন্যই ব্যবহার করা এবং নিজেদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি করা। এই মহব্বত বৃদ্ধি করা মানুষের ইখতিয়ারাধীন।

বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রভাব

দুনিয়াতে মাখলুকের যে সৌন্দর্য ও শোভা আছে, তার সবই আল্লাহর দান। শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যের পেছনে যে দৌড়ায়, সে ক্ষতি ও সমস্যার মধ্যে পড়ে। হযরত ইউসুফ (আ.) গর্ভজাত সুদর্শন ছিলেন। তিনি এতটা সুদর্শন ছিলেন যে, 'ইউসুফী সৌন্দর্য' পৃথিবীতে প্রবাদ বাক্য হয়ে গেছে। তাকে যখন কূপে ফেলা হয় এবং কূপ থেকে তুলে বিক্রি করা হয়, তখন তার দাম কত ওঠে? পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

'এবং তাকে তারা হাতে গোনা কতক অচল পয়সায় বিক্রি করে।'[১]

এ থেকে জানা যায়, মাখলুকের বাহ্যিক সৌন্দর্যের মূল্য আল্লাহর দৃষ্টিতে কয়েকটি অচল মুদ্রামাত্র। সৌন্দর্যপূজারীদের শিক্ষা নিতে হবে যে, তারা কত মূল্যহীন বস্তুর পেছনে দৌড়াচ্ছে। আল্লাহপাক বলেন–

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

'এবং যখন সে সক্ষমতার বয়সে পৌঁছে যায়, আমি তাকে হেকমত ও ইল্‌ম প্রদান করি। এমনিভাবে আমি সৎকর্মশীলদের বদলা দেই।'[২]

এর পরে তার জীবনে পরীক্ষা আসে। কিন্তু আল্লাহ তাকে পরীক্ষায় কামিয়াব করেন। পরে এই সৌন্দর্যের কারণেই তাকে জেলখানায় পর্যন্ত যাওয়া লাগে। দীর্ঘ নয় বছর ধরে তিনি কারারুদ্ধ থাকেন। তাঁর কাছে ভাই-বোন ছিল না, ছিল না তার পিতামাতা। নয় বছর কারারুদ্ধ থেকে যখন মুক্ত হন, তখন সেটা সৌন্দর্যের কারণে ছিল না; বরং তা ছিল ইল্‌মের অবদান। আর তা এভাবে যে, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি দেশকে কীভাবে হেফাযত করবেন? তখন তিনি বলেছিলেন–

اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

'আপনি আমাকে খাদ্যভাণ্ডারের অধিকর্তা বানান। আমি হেফাযতকারী ও জ্ঞানী।'[৩]

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২০

২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২২

৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৫৫

তিনি একথা বলেননি যে, আমাকে খাদ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজার বানান। কারণ, আমি সুন্দর ও সুদর্শন।

এ থেকে জানা যায়, সম্মান সৌন্দর্যের কারণে অর্জিত হয় না; বরং জ্ঞানের বদলে লাভ হয়। মনে রাখবেন, মানুষের গঠন-আকৃতির কানাকড়ি মূল্যও আল্লাহর কাছে নেই।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ দেখেন না তোমাদের চেহারা এবং তোমাদের ধনসম্পদ। বরং তিনি দেখেন তোমাদের মন ও আমল।'

আমাদের কর্তব্য হলো, যে মন আল্লাহ দেখেন তাতে আল্লাহর মহব্বত ভরা। মহব্বতকারীদের সঙ্গে উঠাবসার দ্বারা এই মহব্বত বাড়ে। পক্ষান্তরে অলসতা ও উদাসীনতার খপ্পরে পড়লে আল্লাহর মহব্বত কমে যায়।

আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্য

মনে রাখবেন, মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্য দেওয়া হয় হযরত ইউসুফ (আ.)-কে। কিন্তু আল্লাহর সৌন্দর্যের সামনে তার সৌন্দর্য কিছুই নয়। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, সমস্ত মাখলুককে যত সৌন্দর্য দেওয়া হয়েছে, তিনি একাই লাভ করেছেন সেই সৌন্দর্য। অর্থাৎ আল্লাহপাক যত সৌন্দর্য বণ্টন করেছেন, তার মধ্য হতে অর্ধেক দিয়েছেন সমস্ত মাখলুককে আর বাকি অর্ধেক পেয়েছেন হযরত ইউসুফ (আ.)। অর্ধেক সৌন্দর্য পেলেও তাকে যে-ই দেখত সে-ই সপ্রণোদিত হয়ে বলত–

حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

'ইনি মানব নন; বরং তিনি একজন সম্মানিত ফেরেশতা।'[১]

মাখলুকের সৌন্দর্যের পরিসমাপ্তি হলো, দর্শক তাকে দেখে ফেরেশতা মনে করেছে। আল্লাহর সৌন্দর্যের সঙ্গে এই সৌন্দর্যেরও কোনো তুলনা নেই। আল্লাহর সৌন্দর্য উপমাহীন। যে আল্লাহ এত সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিজের সৌন্দর্যের অবস্থা কেমন হতে পারে তা কল্পনারও বাইরে। হাদীছে এসেছে–

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৩১

اَللّٰهُ جَمِيْلٌ

'আল্লাহপাক সুন্দর।'

আল্লাহপাকের সৌন্দর্যের জৌলুস কেমন হবে তা কেয়ামতের দিন জান্নাতে গিয়ে ঈমানদাররা দেখবে। দুনিয়াতে থেকে এই জৌলুসের কল্পনাও হবে না। তবে এতটুকু বলা যায় যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে যাবে এবং হুর-গেলমানদের সৌন্দর্য দেখবে, তখন তারা এত হতবাক হয়ে যাবে যে, পাঁচশ বছর ধরে তারা তাদের অনিমেষ লোচনে দেখতে থাকবে। তারপর যখন তারা জান্নাতে থাকা শুরু করবে এবং একসময় আল্লাহপাক জান্নাতীদের তার দীদার দানে ধন্য করবেন, হাদীছে এসেছে, দীদারের সময় জান্নাতীদের উপর দিয়ে নূরের ঝড় বইবে।

দুনিয়াতে ঝড় উঠলে উৎক্ষিপ্ত ধুলাবালু মানুষের চেহারায় এসে পড়ে, ঠিক এমনিভাবে জান্নাতেও নূরের ঝড় উঠবে এবং নূরের একটি ঝলক জান্নাতীদের চেহারায় লেগে যাবে। এই নূরের কারণে জান্নাতীদের চেহারার সৌন্দর্য এত বেড়ে যাবে যে, যখন তারা দীদার শেষে নিজ-নিজ ঘরে ফিরবে, তখন তাদের হুর ও গেলমানরা তাদের সৌন্দর্য দেখে পাঁচশ বছর ধরে অপলক নেত্রে দেখতে থাকবে। হে আল্লাহ! তোমার সৌন্দর্যের কোনো সীমা নেই। তোমার দীদার যারা পাবে, তাদের সৌন্দর্যের অবস্থা হবে, জান্নাতী মাখলুক পর্যন্ত সেই সৌন্দর্যে তাজ্জব হয়ে দেখতে থাকবে। এভাবে দেখতে-দেখতে পাঁচশ বছর পেরিয়ে যাবে, তবুও তাদের মন ভরবে না। তারা শুধু দেখতেই থাকবে, কত যে সময় পার হয়ে যাচ্ছে তার খবর কারুর থাকবে না।

হযরত মূসা (আ.)-এর উপর খোদায়ী তাজাল্লীর প্রভাব

হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে গিয়ে সেখানে ৪০ দিন অবস্থান করেন। একপর্যায়ে সেখানে তিনি আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হন। তখন আল্লাহপাক ৭০ হাজার পর্দার আড়াল হতে তাজাল্লী দান করেন। তারপরও এই তাজাল্লীর প্রভাব এত বেশি ছিল যে, তূর পর্বত পুড়ে সুরমার মতো হয়ে যায় এবং হযরত মূসা (আ.) বেহুঁশ হয়ে যান। তবে তিনি আগুনে জ্বলে যান না এবং তাঁর মৃত্যুও হয় না। কেননা, এখানে যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য ছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর কলবে আল্লাহপাকের মহব্বত ও তাজাল্লী গ্রহণের যোগ্যতা ছিল। পক্ষান্তরে পাহাড়ের মধ্যে এই যোগ্যতা ছিল না, যার ফলে পাহাড় জ্বলে যায়; কিন্তু হযরত মূসা (আ.) ভস্মীভূত হন না। শুধু তিনি মূর্ছা যান। তাফসীরে দুররে মনসুরে লেখা আছে–

لَمَّا كَلَّمَ مُوْسٰى رَبَّهٗ عَزَّوَجَلَّ مَكَثَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا لَا يَرَهٗ اَحَدٌ اِلَّا مَاتَ مِنْ نُوْرِ اللّٰهِ.

'হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে ৪০ দিন সেখানে অবস্থান করেন। সেখান থেকে আসার পরে কেউ তার চেহারায় দৃষ্টি জমিয়ে রাখতে পারত না। দৃষ্টিপাত করলেই সে মারা যেত।'

এ কারণে হযরত মূসা (আ.) স্বীয় চেহারা ঢেকে রাখতেন। এমনকি তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত তাঁর চেহারা দেখতে খুবই চেষ্টা করতেন; কিন্তু তিনি দেখতে দিতেন না। কারণ হলো, দীদারের তাজাল্লীর কারণে তাঁর চোখে-মুখে ওই নূর ও সৌন্দর্য চলে এসেছিল। তাকে যে-ই দেখত, সে-ই তা সহ্য করতে না পেরে আত্মাহুতি দিত। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর সৌন্দর্য ৭০ হাজার পর্দার আড়াল হতে দেখার পরও তাঁর চেহারার সৌন্দর্য এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাঁর চেহারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার যোগ্যতা কারো মধ্যে ছিল না।

দারাকুতনিতে তিবরানির বর্ণনা আছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهٗ قَالَ لَمَّا كَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَبْصُرُ النَّمْلَ عَلَى الصَّفَا فِى اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ.

'হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহপাক যখন হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কথা বললেন, তখন থেকে হযরত মূসা (আ.) কঠিন অন্ধকার রাতে পাহাড়ের উপরের পিঁপড়া খালি চোখে দেখতেন।'

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যের ঝলক দুনিয়াতে বহুবার পড়েছে; কিন্তু তাতে দুনিয়ার কিছুই হয়নি। পক্ষান্তরে তূর পর্বতে আল্লাহর সৌন্দর্যের তাজাল্লী মাত্র একবার হয়েছে। কিন্তু এই একবারের উত্তাপে তূর পর্বত সুরমা হয়ে যায়। যারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দর্শনকারীদের দেখেছেন তাদের মাঝে তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। এটা আল্লাহর সৌন্দর্যেরই তাজাল্লীর মোজেযা ছিল যে, পর্বত পর্যন্ত পুড়ে সুরমার মতো হয়ে গিয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) জ্ঞান হারিয়ে ভূতলে আছড়ে পড়েন এবং তাঁর চোখের পাওয়ার এত বেড়ে যায় যে, তার চোখে যার চোখ পড়ত, তার চোখ অন্ধ হয়ে যেত।

আল্লাহর তাজাল্লির বরকতসমূহ

আল্লাহ রব্বুল ইযযাত যখন তূর পাহাড়ের উপর নিজের তাজাল্লি দিলেন। তো তখনকার অবস্থা তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে–

عذب كل ماء وافاق كل مجنون وبر كل مريض وزال الشرك عن الاشجار واخضرت فى الارض واظهرت حسنت نيران المجوس وخرت الاصنام بوجوههن وانقطعت اصوات الملآئكة وجعل الجبل ينهدم وينحال

'সমস্ত লবণাক্ত পানি মিঠা হয়ে গেছে। সব পাগল সুস্থ হয়ে গেছে। সমস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। গাছ থেকে কাঁটাগুলো ছিঁড়ে পড়ে গেছে। সবস্ত ভূমি সবুজ ও সুন্দর হয়ে গেছে। অগ্নিপূজকদের আগুন নিভে গেছে। জগতের সমস্ত মূর্তি মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। ফেরেশতাদের ডাক-চিৎকার থেকে গেছে। পাহাড়গুলো আপন-আপন জায়গায় কেঁপে উঠেছে।

আল্লাহর অবমূল্যায়ন

বান্দা আল্লাহ রব্বুর ইযযাতের দিদারের স্বাদের স্থলে সৃষ্টির দিদারের পেছনে ঘুরে বেড়ায়। আমরা স্থায়ী সৌন্দর্যের বদলে অস্থায়ী সৌন্দর্যকে বেছে নিয়েছি। তো যেন আমরা মহান আল্লাহর অবমূল্যায়ন করেছি। বিস্ময় ও আত্মমর্যাদার বিষয় যে, লোহা কখনরও মণি-মুক্তার দিকে ফিরে তাকায় না। অথচ আমরা আল্লাহ রব্বুল ইযযাতের মতো সুদর্শন হাস্তিকে ছেড়ে দুনিয়ার বিভিন্ন বস্তুর দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে চোখ ফেলছি।

আমার বন্ধুগণ!

যারা পরওয়ারদেগারের মূল্যায়ন করেছে, পরওয়ারদেগার তাদের সম্মান দিয়েছেন। আজ আমরা আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মাখলূকের প্রতি মনোনিবেশ করেছি। আর সেজন্যই আমাদের জীবন থেকে পেরেশানি দূর হচ্ছে না। কলুর বলদের মতো আমরা কেবলই সমস্যা ও পেরেশানির আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি। পরিস্থিতি আমাদের অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলছে, আমাদের মনোযোগের কেবলা ঠিক করা একান্তই আবশ্যক। মানুষ সব কিছুরই কদর করেছে। যদি নাকদরি কিছু কারো করে থাকে, তা আপন রবের করেছে। এ কেমন শিক্ষার বিষয় যে, আল্লাহকে বলছে হয়েছে–

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

'তারা আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন করেনি।'[১]

জি; মহব্বতওয়ালাদের এ বিষয়টি খুবই খারাপ লাগে!

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ৬৭

নবীজির অবমূল্যায়ন

সত্য কথা হলো, আমরা না আল্লাহ তা'আলার কদর করেছি, না তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদর করেছি। আল্লাহ তাআলা খুবই আজব পন্থায় বলেন–

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.

'আক্ষেপ মানুষের উপরে! তাদের কাছে এমন কোনো রাসূল আসেনি, যাদের তারা উপহাস করেনি!'[১]

নবীর যুগে নবীদের উপহাস করা হতো। আর বর্তমান যুগে নবীর সুন্নতকে উপহাস করা হচ্ছে। বর্তমানে কোনো বাড়িতে যদি কোনো যুবক তার চেহারায় নবীর সুন্নত ধারণ করে অর্থাৎ দাড়ি রাখে, তবে-

তার মা তাকে বিদ্রূপ করে।

তার বোন টিপ্পনি কাটে।

তার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সমালোচনা করে।

তারা সকলেই মুসলমান। তাই বলছিলাম, আমরা উম্মত হলেও নবীজিকে মূল্যায়ন করিনি।

পবিত্র কুরআনের অবমূল্যায়ন

মানুষ এমনই স্বার্থপর ও অকৃতজ্ঞ যে, সামান্য কটা পয়সার জন্য আল্লাহপাকের কালাম তথা পবিত্র তাওরাতকে বিকৃতি করেছিল। তারা জানত, আল্লাহর সহীহ কালাম এটি। কিন্তু দুনিয়ার কটি টাকার জন্য আল্লাহর কালাম বদলে ফেলল মানুষ! একজন হিন্দু মহিলা যদি তার মৃত স্বামীর জন্য জীবন ওয়াক্‌ফ করে দিতে পারে, তাহলে জীবিত খোদার পিছনে তোমার জীবন উৎসর্গ করা কেন কঠিন হবে? আমাদেরও কর্তব্য হলো আমাদের জীবন ও মরণকে আল্লাহ তা'আলার জন্য উৎসর্গ করা।

লায়লার সৌন্দর্যের অবস্থা

লায়লার সঙ্গে মজনুর সম্পর্ক ছিল। লায়লার নাম লায়লা এজন্য ছিল যে, সে রাতের অন্ধকারের মতো কলো ছিল। একদিন মজনুর সামনে এক অপরূপ সুন্দরী নারী আনা হলে মজনু তার দিকে চোখ তুলেও তাকাল না।

---

১. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৩০

এখানে চিন্তার বিষয় হলো, মজনু কালো মেয়ের মহব্বতে এমন দেওয়ানা হয় যে, সে অপূর্ব সুন্দরী নারীকেও দেখতে চায় না। এর বিপরীতে আমরা আল্লাহর কেমন পাগল যে, আল্লাহপাকের মতো সুন্দর ও নয়নাভিরাম মুক্তা ছেড়ে কালচে মানুষের পেছনে ঘোরাঘুরি করি। বলুন তো, তবে কী লায়লার সৌন্দর্যের চেয়ে মাওলার সৌন্দর্য কম? লায়লার মধ্যে আর মাওলার মধ্যে পার্থক্য কেমন?

কেউ আসমান জমিনের মতো পার্থক্য বললে তাও কখনো যথার্থ নয়।

কেউ আরশ আর ফরাশের পার্থক্য করলে তাও যথার্থ হবে না।

কেউ পানির ফোঁটা ও সমুদ্রের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করলে তাও যথার্থ হবে না।

কেউ সূর্য আর অণুর পার্থক্য বললে তাও যথার্থ হবে না।

কারণ, মাখলুকের সৌন্দর্যের কোনো তুলনাই হয় না আল্লাহপাকের সৌন্দর্যের সঙ্গে। এজন্য আমাদের কর্তব্য হলো, দুনিয়ার রূপের পাগল না হয়ে রূপের স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহপাকের প্রকৃত প্রেমিক হয়ে জীবন যাপন করা।

প্রেমের তিন পরীক্ষা

জগতে মাওলাপ্রেমের কিংবদন্তী হযরত ইবরাহীম (আ.)। তিনি ছিলেন আল্লাহর কঠিন প্রেমিক। আল্লাহ তাঁর প্রেমের পরীক্ষা নিলে তিনি তাতে শতভাগ পাশ করেন। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনে এভাবে আলোচিত হয়েছে–

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.

'সে সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন তার প্রভু তাকে পরীক্ষা করেন কয়েকটি বিষয় দ্বারা আর তিনি তাতে কৃতকার্য হন।'[১]

আমার প্রিয় মুরশিদ (রহ.) বলতেন, فَأَتَمَّهُنَّ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তিনি পরীক্ষায় Cent per cent তথা শতভাগ উত্তীর্ণ হন। তিনি যেসব পরীক্ষায় পাস করেন, তার বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো।

নমরূদের আগুনে নির্দ্বিধায় লাফিয়ে পড়া

হযরত ইবরাহীম (আ.) নমরূদের আগুনে নিক্ষিপ্ত হন।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৪

এর পেক্ষাপট সম্পর্কে কিতাবের বর্ণনা হলো–

اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى نَبِيِّهٖ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَا اِبْرَاهِيْمُ اِنَّكَ لِيْ خَلِيْلٌ فَاحْذَرْ اِنْ اَطَّلِعَ عَلٰى قَلْبِكَ فَاَجِدُ مَشْغُوْلًا بِغَيْرِيْ فَيَقْطَعُ حُبُّكَ مِنِّيْ فَاِنِّيْ اِنَّمَا اَخْتَارُ لِحُبِّيْ مَنْ لَوْ اَحْرَقْتُهُ بِالنَّارِ لَمْ يَلْتَفِتْ قَلْبُهُ عَنِّيْ.

'আল্লাহপাক তাঁর নবী ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেন এই মর্মে যে, হে ইবরাহীম! তুমি আমার বন্ধু। তোমাকে এর থেকে বিরত থাকা চাই যে, আমি তোমার মনের দিকে তাকালে দেখব, তা অন্যের চিন্তায় বিভোর তারপর এ কারণে তোমার মহব্বত আমার থেকে ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ হলো, আমি যাকে আমার বন্ধুরূপে চয়ন করি, তার এমন হওয়া উচিত যে, যদি তাকে আগুনেও জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তথাপিও তার মন আমার থেকে অন্যের প্রতি ধাবিত হবে না।'

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সামনে এ ঘটনা বাস্তব হয়ে দেখা দেয় যে, এক সময়ে নমরূদ তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়। তাফসীরের কিতাবে এই অগ্নির ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য এসেছে। কাঠের স্তূপে একই সময় আগুন লাগানো হয়। যখন বিস্তৃত এলাকা জুড়ে আগুন জ্বলতে থাকে, তখন নমরূদের এই চিন্তা হয় যে, ইবরাহীমকে কীভাবে আগুনে ফেলা হবে। কেননা, আগুনের তাপ ও প্রতাপ এত প্রখর হয় যে, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এলাকা উত্তপ্ত হয়ে যায় এবং তার ধারে-কাছে যাওয়া যায় না। পরিশেষে শয়তান নমরূদের কাছে আসে এবং এই উপায় বের করে দেয় যে, আপনি একটি ঝোলা বানান। তারপর ইবরাহীমকে তাতে বসিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করুন। এ প্রক্রিয়ায় দূর থেকেই তাকে আগুনে ফেলা যাবে এবং ইবরাহীম দূর থেকে হলেও সোজা আগুনের মধ্যভাগে গিয়ে পড়বে। নমরূদ শয়তানের প্রস্তাব লুফে নেয় এবং একটা ঝোলা বানিয়ে তাতে বসিয়ে ইবরাহীম (আ.)কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)কে নিয়ে ঝোলা আগুনে চক্কর খেতে থাকলে ফেরেশতারা আঁৎকে উঠে বলল, হে আল্লাহ! ইবরাহীম আপনাকে কতখানি ভালোবাসে যে, আপনাকে ভালোবাসার অপরাধেই আজ তাকে আগুনে ফেলা হচ্ছে। তিনি কোনো আসবাবের পরোয়া করেননি। হে আল্লাহ! আপনি তাকে সাহায্য করুন। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের কথার জবাবে বললেন, তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও এবং তাকে সাহায্য করতে চাও। যদি

তোমাদের সাহায্য সে গ্রহণ করে, তাহলে সাহায্য করবে। আর যদি সে সাহায্য না নেয়, তাহলে তা ইবরাহীম ও তার রবের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমরা আর মাথা ঘামাবে না। কেননা, এটি আশেক-মাশুকের খেলা ও রহস্য।

ফেরেশতারা সঙ্গে-সঙ্গে ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে ছুটে যায় এবং সাহায্য করার অনুমতি চায়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের কথার জবাবে বললেন–

لَاحَاجَةَ لِيْ إِلَيْكُمْ

প্রচলিত ভুল ২/১৪৮

'তোমাদের সাহায্যের আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

তারপর ফেরেশতাপ্রধান হযরত জিবরাঈল (আ.) স্বয়ং তাঁর কাছে আসেন এবং সাহায্য করার অনুমতি চান। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) ও ইবরাহীম (আ.)-এর মাঝে নিম্নরূপ আলাপ হয়-

হযরত ইবরাহীম : ভাই জিবরাঈল! আপনি নিজ উদ্যোগে এসেছেন, নাকি আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন? হাদীসের নামে জালিয়াতি পৃ: ২৩৯

হযরত জিবরাঈল : আমি আল্লাহর অনুমতি নিয়েই এসেছি। তবে আল্লাহপাক বলেছেন, যদি ইবরাহীম সাহায্য চায়, তবেই সাহায্য করবে।

হযরত ইবরাহীম : আমি আপনার সাহায্য গ্রহণ করতে পারছি না বলে দুঃখিত। কারণ, আমার মাওলা জানেন, আমি কোন বিপদে আছি। তারপরও তিনি যেহেতু আপনাকে সাহায্য করার নির্দেশ দেননি, যার দ্বারা বোঝা যায়, তিনি আমার এই অবস্থার প্রতি জেনে-বুঝে রাজী, তাই আমার মাওলার ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে আমি অগ্নির দহনকেই বেছে নিচ্ছি। আপনার সাহায্যে আমি অগ্নির কবল থেকে বাঁচতে চাই না।

হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই অদম্য প্রভুপ্রেম দেখে আল্লাহর কাছে ফিরে যান এবং ইবরাহীমের নিখাদ প্রেম ও ভালোবাসার কথা জানান। আল্লাহপাক তখনই আগুনকে সম্বোধন করে নির্দেশ দেন–

يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ

'হে আগুন! আমার ইবরাহীমের প্রতি তুমি শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।'[১]

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৬৯

এভাবে আল্লাহপাক ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য অগ্নিকুণ্ডকে ফুলবাগানে পরিণত করে দেন। এটি ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় তিনি শতভাগ কৃতকার্য হলে আল্লাহপাক তাকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করেন। আগুনের কারাগারে তিনি তাঁকে শান্তি ও নিরাপদ রাখেন।

পানিশূন্য মরু প্রান্তরে স্ত্রীকে নির্বাসন

ইসমাঈল (আ.) জন্মলাভ করলে ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনে দ্বিতীয় পরীক্ষা চলে আসে। আল্লাহপাক এ সময় তাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন–

'হে আমার প্রিয় বন্ধু! তুমি তোমার স্ত্রীকে পানিশূন্য মরু প্রান্তরে রেখে আসো।'

সেমতে হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত হাজেরা ও তাঁর শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)কে বায়তুল্লাহ-এর সন্নিকটে পানি ও তৃণলতাবিহীন স্থানে রেখে আসেন। তিনি কোনো কথা বললেন না। নীরবে স্ত্রী-সন্তানকে রেখে সিরিয়ায় ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নেন।

এটি কোনো সামান্য ঘটনা ছিল না। একটু চিন্তা করে দেখুন, স্ত্রীকে নির্জন স্থানে রেখে আসতে কারো মন চায় না। শহরেও এভাবে রাখতে মন সাড়া দেয় না। সেখানে স্ত্রী-সন্তানকে এমন মরুভূমিতে রেখে আসা, যেখানে তৃষ্ণা নিবারণের পানি নেই এবং চতুর্দিকে শুধু পাথর আর পাথর। এ কত বড় পরীক্ষা! ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহর নির্দেশে স্ত্রী-সন্তানকে সেখানে রেখে ফিরতে উদ্যত হন, তখন তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমাদেরকে এখানে কেন রেখে যাচ্ছেন? ইবরাহীম (আ.) এবারও কোনো জবাব দেন না। তাঁর স্ত্রী যেহেতু নবীর সান্নিধ্যপ্রাপ্তা ছিলেন, তাই তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কি আল্লাহর নির্দেশে আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন? তিনি মুখে জবাব না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ান। এতে তিনি ইশারার সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, আমি আল্লাহর নির্দেশে তোমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছি। তার স্ত্রী একথা শুনে বললেন, যদি আপনি আল্লাহর নির্দেশে রেখে যান, তাহলে আল্লাহ কখনও আমাদের বিপদগ্রস্ত করবেন না। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী-সন্তানকে রেখে সিরিয়া চলে যান।

হযরত ইসমাঈলকে কে শেখাল সন্তানের শিষ্টাচার?

নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া সহজ; কিন্তু নিজের চোখের সামনে সন্তানকে মৃত্যুবরণ করতে দেখা তার চেয়ে অনেক-অনেক কঠিন কাজ। এ

কারণেই সন্তানকে রক্ষা করতে পিতামাতা সামনে চলে আসে এবং বলে, আগে আমাকে মারো তারপর সন্তানের গায়ে হাত দাও। এর থেকে জানা যায়, হযরত ইবরাহীম (আ.)কে আগুনে নিক্ষেপ করার পরীক্ষার চেয়ে তার সন্তানকে নিজহাতে জবাই করার পরীক্ষা ছিল বেশি কঠিন।

হযরত ইবরাহীম (আ,) স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে সাক্ষাত করতে সিরিয়া হতে মক্কায় আসেন। তিনি ৮ জিলহজ্ব স্বপ্নে দেখলেন, তিনি নিজ হাতে স্বীয় পুত্রকে জবাই করছেন। তিনি সকালে উঠে এর ব্যাখ্যা করলেন, হয়ত কুরবানি কামনা করা হচ্ছে। ফলে তিনি ৭০টি উট আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করলেন। নবম তারিখের রাতে তিনি আবার পূর্বের মতো স্বপ্ন দেখলেন। ফলে পরের দিনও তিনি ৭০টি উট কুরবানি দিলেন। দশম তারিখের রাতে আবার স্বপ্ন দেখলেন, নিজ হাতে ইসমাঈলকে জবাই করছেন। তৃতীয়বারের মতো একই স্বপ্ন দেখলে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ পশুর নয়, বরং তাঁর পুত্রেরই কুরবানি চান। ফলে তিনি দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, এবার আমি স্বীয় সাত বছর বয়সী পুত্র ইসমাঈলকে আল্লাহর নামে কুরবানি দেব।

প্রভাতে উঠে হযরত ইবরাহীম (আ.) শিশুপুত্রকে আদর করলেন এবং বললেন, বৎস! আমার সঙ্গে চলো। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, এক বড়জনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে। তিনি নাম বললেন না। কেননা, তিনি মা ছিলেন। সম্ভব ছিল যে, কুরবানির নাম শুনলে তার মনে ব্যথা লাগবে, চোখে পানি চলে আসবে এবং এতে ধৈর্য ধারণে ব্যাঘাত ঘটবে। তাই ইবরাহীম (আ.) ব্যাপারটা খুলে না বলে বললেন, এক বড়জনের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

স্বামীর কথায় হযরত হাজেরা (রাযি.) হযরত ইসমাঈল (আ.)কে গোসল করান, মাথায় তেল দেন এবং চিরুনীও করে দেন। কিন্তু তাঁর জানা ছিল না, আজ তার পুত্র কোন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। অবশ্য যাওয়ার কালে হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্রকে বললেন, পুত্র! একটা রশি আর একটা ছুরি সঙ্গে নিয়ে নিও। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আব্বাজান! রশি-ছুরি নিতে হবে কেন? তিনি বললেন, বাবা! বড়দের সঙ্গে সাক্ষাত করলে কুরবানিও করতে হয়। পুত্র ভাবলেন, হয়ত কোনো পশু কুরবানি করবেন। এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর কলিজার টুকরাকে কুরবানি করার জন্য বাড়ি হতে রওনা হন।

হযরত ইবরাহীম (আ.) কিছু দূর যেতেই পাপিষ্ঠ শয়তান বিবি হাজেরা (রাযি.)-এর কাছে আসে এবং বলে, তুমি কি জান, আজ তোমার ছেলের

পরিণতি কী হতে চলেছে? তিনি জানতে চাইলেন, কি আর হবে? শয়তান বলল, তোমার স্বামী তোমার পুত্রকে জবাই করে ফেলবে। তিনি বললেন, এই বুড়া! তুমি পাগল হয়ে গেছ না-কি? কোনো পিতা কি তার পুত্রকে জবাই করে? শয়তান বলল, হাঁ, আল্লাহ তাকে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন। যখন শয়তান বলল, আল্লাহ তাকে এমন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন বিবি হাজেরা বললেন, আল্লাহ হুকুম দিয়ে থাকলে আমার পুত্রের কুরবান হতে বাধা কোথায়? যদি আমার ব্যাপারেও এই নির্দেশ আসে যে, তোমাকে কুরবান হতে হবে, আমিও এর জন্য প্রস্তুত আছি। প্রচলিত ভুল ২/১৬৩

শয়তান বিবি হাজেরাকে বিপথগামী করতে ব্যর্থ হয়ে এবার হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কাছে এল। তাকে জিজ্ঞাসা করল, বলো তো তুমি কোথায় যাচ্ছ? ইসমাঈল বললেন, এক বড়জনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি। শয়তান বলল, মোটেও নয়। তোমাকে জবাই করা হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কীভাবে সম্ভব? বাপ হয়ে কেউ কি ছেলেকে জবাই করতে পারেন? শয়তান বলল, আল্লাহ তাকে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন, আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে থাকলে আমি প্রস্তুত আছি। সুতরাং শয়তান এবারও ব্যর্থ হলো। হাদীসের নামে জালিয়াতি, ২৪০ পৃ:

তারপর শয়তান হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে এসে বলল, পুত্রকে কেন জবাই করতে যাচ্ছেন? স্বপ্নের কারণে কেউ কি স্বীয় সন্তানকে জবাই করে? মনে রাখবেন, কাবীল হাবীলকে হত্যা করেছিল। এ কারণে তার বদনাম ও জিল্লতির কথা কে না জানে? আজ যদি আপনিও নিজ পুত্রকে জবাই করেন, তবে হতে পারে, এই হত্যার কারণে আপনার নামটিও কেয়ামত পর্যন্ত কলঙ্কিত হয়ে যাবে। অতএব, আপনি এ কাজটি করবেন না। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, রে হতভাগা! কথা শুনে মনে হচ্ছে তুই শয়তান। কাবীল তো হাবীলকে স্বীয় স্বার্থে হত্যা করেছিল। পক্ষান্তরে আমি স্বীয় প্রভুর পক্ষ হতে প্রাপ্ত স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য স্বীয় পুত্রকে কুরবান করছি। আমার স্বপ্নের সঙ্গে কাবীলের ভাতৃহত্যার মিল কোথায়? কাবীলের লক্ষ্য ছিল নারীর সঙ্গ লাভ। পক্ষান্তরে আমার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। অতএব, আমি আজ স্বীয় পুত্রের কুরবানি দিয়ে মাওলার মহব্বতের প্রমাণ পেশ করব।

তারপর হযরত ইবরাহীম (আ.) সামনে অগ্রসর হতে চাইলে শয়তান সামনে এসে পথ আগলে তাঁর গতিরোধ করল এবং বলল, সামনে যেতে দেব

না। হযরত ইবরাহীম (আ.) শয়তানকে তাড়াতে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। এর উসিলায় আল্লাহপাক সেখান থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে দিলেন। পরে এ স্থানের নাম হয়ে যায় জামরায়ে উলা।

কিছু দূর যাওয়ার পর শয়তান আবার গতিরোধ করল। হযরত ইবরাহীম (আ.) এখানেও ৭টি কঙ্কর মেরে শয়তানকে তাড়িয়ে দিলেন। এ স্থানটির নাম হয় জামরায়ে উস্‌তা। কিছু দূর আওয়ার পর আবার শয়তান এল এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পথ রোধ করল। হযরত ইবরাহীম (আ.) এখানেও ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করে শয়তানকে তাড়িয়ে দিলেন। এ স্থানটির নাম হয় জামরায়ে আকাবা।

জামরায়ে আকাবা ছেড়ে সামনে এগিয়ে গেলে হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আব্বাজান! আপনি বলেছিলেন, এক বড়জনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যেতে হবে। বলুন, তাঁর সঙ্গে কখন সাক্ষাত হবে? এবার হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্র ইসমাঈলকে সব কথা খুলে বললেন। তিনি বললেন–

يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى

'প্রিয়পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখলাম, তোমাকে জবাই করছি। বলো, এখন তোমার অভিমত কী?'[১]

পুত্রও ছিলেন নবীঘরানার সন্তান এবং ভবিষ্যতে তিনিও মর্যাদাসম্পন্ন নবী হবেন। তাই বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করে বিনীতভাবে বললেন–

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ

'শ্রদ্ধেয় আব্বাজান! আপনি যে ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছেন, তা সম্পন্ন করুন। আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্গত পাবেন।'[২]

সুবহানাল্লাহ! পিতার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ভরপুর থাকলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে তার নমুনা পাওয়া যায়, যার প্রমাণ আলোচ্য ঘটনা। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর হৃদয়ে খোদাপ্রেম ছিল বিধায় হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাঝেও খোদাপ্রেমের জীবন্ত প্রকাশ ঘটেছে।

---

১. সূরা সাফফাত : আয়াত ১০২

২. সূরা সফফাত : আয়াত ১০২

পুত্র ইতিবাচক জবাব দিলে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে জবাই করতে প্রস্তুত হন। পিতার প্রস্তুতি দেখে হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন–

আব্বাজান! আমি আপনাকে ৪টি কথা বলতে চাই।

হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, বলো বৎস! তুমি আমাকে এ মুহূর্তে এমন কী কথাটি বলতে চাও? হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন–

(১) আব্বাজান! প্রথম কথা হলো, আপনি ছুরিটা ভালো করে ধার করে নিন, যেন এমন না হয় যে, ছুরি ভোতা হওয়ার কারণে আমাকে জবাই করতে সময় লেগে যাবে। আমি যখন আল্লাহর নামে কুরবান হতে চলেছি, তখন ছুরি বেশি ধার করে নিলে আমি দ্রুত আল্লাহর কাছে পৌঁছে যেতে পারব।

পুত্রের এই পরামর্শ শুনে হযরত ইবরাহীম (আ.) ছুরিটা আরও বেশি ধার করে নিলেন এবং বললেন, এবার বলো, তোমার দ্বিতীয় কথাটি কী?

হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন–

(২) আব্বাজান! আমি যেহেতু ছোট, তাই আমাকে রশি দিয়ে ভালো করে বেঁধে নিন, যাতে আমি নড়াচড়া করতে না পারি।

হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্রের এই পরামর্শও গ্রহণ করলেন এবং তাকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেললেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) জানতে চাইলেন, তোমার তৃতীয় কথাটি কী? হযরত ইসমঈল (আ.) বললেন–

(৩) আব্বাজান! আপনি যখন আমাকে জবাই করবেন, তখন আমার চেহারা আকাশমুখী করবেন না। কেননা, আমি চাই, সেজদা অবস্থায় আমার ইন্তেকাল হোক। এমনিভাবে যখন আপনার দিকে আমার ঘাড় পড়বে, তখন আমার প্রতি আপনার মহব্বত উথলে উঠবে না। নতুবা হতে পারে, আমার চোখে চোখ পড়ায় আপনার পিতৃহৃদয় কেঁদে উঠবে আর আপনি জবাই করতে পারবেন না।

হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, ঠিক আছে; আমি তোমাকে উপুড় করে শুইয়ে নেব। এবার বলো, তোমার চতুর্থ কথাটি কী?

হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন–

(৪) আব্বাজান! আমাকে জবাই করা হলে আপনি আমার গায়ের পোশাক খুলে নিয়ে যাবেন এবং এই রক্তমাখা জামা আমার মাকে দেখিয়ে বলবেন, তোমার পুত্র আল্লাহর নামে সফল হয়ে গেছে।

পুত্রের এই চতুর্থ কথাটি শুনে হযরত ইবরাহীম (আ.) ডুকরে কেঁদে উঠলেন এবং আল্লাহকে সম্বোধন করে বললেন–

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দিয়েছেন। এখন সেই মাসুম বাচ্চার কুরবানি চাচ্ছেন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার খলীলের উপর রহম করুন। দয়া করুন ওই বাচ্চার উপর, যে আপনার নামে কুরবান হতে প্রস্তুত।

তারপর হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)কে উপুড় করে শুইয়ে তার গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন। কিন্তু ছুরি তাকে কাটে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত জিবরাঈল (আ.) কে নির্দেশ দিলেন–

'যাও জিবরাঈল! ইবরাহীমের ছুরিটা ধরে ফেলো। যদি ছুরি দ্বারা ইসমাঈলের কোনো রগ কাটা যায়, তাহলে ফেরেশতাদের দফতর থেকে তোমার নাম কেটে দেব।'

হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে ছুরিটা ধরে ফেললেন।

এদিকে হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে পুনর্বার কাটার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ছুরি কাজ করল না। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছুরি দ্বারা জবাই করতে গায়ের সর্বশক্তি ব্যয় করলেন। কিন্তু তারপরও ছুরি কাটে না। এবার হযরত ইবরাহীম (আ.) রাগতস্বরে ছুরিকে বললেন, এই ছুরি! তুই কাটছিস না কেন?

আল্লাহর কী লীলা! ছুরির যবান খুলে গেল। ছুরি জিজ্ঞাসা করল, ইবরাহীম! আপনাকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন আগুন আপনাকে পোড়াল না কেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, 'আগুনের প্রতি নির্দেশ ছিল, আমার ইবরাহীমকে জ্বালাবি না।'

ছুরি বলল, হে ইবরাহীম! আপনি আমাকে একবার বলেছেন, গলা কাটো। কিন্তু আল্লাহপাক ৭০ বার আমাকে বলেছেন, খবরদার কাটবে না। এখন বলুন, আমি কীভাবে কাটতে পারি?

আল্লাহপাকের শান দেখুন! তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)কে বাঁচিয়ে রাখলেন এবং তার পরিবর্তে দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই প্রচেষ্টা আল্লাহর কাছে এত ভালো লাগল যে, আল্লাহ তাঁর পুত্রকে হেফাযত করলেন এবং বললেন–

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

'তার স্থলে আমি বিরাট একটা কুরবানির পশু প্রদান করি।'[১]

---

১. সূরা সাফ্ফাত : আয়াত ১০৭

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে عظيم শব্দটি এ জন্য বলেছেন যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কপালে দুই নবুওয়াতের নূর ছিল। একটি তাঁর নিজের, অপরটি শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের।

আল্লাহ বলেন–

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ

'নিঃসন্দেহে এটি বিরাট পরীক্ষা ছিল।'[১]

তারপর আল্লাহপাক বলেন–

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

'হে ইবরাহীম! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।'[২]

অর্থাৎ হে ইবরাহীম! তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছ। কেননা, তুমি এমন কুরবানি পেশ করেছ, যা চিরদিনের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

আল্লাহপাক এই সীমাহীন অবদানের জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)কে মুবারকবাদ জানিয়েছেন এবং একে কেয়ামত পর্যন্ত অমর করে দিয়েছেন।

আল্লাহপাক বলেন–

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

'এবং আমি পরবর্তীদের মাঝে এই বিধান প্রদান করেছি।'[৩]

অর্থাৎ ইবরাহীম! তোমার এই ত্যাগ আমার এত ভালো লেগেছে যে, আমি কেয়ামত পর্যন্ত নিয়ম বানিয়ে দিলাম, যুগ-যুগ ধরে মানুষ তোমার স্মৃতি স্মরণ করত আল্লাহর জন্য কুরবানি করে যাবে।

দেখুন, যেব্যক্তি প্রেমে সফল হয়, আল্লাহপাকের পক্ষ হতে তার সম্মান এভাবে মেলে। আজও ঈমানওয়ালাদের জীবনে মহব্বতে এলাহির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। কত মা আছেন, যারা আজও আপন সন্তানদের ইসলামের সমুন্নতির জন্য জিহাদের ময়দানে পাঠিয়ে দেন আর বলেন, যাও; নিজের জীবনটা কুরবান করে দাও।

---

১. সূরা সাফ্ফাত : আয়াত ১০৬
২. সূরা সাফ্ফাত : আয়াত ১০৯
৩. সূরা সাফ্ফাত : আয়াত ১০৮

আদর্শ মাতা একেই বলে

জং শহরের বাসিন্দা এক যুবক কিছু দিন পূর্বে জিহাদের ময়দানে শহীদ হন। তার জানাযা পড়ার সময় তার মাতা বললেন–

'আমার এক ছেলে শহীদ হয়েছে; আরও তিন ছেলে আছে। আমার মন চায়, অপর তিন ছেলেও যেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়।'

দেখুন, ঈমানদারদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত কত বেশি! আজও ঈমানদার মহিলারা আকাঙ্ক্ষা রাখেন, আমাদের সন্তান যেন আল্লাহর দীনের জন্য জীবন কুরবান করে।

আল্লাহর স্মরণের গুরুত্ব

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! যিকিরের দ্বারা অন্তরে আল্লাহর জাতের মহব্বত পয়দা হয়। এই যিকিরের উদ্দেশ্য শুধু গণনা করে সংখ্য পূরণ করা নয়, বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো, অন্তরে আল্লাহর মহব্বত পয়দা হওয়া। কবি সুন্দর বলেছেন–

اشتیاق حق بود ذکر دلت

کوشش تا گردد ترا ایں حاصلت

আল্লাহর ইশক-মহব্বত হোক তোমার দিলের যিকির,
এটাই তুমি কর অর্জন এটাই তোমার ফিকির।

আল্লাহর মহব্বত অন্তরে এসে গেলে মানুষের পক্ষে ইবাদাত করা সহজ হয়ে যায়। তখন আল্লাহর জন্য কুরবানি দেওয়া সহজ হয়। নফ্সকে নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ হয়ে যায়।

এ-কারণেই বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে মাত্র ২টি জিনিস চাই।

১. আপনার প্রগাঢ় মহব্বত।

২. যারা আপনাকে মহব্বত করে, তাদেরও মহব্বত চাই।'

আমাদেরও কর্তব্য হলো, আমরাও আল্লাহর কাছে তাঁর মহব্বত প্রার্থনা করব। মনে রাখবেন–

دوعالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذت آشنائی

প্রেমের সুধার যায় না বলা কী যে মজা তার
অন্তরে সে এলে পরে দোজাহানও হয় পর।

যখন মানুষের অন্তরে আল্লাহর মহব্বতের স্বাদ এসে যায়, তখন সে সারা দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মানুষের দৃষ্টি কেবল আল্লাহর জাতের উপরই নিবদ্ধ হয়ে যায়। তার দৃষ্টি একমুখী হয়ে যায়। সে لا এর তলোয়ার দ্বারা বাকি সব কিছুর অস্তিত্ব মুছে ফেলে। তার অন্তরে শুধু আল্লাহপাকই থাকেন। তার অন্তরে আল্লাহ গেঁথে যান; তার দিলে আল্লাহ ঢুকে যান। একে 'ফানায়ে কল্‌ব' বলে। এই স্তর অর্জনের জন্য আমি এবং আপনারা আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী।

আমাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহপাকের কাছে এভাবে কামনা করা যে, হে দয়ালু দাতা! আমাদেরকে আপনার এমন স্মরণ দান করুন, যার সুবাদে আমাদের তামাম যিন্দেগী যেন তার নির্দেশনা অনুযায়ী হয়ে যায়।

মনে রাখবেন, যে চায় সে পায়। হযরত খাজা মুহাম্মদ মাসুম (রহ.) বলেন–

سالک جب تک ہالک نہ بنے کام نہیں ہوتا

' নিজেকে না হারানো পর্যন্ত সালেকের কার্যসিদ্ধি হয় না।'

এ কারণে আল্লাহপাক মানুষের উপর যিকিরের কোনো সময়সীমা উল্লেখ করেননি; বরং বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকহারে আল্লাহর যিকির করো।'[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহপাক বলেছেন–

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

'অধিকহারে যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী মহিলা।'[২]

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৪১

২. সূরা আহযাব : আয়াত ৩৫

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাঁর যিকিরের জন্য 'অধিক' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'অধিক' একে বলে না যে, আমরা মাত্র ৫/১০ মিনিট মুরাকাবা করলাম। যখন মিনিটের হিসাব ছেড়ে বাইরে আসা হবে এবং যিকির করাকেই স্বীয় জীবনের লক্ষ্য বানানো হবে, তখন আল্লাহপাকও আমাদের উপর রহম করবেন। এ বিষয়ে শায়েখ ওজীহুদ্দীন (দা.বা.)-এর মন্তব্য অতি চমৎকার।

তিনি বলেন–

بادشاہ اپنے دیدار کے لئے انتظار کروایا کرتے ہیں

'বাদশা তাঁর সাক্ষাত প্রার্থীদের ইচ্ছা করেই বসিয়ে রাখেন।'

আল্লাহপাক যেন আমাদেরকে মুরাকাবার আদলে তার সাক্ষাতের জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করার তাওফীক দেন। যদি আমরা শুধু এ বিষয়টি অন্তরে গেঁথে নিতে পারি, তবে আমাদের এখানে আগমনের লক্ষ্য পূরণ হয়ে যাবে। মানুষ আল্লাহর কাছে তার মহব্বত এভাবে প্রার্থনা করবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْكَ

'হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে কেবল আপনাকেই চাই।'

যদি মানুষের অন্তরে সত্যিকার অর্থে এমন কামনা-বাসনা পয়দা হয়, তখন গিয়ে তার ইবাদাত-বন্দেগীর ঢংই পাল্টে যাবে। জীবনে যার কখনো গুনাহ হবে না এবং আল্লাহপাকের পূর্ণ আনুগত্য এসে যাবে।

আল্লাহর মহব্বত প্রত্যেক কালেমাওয়ালার মাঝে কিছু না কিছু থাকেই। কিন্তু আল্লাহপাক এই 'সামান্য'তে খুশি নন। তিনি চান মহব্বতের চূড়ান্ত। এজন্যই তো তিনি اشد শব্দ ব্যবহার করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত এই اشد তথা সর্বোচ্চ স্তরের না হবে, ততক্ষণ ঈমানই পরিপূর্ণ হবে না। বান্দা ঈমানের পুরো মজা পাবে না। এজন্য আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তাঁর মহব্বতের ঢেউ ও বন্যা কামনা করা এবং এভাবে দু'আ করা–

'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার মহব্বতের দেওয়ানা ও পাগল বানিয়ে দিন। সর্বক্ষণ আপনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অটুট রাখুন। সর্বদা আপনি আমাদের অন্তরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করুন।'

জনৈক কবি অতি নিপুণভাবে প্রেমিকের ইশ্‌ক ব্যক্ত করেছে এভাবে–

مجھ کو نہ اپنا خوش نہ دنیا کا ہوش ہے
بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں

নিজের চিন্তা নেই আমার নেই দুনিয়ার ফিকির,
তোমার প্রেমে বিভোর আমি মুখে তোমার যিকির।

تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی
راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں

প্রশ্ন কর তারাদের কাছে বলবে মোর জীবনী,
তোমার ধ্যানে কাটে আমার সকল বিনিদ্র রজনী।

আমাদেরও উচিত আল্লাহর জন্য রাত জাগরণকারী হওয়া। নিয়মিত তাহাজ্জুদগুযার হওয়া এবং সর্বক্ষণ অন্তরে আল্লাহর ধ্যান রাখা। আল্লাহপাক আমাদের তাওফীক দিন।

হৃদয়জগৎ পরিষ্কার করা

আল্লাহর মহব্বতের প্রাচুর্য ও প্রগাঢ়তা অর্জন করতে হলে প্রথমে অন্তর্জগত পরিষ্কার করতে হবে। মানুষ যখন তার মণিকোঠায় সযত্নে লালিত স্মৃতিগলো ভেঙে চুরমার করে দেয়, তখন আল্লাহ সেখানে স্বীয় নূরের তাজাল্লি বর্ষণ করেন। ময়লাযুক্ত স্থানে কোনো মানুষ বসতে চায় না। তাহলে আল্লাহ তা'আলা কীভাবে ময়লাযুক্ত ও নাপাক স্থানে আসা পছন্দ করবেন? তিনিও চান, মানুষ তার হৃদয়জগতকে গায়রুল্লাহ হতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করুক। তাই আমাদের করণীয় হলো, আমরা গায়রুল্লাহ হতে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিব। চাই তা আত্মকেন্দ্রিক হোক, চাই বহিঃরাষ্ট্রের হোক, চাই কল্পিত প্রতিচ্ছবি হোক।

মনে রাখবেন, কতক মূর্তি এমনও হয় যে, মানুষ তাদের মাথায় ও মনে রেখে পূজা করে। অন্তরে আল্লাহকে ঢোকাতে হলে গায়রুল্লাহর মূর্তিশালা ভেঙে চুরমার করতে হবে।

আলোচনার সারনির্যাস

আমার বন্ধুগণ! আমাদের ইবাদাত ও মুজাহাদা নিঃসন্দেহে এমন উচ্চাঙ্গের নয় যে, তার সুবাদে আমরা আল্লাহর মহব্বতের স্থায়ী দৌলত পেয়ে যাব। কিন্তু আমরা তো প্রার্থনাকারী। প্রার্থনাকারীদের কাজই হলো

প্রার্থনা করা। প্রার্থনাকারীরা এটা দেখে না যে, আমরা যা চাচ্ছি আমরা তা পাওয়ার যোগ্য কি-না। আমরাও আল্লাহর দরবারে একথা বলতে থাকি যে, হে আল্লাহ! যদিও আমরা পাওয়ার যোগ্য নই, তথাপিও আপনি দান করুন। যোগ্যও তো আপনিই বানান।

আল্লাহপাক বলেন–

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا

'যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো, তাহলে তোমাদের একজনও কস্মিনকালেও পবিত্র হতে পারত না।'[১]

এ আয়াত থেকে জানা গেল, ফলাফল আমাদের মেহনতের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার উপর নির্ভরশীল। বাচ্চা হাত পা ছোড়ে, এতে পিতামাতার দয়া-মমতা এসে যায়। তাযকিয়াও এমন। সালেক অধিক প্রচেষ্টা চালায়। যখন আল্লাহ তার ঐকান্তিক ও নিরন্তর প্রচেষ্টা দেখেন, তখন আল্লাহর দরদ এসে যায়। ফলে তিনি নিজেই তার তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক স্বীয় বান্দাদের অনুনয়-বিনয় কবুল করেন। পিতা যেমন পুত্রকে বলে, বেটা! আমার কাছে এসো। অথচ সে ভালো করেই জানে, ছোট্ট বাচ্চা অতিশয় দুর্বল; সে আসতে পারবে না, আসতে গেলে পড়ে যাবে। কিন্তু পিতার মনে একথা থাকে যে, আমি তাকে পড়তে দিব না। পিতা শুধু এটুকুই দেখতে চান যে, পুত্র তার দিকে হাত-পা বাড়ায় কি-না!

এমনিভাবে আমাদেরও কর্তব্য হলো, তাযকিয়ার রাস্তায় সামনে অগ্রসর হওয়া, সামনে কদম ফেলা। যদিও আমরা দুর্বল এবং তাযকিয়া লাভের অনুপযুক্ত, কিন্তু যখন সামনে অগ্রসর হব এবং কোথাও গিয়ে পা কাঁপতে থাকবে, তখন তা আল্লাহপাকও দেখবেন। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে ফেতনাগ্রস্ত হওয়া থেকে হেফাযত করবেন। পিতামাতা যেভাবে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে অগ্রসরমান সন্তানকে বুকে টেনে নেয়, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহপাকও আমাদেরকে স্বীয় রহমতের ছায়ায় স্থান করে দিবেন।

আল্লাহপাকের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন এবং আমাদেরকে নিম্নোক্ত আয়াত

---

১. সূরা নূর : আয়াত ২১

وَالَّذِينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'মুমিনরা আল্লাহর প্রেমে পাগল।'

এর পরিপূর্ণ লক্ষ্যস্থল ও প্রয়োগক্ষেত্র বানিয়ে দেন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে আলেমরা-ই তাঁকে ভয় করে।'

–সূরা ফাতির : ২৮

উপকারী ইল্‌মের বরকত

[১৪২৩ হিজরীর ২৪ রবিউসসানী মোতাবেক ২০০২ সালের ১ জুলাই সোমবার পাকিস্তানের লেলুঙ্গু শহরে হযরতওয়ালা দামাত বারাকাতুহুম এই গুরুত্বপূর্ণ বয়ানটি পেশ করেন। মজলিসে বহু ওলামায়ে কেরাম, তালেবে ইল্‌ম ও সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।]

'যদি কারো ফালসাফা ও মানতেক নিয়ে গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

যদি কারো স্বীয় মেধার উপর গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

যদি কারো মধ্যে ফাসাহাতের গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

যদি কারো মাঝে ইসলামী আন্দোলনের গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

যদি কারো মাঝে তা'লীম ও তাদরীসের গর্ব থাকে, তবে তিনি শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

যদি কারো মাঝে দীনের তাবলীগের ব্যাপারে গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

যদি কারো মাঝে স্বীয় তাসনীফ ও রচনার গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

যদি কারো মাঝে বয়ান ও বক্তৃতার গর্ব থাকে, তবে তিনি আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

যদি কারো মাঝে আরবীতে পারদর্শিতার গর্ব থাকে, তবে তিনি সাইয়্যেদ সুলাইমান নদবী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

যদি কারো মাঝে ইতিহাস চর্চার গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।'

উপকারী ইল্‌মের বরকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : وَلٰكِنْ كُوْنُوا رَبَّانِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ: اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

ইল্‌ম ও মহব্বতের পাত্র

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতিটি মানুষকে দুটি বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন। (১) অস্থির দেমাগ বা মস্তিষ্ক ও (২) ভীত অন্তর। অস্থির মস্তিষ্ক হলো ইল্‌মে ইলাহীর পাত্র আর ভীত অন্তর হলো মহব্বতে ইলাহীর পাত্র। মানুষের কর্তব্য হলো উভয় পাত্র ভরপুর রাখা। যদি অন্তর মহব্বতে ইলাহীর পাত্র ভরে যায়; কিন্তু মস্তিষ্ক ইল্‌মে ইলাহী থেকে শূন্য থাকে, তাহলেও মানুষ গোমরাহ হয়ে যায়। মহব্বত মানুষকে বিদ'আত শেখায়। ইল্‌ম এই মহব্বতের মাঝে ভারসাম্য পয়দা করে। এমনিভাবে মস্তিষ্ক যদি ইল্‌ম দ্বারা ভরে যায়; কিন্তু অন্তরে মহব্বত না থাকে, তবুও মানুষ গোমরাহ হয়ে যায়। তখন সে আত্মম্ভরিতা ও গর্ব-অহংকারের ফাঁদে পড়ে যায়। শয়তানের কাছে ইল্‌ম ছিল।

তারপরও তার পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ কী? কারণ হলো, তার মধ্যে 'অহংকার' ছিল। আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথানত করার পরিবর্তে মাথা উঁচিয়ে সে বলেছিল–

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

'আমি আদম অপেক্ষা উত্তম।'[১]

শয়তানের এই আত্মম্ভরিতা ও গর্ব-অহংকার তাকে আল্লাহর দরবারে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত বানিয়ে দিয়েছিল।

তিনটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন

প্রথম যুগের লোক ও বর্তমান যুগের লোকের মাঝে তিনটি পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। আর তা হলো-

(১) প্রথম বিষয়টি হলো, আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ আল্লাহপাকের মারেফাত অর্জনের জন্য দিন-রাত চিন্তিত থাকতেন। পক্ষান্তরে বর্তমান যুগের মানুষ মাখলুকের মারেফাত (সৃষ্টিতত্ত্ব) অর্জনের জন্য গবেষণারত। বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার সামনে নিয়ে সবসময় বসে থাকে, যাতে আকাশের ছায়াপথ, সৌরমণ্ডল ও গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে নিত্যনতুন তথ্য জানতে পারে।

(২) দ্বিতীয় পরিবর্তন এই দেখা যায় যে, আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ আখেরাতের জন্য যত বেশি মেহনত করেছেন, বর্তমানের মানুষ সেই মেহনত করছে দুনিয়ার জন্য। মানুষ দিন-রাত দুনিয়ার পেছনে ছুটছে আর ছুটছে। দুনিয়া তাদের অন্তরে এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে, দিনের বেলায় মানুষ থাকে দোকানের মধ্যে; কিন্তু রাতের বেলায় দোকান থাকে মানুষের মধ্যে। দোকানের চিন্তা-ভাবনাতেই তার রাত পার হয়।

(৩) তৃতীয় পরিবর্তনটি হলো, আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ রূহকে সতেজ ও সবল করতে যারপরনাই চেষ্টা করতেন। পক্ষান্তরে বর্তমানের মানুষ দেহকে সবল-শক্তিশালী করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে, যার ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, দেহ সতেজ-সবল হলেও রূহ ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। আগের যুগের মানুষ খাদ্যের স্বল্পতায় মারা যেত; কিন্তু বর্তমানে মানুষ বেশি মরছে অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে। যতব বড়-বড় রোগ-ব্যাধি আছে সবগুলোর জন্ম হয় অতিরিক্ত ভোজন থেকে। তাই আফসোসের সঙ্গে বলতে

---

১. সূরা সাদ : আয়াত ৭৬

হচ্ছে, মহিলাদের সময় ততটুকু জায়নামাযে ব্যয় হয় না, যতটুকু ব্যয় হয় রান্নাঘরে।

দার্শনিক ও আম্বিয়ায়ে কেরামের মূলনীতির মধ্যে প্রভেদ

পৃথিবীতে বিভিন্ন ঘরানার যেসব জ্ঞানীজন আছেন, তারাও মানবতার কল্যাণ ও উন্নতিকল্পে অনেক রীতি-নীতি বানিয়েছেন। পক্ষান্তরে আম্বিয়ায়ে কেরামও দুনিয়ায় এসে মূলনীতি পেশ করেছেন। মনীষীগণ নিজেদের জ্ঞান ও বিবেকের উপর ভিত্তি করে জীবন পরিচালনার নীতিমালা উদ্ভাবন করেছেন। মনুষ্য-বিবেকের কাছে যা উপকারী বলে বিবেচিত হয়েছে; তারা তাকে গ্রহণ করেছেন আর বিবেকের দৃষ্টিতে যেটা ক্ষতিকর প্রতিভাত হয়েছে, তা থেকে পিছু হটেছেন। মোটকথা, তারা বিবেকের পূজা করেছেন। পৃথিবীর এক শ্রেণীর মানুষ এই জ্ঞানী ও দার্শনিকদের পিছনে চলছে। পক্ষান্তরে কালেমাওয়ালা এক শ্রেণীর লোক চলছে আম্বিয়ায়ে কেরামের বাতলানো রাস্তায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক নিজেদের কলবের উপর মেহনত করেছে এবং কলবকে ঈমানে হাকীকী ও মহব্বতে ইলাহী এবং নিজেদের মস্তিষ্ককে ইল্‌মে ওহী দ্বারা ভরপুর করেছেন। তারা আল্লাহপাকের ইচ্ছা মোতাবেক জীবন অতিবাহিত করেছেন।

আজব ব্যাপার হলো, উল্লিখিত দুই চিন্তাধারার লোকদের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনটি উল্লেখযোগ্য ফারাক দেখা যায়।

(১) যারা বিবেকপূজারী, বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকদের পেছনে চলে, তাদের মাঝে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তারা মানবতার কল্যাণের জন্য যে রীতিনীতি উদ্ভাবন করেছেন, তাদেরই সমসাময়িক অন্যান্য দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীরা তার বিরোধিতা করেছেন। এক দার্শনিকের মূলনীতি এক ধরনের হয় আর অন্য দার্শনিকের হয় ভিন্ন, যেন প্রত্যেকের চিন্তা ভিন্ন, দর্শন ভিন্ন। পক্ষান্তরে সকল নবীর কথা এক ও অভিন্ন। প্রত্যেকেই এসে একথা বলেছেন যে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করো। এর স্বপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ বলেন–

(١) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ.

'মাদায়েনে প্রেরণ করেন তাদের ভাই শুয়াইবকে। তিনি বলেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো।'[১]

---

১. সূরা হুদ : আয়াত ৮৪

(২) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ.

'এবং সামুদের প্রতি তাদের ভাই সালেহকে। তিনি বলেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো।'[১]

(৩) وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ.

'আদ গোত্রের প্রতি তাদের ভাই হূদকে। তিনি বলেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো।'[২]

(৪) وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ.

'এবং ইবরাহীমকে পাঠালাম। তিনি তার জাতিকে বললেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো।'[৩]

(৫) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ.

'এবং আমি নূহকে তার জতির কাছে পাঠিয়েছি। তিনি বলেছেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো।'[৪]

(৬) وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ.

'এবং মাসীহ (হযরত ঈসা আ.) বলেন, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো।'[৫]

(৭) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ.

'নিশ্চয় আমি প্রত্যেক উম্মতের ভেতর কোনো-না-কোনো রাসূল পাঠিয়েছি এই পথনির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো।'[৬]

যেন সকল নবী তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের সত্যায়ন করেন যে, যে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা লালন করতেন, আমরা তারই চেতনাবাহী। সকলের সুর এক, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য অভিন্ন।

---

১. সূরা হুদ : আয়াত ৬১
২. সূরা হুদ : আয়াত ৫০
৩. সূরা আনকাবুত : আয়াত ১৬
৪. সূরা মমিনূন : আয়াত ২৩
৫. সূরা মায়েদা : আয়াত ৭২
৬. সূরা নাহল : আয়াত ৩৬

(২) দ্বিতীয় সুস্পষ্ট পার্থক্য হলো, যেসব দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন, তাদের শিষ্যরাই পরে ওস্তাদদের গবেষণালব্ধ তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং অগ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন– কমিউনিজম একটি জীবনতন্ত্র ছিল। কিন্তু সত্তর বছর পরে খোদ কমিউনিজমের বার্তাবাহীরাই লেনিনের মূর্তি সড়কে ভেঙে চুরমার করেছে এবং বলেছে, এই লোক আমাদের ভুল পথ প্রদর্শন করেছে।

পক্ষান্তরে যেসব নবী-রাসূল এসেছেন, তাঁদের ভক্তবৃন্দ জীবনভর তাঁদের সত্যায়ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু শরীয়ত হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এনেছেন, সাহাবায়ে কেরাম তা অবলীলায় মেনে নিয়েছেন। এমনকি কাফের সর্দার আবুজাহাল পর্যন্ত বলেছে, আবুবকর! কোনো মানুষের পক্ষে কি এক রাতেই মক্কা হতে মসজিদে আকসা (ফিলিস্তিন) পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব? হযরত আবুবকর (রাযি.) বললেন, স্বাভাবিকভাবে তো সম্ভব নয়। তখন আবুজাহাল বলল, তোমার বন্ধু (মুহাম্মাদ) তো বলে, সে নাকি গিয়েছে! তখন হযরত আবুবকর (রাযি.) বললেন, যদি তিনি বলেন, তবে তিনি আল্লাহর নবী; তিনি সত্যই বলেছেন। সুবহানাল্লাহ! তৎক্ষণাৎ সত্যায়ন করে ফেললেন।

(৩) তৃতীয় পার্থক্যটি হলো, যেসব লোক জ্ঞান ও বিবেকের ভিত্তিতে মূলনীতি তৈরি করেছেন, তখনই তারা বিষয়টি জাতির সামনে এভাবে পেশ করেছেন যে–

এটা আমার চিন্তার ফসল।

আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

আমার গবেষণালব্ধ এটা।

আমার অভিজ্ঞতা এমন বলে।

আমার মাথায় এমন এসেছে।

আমার ব্যক্তিগত মত এটা।

সারকথা হলো, তাদের সমস্ত কথার নির্যাস হলো, আমি, আমি, আমি। অথচ অপরদিকে আম্বিয়ায়ে কেরাম যে শিক্ষা উপহার দিয়েছেন, তাতে সকলেই নিজ-নিজ উম্মতের দৃষ্টি আল্লাহপাকের দিকে ফিরিয়েছেন। তাঁরা কখনও নিজেদের ব্যক্তিমতকে সামনে রাখেননি; বরং আল্লাহর বার্তা সামনে পেশ করেছেন এবং বলেছেন–

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন।

আল্লাহপাক এটি নাযিল করেছেন।

আল্লাহপাকের পক্ষ হতে আমার প্রতি এই বার্তা এসেছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

মোটকথা, আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের সমস্ত শিক্ষায় উম্মতকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! যে দীন আমরা মেনে আসছি, সেটি পূর্ববর্তী সকল ধর্মের সারনির্যাস। যেমন– দুধ থেকে মাখন বের করে বলা হয়, এটা সমস্ত দুধের সারনির্যাস, তেমনি শরীয়তী মুহাম্মাদীও হলো সমস্ত শরীয়তের সারনির্যাস। এটি এমন নেয়ামত, যার ব্যাপারে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ.

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমি তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম।'[১]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহপাক স্বয়ং আমাদের দীনকে 'নেয়ামত' আখ্যা দিয়েছেন। ওই মহান সত্তার প্রতি আমরা কুরবান, যিনি আমাদের মতো অক্ষম ও অযোগ্যদের শ্রেষ্ঠ শরীয়তের উপর আমল করার তাওফীক দিয়েছেন।

মনে রাখবেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত। এই শরীয়ত সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হওয়ার জন্য ইল্‌ম অর্জন করা জরুরি। ইল্‌ম ব্যতীত শরয়ী বিধিবিধান জানা যায় না।

মানুষ হলো খনি

মানবতার মুক্তির দূত, বিশ্বরহমতের মূর্তপ্রতীক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ

'মানুষ হলো খনির মতো।'

নবীজি অত্যন্ত দামী কথা বলেছেন। মানুষ দুনিয়ায় কারো ভালো কথা শুনে ভূয়সী প্রশংসা করে বলে, অমুক লক্ষ টাকার মতো দামী কথা বলেছে।

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩

কিন্তু আমরা বলি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত বাণীটি এক লক্ষ টাকার সঙ্গে তুলনা করা যায় না; বরং সত্য কথা হলো, শত-কোটি ডলারের সঙ্গেও তার তুলনা হয় না। এত দামী কথা!

'খনি' ভূগর্ভস্থ ধনভাণ্ডারকে বলে। কোথাও স্বর্ণের খনি থাকে। কোথাও তামার খনি। কোথাও লোহার খনি মেলে। কোথাও মেলে ইউরেনিয়ামের খনি। এসব খনি হতে বিভিন্ন দামী বস্তু বের করে বিভিন্ন উপায়ে উপকার গ্রহণ করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতিকে খনির সঙ্গে এজন্য তুলনা করেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের মাঝে আল্লাহপাক বিভিন্নমুখী যোগ্যতা ও গুণের খনি সঞ্চিত রেখেছেন। যেভাবে খনি হতে সম্পদ নিজেই বের হয়ে পড়ে, তেমনি মানুষ নিজ মেহনত মুজাহাদার মাধ্যমে তার মধ্যেকার গুপ্ত যোগ্যতা ও সুপ্ত গুণ-প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে। যেহেতু প্রত্যেক লোকের মাঝে এহেন যোগ্যতা রয়েছে, তাই কাউকেও ছোট নজরে দেখা উচিত নয়। হাদীছ শরীফে এসেছে–

خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا فَقِهُوْا.

'ইসলামী যামানায় তোমাদের মধ্যে ভালো তারা, যারা জাহেলী যামানায় ভালো ছিল যদি তারা দীনের জ্ঞান অর্জন করে।'

যদি মানুষ মুসলমান হয়ে নেককার হয়, তাহলে সে দীনের ক্ষেত্রেও তোমাদের থেকে এগিয়ে যাবে এবং তারা দীনি ব্যুৎপত্তি লাভ করবে। কারণ হলো, প্রথম দিকে যেব্যক্তি ডাকাত-সর্দার থাকে, পরে যখন সে তাওবা করে, তখন সে নেককাজেও অন্যদের ছাড়িয়ে যায়। কেননা, তার মধ্যে নেতৃত্বের (Leadership) যোগ্যতা মজুদ থাকে।

বিষয়টির দৃষ্টান্ত এমন যে, একটি বীজের মাঝে বৃক্ষ হওয়ার যোগ্যতা থাকে। বটবৃক্ষ অনেক বড় হয়। কিন্তু তার বীজ খুবই ছোট হয়। এত ছোট বীজের মধ্যে কত বিশাল বৃক্ষ হওয়ার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু প্রত্যেকটি বীজ কিন্তু বৃক্ষ হয় না। কেবল সেই বীজই বৃক্ষ হয়, যে বীজ উপযুক্ত জমি, রীতিমত পানি এবং পরিচর্যাকারী উপযুক্ত মালী পায়। নতুবা হাজারো বীজ মাটিতে পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যায়। এমনিভাবে মানুষের মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভা তখনই বিকশিত হয়, যখন তারা উপযুক্ত সংস্রব পায় এবং কোনো ভালো শিক্ষক এবং উপযুক্ত শায়েখ মুরুব্বী পায়, যিনি তাকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে গড়ে তোলেন।

শাহ ভেক (রহ.) নামের এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি হিন্দী ভাষায় একটি চমৎকার চরণ লিখেছেন। কবিতাটির ভিত্তি ছিল ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর একটি উক্তি। তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মাঝে ওলী হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। অর্থাৎ তার মাঝে ওলী হওয়ার সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে। এই প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে সে এক সময় আল্লাহর ওলী হতে পারে। তবে এ মুহূর্তে ওলী হওয়া কঠিন। এর জন্য চাই চূড়ান্ত মুজাহাদা। এ মেহনত-মুজাহাদা যেহেতু সবাই করতে পারে, তাই প্রত্যেকেই আল্লাহর ওলী হতে পারে। শাহ ভেক (রহ.) নিজের ছদ্মনাম লিখতেন 'ভেকা'।

তার কবিতাটি এমন–

بھیکا بھگھا کوئی نہیں ہر دی گٹھڑی لعل

گرہ کھول نہ جاندے تے ترت پھرن کنگال

'ভেকা! কেউ শূন্য নয়। প্রত্যেকের নিকট জওহার ও মোতি রয়েছে। এরা নিজেদের বস্তার মুখ খুলতে জানে না, তাই বেচারারা কাঙালের মতো ঘুরে বেড়ায়।'

বাস্তবিক আল্লাহ আমাদের মাঝে বিভিন্নমুখী যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। আমরা আমাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করি না। এজন্যই কাঙালের মতো জীবন অতিবাহিত করি।

এই সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার চাবি হলো ইল্‌ম। এ কারণে দীন ইসলামের ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর আবশ্যক করা হয়েছে।

ফরজ বিষয়ের ইল্‌ম অর্জন করা ফরজ।

ওয়াজিব বিষয়ের ইল্‌ম অর্জন করা ওয়াজিব।

সুন্নতের ইল্‌ম অর্জন করা সুন্নত।

ইল্‌ম অর্জন করা এজন্য জরুরি যে, মানুষের সঙ্গে সবসময় মুফতী সাহেব থাকেন না যে, তার থেকে জিজ্ঞাসা করে কাজ চালাবে। দীনের একান্ত বিষয়সমূহের জ্ঞান অর্জন করার বিকল্প নেই। অবশ্য যদি কেউ এর বেশি তথা পরিপূর্ণ ইল্‌ম অর্জন করে, তাহলে তা হবে সোনায় সোহাগা। ইল্‌ম আল্লাহর নেয়ামত তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

প্রতিভা কখন বিকশিত হয়?

মানুষের মধ্যে কার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ কখন ঘটে এবং তার মধ্যে দীনের ব্যুৎপত্তি কখন আসে? এর উত্তর হলো, যখন মানুষের অন্তর পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত হয়ে যায়, তখনই তার মধ্যে দীনের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সৃষ্টি হয়। এ কারণে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا

'তাদের অন্তর রয়েছে, যা তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দেখায়।'[১]

এ আয়াতে জ্ঞান-বুদ্ধিকে অন্তরের অধীন করা হয়েছে।

খানকা দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

আমাদের সমাজে অন্তর পরিষ্কার ও সুসজ্জিত করার যেসব পাঠশালা রয়েছে, তাকে খানকা বলে। এই খানকা কোনো বিল্ডিংয়ের নাম নয়; বরং এটি বিশেষ ব্যক্তিত্বের নাম, যিনি স্বীয় শায়েখের দরবারে দীর্ঘ সময় কাটান এবং তাঁর থেকে আধ্যাত্মিক দীক্ষা পান, তারপর তার শায়েখ তার ইল্‌ম ও আমলের মাঝে সমন্বয় ও জাহের-বাতেনের মাঝে পার্থক্য দূর হওয়া সম্পর্কে জানেন, তখন তিনি সার্টিফিকেট দেন-

এখন লোকটির জীবন পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে।

এখন তার দীনি দীক্ষা পূর্ণতা পেয়েছে।

এখন সে অন্যকে 'আল্লাহ আল্লাহ' শেখানোর উপযুক্ত হয়েছে।

এমন সনদপ্রাপ্ত বিশেষ ব্যক্তিত্বর নাম হলো খানকা।

ইউনিভার্সিটি ও খানকার শিক্ষার মধ্যে তফাৎ

ইউনিভার্সিটিতেও শিক্ষা দেওয়া হয় এবং খানকাতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু উভয় শিক্ষার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। ইউনির্ভার্সিটি হলো ভবনের নাম। পক্ষান্তরে খানকা কোনো ভবনের নাম নয়; বরং তা হলো একটি ভ্রাম্যমান পাঠশালা।

ইউনিভার্সিটিতে একটি নির্দিষ্ট সময় পাঠদান করা হয় মাত্র। কিন্তু খানকায় পাঠদান চলে ২৪ ঘণ্টা। যেসব ছাত্র খানকায় এসে অবস্থান গ্রহণ করে, তারা ২৪ ঘণ্টার স্টুডেন্ট (ছাত্র) হয়। রাত-দিন তারা স্বীয় শায়েখ হতে দীন শিখতে থাকে।

---

১. সূরা হজ : আয়াত ৪৬

ইউনিভার্সিটির কোর্স হয় মাত্র কয়েক বছরের। যেমন– ডাক্তার কয়েক বছর শিক্ষা নিলেই ডাক্তার হয়ে যায় এবং সে তখন ইউনির্ভার্সিটি হতে বিদায় গ্রহণ করে। কিন্তু খানকার কোর্স জীবনব্যাপী। সারা জীবনেও এ পাঠশালা হতে ছুটি মেলে না। খানকার কোর্স মানুষকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত ফলো করতে হয়, মেনে চলতে হয়।

مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے

اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

প্রেমের পাঠশালার আজব রীতি জেনে রেখো ভাই,

এ ক্লাসে পড়েন যিনি তার ছুটি নাই।

যদি কেউ মেহনত করে নিজেকে গড়ে, তাহলে শায়েখ তাকে বসে থাকতে দেন না; বরং তাকে অন্যদের ইসলাহের কাজে লাগিয়ে দেন।

খানকাগুলোর সবচেয়ে বড় উপকারিতা

এই খানকাগুলো মানুষকে উপকারী ইল্‌ম দ্বারা উপকার অর্জনকারী বানিয়ে দেয় এবং তাদের জন্য সেসব বিষয় ক্ষতিকর তা হতে তাদের বাঁচায়। যেমন শরীরের মধ্যে পাকস্থলী। যেসব খাদ্য আমরা খাই, তার মধ্যে কিছু খাদ্য শরীরের জন্য উপকারী। পাকস্থলী খাদ্যকে রক্ত বানিয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে সাপ্লাই করে। কিন্তু যেসব খাদ্য ক্ষতিকারক হয়, সেগুলোকে পেশাব-পায়খানা বানিয়ে দেহের বাইরে পাঠিয়ে দেয়, যেন যেসব খাদ্য উপকারী ছিল তা পাকস্থলী অর্জন করল আর যেসব খাদ্য অনোপকারী ছিল, তা হতে দেহকে বাঁচাল। খানকাতেও এমন হয়। মানুষ যে ইল্‌ম অর্জন করে, তার কিছু ভালো দিক রয়েছে। ভালো দিকগুলো হলো, ইল্‌ম অর্জনকারীর অন্তরে-

ইবাদাতের প্রতি আগ্রহ পয়দা হওয়া।

ইখলাস পয়দা হওয়া।

খুশুখুযু ও বিনয় পয়দা হওয়া।

উত্তমরূপে নামায আদায়কারী হওয়া।

ইল্‌ম শেখার দ্বারা এসব ফায়দা লাভ হয় সত্যই। কিন্তু উপকারী ইল্‌মের কিছু ক্ষতিকর দিকও আছে। ইল্‌ম শেখার পর মানুষের মাঝে 'আমিত্ব' চলে আসে। পরে এটা আত্মম্ভরিতা ও গর্ব-অহংকারে রূপ নেয়। তার মধ্যে এই ভাব জাগে যে–

ہم چوماں دیگرے نیست

'আমার মতো কেউ নেই; তথা আমি সবচেয়ে ভালো।'

আর এটা ঠিক ওই কথা, যে কথার কারণে শয়তান হিরো থেকে জিরো হয়েছে এবং আল্লাহর দরবার থেকে চিরতরে বিতাড়িত হয়েছে।

ইহুদীরা ইল্‌ম বেশি রাখত। এই বেশি ইল্‌ম তাদের মধ্যে এই চিন্তা সৃষ্টি করে দেয় যে-

نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ

'আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয়ভাজন।'[১]

ইহুদীরা এ উক্তি দর্পবশত করেছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন–

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে, তাদের আমি আমার নিদর্শনাবলী হতে বিমুখ করে রাখব।'[২]

যেহেতু অহংকার ও আত্মশ্লাঘা একটি ক্ষতিকর জীবাণু, তাই খানকাসমূহে মানুষের মধ্য হতে এই ক্ষতিকর জীবাণু বের করা হয়, যার ফলে মানুষ পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ হয়ে যায়। অহংকার ও আত্মম্ভরিতা বের করা বিরাট কঠিন কাজ। মানুষ বর্তমানে একটি ভালো স্বপ্ন দেখে নিজেই নিজের ভক্ত হয়ে যায় এবং সিদ্ধান্ত নেয়, সে বিরাট কিছু হয়ে গেছে। অথচ বাস্তব জীবনে তার থেকে বহু কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাচ্ছে। শয়তান তাকে তার কবীরা গুনাহ হতে দৃষ্টি সরিয়ে রাখে এবং তাকে নিজের ভক্ত বানিয়ে দেয়। মানুষ আল্লাহওয়ালাদের খেদমতে এসে এই ক্ষতিকর দিক হতে নিরাপদ থাকে।

খানকায় কীসের দীক্ষা দেওয়া হয়?

ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) লিখেছেন, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্বভাবজাত সমাজপ্রিয়তা দিয়ে। অর্থাৎ মানুষ একা থাকতে পছন্দ করে না; বরং সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়। যখন মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে, তখন তাকে পারস্পরিক হকও আদায় করা লাগে।

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ১৮

২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৬

তাই মানুষের সামাজিক দায়িত্ব হলো, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকারসহ অন্যান্য মন্দ দোষ থেকে বেঁচে থাকা। এর জন্য দরকার হলো উপযুক্ত দীক্ষা।

মনে রাখবেন, উত্তম গুণগুলো মানুষের মাঝে এমনিতেই পয়দা হয় না এবং মন্দ দোষগুলো নিজে নিজেই বিদায় নেয় না। উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি এই সিদ্ধান্ত নেন যে, আজকের পর থেকে আর কখনো মিথ্যা বলব না, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, আজই আপনার থেকে মিথ্যা বলার দোষ বিদায় নিল এবং সত্য বলার গুণ চলে এল। না; বরং যেহেতু এতদিন মিথ্যা বলার অভ্যাস চলে আসছে, তাই এরপরও আপনার মুখ থেকে নিজের অজান্তেই মিথ্যা বের হবে। একটি বাস্তব উদাহরণ দেই। মানুষ অনেক সময় ফোনে অপর প্রান্তকে বলে, 'আমি এক সেকেন্ডের মধ্যে আসছি।' এটি মূলত একটি মিথ্যা কথা।

কিন্তু মানুষ একে মিথ্যাই মনে করে না। কেউ যদি বিষয়টি তাকে ধরিয়ে দেয়, তখন বলে, ঠিক আছে, সামনের থেকে এমনটি আর বলব না। কিন্তু তারপরও তার মুখ থেকে এটা বের হবে। কেননা, এমন বলা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। এর থেকে বোঝা যায়, যেসব বিষয় অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তা ত্যাগ করা সহজ নয়। এর জন্য শায়েখের প্রয়োজন হয়, যিনি প্রতিপদে তার ভুল ধরিয়ে দিবেন যে, তুমি অমুক-অমুক সময় এই-এই ভুল করেছ। এই শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের নামই তাযকিয়া। খানকাগুলোতে এই প্রশিক্ষণই দেওয়া হয়।

সাহাবায়ে কেরামের দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ

আল্লাহপাক স্বয়ং তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গড়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে মনের মতো করে সাহাবায়ে কেরামকে গড়েছেন। নবীজি দীক্ষা দিতেন বিভিন্ন উপায়ে। যথা–

(১) কখনো সাহাবায়ে কেরাম হতে অনুচিত কাজ প্রকাশ পেলে নবীজির চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠত। এতে সাহাবায়ে কেরাম বিষয়টির মন্দতা সম্পর্কে জেনে সামনে তা হতে বিরত থাকতেন।

(২) কখনো নবীজি কোনো বিষয় দেখে চুপ থাকতেন। নবীজির এই নীরবতা সাহাবায়ে কেরামের জন্য সহ্য করা কঠিন হতো।

(৩) কখনো নবীজি মৌখিকভাবে সাহাবাদের সংশোধন করতেন।

(৪) কখনো চুপ থেকে আবার কখনো কথা বলে শিক্ষা দিতেন। এক সাহাবী কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ততক্ষণ আমার কাছে জানতে চেয়ো না, যতক্ষণ আমি নিজে না বলি। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির উপর এ কারণেই আজাব এসেছিল যে, তারা তাদের নবীকে অধিকহারে প্রশ্ন করে পেরেশান করত।

(৫) কখনো নবীজি বাস্তব নমুনা দেখিয়ে শিক্ষা দিতেন। একটা গাছ ধরে নাড়া দিলেন। যখন গাছের পাতাগুলো পড়ে গেল, তখন বোঝালেন, যেব্যক্তি নামায পড়ে তার গুনাহ সেভাবে ঝরে যায়, যেভাবে শীতকালে গাছের পাতা ঝরে।

(৬) কখনও নদীর প্রসঙ্গ টেনে এনে বোঝান, যদি কারো ঘরের সামনে নদী থাকে, আর সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে কি? সাহাবায়ে কেরাম জবাবে বললেন, না হুজুর, কোনো ময়লা-ই থাকবে না। নবীজি বললেন, যেব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ওজু করে, সেও গুনাহের ময়লা-আবর্জনা হতে পাক হয়ে যায়।

দীনি উপকারী ইল্‌মের প্রভাব

আল্লাহপাক স্বীয় বার্তা আম্বিয়ায়ে কেরামের অন্তরে নাযিল করেছেন। তাই ইরশাদ হয়েছে–

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ

'নিঃসন্দেহে তিনি কুরআন নাযিল করেছেন আপনার অন্তরে।'[১]

এ আয়াত দ্বারা জানা গেল, ওহীর সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে – বিবেক-বুদ্ধির সঙ্গে নয়। তাই যে ইল্‌ম মানুষ অন্তরের মাধ্যমে পায়, তা-ই প্রকৃত ইল্‌ম। আর যে জ্ঞান মানুষ বিবেকের মাধ্যমে পায়, তা পোক্ত হয় না। ব্রেন একটি বিষয় ধারণের পরে আরেকটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করে। তারপর আরেকটি চিন্তা করে। যেহেতু বিবেকগত জ্ঞানে স্থিরতা থাকে না, তাই মানুষ তার জীবনের ভিত্তি বিবেক-বুদ্ধির উপর রাখতে পারে না।

আম্বিয়ায়ে কেরাম দীনি ইল্‌ম অন্যান্য মানুষকে শিখিয়েছেন। নবীগণ খোদায়ী বর্তাসমূহ নিজেদের ভাষায় সুপ্রতিভাত করেছেন।

---

[১]. সূরা বাকারা : আয়াত ৯৭

আল্লাহ বলেন–

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

'যাতে আপনি বর্ণনা করে দেন সেসব, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।'[১]

এ কারণে দীনি উপকারী ইল্‌মের ভিত্তি পুরোটাই সত্য ও খাঁটি বান্দাদের উপর রচিত, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কাছে দীনি ইল্‌ম পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। সৎ লোকদের দেখানো পথে জীবন পরিচালনাকারীরা সবসময় সফলকাম হয়। ইলহামী ইল্‌ম থেকে ফায়দা লাভের জন্য মানুষকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ হতে হয়, যাতে গুনাহের ময়লা-আবর্জনা দূর হয়ে যায়। যতক্ষণ মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ এই ইল্‌ম উপকার দেয় না। এ কারণেই নবীজির আগমনের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য এটিও ছিল যে–

وَيُزَكِّيهِمْ

'এবং তিনি তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন।'[২]

এই নির্দেশের ভিত্তিতে নবী করীম সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম সাহাবায়ে কেরামকে তাযকিয়া তথা পরিশুদ্ধ করেন। এই তাযকিয়া অর্জন করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য অতীব জরুরি। যখন কারো তাযকিয়া হয়ে যায়, তখনই এই দ্বীনি ইল্‌ম প্রকৃত অর্থে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তখন–

কলবের মধ্যে ঈমান বৃদ্ধি পায়।
আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পায়।
আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি পায়।
তার অন্তর সুসজ্জিত হয়ে যায়।
এভাবেই মানুষ সফল জীবন যাপন করে।

ঈমানদারদের দুটি চিহ্ন

পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে ঈানদারদের দুটি চিহ্ন চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের কর্তব্য সেই দুটি চিহ্ন নিজেদের জীবনে আছে কি-না তার খবর নেওয়া।

---

১. সূরা নাহল : আয়াত ৪৪
২. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৯

প্রথম চিহ্ন সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

'নিঃসন্দেহে ঈমানদার তারা, যাদের সামনে আল্লাহর কথা আলোচনা করা হলে তাদের দিল উদ্বেলিত হয়ে ওঠে (গলে যায়)।'[১]

প্রেমাস্পদের নাম শুনে মানুষ যেমন তার দিকে ঝুঁকে যায় এবং তার অবস্থা বদলে যায়, ঠিক তেমনি আল্লাহপাকের নাম কানে পড়তেই মুমিনও আত্মহারা হয়ে যায়। কবি বলেন–

ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی
جب تیرا کسی نے نام لیا

প্রিয় তোমার নামটি স্মরিল যখন কেউ
প্রেমদরিয়ায় উঠল তখন হাজারো ঢেউ।

এখন দেখার বিষয় হলো, এই চিহ্নটি আমাদের মধ্যে আছে কি-না। যখন আমাদের সামনে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, তখন কি আমাদের হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়? যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের ঈমান এখনও পরিপূর্ণ স্তরে পৌঁছেনি।

এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, যে বান্দা কালেমা পাঠ করে, তার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত অবশ্যই থাকে। কিন্তু এই মহব্বত বাড়িয়ে তাকে তীব্রতর করা আমাদের দায়িত্ব। কেননা, আল্লাহপাক বলেছেন–

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

'ঈমানদাররা আল্লাহর মহব্বতে তীব্রতর হয়।'[২]

দ্বিতীয় চিহ্ন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا.

'আর যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়।'[১]

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ২
২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

এ অবস্থাও কী আমদের হয়? অর্থাৎ যখন আমরা কুরআন পড়ি বা কুরআন পড়তে শুনি, তখন কি আমাদের অন্তরে এই প্রভাব বিস্তার হয়? তথা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়?

রহমতের জোয়ারের মধ্যে অবস্থান করেও রহমত থেকে বঞ্চিত থাকা

একটি কথা বড়ই আফসোসের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এক কারী সাহেব নিজের অবস্থা তুলে ধরে বলেন, হযরত! আমি যখন বাচ্চাদের সবক শুনি, তখনও একটি বাচ্চার প্রতি আমার কামাতুর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। এর কারণ কী? এমনটা কেন হয়? অথচ আল্লাহপাক তো বলেছেন, যেখানে কুরআন পড়া হয়, সেখানে রহমত বর্ষিত হয়। যেলোক ফজরেরও পূর্ব হতে ক্লাস নেয়া শুরু করেন এবং ফজরের পরের থেকে নিয়ে ঈশা পর্যন্ত বিভিন্ন বৈঠকে বাচ্চাদের কুরআন পড়ান, নিজেও পড়েন, বাচ্চাদের থেকেও শোনেন, এক সময়েই এক সাথে অনেক বাচ্চার কুরআন পড়ার আওয়াজ কানে আসতেই থাকে, তাহলে তিনি তো ১২/১৪ ঘণ্টা আল্লাহর রহমতের জোয়ারের মধ্যে কাটান। এমন বান্দার দিল তো রহমতের জোয়ারে নূরান্বিত হওয়ার দরকার ছিল। তারপরও এমন লোকের উপর নফ্স ও শয়তান কীভাবে প্রবল হলো এবং তার উপর কুরআন তেলাওয়াতের প্রভাব কেন পড়ল না?

আমাদের শায়েখগণ এর উত্তর দিয়েছেন, কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের সময় আল্লাহর রহমত বর্ষণের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হলো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তর রহমত ধারণ করতে পারছিল না।

বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ। শিশু জন্মলাভ করার প্রথম দিনই যদি তাকে গরুর দুধ দেওয়া হয়, তাহলে সে হজম করতে পারবে না, পেট নষ্ট হয়ে যাবে। কেন? কারণ, তার পেটে এতটুকু যোগ্যতা এখনো তৈরি হয়নি যে, গরুর দুধ হজম করবে। এখন হয় তাকে মায়ের দুধ দিতে হবে অথবা পানি মিশিয়ে বকরির দুধ দিতে হবে। শিশুটি এই দুধ পান করবে। তারপর ধীরে-ধীরে সে উপযুক্ত হবে। তখন পানি ব্যতীত সরাসরি বকরির দুধ তাকে দেওয়া যাবে। তারপর সে আরো বড় হবে, যোগ্যতা আরো বাড়বে। এভাবে একসময় শিশুটি গরুর দুধ পর্যন্ত

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ২

হজম করে ফেলবে। শুধু তা-ই নয়, হজম শক্তি বৃদ্ধি পেতে-পেতে একদিন মহিষের দুধও সে অনায়াসে হজম করে ফেলবে।

কেন এমনটি হয়? এর কারণ হলো, প্রথমে সহ্য করার শক্তি থাকে না। পরে ধীরে-ধীরে শক্তি হাসিল হয়। ঠিক এমনিভাবে কুরআন মাজীদের নূরগুলো খুবই ভারী। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেন–

إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا.

'আমি শীঘ্রই আপনার প্রতি একটি ভারী কথা নাযিল করব।'[১]

এ কারণে কুরআনের নূর সহ্য করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। আমাদের শায়েখ বলেন, যিকরুল্লাহর নূর খুবই সূক্ষ্ম হয়। তাই যে কেউ আল্লাহর যিকির করলে তার অন্তর গুনাহের ময়লা দ্বারা যতই ভরে যাক না কেন, যিকিরের নূর কলব গ্রহণ করে নেয়। যিকরুল্লাহর দ্বারা তার কলবের নূর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি এক সময় এমন হয় যে, তার কলব لا إله إلا الله -এর নূরসমূহ কবুল করার যোগ্য হয়ে যায়। لا إله إلا الله যিকির করতে-করতে মানুষের অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছে, তখন সে কুরআন শরীফের নূরের প্লাবনও পেতে শুরু করে। তখন তার কলবের আত্মিক শক্তি এত বেড়ে যায় যে, তার কলব কুরআন শুনে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং কুরআন তার মাঝে তোলপাড় সৃষ্টি করে।

সূরা যিলযাল শোনার আকাঙ্ক্ষা

আমাদের মাশায়েখদের কানে কুরআন শরীফের তেলাওয়াতের আওয়াজ এলে তাদের অবস্থাই বদলে যেত, রং পরিবর্তন হয়ে যেত। তারা আয়াত শুনে আত্মহারা হয়ে যেতেন। কেউ-কেউ তো এমনও ছিলেন যে, তিনি এভাবে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! সূরা যিলযাল সম্পূর্ণটা শুনতে চাই। কিন্তু শুরুর কয়েক আয়াত শোনার পরেই তারা বেহুঁশ হয়ে যেতেন। তারা মূর্ছা গিয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়তেন এবং টানা কয়েকদিন বেহুঁশ থাকার পর তাদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতো।

এত আল্লাহভীতি কেন?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাহাজ্জুদ নামাযে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন–

---

১. সূরা মুয্যাম্মিল : আয়াত ৫

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَّجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا أَلِيمًا.

'নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, আমার কাছে আছে কঠিন বেড়ি ও প্রজ্বলিত আগুন এবং এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাময় শাস্তি।'[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) নামায পড়ছিলেন। তিনি এ আয়াত শুনে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং তখনই তাঁর প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল। তাদের এমনই ছিল খোদার ভয়। হযরত সাইয়্যেদা আশেয়া (রাযি.) সারা রাত এই আয়াতটি পড়তেন–

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ.

'আর আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের সামনে এমন কিছু প্রকাশ পাবে, যা তারা কল্পনাও করেনি।'[২]

তাঁরাই মূলত কুরআন শরীফের নূর ও মজা পেতেন। কুরআন তেলাওয়াত শুনলে অশ্রু তাদের গন্ডদেশ বেয়ে অঝোর ধারায় পড়ত। পবিত্র কুরআন তাদের অবস্থা চিত্রিত করেছে এভাবে–

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ.

'এবং রাসূলের প্রতি যে কালাম নাযিল হয়েছে, তারা যখন তা শোনে তখন তারা যেহেতু সত্য চিনে ফেলেছে, সেহেতু তাদের চোখসমূহকে দেখেবে যে, তা থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।'[৩]

আমাদের কি এই অবস্থা হয়? যদি আমাদের হালত এমন না হয়, তাহলে এটি এরই বড় প্রমাণ যে, আমাদের আরও মেহনত করতে হবে। কুরআন পড়া অবস্থায় যদি আমাদের থেকে কু-মনোভাব দূর না হয়, তাহলে এটিই প্রমাণ, আমাদের কলব এখনও পরিষ্কার হয়নি। দিল সাফ করতে আমাদের মেহনত অব্যাহত রাখতে হবে। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ার আগেই রূহানী ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমাদের রূহ চেকআপ করাতে হবে। যদি তা না করা হয়, তাহলে এই গুনাহের নাপাকি নিয়েই আমাদের কবরে যেতে হবে।

---

১. সূরা মুয্যাম্মিল : আয়াত ১২, ১৩
২. সূরা যুমার : আয়াত ৪৭
৩. সূরা মায়েদা : আয়াত ৮৩

হাদীছে জিবরাঈলের ব্যাখ্যা

হযরত উমর (রাযি.) হলেন হাদীছে জিবরাঈলের বর্ণনাকারী সাহাবী। তিনি বলেন, একলোক নবীজির খেদমতে এল। তার পোশাক সাদা এবং চুল ছিল কালো। চেহারা ছিল তরতাজা ও স্বাভাবিক। লোকটি এসে নবীজির খেদমতে এমনভাবে বসল যে, তিনি নবীজির সামনে আত্তাহিয়্যাতুর মতো বসে নিজের হাঁটু নবীজির হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিল। লোকটি আর নবীজির মাঝে নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তর হয়–

লোকটি : مَاالْإِسْلَامُ ইসলাম কাকে বলে?

নবীজি : ইসলাম পাঁচ জিনিসের নাম। যথা–

(١) اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ.

(১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

(٢) وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ

(২) নামায কায়েম করা।

(٣) وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ

(৩) যাকাত আদায় করা।

(٤) وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ

(৪) রমযানের রোযা রাখা।

(٥) وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا.

(৫) হজ করার সামর্থ থাকলে হজ করা।

লোকটি নবীজির এই জবাব শুনে মন্তব্য করল, 'হে নবী! আপনি ঠিকই বলেছেন।'

লোকটির এই মন্তব্যে আমরা একথা ভেবে তাজ্জব হয়ে যাই যে, লোকটি নিজেই প্রশ্ন করল আবার নিজেই নবীজির প্রদত্ত জবাব সমর্থন করছে, যার দ্বারা বোঝা যায়, প্রথম থেকেই জবাবটি তার জানা ছিল।

লোকটি প্রথম প্রশ্ন শেষ করে আবার প্রশ্ন করল।

লোকটি : مَاالْإِيْمَان ঈমান কাকে বলে?

নবীজি : ঈমান ছয় জিনিসের নাম। যথা–

(١) أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ

(১) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখা।

(٢) وَمَلَائِكَتِهِ

(২) ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস রাখা।

(٣) وَكُتُبِهِ

(৩) আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখা।

(٤) رُسُلِهِ

(৪) নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

(٥) وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

(৫) আখেরাত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখা।

(٦) وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

(৬) ভাগ্যের ভালো-মন্দের (তাকদীরের) প্রতি বিশ্বাস রাখা।

লোকটি এবারও নবীজির জবাব শুনে বলল, 'হে নবী! আপনি সঠিক বলেছেন।'

লোকটির সত্যায়নে এবারও আমরা তাজ্জব হই। আমাদের বিস্ময় ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

লোকটি তারপর তৃতীয় প্রশ্ন করল।

লোকটি : مَا الْإِحْسَانُ ইহসান কাকে বলে?

নবীজি : ইহসান দুটি অবস্থার নাম। যথা–

(١) أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

(১) এভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা, যেন তুমি স্বচক্ষে তাকে দেখছ।

(٢) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

(২) ইবাদাত করার সময় যদি তুমি আল্লাহকে না দেখতে পাও, তবে এই বিশ্বাস রাখবে যে, অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

লোকটি তারপর চতুর্থ প্রশ্ন করল।

লোকটি : مَتَى السَّاعَةُ কেয়ামত কবে হবে?

নবীজি : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রশ্নকারী হতে অধিক জানে না।

লোকটি : فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ إِمَارَاتِهَا কেয়ামতের কিছু আলামত বলুন।

নবীজি : দুটি আলামত নিম্নরূপ-

(١) أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا.

(১) বাঁদী আপন মনিবকে জন্ম দিবে।

(٢) وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ

(২) তুমি দেখবে, (এককালে) যাদের পায়ে জুতা ও গায়ে কাপড় ছিল না, হতদরিদ্র এবং রাখাল শ্রেণীর ছিল, (পরবর্তীকালে) তারা বড়-বড় ভবন নির্মাণ করে পরস্পরে গর্ব-অহংকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হচ্ছে।

বিস্ময়কর লোকটি নবীজির জবাব পুরোপুরি সমর্থন করল এবং একটু পরে উঠে চলে গেল। সাহাবায়ে কেরাম লোকটির ব্যাপারে পুরোপুরি বুঝতে পারছিলেন না যে, লোকটি দেশী, না বিদেশী। বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্থানীয় ও দেশী বলেই মনে হচ্ছিল। কেননা, তার চেহারায় সফরের ক্লান্তি ও পোশাকে সফরের আলামত ছিল না। কিন্তু আবার নিশ্চিতভাবে তাকে স্থানীয়ও বলা যাচ্ছিল না। কেননা, স্থানীয় হলে কেউ-না-কেউ তাকে চেনার কথা; অথচ আমাদের কেউ তাকে চেনে না। আর যদি সে ভিনদেশী হয়, তাহলে তার চেহারা ও পোশাকে সফরের আলামত নেই কেন?

সাহাবায়ে কেরাম যখন এ ধরনের চিন্তা করছিলেন এবং কেউ লোকটির প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করতে পারেননি, ঠিক তখনি নবীজি নিজেই লোকটির পরিচয় দিলেন। তখন আমার ও নবীজির মাঝে নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তর হয়।

নবীজি : أَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ يَا عُمَرُ! উমর! জানো, প্রশ্নকারী কে?

উমর : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। অর্থাৎ আমি জানি না। দয়া করে আপনি বলে দিন।

নবীজি : فَإِنَّهٗ جِبْرِئِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ তিনি হলেন ফেরেশতা জিবরাঈল। তিনি এসেছিলেন তোমাদেরকে দীনের মৌলিক বিষয় শিক্ষা দিতে। অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর পর্বটি ছিল নিছকই শিক্ষামূলক। মূলত উম্মতকে দীন শিক্ষা দিতে

তিনি প্রশ্নকারী সেজে প্রশ্ন করেন, যাতে উম্মত নবীজির মুখ থেকে সঠিক উত্তর শুনে বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন।[১]

চিন্তা করুন, হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে যখন প্রশ্ন করছেন আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলছেন, জিবরাঈল তোমাদের দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।

এ হাদীছে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। যথা–

(১) প্রথম বিষয় হলো, অবশ্যই হযরত জিবরাঈল (আ.) নিজ ইচ্ছায় আসেননি। কেননা, ফেরেশতাদের অবস্থা হলো কুরআনের ভাষায়–

لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

'আল্লাহ তাদের যে নির্দেশ দেন, তারা তার অবাধ্যতা করে না এবং তারা তা-ই করে, যার নির্দেশ তাদের দেওয়া হয়।'[২]

এ আয়াত হতে জানা গেল, হযরত জিবরাঈল (আ.) নিজ থেকে আসেননি; বরং আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছিলেন।

(২) দ্বিতীয় বিষয় হলো, হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে যেসব প্রশ্ন করেন, তাও তিনি নিজ ইচ্ছায় করেননি; বরং স্বয়ং আল্লাহ তার মাধ্যমে এসব প্রশ্ন করিয়েছেন। আল্লাহপাক চেয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম যেন বিষয়গুলো জানতে পারেন, তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)কে এর মাধ্যম বানিয়েছেন।

(৩) তৃতীয় বিষয় হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, ইনি জিবরাঈল; তোমাদেরকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন। একথার মর্মার্থ হলো, তিনি প্রথমে যে তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, সেটিই মূলত দীন। অতএব এর থেকে জানা গেল, مَاالْإِحْسَانُ এর যে উত্তর, সেই অবস্থা হাসিল করাও দীনের বিষয়। এটি মূল দীনের বাইরের বিষয় নয়। যারা একে দীনের বাইরের বিষয় বলে মনে করবে, তাদের দীন অসম্পূর্ণ থাকবে। দীন তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সব কটি নিজের মধ্যে এসে যাবে। একটিও বাকি থাকলে দীন পরিপূর্ণ হবে না।

---

১. মুসলিম শরীফ ১ : আয়াত ২৭

২. সূরা তাহরীম : আয়াত ৬

নামাযের ব্যাপারে মেহনত করার প্রয়োজনীয়তা

আমাদের নামাযের ব্যাপারে চিন্তা করুন। হাদীছে দুটি অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। (১) এভাবে ইবাদাত করো, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ এবং (২) অথবা এটা সম্ভব না হলে অন্তত এতটুকু বিশ্বাস রেখে ইবাদাত করতে হবে যে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।

আমাদের নামাযে এই দুই অবস্থার কোনটি আছে? একটিও নয়। তাহলে আমাদের নামায কেমন হচ্ছে? স্পষ্ট যে, আমাদের নামায প্রথম অবস্থা অনুযায়ী হচ্ছে না এবং দ্বিতীয় অবস্থা অনুযায়ীও নয়। তাহলে এর বাইরের তৃতীয় অবস্থার নামায কীভাবে কবুল হবে? কেননা, আমাদের নামায তো দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনায় ভরপুর থাকে। আমরা রুকু-সেজদা ইত্যাদি করি ঠিকই, কিন্তু তা হয় প্রাণহীন। আমাদের দেহ শুধু নামায পড়ে। মন নামাযে থাকে না। যাতে আমরা মন লাগিয়ে নামায পড়তে পারি তার জন্য মেহনত-মুজাহাদা দরকার। যে পর্যন্ত হাদীছে বর্ণিত দুই অবস্থার কোনো এক অবস্থা সৃষ্টি না হবে, ততদিন মেহনত-মুজাহাদা অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের মুশাহাদার অবস্থা সৃষ্টি হবে এভাবে যে, আমরা ইবাদাতের সময় আল্লাহকে দেখতে পাব। আর যদি এই স্তর অর্জন করা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত মুরাকাবার অবস্থা সৃষ্টি হতেই হবে যে, আমাদের মনে এই বিশ্বাস রেখে ইবাদাত করব যে, আমি আল্লাহকে না দেখলেও ঠিকই আল্লাহ আমাকে দেখছেন এবং আমি তাঁরই সামনে আছি। আমার প্রতিটি আচার-আচরণ-উচ্চারণ, ওঠা-বসা সবকিছুই আল্লাহ দেখছেন। ইবাদাত এই স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য আমাদের আকাবির হযরতগণ তাদের নামাযে মেহনত-মুজাহাদা করতেন।

নামাযে বাইরের চিন্তা কীভাবে দূর হবে?

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) একবার একশত রাকাত নামায শুধু এ কারণে পড়েন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা ব্যতীত নামায পড়বেন। কিন্তু প্রত্যেকবার নামায পড়তে গিয়ে বাইরের কোনো-না-কোনো চিন্তা তার এসেই যায়। এভাবে দুই-দুই রাকাত করে ১০০ রাকাত পড়ার পরেও যখন তিনি বাইরের চিন্তামুক্ত হতে পারেননি, তখন ভীষণ চিন্তিত হয়ে মনে-মনে ভাবলেন, আমি একশত রাকাত নামায পড়লাম; অথচ এর মধ্যে মাত্র দুই রাকাত নামাযও এমনভাবে পড়তে পারলাম না যে, তার মধ্যে নামাযের বাইরের খেয়াল আসবে না।

তারপর তিনি সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর খেদমতে এসে নিবেদন করলেন–

'হযরত! আমি একমাত্র আল্লাহর চিন্তায় দুই রাকাত নামায পড়ব বলে দুই-দুই করে একশত রাকাত পড়লাম, কিন্তু এর মধ্যে কোনো দু-রাকাতও এমনভাবে পড়তে পারিনি, যার মধ্যে বাইরের চিন্তা না আসে; বরং প্রতি নামাযের মধ্যেই কোনো-না-কোনো বাইরের চিন্তা এসেই পড়ে। শতবার চেষ্টা করেও যখন আমি ব্যর্থ হলাম, তখন এই ভেবে পেরেশান যে, তাহলে আমার নামাযের উপায় কী হবে?'

তার এই উদ্বেগের কথা শুনে হযরত শাহ সাহেব বললেন, ঠিক আছে; তুমি একটা কাজ করবে। তুমি তাহাজ্জুদের সময় আমার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। হযরতের কথা মোতাবেক হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর জায়নামাযের কাছে এসে তাহাজ্জুদের নিয়তে নামায শুরু করলেন। শায়খের এই সোহবতের ফল এই হয় যে, প্রথম রাকাত শেষ না হতেই তার ভেতরের অবস্থা পাল্টে গেল। তিনি ভাবাবেগে অত্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ফলে তিনি এত কাঁদলেন যে, তার পক্ষে নামাযের সালাম ফিরানোই কঠিন হয়ে গেল। এর পূর্বে একশত রাকাত নিজে-নিজে পড়ে কোনো সুফল পেলেন না। কিন্তু যখন শায়খের কাছে এসে নিয়ত বাঁধলেন, তখন তাঁর মাঝে ভাবাবেগের জোয়ার বয়ে গেল। সালাম ফিরানোই দায় হয়ে পড়ল। এর দ্বারা বোঝা গেল, শায়খের সোহবত দ্বারা আমলে রূহ আসে। নিজের শত চেষ্টাতেও যা হয় না, শায়খের একটুখানি নজর ও সোহবতে তা অতি সহজে হয়ে যায়। সত্যিকার পীর-বুযুর্গগণ মানুষের যিন্দেগীকে 'প্রকৃত যিন্দেগী'তে পরিণত করেন। এটিই তাঁদের কৃতিত্ব। এটিই তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

নববী আবেগ ও ভাবের উত্তরসূরী

ওলামায়ে কেরাম হলেন উলূমে নববীর উত্তরাধিকারী আর পীর-মাশায়েখগণ হলেন নববী ভাব ও আবেগের উত্তরাধিকারী। যেমন– কেউ যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের তাওয়াজ্জুহ দেখতে চায়, তবে তার বিবরণ কিতাবাদিতে খুব কমই মিলবে। এর জন্য পীর-মাশায়েখদের জীবনী অধ্যয়ন করতে হবে। এমনিভাবে যদি যুহ্দ দেখতে হয়, মাখলুক হতে সম্পর্কহীনতা দেখতে হয়, মহব্বতে ইলাহী দেখতে হয়, যদি নবীজির পবিত্র কলবের অবস্থার নমুনা দেখতে হয়, তাহলে এর জন্য মাশায়েখ-

বুযুর্গদের সান্নিধ্য অবলম্বন করতে হবে। কতক এমন ভাগ্যবান হযরতও আছেন, যারা উপকারী ইল্‌মেরও ওয়ারিস হন এবং ভাবেরও ওয়ারিস হন। আল্লাহপাক তাদেরকে পরিপূর্ণতার শীর্ষে উন্নীত করেন। আমাদেরও এমন হওয়া উচিত, যাতে আমরাও নবীজির দেখানো পথ অনুসরণ করে 'ইনাবাত ইলাল্লাহ'র অবস্থা অর্জন করতে পারি। এমন মেহনত করা আমাদের জন্য জরুরি।

আমাদের মাদরাসায় পড়ারও মূল উদ্দেশ্য এটি। আমরা এখানে শুধুই শব্দ শিখতে আসিনি। কেবল শব্দ মাথায় করে বিদায় নিলে হবে না। যদি শুধু ইল্‌মে ক্ষমা পাওয়া যেত, তবে অনেক আগেই শয়তান ক্ষমা পেয়ে যেত। কেননা, সে আমাদের চেয়েও বড় আলেম। অতএব, জানা গেল, শুধু ইল্‌মই বড় কথা নয়। ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা আসল বিষয়। আর আসলের সঙ্গে ইখলাসও থাকতে হবে। তবেই ইল্‌ম অর্জনের মৌলিক উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। এর সুন্দর পন্থা হলো, যখন আমরা ওস্তাদগণের সামনে পড়তে বসব, তখন এই নিয়ত করব যে, আমরা যা কিছু পড়ব, তার উপর ইখলাসের সঙ্গে আমল করব। আমরা যা কিছু শুনব, তার উপর আমল করব। এমনটি ভাবা উচিত নয় যে, আগে পড়ে নিই, যখন সব কিছু পড়া হয়ে যাবে, তখন গিয়ে সবটার উপর আমল করব। এমন নিয়ত মাথায় এলে সর্বনাশ। এটা শয়তানের ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা। এই ফাঁদে একবার পা দিলে শয়তান তাকে কখনো আমল করতে দিবে না। শুধু ইল্‌ম নিয়েই ঘুরতে হবে; আমলের তাওফীক আর হবে না।

ইল্‌ম শিখতে হবে আমলের নিয়তে

একব্যক্তি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! দীনের যেসব কিতাব আপনি পড়েছেন, সেসব তো আপনার অন্যান্য সাথীরাও পড়েছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে মর্যাদার স্তরে উন্নীত করেছেন, এমনটি তো আর কেউ পারেননি! এর রহস্য কী? পার্থক্যটা কোথায়? হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) এই প্রশ্নের এক আজব উত্তর দেন। তিনি বললেন, আমার সঙ্গীগণ কুরআন শরীফ এই নিয়তে পড়েন যে, আমরা যেন কুরআনের গভীর জ্ঞান লাভ করি, গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে অবিহত হতে পারি। নিয়ত হিসেবে তারা কুরআনের গূঢ়তত্ত্ব তো জেনেছেন; কিন্তু ওই নেয়ামত পাননি, যা আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। লোকটি জানতে চাইল, হযরত! আপনি সেই নেয়ামত কীভাবে পেয়েছেন? তিনি বললেন, আমি

যখনই কুরআন শরীফ পড়ি, এই নিয়তে পড়ি যে, হে আল্লাহ! তোমার গোলাম উপস্থিত। সে তোমার আদেশ-নিষেধ জানতে চায়, যাতে তদনুযায়ী আমল করতে পারে।

সুবহানাল্লাহ! বস্তুত এই জিনিসটিই ছিল সাহাবায়ে কেরামের মাঝে। হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর সূরা বাকারা পড়তে আড়াই বছর সময় লেগেছিল। অথচ আরবী ভাষা ছিল তাঁর মাতৃভাষা। ফলে তাঁর নাহু-সরফের কোনোই প্রয়োজন ছিল না। তারপরও আড়াই বছর লাগল কীভাবে? জানা গেল, তিনি একটি করে আয়াত পড়তেন এবং তার উপর আমল করতেন। এদিকে যখন সূরা পরিপূর্ণ হয়, ওদিকে তখন সমস্ত আয়াতের উপর আমলও হয়ে যায়।

আমরা কি কখনও এই নিয়তে কুরআন খুলেছি? এই মেহনত আমাদের করতে হবে। এই মেহনত ব্যতীত সেই কৃতিত্ব আমাদের অর্জিত হবে না, যা আমাদের পূর্বসূরীগণ অর্জন করেছিলেন। এই নেয়ামত অর্জন করাকেই তাযকিয়া ও ইহসান বলা হয়।

জুতা সোজা করার দরুন অহংকার দূর হওয়া

কারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব (রহ.) খুবই সুদর্শন ছিলেন। তাঁর স্বভাবে পরম ভদ্রতাও ছিল। উন্নত ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতেন। মানুষ তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলত–

مَاهٰذَا بَشَرًا إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ.

'ইনি কোনো মানুষ নন; বরং একজন সম্মানিত ফেরেশতা।'

তিনি নিজের ঘটনা লিখেছেন, আমি অল্প বয়সে মুহতামিম হয়েছিলাম। একদিকে অল্প বয়স অপর দিকে মুহতামিম! এ কারণে তার মধ্যে কিছুটা গর্বের ভাব এসেছিল। মুহতামিম শব্দটি বের হয়েছে هم থেকে। هم আরবী ভাষার শব্দ; উর্দু ভাষার নয়। উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত هم এর অর্থ হলো আমিই আমি। পক্ষান্তরে আরবী ভাষার هم শব্দের অর্থ চিন্তা। এখন هم হলো দুটি। (১) চিন্তাওয়ালা هم এবং (২) আম্বিওয়ালা هم। যেহেতু কারী সাহেবের বয়স ছিল কম, তাই তার মাঝে চিন্তাওয়ালা هم এর পরিবর্তে আমিত্বওয়ালা هم ছিল। কারী সাহেবের বাইয়াতের সম্পর্ক ছিল হযরত শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর সঙ্গে।

যখন কারী সাহেব অনুভব করলেন, তার মধ্যে অহমিকা চলে এসেছে, তখন তিনি হযরত থানবী (রহ.)কে এই মর্মে পত্র লিখলেন–

'হযরত! আমি নিজের মাঝে অহমিকা অনুভব করছি।'

হযরত থানবী (রহ.) বললেন, সব কিছু ফেলে আমার কাছে চলে এসো। হযরতের নির্দেশ পেয়ে কারী সাহেব তৎক্ষণাৎ থানাভবনে হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে ছুটে যান। হযরত থানবী (রহ.) তাঁর জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মনে রাখবেন, অভিজ্ঞ ডাক্তাররা ব্যক্তি হিসেবে রোগের ঔষধ দেন। তিনি তাকে দায়িত্ব দিলেন, খানকায় যেসব লোক আসে, তারা দামী জুতা সিঁড়িতে খুলে রেখে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে। তোমার দায়িত্ব হলো, এসব জুতা সোজা করে সাজিয়ে রাখবা।

কল্পনা করুন, বড় বিজ্ঞ আলেম, বিরাট মাদরাসার মুহতামিম, টগবগে যুবক! তাকে জুতা সোজা করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। প্রথমে রুচি ও বিবেকে বাঁধলেও শায়খের নির্দেশ পালনার্থে তিনি জুতা সোজা করার কাজে লেগে গেলেন।

হযরত থানবী (রহ.) দূর থেকে খেয়াল রাখলেন, কারী সাহেব কীভাবে জুতা সোজা করেন। একবার হযরত দেখলেন, নতুন জুতাগুলো খুব ভালোভাবে সোজা করলেও পুরাতন ও নোংরা জুতাগুলোতে কেবল হাত লাগান; ভালো করে সোজা করেন না। এতে হযরত বুঝে নিলেন, ভেতর থেকে অহংকার এখনও বের হয়নি। হযরত থানবী (রহ.) বললেন, আগে পুরাতনগুলো সাইজ করো। কারী সাহেব বলেন, হযরতের এই নির্দেশ শুনতেই আমার ভেতর থেকে সমস্ত আত্মগর্ব ও অহংকার ধুয়ে-মুছে বেরিয়ে যায়। এভাবে কয়েকদিন জুতা সোজা করার কারণে আমার মনের ভেতর থেকে গর্ব-অহংকারের বীজ চিরতের নষ্ট হয়ে যায়।

অহংকার একটি এটমি গুনাহ

ر.ب.ك মূল অক্ষর বিশিষ্ট আরবী শব্দটি (كِبْر) সমস্ত রোগের মূল।

হাদীছ শরীফে এসেছে-

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

'সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার মনে বিন্দুপরিমাণ অহংকার থাকবে।'

হাদীছের مِثْقَالَ ذَرَّةٍ শব্দটিই প্রমাণ করে, তাকাব্বুর এটম বোমার মতো ভয়ঙ্কর গুনাহ। মানুষ যেমনিভাবে এটম বোমাকে ভয় করে, ঠিক তেমনি এই গুনাহ থেকেও বাঁচা দরকার। কেননা, এটম বোমা যেমনিভাবে ধ্বংস ছড়ায়, ঠিক তেমনিভাবে তাকাব্বুরও মানুষকে এত পরিমাণ ক্ষতি করে যে, তার সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এ কারণে মাশায়েখগণ এই গুনাহ বর্জনের ব্যাপারে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালান, যাতে মানুষের অন্তর থেকে এই ভয়ঙ্কর ব্যাধিটা বিদায় নেয় এবং মানুষ নিরাপদ হতে পারে।

বড় মাশায়েখদের নিজেদের নিয়ে ভাবনা

যারা বড়-বড় মাশায়েখ, তাঁরা এমনিতেই বড় হননি। নিজেদের গড়তে তাঁদের শায়েখদের হাতে নিজেদের তুলে দিয়েছিলেন। তারা গোসলদাতার হাতে মাইয়্যেতের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। শায়খগণ তাদেরকে ইচ্ছামতো গড়েছেন। ফলে তারা একেকজন বড়-বড় শায়েখ হয়েছেন। কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত ঘটনা নিম্নরূপ–

(১) হযরত মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী (রহ.) মাযাহিরে উলূমের শায়খুল হাদীছ ছিলেন। তিনি সেখানে বুখারী শরীফের দরস দিতেন। বুখারী শরীফের দরসদানে তার সুনাম এত বেশি ছিল যে, ছাত্ররা শত-শত মাইল দূর থেকে তার নিকট বুখারী শরীফ পড়ার জন্য মাযাহিরে উলূমে আসত। বুখারী শরীফের ওস্তাদ থাকাবস্থায় তিনি হযরত থানবী (রহ.)কে পত্র লিখেন এবং তাঁর নিকট বাইয়াত হওয়ার আবেদন করেন। কেন আবেদন করেন? এর দ্বারা বোঝা যায়, এটি একটি বিরাট নেয়ামত, যার জন্য তাঁর মতো লোককেও শায়েখের কাছে সোপর্দ করতে হয়।

(২) হযরত সাইয়্যেদ সুলায়মান নদবী (রহ.) আরবী ভাষার বড় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে বাইয়াত হন।

(৩) হযরত মুফতী মুহাম্মদ হাসান অমৃতসরী (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দ হতে শিক্ষা লাভ করে সেখানেই শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত হন। তিনি সেখানের মুফতী ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। কিন্তু তিনি গভীরভাবে অনুভব করতেন, উপকারী ইল্‌মের যে প্রতিক্রিয়া ও ভাব আমার ভিতরে দরকার, তা নেই। এই চিন্তায় চিন্তিত হয়ে তিনি অবশেষে হযরত থানবী (রহ.)-এর দরবারে যান। তাঁর হাতে বাইয়াত হন এবং একপর্যায়ে হযরত থানবী (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

(৪) হযরত থানবী (রহ.) অনেক কিতাব লিখেছেন। তাঁর লিখিত কিতাবগুলো ইল্‌মি বিচারে অনেক ঊর্ধ্বের। হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) তাঁর ছাত্রদের নিষেধ করেছিলেন, তোমরা উর্দু কিতাব দেখবে না। কেননা, তা ইল্‌মশূন্য। বরং আরবী কিতাব দেখবে। একবার হযরত থানবী (রহ.)-এর লিখিত বয়ানুল কুরআন নামক তাফসীরটি হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.)-এর নজরে পড়ে। তিনি কিতাবটি মুতালা'আ করে দরসে এসে ছাত্রদের বললেন, আমি এতদিন তোমাদেরকে উর্দু ভাষার কিতাব দেখতে নিষেধ করে এসেছি। কেননা, তাতে ইল্‌ম বলতে বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু তাফসীরে বয়ানুল কুরআন মুতালা'আ করে আমি জানতে পারি, না উর্দু ভাষাতেও ইল্‌ম আছে।

হযরত থানবী (রহ.)-এর কিতাবে এমন ইল্‌ম ছিল, যার সত্যায়ন হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিত্বও করেছেন। হযরত থানবী (রহ.) এত গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর খেদমতে ওই আত্মিক অবস্থা ও ভাবাবেগ অর্জন করার জন্য যান, যার দ্বারা মানুষের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের অন্তরে আল্লাহর মহব্বতের জোয়ার নামে। এরই নাম তাযকিয়া, এর নামই তরবিয়ত।

যদি কারো অহমিকা থাকে, তাহলে...

মনে রাখবেন–

(১) যদি কারো ফালসাফা ও মানতেক নিয়ে গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

(২) যদি কারো নিজের মেধার উপর গর্ব হয়, তবে হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

(৩) যদি কারো মধ্যে ফাসাহাতের গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এ জীবনী পড়ুন।

(৪) যদি কারো মাঝে ইসলামী আন্দোলনের গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

(৫) যদি কারো মাঝে তা'লীম ও তাদরীসের গর্ব থাকে, তবে তিনি শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

(৬) যদি কারো মধ্যে দীনের তাবলীগের ব্যাপারে গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

(৭) যদি কারো মাঝে স্বীয় তাসনীফ ও রচনার গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

(৮) যদি কারো মাঝে বয়ান ও বক্তৃতার গর্ব থাকে, তবে তিনি আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

(৯) যদি কারো মাঝে আরবীতে পারদর্শিতার গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত সাইয়্যেদ সুলাইমান নদবী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

(১০) যদি কারো মাঝে ইতিহাসচর্চার গর্ব থাকে, তবে তিনি হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.)-এর জীবনী পড়ুন।

এখানে যাদের নাম উল্লেখ করা হলো, তাঁরা নিজ-নিজ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তারপরও তাঁরা আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভের জন্য মাশায়েখের কাছে বাইয়াত হয়েছেন এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের সান্নিধ্যে সময় ব্যয় করেছেন। যদি তাদের মতো ভুবনখ্যাত লোকদেরও শায়েখের সোহবতে সময় ব্যয় করতে হয়, তাহলে আমরাও যদি এ নেয়ামত চাই, এর জন্য আমাদেরও মেহনত করতে হবে।

আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও

ওলামা ও তুলাবাদের বিশেষভাবে শায়খ-বুযুর্গদের সোহবতে থেকে তরবিয়ত পাওয়া দরকার। কেননা, আল্লাহপাক বলেছেন–

كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ.

'তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। কেননা, তোমরা কিতাবের তা'লীম দিচ্ছ এবং দরস-তাদরীসের কাজ করছ।'[১]

এখানে كونوا নির্দেশসূচক ক্রিয়া। অতএব আল্লাহপাক নির্দেশ দিচ্ছেন–

'হে কুরআন পাঠকারীগণ! হে আমার কুরআনের উত্তরাধিকারীগণ! তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও।'

এর থেকে জানা যায়, যারা আসমানী উপকারী ইল্‌মের ধারক-বাহক এবং দীনি উপকারী ইল্‌মের দরস-তাদরীসের কাজে লিপ্ত, তাদের আল্লাহওয়ালা হওয়া এবং এর জন্য বিশেষভাবে মেহনত করা জরুরি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি তাদের সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭৯

আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। ফলে আমাদের করণীয় হলো আমাদের মধ্যে ইখলাস পয়দা করা, উপকারী ইল্‌মের রঙে রঞ্জিত হওয়া, যাতে আমরা যা কিছু পড়েছি, তা যেন বাস্তব হয়ে আমাদের জীবনে প্রকাশ পায়। আমাদের দায়িত্ব হলো, প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা। যেমন– ছোট বাচ্চাকে তার মা মারলেও সে আম্মা-আম্মা বলে কাঁদে, অন্য কেউ মারলেও সে আম্মা আম্মা বলে কাঁদে। বাচ্চা কিছু চাইলেও আম্মা বলে ডাকে। কেউ তার থেকে কোনো জিনিস কেড়ে নিলেও সে আম্মা বলেই চিৎকার দেয়। পা পিছলে পড়ে গেলেও আম্মা বলে কেঁদে ওঠে। মায়ের সঙ্গে বাচ্চার এমন গভীর সম্পর্ক হয়ে যায় যে, সে আম্মা ছাড়া কিছুই বোঝে না। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় সে কেবল মাকেই স্মরণ করে।

মুমিনের হতে হবে বাচ্চার মতো। মায়ের সঙ্গে বাচ্চার যেমন ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে, মুমিনেরও তেমন গভীর সম্পর্ক থাকতে হবে আল্লাহর সঙ্গে। এমন অন্তরঙ্গ ও গাঢ় সম্পর্ক যে, মুমিন প্রতি কদমে-কদমে এবং প্রতিটি কাজে ও সময়ে আল্লাহর কথা তার মুখে জারি থাকবে এবং সে সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহরই পানে ধাবিত হবে। আল্লাহ ছাড়া সে কিছু জানবে না, বুঝবে না, মানবে না।

নূরের কিরণ

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.) স্বীয় কিতাবে নিজের একটি ঘটনা লিখেছেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

'আমি একবার হজে যাই। মদীনা শরীফে গিয়ে যখন আমি নবীজির রওজা শরীফে সালাম পেশ করার জন্য রওজার সন্নিকটে যাই, তখন দেখতে পাই, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কলব হতে একটি নূর আসছে। ওই নূরের কিরণ চিকন সোনালী সূতার মতো হয়ে তাদের অন্তরে গিয়ে পড়ছে, যারা হাদীছ শরীফের খেদমত করেন। সুবহানাল্লাহ!

যেহেতু মুহাদ্দিছগণ নবীজির ওয়ারিস, তাই অল্প মেহনতেই তাদের কাজ হয়ে যায় এবং তারা দ্রুত যোগ্য হয়ে যান।

নবীজির দাওয়াত

হযরত তাওয়াক্কুল শাহ আম্বালবী (রহ.)-এর দস্তরখান অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনি মানুষকে তৃপ্তিসহকারে খানা খাওয়াতেন। তাঁর পক্ষ থেকে খানা খাওয়ার সাধারণ অনুমতি ছিল। তিনি সবাইকে

আমভাবে দাওয়াত দিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর দস্তারখান ধনী-গরীব সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল, যার ফলে গরীব, মিসকীন ও অসহায় লোকজন তাঁর দস্তরখানে এসে বসত এবং নিজের বাড়ির মতো খাওয়া-দাওয়া করত।

একদিন তাওয়াক্কুল শাহ (রহ.) স্বপ্নে নবীজিকে দেখলেন। নবীজি তাকে সম্বোধন করে বললেন, তাওয়াক্কুল শাহ! তুমি প্রতিদিন আল্লাহকে দাওয়াত করে খাওয়াও; কিন্তু কখনও আমাকে দাওয়াত দাও না কেন?

স্বপ্নের কথা ব্যস এতটুকুই। তারপর তাঁর চোখ খুলে গেল। তিনি স্বপ্নের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা বুঝতে না পেরে খুব পেরেশান হলেন। তিনি আল্লাহর কাছে কেঁদে-কেঁদে বললেন, হে আল্লাহ! এই স্বপ্নের মর্মবাণী আমার সামনে স্পষ্ট করে দাও। একসময় তাঁর দু'আ কবুল হলো। তাঁর অন্তরে এই মর্মে ইলহাম হলো যে, তুমি আল্লাহর জন্য আল্লাহর সৃষ্টিজীবকে প্রতিদিন খাওয়াও; কিন্তু রাসূলের ওয়ারিস তথা ওলামা, তুলাবা ও কারী সাহেবদের বিশেষভাবে দাওয়াত দিয়ে খানা খাওয়াও না।

স্বপ্নের ভেদ প্রকাশ পেলে তিনি খুব খুশী হলেন। তিনি তাঁর শহরের সমস্ত আলেম, তুলাবা ও কারী সাহেবদের বিশেষভাবে দাওয়াত দিলেন। তাদের দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে তিনি স্বপ্নের বাণী বাস্তবায়ন করলেন এবং তাঁর দস্তরখানে খোদ নবীজি দাওয়াত প্রদানের গৌরব অর্জন করে ধন্য হলেন।

তালেবে ইল্‌মের দু'আর বরকত

সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.) একজন বিখ্যাত বাদশা ছিলেন। বুযুর্গও ছিলেন বড়। তিনি দীর্ঘদিন যাবত রাজ্যশাসন করেছেন। ভারতবর্ষে তিনি ১৭ বার আক্রমণ পরিচালনা করে ইতিহাস গড়েছেন।

সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.)-এর মনে দীর্ঘদিন ধরে তিনটি বিষয়ে ভীষণ খটকা ছিল। যথা–

(১) আমি বাদশা সবুক্তগীনের পুত্র। সবুক্তগীন প্রথম দিকে বাদশা ছিলেন না; বরং একজন সিপাহী ছিলেনমাত্র। পরে ভাগ্যগুণে বাদশা হয়েছেন। তাঁর থেকে আমার বংশীয় সম্পর্ক বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত কি-না?

(২) দীনের বহু শাখা-প্রশাখা আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম শাখা কোনটি? অর্থাৎ উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম শ্রেণীর লোক কারা?

(৩) দীর্ঘদিন যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর দীদার হয় না। এতে তাঁর মনে স্বপ্নে নবীজিকে দেখার দুর্বার বাসনা জাগে।

সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.) এই তিন খটকা মনে পুষে চলছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, যেন অচিরেই তাঁর এই খটকাগুলো দূর হয়ে যায়। আল্লাহপাকের দয়া যে, তাঁকে এর জন্য বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না। আল্লাহপাক গায়েবীভাবে এর ব্যবস্থা করে দিলেন।

একরাতে তিনি একটি রাস্তা দিয়ে চলছিলেন। তিনি একস্থানে দেখলেন, এক তালেবে ইল্‌ম একটি ঘর থেকে আসা আলোতে কিতাব পড়ছে। তিনি ছেলেটির কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মসজিদে না পড়ে এখানে পড়ছ কেন? তালেবে ইল্‌ম জানাল, মসজিদে আলোর ব্যবস্থা নেই। এই ঘরের থেকে আলো বাইরে এসে পড়েছে, তাই আমি তার আলোতে পড়ছি।

সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.) বললেন, ঠিক আছে, তুমি পড়তে থাকো। আজকের পর থেকে আমি তোমার জন্য মসজিদে আলোর ব্যবস্থা করে দেব। যখন পরের দিন তালেবে ইল্‌ম মসজিদে আলোর ব্যবস্থা দেখল, তখন সে দু'আ করল, হে আল্লাহ! যিনি আলোর ব্যবস্থা করে দিলেন, তুমি তার মনের সকল আশা পূরণ করে দাও।

সে রাতের ঘটনা। সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.) উক্ত তালেবে ইল্‌মের জন্য আলোর ব্যবস্থা করে ঘরে ফিরে এলেন। রাতে নিদ্রা যান। নিদ্রাবস্থায় নবীজির যেয়ারত তাঁর নসিব হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্বোধন করে বললেন–

'হে সবুক্তগীনের পুত্র! তুমি আমার ওয়ারিসের সম্মান করেছ। এর প্রতিদানে আল্লাহ তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করবেন।'

সুবহানাল্লাহ! এটি ছিল ওই তালেবে ইল্‌মের দু'আর ফসল। আল্লাহপাক তার দু'আর বরকতে সুলতান মাহমুদ গজনবী (রহ.)-এর সুপ্ত তিনটি ইচ্ছা-ই পূরণ করে দিলেন, যা দীর্ঘদিন তাকে পেরেশান করে রেখেছিল। আর তা এভাবে যে-

(১) তিনি স্বপ্নে নবীজির সাক্ষাত লাভে ধন্য হন।

(২) নবীজি তাঁকে সবুক্তগীনের পুত্র বলে সম্বোধন করেন, যার দ্বারা তার পিতৃসম্পর্কের ব্যাপারে যে খটকা ছিল, তা দূর হয়ে যায়।

(৩) তালেবে ইল্‌মকে নবীজি তাঁর ওয়ারিস বলেছেন। এতে সুলতান জানতে পারলেন, দীনের তা'লীমের সাথে যারা সম্পৃক্ত, তাদের দাম সবচেয়ে বেশি।

প্রতি সপ্তাহে নবীজির যেয়ারত

আমার এক বন্ধু হাফেযে হাদীছ ছিলেন। একদিন তিনি দরসে এ প্রসঙ্গে আলাপ করছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো বুখারী শরীফের হাফেয; তো আপনি কী আপনার জীবনে এর কোনো বরকত অনুভব করেছেন? তিনি জবাবে বললেন, হযরত! আমি এ ব্যাপারে বড়ই বিস্ময়ের মধ্যে আছি যে, হাদীছ মুখস্থ করার পর আমার উপর আল্লাহর এমন অনুগ্রহ হয়েছে যে, আমার কোনো সপ্তাহ নবীজির যেয়ারত থেকে খালি যায় না। প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার, আবার কোনো সপ্তাহে একাধিকবারও নবীজির যেয়ারত লাভে আমি ধন্য হই।

আলহামদুলিল্লাহ! এই হাফেযে হাদীছ এখনও বেঁচে আছেন। হাদীছের মহব্বত তাকে নবীজির এমন আশেক ও প্রিয় বানিয়ে দিয়েছে যে, প্রতি সপ্তাহে নবীজি তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন। কী পরম সৌভাগ্য! কী ঈর্ষণীয় সফলতা! উপকারী ইল্‌মের কী শান ও মান! আল্লাহপাক আমাদের সকলকে এই ফযিলত লাভের উপযুক্ত বানিয়ে দিন। নবীজির যেয়ারত দ্বারা ধন্য করুন।

তার কান্না বড়ই ভালো লাগে

হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) হাদীছ শরীফের খেদমত করার সুবাদে প্রায় রাতে স্বপ্নে নবীজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হতো। একবার কিছুদিনের জন্য তাঁর এই যেয়ারত-ধারা বন্ধ হয়ে যায়। এতে তিনি ভীষণ পেরেশান ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। অধিক চিন্তাহেতু তাঁর শরীর খারাপ হয়ে যায়। তিনি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

সুখস্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হয়তোবা আমার থেকে কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেছে, যার কারণে শাস্তিস্বরূপ এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। একথা মনে করে তিনি খুব কাঁদলেন। তাঁর কান্না আল্লাহর বড়ই ভালো লাগল। ফলে তিনি যেয়ারতের নেয়ামত আবার ফিরিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ!

এসব ঘটনা প্রমাণ করে, ওলামায়ে কেরাম ও তুলাবারা যদি একটু কদম বাড়ান, তাহলে আল্লাহপাক তাদের উপর খাস রহমত নাযিল করেন। সাধারণ লোকের মতো বেশি মেহনত তাদের করা লাগে না; বরং অল্প মেহনতই তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর সফলতার রহস্য

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) যখন মুসলমান হন, তখন তাঁর বয়স বার্ধক্য ছুঁই-ছুঁই করছিল। তিনি হাদীছ বেশি মনে রাখতে পারতেন না।

একদিনের ঘটনা। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বুকভরা আক্ষেপ নিয়ে নবীজির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সব কথাই শুনি; কিন্তু কিছুই মনে রাখতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার চাদরটা পাতো। তিনি গায়ের চাদরটা খুলে মেলে ধরলেন। নবীজি স্বীয় দু'হাত দ্বারা এমনভাবে ইশারা করলেন, যেন তিনি পাত্রে কিছু ঢালছেন। তারপর নবীজি বললেন, আবু হুরায়রা! এবার চাদরটা বাঁধো। তিনি চাদরটা বাঁধলেন। নবীজির এই দু'আর বরকতে আল্লাহপাক হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)কে এমন স্মৃতিশক্তি দান করলেন যে, তার পর থেকে আর কোনো কথা তিনি ভোলেননি।

ইল্‌ম অর্জনের জন্য হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) কদম বাড়িয়েছিলেন। অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধীশক্তির স্বল্পতা। কিন্তু নবীজির দু'আয় এই বাধা অপসারিত হয়ে গেল আর তিনি হয়ে গেলেন শ্রেষ্ঠ মেধাবী।

হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) মৌলভী ধরনের সাহাবী ছিলেন। হাদীছ সংগ্রহ করা ছিল তাঁর নেশা। ফলে এটিই হয়ে যায় তাঁর সর্বোচ্চসংখ্যক হাদীছ বর্ণনার কারণ।

যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থাকবেন ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে। সর্বোচ্চসংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করে তিনি যে রেকর্ড গড়েছেন, কেয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে তাঁর একক রেকর্ড। কারো পক্ষে এই রেকর্ড ভঙ্গ করা সম্ভব হবে না কোনোদিন। ইল্‌ম অর্জন ও হাদীছ সংগ্রহের নেশা তাঁকে চির অমর করে দিয়েছে।

স্মৃতিশক্তি কাকে বলে?

একবার আবদুল মালিকের মাথায় চিন্তা এল, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) অনেক অনেক হাদীছ শোনান। তাঁর বর্ণনাকৃত শব্দগুলো কি হুবহু নবীজির, নাকি তিনি নবীর কথা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন পরীক্ষা করার জন্য একবার আবদুল মালিক হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)কে দাওয়াত দিলেন। তিনি অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকেও নিমন্ত্রণ জানালেন। তিনি একটি পর্দা টাঙিয়ে তার অন্তরালে দুজন লিপিকার বসালেন এবং তাদের নির্দেশ দিলেন, হযরত

আবু হুরায়রা আজ যেসব হাদীছ শোনাবেন, তা তোমরা লিপিবদ্ধ করবে। দুজন লিপিকার রাখলেন, যাতে একে অপরের সহযোগিতায় হাদীছ ভালোভাবে লিপিবদ্ধ হয়।

মজলিস শুরু হলে আবদুল মালিক বললেন, হযরত! আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদীছ শুনেছেন। অনুগ্রহপূর্বক আজ আমাদের কিছু হাদীছ শোনান। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) ওই মজলিসেই ১০০ হাদীছ বর্ণনা করলেন। পর্দার ওপাশের লেখকদ্বয় সব হাদীছ লিখে নেয়। কিন্তু এত গোপনে এই লেখার কাজ সম্পন্ন হয় যে, কেউ তা টের পায়নি। এক সময় মজলিস শেষ হয়ে যায়।

এক বছর পরের ঘটনা। আবদুল মালিক হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)কে আবারও দাওয়াত দিলেন। এবারও তিনি পর্দার ওপাশে পূর্বের দুজন লোক রাখলেন এবং তাদের বলে দিলেন, এবার তোমাদের কাজ হলো, পূর্বের লিখিত খাতা বের করে হাদীছগুলো মেলানো। আমি হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)কে অনুরোধ জানাব, তিনি যেন ওই সকল হাদীছই আবার বর্ণনা করেন, যা তিনি গত বছর বর্ণনা করেছিলেন।

এক সময় মজলিস শুরু হলো। খানাপিনা শেষে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)কে আবদুল মালিক বললেন, হযরত! গত বছর আপনি যে হাদীছগুলো শুনিয়েছিলেন, তা খুব ভালো লেগেছিল। আজও ওই হাদীছগুলো শোনালে ভালো হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) গত বছরের বর্ণনাকৃত ১০০ হাদীছ আবার শুনিয়ে দিলেন। হাদীছ লেখকদ্বয় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান যে, একটি হরফেরও হেরফের হয়নি। গত বছর ঠিক যে বিন্যাস ও শব্দে হাদীছ শোনান, এ বছরও ঠিক সেই ধারায় ও শব্দে হাদীছ শোনান। আল্লাহপাক তাঁকে এমন ফটোগ্রাফিক মেমোরী দান করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

উপকারী ইল্‌মের টানে কারাবরণ

হযরত ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর এক ছাত্রের ঘটনা। ঘটনাটি লেখা আছে হযরত ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর জীবনীতে। তৎকালীন বাদশা একদা হযরত ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর কাঁছে একটি ফতোয়া চাইলেন। কিন্তু তিনি ফতোয়া দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। এতে বাদশা ক্ষুব্ধ হয়ে হযরত ইবনে তাইমিয়া (রহ.)কে বন্দী করে কারাগারে প্রেরণ করলেন। তিন দিন পর্যন্ত তিনি বিনা অপরাধে কারাগারে বন্দী থাকলেন।

তিন দিন পর। বাদশা স্বীয় দরবারে উপস্থিত। ইতিমধ্যে এক যুবক সেখানে এল। অত্যন্ত সুদর্শন যুবক। তার চেহারা থেকে সরলতা, নিষ্পাপতা ও সৌন্দর্য ঠিকরে পড়ছিল। যুবক অঝোর ধারায় কাঁদছিল। তার অধিক ক্রন্দনে উপস্থিত সকলেই ব্যথিত হলো। সবাই ছেলেটির দুঃখে দুঃখিত হলো। সকলেই চাচ্ছিল, বাদশা যেন ছেলেটির দুঃখ দূর করে দেন এবং তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। ছেলেটিকে এভাবে কাঁদতে দেখে বাদশারও দয়া হলো। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, হে যুবক! তুমি কেন এত কাঁদছ? তোমার কোনো ভয় নেই। বলো, তুমি কী চাও? আমি তোমার বাসনা অবশ্যই পূরণ করব। বাদশা এই প্রতিশ্রুতি দিলে ছেলেটি এবার বলল, মহামান্য বাদশা! আপনি আমাকে বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়ে দিন!

বাদশা ছেলেটির এহেন অনুরোধে যারপরনাই বিস্মিত হলেন। তিনি এই ভেবে পেরেশান হলেন যে, জেলখানায় যেতে কেউ এভাবে কাঁদে? তারপর নিজেকে স্বাভাবিক করে বললেন, নওজোয়ান! খুলে বলো তো, তোমার এই স্বেচ্ছাকারাবরণের হেতু কী? ছেলেটি বলল, সম্মানিত বাদশা! আপনি আমার ওস্তাদকে তিন দিন ধরে বন্দী করে রেখেছেন। এ কারণে এই তিন দিন আমার সবক পড়া হয়নি। যদি আপনি আমাকেও বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়ে দেন, তাহলে বন্দী হওয়ায় একটু কষ্ট হলেও ওস্তাদ থেকে প্রতিদিন সবক তো পড়তে পারব! আমি সব কিছু সইতে পারি; কিন্তু সবক কামাই মানতে পারি না।

এ ছিল পূর্বের যুগের ছাত্রদের ইল্‌মপিপসার নমুনা। তারা প্রয়োজনে কারাবরণ করতেও প্রস্তুত ছিল। ওস্তাদের সঙ্গে, উপকারী ইল্‌মের সঙ্গে ছাত্রদের গভীর মহব্বত ও হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু বর্তমান সময় উপকারী ইল্‌মের এই পিপাসা হ্রাস পেতে-পেতে শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছেছে। আমরা উপকারী ইল্‌মের মহব্বত বিদায় দিয়ে টেলিভিশনকে মহব্বতের পাত্র বানিয়ে নিয়েছি এবং যত ব্যস্ততাই থাক না কেন, টিভির কোনো অনুষ্ঠান ও প্রোগ্রাম দেখা বাদ যায় না।

এর বিপরীতে আল্লাহর কিতাব কুরআন শরীফ খোলার সময়ই হয় না। সারা দিনে একবারের জন্যও কুরআন খুলি না, পড়ি না। অনেক বাড়ি তো এমনও আছে যে, সেখানে কুরআন শরীফও নেই। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

এক নারীর জন্য চার পুরুষ জাহান্নামে যাবে

পুরুষরা মনে করে, নারীদের দীনি শিক্ষার কোনোই প্রয়োজন নেই। তাদের দায়িত্ব শুধু রান্নাঘর সামলানো। ভাত-তরকারি রান্না করা, রুটি বানানো, পিঠা-পায়েস তৈরি করা ইত্যাদি। আমাদের সমাজে সেসব মেয়েদের গুণবতী মনে করা হয়, যারা রান্নাবিদ্যায় পারদর্শী হয়।

মনে রাখবেন, মহিলাদের এভাবে রান্নাঘরে আবদ্ধ রাখার দায়ভার কাল কেয়ামতে পুরুষদের উপরেই চাপবে। কাল কেয়ামতে মহিলারা যখন ধরা খাবে এবং হিসাবে আটকে যাবে, তখন তারা এর জন্য আল্লাহর কাছে পুরুষদের দায়ী করবে। মহিলারা ওজর পেশ করে বলবে, পুরুষরা আমাদের দীন পালনের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা ঘরে নিজেরাও দীনি আলোচনা করত না এবং আমাদেরও কোনো দীনের মজলিসে গিয়ে দীনি আলোচনা শুনতে দিত না, যার ফলে আমরা দীনদার হতে পারিনি, আমল করতে পারিনি।

নারীদের এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুরুষদের পাকড়াও করা হবে। এক বর্ণনায় এসেছে, এক জাহান্নামী মহিলা জাহান্নামে যাওয়ার সময় চারজন পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। (১) পিতাকে (২) স্বামীকে (৩) ভাইকে (৪) পুত্রকে। মহিলা বলবে, আমাকে সংসারে ধোপা ও বাবুর্চীর কাজে ব্যস্ত রাখা হয়েছিল। এসব কাজ করতে পারলেই তারা খুব খুশি হতো। দুনিয়াবি কাজে ত্রুটি হলে আমাকে সতর্ক করত, রাগারাগি করত, কৈফিয়ত তলব করত। কিন্তু দীনের দাবি অনুযায়ী না চললে কখনো কিছু বলত না। এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিত না। কখনো জিজ্ঞাসা করত না,

আমি নামায পড়েছি কি-না।

রমযান মাসে রোযা রেখেছি কি-না।

সম্পদের যাকাত দিয়েছি কি-না।

হজ ফরজ হলেও তা করলাম কি-না।

কুরআন তেলাওয়াত করি কি-না।

সুন্নত মোতাবেক চলি কি-না।

পর্দা মেনে চলি কি-না।

আমি মিথ্যা কথা বললেও কিছু বলত না।

গীবত-পরনিন্দা করলেও বাধা দিত না।

হিংসা-বিদ্বেষ দেখেও কিছু বলত না।
গর্ব-অহংকার থাকলেও বাধা দিত না।
টিভি-ভিসিআর দেখলে নিষেধ করত না।
নভেল-নাটক পড়লে কিছু বলত না।
কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত বলেনি।
কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম বলেনি।
কীসে আল্লাহ খুশি হন আর কীসে বেজার হন তা জানায়নি।
কোন কাজ করণীয় আর কোন কাজ বর্জনীয় তা বলেনি।
আমাকে ঈমান শিক্ষা দেয়নি।
দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা দেয়নি।
নামায পড়া শিক্ষা দেয়নি।
কুরআন পড়া শিক্ষা দেয়নি।
পর্দায় থাকা শেখায়নি।
নবীজির সুন্নত শেখায়নি।
ইসলামী আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়নি।
জান্নাত সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করেনি।
জাহান্নাম সম্পর্কে ভয় দেখায়নি।
কবরের আজাব সম্পর্কে বলেনি।
কেয়ামতের কথা বলেনি।
পরকালে হিসাবের কথা বলেনি।
দু'আ-দুরূদ শিক্ষা দেয়নি।
দুনিয়ার অসারতা সম্পর্কে জানায়নি।
আখেরাতের স্থায়ী জীবনের সন্ধান দেয়নি।

এসব অভিযোগ এমন, যার কোনো সদুত্তর সেদিন পুরুষরা দিতে পারবে না। ফলে অন্যান্য অপরাধ না থাকলেও শুধু এই অপরাধে অর্থাৎ অধীন নারীদের দীনি ইল্‌ম শিক্ষা না দেওয়া ও কুরআন-সুন্নাহ তথা শরীয়ত অনুযায়ী তাদের আমলের উপর না উঠানোর অপরাধে প্রত্যেক জাহান্নামী নারীর সাথে তার অভিভাবকদেরও জাহান্নামে পাঠানো হবে।

দাওরায়ে হাদীছের পরে আবার দাওরায়ে হাদীছ

যারা উপকারী ইল্‌মের আশেক, তারা সারাটা জীবনকে উপকারী ইল্‌মের জন্য উৎসর্গ করে। তাই আজ তরুণ আলেমদের প্রতি অনুরোধ রাখি, তারা যেন মাদরাসা থেকে যাওয়ার পর নিজেদের ইল্‌ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেন এবং তরতাজা রাখেন। বলুন তো, কতজন আলেম এমন মিলবে, যারা দাওরায়ে হাদীছ পড়ে আবার হাদীছের দাওর করেছেন? অর্থাৎ এক দাওরা তো হলো, দাওরার বছর ওস্তাদগণ হাদীছ পড়ান আর ছাত্ররা তা শোনে। এরপরে আর কখনো হাদীছের কিতাবের দাওর করা হয় কি? মনে রাখবেন, আমাদের আকাবিরগণ যেভাবে নিয়মিত কুরআন খতম করতেন, ঠিক সেভাবে তারা হাদীছের কিতাবাদিও প্রতিদিন তেলাওয়াত করতেন। যেভাবে আমরা কয়েক দিন পরপর কুরআন খতম করে থাকি, ঠিক সেভাবে নিজেদের উপকারের জন্য বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফসহ হাদীছের অন্যান্য কিতাবও খতম করতেন। এতে তাদের ইল্‌ম তাজা থাকত। এমনিক ওলামায়ে কেরাম কিতাবে এমনও লিখেছেন যে, কোনো এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অথবা অন্য কোনো বিপদ আপতিত হলে, সেখানে বুখারী শরীফ খতম করা হতো। এর বরকতে আল্লাহপাক ওই এলাকা হতে বিপদ দূর করে দিতেন। বর্তমানে ওলামায়ে কেরামও নিয়মিত হাদীছ মুতালা'আ করেন না। অবশ্য কখনো ওয়াজ-নসিহতের প্রয়োজন পড়লে নির্দিষ্ট হাদীছ দেখে নেন মাত্র।

পত্রিকাভিত্তিক জুমুআর নিন্দা

কতক স্থানে পত্রিকাভিত্তিক জুমার নামায হয়। জুমুআর খতীব সাহেব বলেন, আমাকে জুমুআর নামায পড়াতে হবে, দু-চারটা পত্রিকা নিয়ে এসো। ব্যস, পত্রিকার আলোচনায় নজর বুলিয়ে তা দ্বারাই জুমুআর আলোচনা চালিয়ে দেন। এহেন পত্রিকাভিত্তিক জুমুআর দ্বারা জাতির ভাগ্যের কীভাবে পরিবর্তন হবে? অথচ পূর্বে জুমুআর নামায পড়াবার জন্য তাফসীরের কিতাবাদি মুতালা'আ করতে হতো। আর বর্তমানে কিতাবাদি মুতালা'আ বাদ দিয়ে পত্রিকার আলোচনা দ্বারা জুমুআ চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উপকারী ইল্‌মের কী অবনতি! উপকারী ইল্‌মের টান ও আকর্ষণ এভাবেই বিদায় নিচ্ছে। পূর্বের যুগে আমাদের পূর্বসূরীগণ ততক্ষণ নিদ্রা যেতেন না, যতক্ষণ তারা শোওয়ার আগে দীনি কিতাবাদি মুতালা'আ না করতেন। আর বর্তমান ততক্ষণ শয়ন করা হয় না যতক্ষণ পরস্পরে জড়ো হয়ে গল্প-গুজব না করা হয়। আমাদের আকাবিরগণ সকালে উঠে সর্বাগ্রে অত্যন্ত আগ্রহ ও মহব্বতের

সঙ্গে কুরআন তেলায়াত করতেন। পক্ষান্তরে বর্তমানের আলেমগণের দিনের সূচনা হয় পত্র-পত্রিকা দেখার মধ্য দিয়ে। কুরআনের স্থান পত্র-পত্রিকা দখল করে নিয়েছে।

অধ্যয়নের গুরুত্ব

দীনি ইল্‌ম মুতালা'আ করার গুরুত্ব যে কত বেশি, তা এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, আল্লাহপাক এই উম্মতকে সর্বপ্রথম যে নির্দেশ দেন, তা হলো, ইল্‌ম অর্জন করো। সর্বপ্রথম ওহী হিসেবে যা অবতীর্ণ হয়, তাতে প্রথম শব্দ ছিল- اقرأ। এর অর্থ হলো, পড়ো। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলেও সত্য যে, এই প্রথম শব্দটির প্রতিও আমাদের মহব্বত নেই। উচিত তো এটাই ছিল যে, মুমিনরা পুরো জীবনকে উপকারী ইল্‌মের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিবে। ইল্‌ম দ্বারা উদ্দেশ্য দীনি ইল্‌ম। ইল্‌মি ক্ষেত্রে প্রতিদিন উন্নতি হওয়া চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেব্যক্তির পর-পর দুদিন এক রকম যায়, সে ব্যর্থ। হাদীছের মতলব হলো, কারো দুটি দিন এক রকম না হওয়া উচিত; বরং প্রতিদিন ইল্‌ম ও আমলে উন্নতি-অগ্রগতি হওয়া কাম্য। প্রত্যেক দিনটি তার পূর্বের দিন হতে ভালো হওয়া চাই। ভালো হওয়া তো দূরে থাক, আমাদের দুটি দিন বরাবরও হয় না; বরং প্রত্যেক দিনে আমাদের অবস্থা পূর্বের দিন থেকে অবনতি হচ্ছে। আমলের দিক থেকে আমরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছি। যেখানে উন্নতি হওয়ার কথা, সেখানে অবনতির পর অবনতি চলছে; শুধু অবনতিই নয়; বরং সঠিক কথা হলো, আমরা ক্রমশ অধঃপতিত হচ্ছি।

মনে রাখবেন, আমরা ওলামায়ে কেরাম যখন উপকারী ইল্‌মের পাগল হব, তখন উম্মতের মধ্যেও ইল্‌ম আসবে এবং আমলের রাস্তা খুলে যাবে। আম্বিয়ায়ে কেরামের মতো যারা উপকারী ইল্‌মের চর্চা করে এবং যারা সন্তানদের ইল্‌ম শিক্ষা দেয়, তাঁরাই মূলত উপকারী ইল্‌মের ভক্ত, তাঁরাই উপকারী ইল্‌মের বন্ধু।

কিতাবের খাজানা

আপনি যত জ্ঞান অর্জন করতে চান করুন; এর কোনো শেষ নেই। আমরা সারা জীবনে যত ইল্‌ম শিখেছি, আমাদের আকাবিরগণ এই পরিমাণ ইল্‌ম শিখে ভুলে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমাদের আকাবিরগণ এত বেশি ইল্‌ম অর্জন করতেন যে, তাদের ভুলে যাওয়া উপকারী ইল্‌মের পরিমাণ আমাদের

সারা জীবনের অর্জিত উপকারী ইল্‌মের চেয়েও বেশি ছিল। তাদের মাথা কিতাবে ভরপুর ছিল। অতএব, এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, তাদের মাথা কিতাবের খাজানা ছিল।

বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি

একবার ভাওয়ালপুর আদালতে খতমে নবুওয়াত প্রসঙ্গে মামলা চলে। কোর্টে তারিখ পড়লে হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) কোর্টে যান। প্রতিপক্ষ বন্ধুগণ আদালতে একটি কিতাবের রেফারেন্স দেন। ওই কিতাবের বক্তব্য মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসবিরোধী ছিল। কিতাবটি মুসলমানদেরই একজন উঁচু পর্যায়ের আলেমই লিখেছিলেন। বিচারক বিব্রত বোধ করলেন। তিনি বললেন, দেখুন, এই কিতাব আপনাদেরই বড় একজন আলেমের লেখা এবং সেটি আপনাদেরই বিরুদ্ধে কথা বলছে। বিচারকের একথা শুনে হযরত কাশ্মিরী (রহ.) বললেন, কিতাবটি আমাকে একবার দেখতে দিন। বিচারক কিতাবটি দেখালেন। হযরত কাশ্মিরী (রহ.) কিতাবের কয়েকটি পৃষ্ঠা পাঠ করে বললেন, যে লিপিকার কিতাবটির কপি করেছেন, তিনি কাজ করার সময় মধ্যখান থেকে একটি লাইন ছুটে গেছে। ফলে মাঝখান থেকে একটি লাইন ছুটে যাওয়ায় আগের লাইনের বক্তব্য পরের লাইনের বক্তব্যের বিরোধী হয়ে গেছে।

পূর্বের যুগে বর্তমানের মতো কিতাব প্রেসে ছাপা হত না; বরং কলমে লিখে কাজ করা হতো। তাই অনেক সময় অসর্তকতাহেতু এমনভাবে ছুটে যেত।

হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বললেন, প্রথমত দেখতে চাইলে এই কিতাবেরই আরেকটি কপি আনা হোক। আরেকটি কপি আনা হলো। যখন উভয় কপি মেলানো হলো, তখন দেখা গেল, হযরত শাহ সাহেবের কথা-ই সঠিক। এভাবে সেদিন প্রতিপক্ষের মুখোশ উন্মোচন হয়ে গেল এবং তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ হয়ে পড়ল।

পরে ওলামায়ে কেরাম শাহ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! আপনি তো জানতেনই না, প্রতিপক্ষ এই কিতাবটি প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে, তাই স্বাভাবিক কথা এটাই যে, আপনি কিতাবটি সদ্য মুতালা'আ করে আসেননি, তাহলে কীভাবে বুঝলেন, মধ্যখান থেকে একটি লাইন ছুটে গেছে? হযরত শাহ সাহেব জবাবে বললেন, ঠিকই বলেছেন, আমি জানতাম না, তারা এই কিতাবটি পেশ করবে, তাই সেটা নগদে মুতালা'আও করিনি। কিন্তু আমি ২৭

বছর পূর্বে এই কিতাবটি মুতালা'আ করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আজও তার প্রতিটি কথা আমার মনে আছে। সুবহানাল্লাহ!

ভুলে যাওয়ার বড় কারণ পাপাচার

মনে রাখবেন, মানুষ পাপের কারণে ভুল রোগের কবলে পড়ে। এটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো কথা।

ছাত্ররা যে বলে, হযরত! দু'আ করুন! শুধু ভুলে যাই; এটা গুনাহের পরিণতি। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আমি স্বীয় ওস্তাদ ইমাম ওকী' (রহ.)-এর সকাশে আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, গুনাহ ছেড়ে দাও। কেননা, ইল্‌ম হলো আল্লাহর নূর; আর আল্লাহর নূর কোনো পাপী পায় না।

উপকারী ইল্‌মের নেসবত

আমাদের নিকটে ইল্‌ম রয়েছে; কিন্তু উপকারী ইল্‌মের নেসবত নেই। নেসবত ওই নূরকে বলে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, সংবাদ ও কাজকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে যা বান্দার বক্ষে স্থানান্তরিত হয়। যদি ওই নেসবতের সূর এসে যায়, তাহলে জীবনের মোড় ঘুরে যায়। যেব্যক্তি এই নেসবতের নূর পেয়ে যায়, আল্লাহর দরবারে সে মাকবুল বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে।

শরীয়তের বার্নিশ

আমরা শৈশবে হাড়ি-পাতিল বার্নিশকারীদের কাছে বসে থেকে তাদের কাজ দেখতাম। আমরা পুরাতন হাড়ি-পাতিল চকচকে হতে দেখে খুবই প্রফুল্ল হতাম। বার্নিশকারীরা গ্রামে ঘুরে-ঘুরে হাড়ি-পাতিল বার্নিশ করুন বলে জোরে-জোরে আওয়াজ দিত। আমরা তখন আম্মাকে এই বলে পীড়াপীড়ি করতাম যে, আপনিও হাড়ি-পাতিল বার্নিশ করিয়ে নিন। আমাদের উদ্দেশ্য থাকত, বার্নিশকারীদের কাছে বসে থেকে তাদের বার্নিশ করা দেখব। আমরা তাদের নিকট হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে যেতাম। তারা প্রথমে হাড়ি-পাতিল আগুনের হাঁপরে ফেলে গরম করত। তারপর তাতে মেডিসিন লাগিয়ে কালো ইত্যাদি ময়লা দাগ উঠাত। তাদের নিকটে বার্নিশ থাকত। ময়লা দূর হয়ে যাওয়ার পর তারা পাতিলে হাল্কাভাবে বার্নিশ দিয়ে লাইন সোজা করে একটি দাগ দিত। তারপর লাইন থেকে নিয়ে পাতিলের সম্পূর্ণ অংশে এমনভাবে বার্নিশ করত যে, বার্নিশের একটি স্তর পুরো পাতিলে পড়ে যেত।

পীর-মাশায়েখগণও এমনটি করে থাকেন। তারা তরিকতের পথের সাধককে মুজাহাদার হাঁপরে ফেলে যিকিরের মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ করেন। কেমন যেন তাঁরা–

لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ

'প্রত্যেক জিনিসের রেত রয়েছে। কলবের রেত হলো যিকরুল্লাহ।'

এর লক্ষ্যবস্তু 'যিকরে ইলাহী'-এর মেডিসিন লাগান। যার দ্বারা আত্মশুদ্ধির সাধকের দিলের পাত্র পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর যখন শায়েখ তার উপর শরীয়তের বার্নিশ করেন, তখন সাধকের অবস্থা বদলে যায়। তার সম্পূর্ণ জীবন শরীয়ত মোতাবেক হয়ে যায়।

রিজালুল্লাহর গুরুত্ব

তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি কোনো শায়েখ ব্যতীত হয় না। মানুষ যদি নিজের পরিশুদ্ধি নিজে করতে পারত, তাহলে আল্লাহপাক নবী পাঠাতেন না। শুধু কিতাব পাঠাতেন এবং বান্দাদের বলতেন, এই কিতাব অনুযায়ী চলো। এমন ঘটেছে যে, নবী এসেছেন; কিন্তু কিতাব আসেনি। তবে এমনটি কখনো হয়নি যে, কিতাব এসেছে; কিন্তু নবী আসেননি। কিতাবুল্লাহ বোঝার জন্য রিজালুল্লাহ থাকা জরুরি। তাই কোনো লোক যখন কোনো শায়েখের সোহবতে থেকে মেহনত-মুজাহাদা করে, তখন তার উপর উপকারী ইল্‌মের নেসবতের রং ধারণ করে।

এ কারণেই জনৈক আল্লাহপাগল বলেন–

قال را بگزار مرد حال شو

پیش مرد کاملے پامال شو

علم قال (মৌখিক জ্ঞান) ছেড়ে علم حال (আমলী জ্ঞান) এর বান্দা হয়ে যাও এবং নিজেকে কোনো কামেল পীরের সামনে মিটিয়ে দাও।

صد کتاب وصد ورق در نار کن

جان ودل را جانب دلدار کن

শত কিতাব এবং শত পৃষ্ঠা আগুনে জ্বালিয়ে দাও আর নিজের জান ও প্রাণ প্রেমাস্পদকে দিয়ে দাও।

মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ

বন্ধুগণ! মানুষের মতো চরম অকৃতজ্ঞ আর কেউ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক নিজেই বলেন–

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ.

'মানুষ তার প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ এবং সে নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী অর্থাৎ তার কার্যকলাপই সাক্ষ্য দেয় যে, সে বড় অকৃতজ্ঞ।'[১]

আমরা যদি আমাদের অন্তরে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে আমাদের অন্তর অবশ্যই সাক্ষ্য দিবে, আমরা অনেক-অনেক বেশি অকৃতজ্ঞ। সামান্য-সামান্য সমস্যা দেখা দিলেই সর্বপ্রথম আমাদের ইবাদাত ছুটে যায়। এ হলো আমাদের ইবাদাতের উপর অটল-অবিচল থাকার অবস্থা। মানুষ বলে, একটু সাংসারিক বা ব্যবসায়িক সমস্যায় আছি। এটা শেষ হলেই নামায পড়া শুরু করব। আস্তাগফিরুল্লাহ! বিপদে ইবাদাত ত্যাগের মাধ্যমে আমাদের সব্যাগ্রে আল্লাহর দরজা ছুটে যায়।

কুকুরের উপদেশ

এক সাধক আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে মেহনত করছিল। লোকটি একটি নিরিবিলি স্থানে একমনে ইবাদাত করে চলছিল। লোকটি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রতিদিন খানা পেয়ে যাচ্ছিল। দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত সে খানা পেতে থাকে।

একবার লোকটির খানা আসা বন্ধ হয়ে গেল। তিন দিন অনাহারে থাকায় সে দুর্বল হয়ে পড়ল। মনে-মনে বলল, এবার কোনো বান্দার কাছে গিয়ে হাত পাততে হবে। এটা ভেবে সে ইবাদাতখানা ছেড়ে গেল এবং এক লোকের দরজায় গিয়ে হাত পাতল। লোকটি তাকে তিনটা রুটি দিল।

সাধক রুটি নিয়ে তার আস্তানায় ফিরছিল। হঠাৎ পথে একটা কুকুর তার পিছু নিল। কুকুরটা এত ক্ষুধার্ত ছিল যে, সাধক তার অবস্থা দেখে মনে করল, হয়ত সে আমাকেই খেয়ে ফেলবে। তাই কুকুরের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে একটা রুটি কুকুরের দিকে ছুড়ে দিল। কুকুর রুটিটা খেয়ে আবার সাধকের পিছু নিল। সাধক জীবন রক্ষার্থে আরেকটা রুটি কুকুরকে দিয়ে দিল। কুকুর রুটিটা খেয়ে আবার সাধকের পিছে ছুটল। সাধক তার আস্তানায়

---

১. সূরা আদিয়াত : আয়াত ৬, ৭

পা দেওয়ার আগেই কুকুরটা তার সামনে গিয়ে হাজির হলো। সাধক জীবন বাঁচাতে তৃতীয় রুটিটাও কুকুরের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল। কুকুর তৃতীয় রুটিটাও খেয়ে ফেলল। সাধক কুকুরকে রুটি দিতে-দিতে বলল, তুই কত বড় জালেম রে, আমাকে একটা রুটিও খেতে দিলি না! আল্লাহর কুদরত দেখুন, কুকুরের জবান খুলে গেল। আল্লাহ কথা বলাতে চাইলে যাকে শক্তি দেন, সে-ই কথা বলতে পারে। কুকুর বলল–

'আমি জালেম নই; আপনিই বরং জালেম।'

লোকটি বলল, কীভাবে? কুকুর বলল, এভাবে যে, আপনার মালিক আপনাকে তিন বছর একই স্থানে বসিয়ে রিযিক দিতে থাকেন। তারপর মাত্র তিন দিন রুটি না পেয়েই আপনি রবের দরজা ছেড়ে অন্যের দ্বারস্থ হলেন। বান্দার কাছে হাত পেতেছেন। এর বিপরীতে আমার অবস্থা দেখুন, আমার মালিক কয়েক দিন যাবত আমাকে রুটি দেন না; আমি সম্পূর্ণ না খেয়ে থাকি; কিন্তু তারপরও স্বীয় মালিকের দরজা কখনো ছাড়ি না। মালিক আমাকে খেতে না দিলেও তার দরজা ছেড়ে অন্যের দরজায় যাই না।

একটি বিরাট উপদেশের কথা

ভোলা শাহ নামে এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি নিজের স্থানীয় ভাষায় একটি বিরাট উপদেশের কথা বলেছেন। আমি তার মর্মার্থ আপনাদের শোনাচ্ছি।

১) তুমি রাত জেগে নিজেকে 'শায়েখ' বলে পরিচয় দাও। কুকুরও তো রাত জাগে। অতএব কুকুর তোমার থেকে ভালো।

২। কুকুর শুকনা-বাসী রুটি খেয়ে রাতভর জেগে থেকে মালিকের ঘর পাহারা দেয়। সকালে তার জন্য নরম বিছানার ব্যবস্থা করা হয় না; বরং কোনো দেওয়াল বা গাছের গোড়ায় বিছানা ছাড়াই খালি মাটিতে ঘুমিয়ে পড়ে। অতএব কুকুর তোমার থেকে ভালো।

৩। তুমি পালঙ্কে ঘুমিয়েও অকৃতজ্ঞ হও। পক্ষান্তরে কুকুর গাছের গোড়ায় শুয়েও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। অতএব, তোমার চেয়ে কুকুর ভালো।

৪। কুকুর কখনো তার মালিকের দরজা ছাড়ে না। চাই তার মালিক তাকে শত জুতার আঘাতও করুক-না কেন। পক্ষান্তরে তুমি সামান্য কিছু ঘটতেই মালিকের দরজা ছেড়ে দাও। অতএব কুকুর তোমার থেকে ভালো।

৫। এই ভোলা! শীঘ্রই ওঠ। তাহাজ্জুদের সময় হয়ে গেছে। এ সময়ে তুই স্বীয় মালিককে রাজি কর। নতুবা তোকে এর জন্য চরম মাশুল দিতে হবে!

আল্লাহপাকের দরবারে মিনতি জানাই, তিনি যেন আমাদেরও স্বীয় মালিকের পূর্ণ অনুগত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমাদের সকলকে উপকারী ইল্‌মের নেসবতের নূর দান করেন এবং সেই নেসবতকে মজবুত করে ধারণ করার তাওফীক দান করেন। মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

الٓرٰ. كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

'আলিফ লা–ম রা (হে নবী!) এটি একটি কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর ভেতর নিয়ে আসতে পার।'

–সূরা ইবরাহীম : ১

কুরআনের বরকত

[১৪২২ হিজরীর ২৯ রমযানুল মুবারক মোতাবেক ২০০১ সনের ১৪ ডিসেম্বর জাম্বিয়ায় হযরতওয়ালা দামাত বারাকাতুহুম ই'তিকাফরত অবস্থায় এই গুরুত্বপূর্ণ বয়ানটি পেশ করেন। মজলিসে বহু ওলামায়ে কেরাম, মু'তাকিফীন ও সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।]

'পবিত্র কুরআন

মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর ভিতর আনয়নকারী কিতাব।

পথহারাদের সঠিক পথের দিশাদানকারী কিতাব।

অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিপতিত লোকদের উন্নতির শিখরে উপনীতকারী কিতাব।

আল্লাহভোলা লোকদের আল্লাহওয়ালা বানানোর কিতাব।

মোটকথা, মানুষকে জিরো থেকে হিরো বানানোর কিতাব।'

কুরআনের বরকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

وَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ مَقَامٍ اٰخَرَ: اَلٓرٰ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অন্ধকার হতে আলোর দিকে

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

اَلٓرٰ. كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ.

'এটি একটি কিতাব। এটি আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে এর মাধ্যমে আপনি মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আনেন।'[১]

আয়াত প্রমাণ করে, পবিত্র কুরআন হলো–

১। মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর ভিতর আনয়নকারী কিতাব।

---

১. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ১

২। পথহারাদের সঠিক পথের দিশাদানকারী কিতাব।

৩। অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিপতিত লোকদের উন্নতির শিখরে উপনীতকারী কিতাব।

৪। আল্লাহভোলা লোকদের আল্লাহওয়ালা বানানোর কিতাব।

মোটকথা, মানুষকে জিরো থেকে হিরো বানানোর কিতাব।

কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় ফযীলত হলো, এটি রাজাধিরাজ ও মহাসম্রাটের বাণী। অন্যসব গ্রন্থের উপর কুরআনের ফযীলত তেমন, সমস্ত মাখলুকের উপর আল্লাহর ফযীলত যেমন।

হিদায়েতের কিতাব

পবিত্র কুরআন হেদায়াতের কিতাব। আল্লাহপাক একে 'ইবাদাতের কিতাব' বলেননি যে, এটি নামাযী ব্যক্তিকে ইবাদাতের বিবরণ প্রদান করে। বরং বলেছেন, 'হিদায়েতের কিতাব'। মানুষের হেদায়াতের কিতাব। এ হিদায়েত সারা জীবনের; জনম থেকে জনমের। উভয় জগতের। মানুষের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু, কেয়ামতে উঠা এবং জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেওয়া পর্যন্ত প্রতি কদমে-কদমে এই কিতাব মানুষকে দিকনির্দেশনা দেয়, সঠিক পথ প্রদর্শন করে। ফলে জীবনের কোনো ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে এবং অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে তখন এই কিতাবে ফিরে আসতে হবে। আপনি এই কিতাবে সকল রোগের চিকিৎসা পাবেন এবং প্রত্যেক সমস্যার সমাধান পাবেন।

কুরআন শরীফের সূচনা হয়েছে بسم الله এর ب দ্বারা আর শেষ হয়েছে والناس এর سين দ্বারা। এই বা আর সীন মিলালে بس শব্দ তৈরি হয়, যার অর্থ হলো যথেষ্ট। এর মর্মার্থ হলো, যেব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং তা ধারণ করে, তার জন্য অন্য আর কোনো হিদায়েতের প্রয়োজন নেই। তার জন্য শুধু কুরআনই যথেষ্ট। সে যদি জীবনভর কুরআন মোতাবেক চলে, তাহলে এই কুরআনই তাকে দোজাহানে সাফল্যমণ্ডিত করবে।

আল্লাহর রহমতের চুম্বকার্ষণ

লোহা যেখানেই থাকুক-না কেন চুম্বক তাকে কাছে টানে। যখন কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয়, তখন এমন অনুভূত হয় যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহর রহমত আকর্ষণের চুম্বক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

'আর যখন কুরআন পড়া হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে, যাতে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়।'[১]

মারেফাতে ভরপুর কিতাব

কুরআন মাজীদ মারেফাতে ভরপুর কিতাব। এটি হাকীকতের খাযানা। নেককার লোকদের বর্ণনার সমষ্টি। বরং সত্য কথা হলো, পবিত্র কুরআন হলো-

Ultimate realities of the universe

'বিশ্বজগতের চরম বাস্তবতা।'

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বিশ্বের সমস্ত সত্য তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এটি আমাদের কাছে বিদ্যমান। এটি পড়ুন। এর উপর আমল করুন এবং দুনিয়া-আখেরাতে সম্মান লাভ করুন।

মনে রাখবেন, যেব্যক্তি দুনিয়াতে এই কুরআনের মূল্যায়ন করবে না, আখেরাতে কুরআন তাকে চিনবে না। এভাবে সে পবিত্র কুরআনের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

একটি ঈমানদীপ্ত ঘটনা

১৯৮৭ সনে আমি ওয়াশিংটনের দার্জিনিয়ার নিকটস্থ একটি এলাকায় ছিলাম। আমাকে জানানো হলো, বিভিন্ন ধর্মের নেতৃস্থানীয় লোকেরা সেখানে একটি নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হয়ে পরস্পর মতবিনিময় করেন। উক্ত সম্মেলনে সকল ধর্মের লোক আসেন; কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার মতো সেখানে কেউ নেই। ফলে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ ইচ্ছামতো ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করেন। ফলে বন্ধুগণ আমাকে কুরবানির জন্তু বানিয়ে দিলেন যে, আপনিই সেখানে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিন। তাদের উপর্যুপরি অনুরোধে আমি উক্ত মজলিসে যাওয়া শুরু করি। প্রতি মাসে একদিন তাদের মিটিং হতো। একেক দিন একেকটি প্রসঙ্গে আলোচনা হতো। আমার দায়িত্ব ছিল ইসলাম সম্পর্কে কোনো কথা আলোচনার টেবিলে এলে এবং সে ব্যাপারে কারো মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২০৪

নিরসন করা। এক বছর যাবত আমি আল্লাহর ইচ্ছায় এই গুরুদায়িত্ব পালন করি। মিটিংয়ে এক চেয়ারে খৃস্টান পাদ্রী বসতেন আরেক চেয়ারে ইহুদী ধর্মগুরু বসতেন। আরেক চেয়ারে হিন্দু পণ্ডিত বসতেন। যে চেয়ারটি মুসলিম প্রতিনিধির জন্য রাখা হয়েছিল, তাতে আমি বসতাম। এ ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিদের জন্যও সংরক্ষিত আসন ছিল। তারাও নিজ-নিজ আসন গ্রহণ করতেন।

এক মিটিংয়ে আমি পয়েন্ট তুলে ধরি, সামনের মিটিংয়ে যেসব এজেন্ডা থাকবে তার মধ্যে এটি সংযোজন করা হোক যে, প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধি নিজ-নিজ আসমানী গ্রন্থ হতে কিছু-কিছু অংশ মিটিংয়ে পড়ে শোনাবেন এবং পরে তার সারকথা পেশ করবেন। আমার এই প্রস্তাব সকলেই লুফে নেন এবং সমর্থন করেন। এই প্রস্তাবের পশ্চাতে একটি রহস্য নিহিত ছিল, যা তাদের কেউ ধরতে পারেনি।

পরের মাসে যখন মিটিং শুরু হয়, তখন অন্যান্য প্রতিনিধিগণ আমাকে বললেন, যেহেতু নিজ-নিজ ধর্মীয় গ্রন্থ হতে পড়ার প্রস্তাব আপনিই দিয়েছিলেন, তাই আপনিই শুরু করুন। আমি সূরা ফাতিহা পড়ে শোনালাম এবং ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে তার অর্থও পেশ করলাম। আমি সূরা ফাতিহা এ কারণে পড়ি যে, আসমানী কিতাবসমূহের সারবাত্তা রয়েছে পবিত্র কুরআনে। আর সমগ্র কুরআনের সারনির্যাস আছে সূরা ফাতিহায়। তাই আমি চিন্তা করলাম, সূরা ফাতিহা পড়া মানে সমগ্র কুরআনই তেলাওয়াত করা। তারপর আমাকে তারা কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। আমার উত্তর শুনে তারা শান্ত হলেন।

আমার পাশে ইহুদী পাদ্রী বসা ছিলেন। তিনি আমাকে সর্বদা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। আমার মাথায় প্রতিবার পাগড়ি বাঁধা থাকত। গায়ে জুব্বা থাকত এবং হাতে থাকত লাঠি। ইহুদী পণ্ডিত হয়ত মনে-মনে ভাবতেন, লাঠি তো হযরত মূসা (আ.)-এর উত্তরাধিকারী সম্পদ, এখন তা মুসলিম প্রতিনিধির হাতে কেন? এমনকি ইহুদী ধর্মগুরু এক দিন মুখ ফুটে বলেই ফেললেন-

You always come with a ditt erent respcctive look.

'আপনি সব দিন অনন্য ও বিশেষ ব্যক্তিরূপে শুভাগমন করেন।'

সুবহানাল্লাহ! তার এই মন্তব্য ছিল নবীজির সুন্নতের বরকতের ফল। ইহুদীদের এক বড় আলেম বলেছিলেন, 'জাদু মূলত সেটিই, যা মানুষের হৃদয় জয় করে নেয়।'

যাহোক, আমি সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত ও তার অর্থ বলা শেষ করলে আমার পাশের ইহুদী পণ্ডিত একটি ইংরেজি গ্রন্থ খুললেন এবং তা হতে পড়া শুরু করলেন। তিনি গ্রন্থটি পড়া শুরু করলে আমি বললাম, একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি বললেন, বলুন। আমি বললাম, বলুন তো হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছিল, তার ভাষা কী ছিল? ইহুদী বললেন, তাওরাত তো ইবরানী ভাষায় নাযিল হয়েছিল। আমি বললাম, আপনি তো ইংরেজি ভাষায় পড়ছেন, অথচ আমাদের মাঝে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আমাদের প্রত্যেকে তার আসমানী কিতাব হতে পড়ে শোনাবেন। আমার একথায় সভায় পিনপতন নীরবতা নেমে এল।

কিছুক্ষণ পর ইহুদী পণ্ডিত বললেন, আপনাকে একটি অতি বাস্তব কথা বলতে হয় যে, বর্তমান বিশ্বে যত ধর্মের লোক আছে, তাদের মধ্যে শুধু মুসলমানরাই এমন, যাদের নিকট খাঁটি আসমানী কিতাব আছে। অন্যদের নিকট আছে শুধু অনুবাদ। উপস্থিত সকলেই ইহুদী পণ্ডিতের কথা সমর্থন করলেন।

আল্লাহু আকবার! সে সময়ে আমার ঈমান এক লাফে অনেক গুণ বেড়ে যায় এই ভেবে যে, বর্তমানে পৃথিবীতে যেসব ধর্ম রয়েছে, তাদের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ এখানে উপস্থিত আর তারা সকলে মিলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, শুধু মুসলিমগণই এমন, যাদের নিকট তাদের রবের কিতাব হুবহু সংরক্ষিত আছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট খোদায়ী কালাম নেই। আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! বস্তুত এ কারণেই হযরত উমর (রাযি.) কুরআন মাজীদ বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন–

هٰذَا كَلَامُ رَبِّيْ هٰذَا كَلَامُ رَبِّيْ

'এটি আমার প্রভুর কিতাব, এটি আমার প্রভুর কিতাব।'

ডিপ্রেশন শব্দটা কোথা থেকে এল?

আজকাল কুরআন পড়া মুসলমানরাও বলে থাকে, কিছু ডিপ্রেশনের মধ্যে আছি। এই 'ডিপ্রেশন' মুসলমানদের শব্দ নয়। আমাদের আসলাফদের জীবনে এই ডিপ্রেশন হতো না। এ কারণে উর্দুতে এ শব্দের সমার্থক কোনো শব্দ নেই। এমনিভাবে আরবী ভাষাতেও নেই। এ কারণেই উর্দুতে ডিপ্রেশনের অর্থ ব্যক্ত করতে হলে ডিপ্রেশনই বলতে হয়। যেহেতু শব্দটি উর্দু ভাষারও নয় এবং আরবী ভাষারও নয়, তাই প্রশ্ন হয়, শব্দটি এলো

কোত্থেকে? এর উত্তর হলো, এটা যাদের ভাষার শব্দ, তাদের জীবনেই কেবল ডিপ্রেশন হয়। সেখান থেকে আমাদের মাঝে ব্যবহৃত হচ্ছে। (বাংলায় এর অর্থ অবসাদ বা ঝিমিয়ে পড়া।) পবিত্র কুরআন হতে বিমুখ হওয়ার কারণে শব্দটি আমাদের জীবনেও চলে এসেছে। মূলত যার সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে থাকে, পেরেশানি-উদ্বেগ তার কাছে ভিড়তে পারে না। মনোযোগ দিয়ে শুনুন, আল্লাহপাক বলছেন–

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

'জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণে চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে।'[১]

দিলে আল্লাহর স্মরণ থাকলে পরে মানুষের মাঝে কোনোই পেরেশানি থাকে না। আমাদের উদ্বেগ-টেনশনের মূল কারণ আমরা নিজেরাই। এটা আমাদের হাতের কামাই। কুরআন শরীফ আছে; অথচ আমরা তা পড়ি না। কুরআন পড়ার কথা বলা হলে উত্তর আসে, সময় হয় না। আমরা বড়ই সৌভাগ্যবান যে, আমাদের কাছে কুরআন আছে। দুনিয়াতে এমন লোকও আছে, যাদের কাছে এই নেয়ামত নেই।

কুরআনের সন্ধানে এক রুশ মহিলা

১৯৯২ সনে আমার তাসখন্দে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। একদিন সেখানকার একটি স্থান অতিক্রমকালে এক মহিলা দ্রুতপদে হেঁটে আমার নিকটে এল এবং বলল–

Are you Muslim?

'আপনি কি মুসলমান?'

আমি বললাম, হাঁ, আমি মুসলমান।

মহিলা বলল–

Do you huve a Quran?

'আপনার কাছে কুরআন মাজীদ আছে কি?'

আমি বললাম, জি, আমার কাছে কুরআন শরীফ আছে। সফরে একটি ছোট সাইজের কুরআন শরীফ বুকের কাছে রাখি।

মহিলা বলল, কুরআন শরীফটি কি আমি একটু দেখতে পারি? আমি বললাম, অবশ্যই। এই নিন; দেখুন।

---

১. সূরা রা'দ : আয়াত ২৮

মহিলা আমার হাত থেকে কুরআন শরীফ নিয়ে তাতে চুমো খেল এবং চোখে, মুখে ও বুকে লাগাল। যুবতীর অবস্থা ছিল অনেকটা পাগলের মতো। আমি কিংবাকবিমূঢ় হয়ে যুবতীর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখছিলাম। মহিলা স্বাভাবিক হলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কুরআন শরীফটি এখনও ফেরত না দেওয়ার কারণ কী?

মহিলা বলল, আমিও মুসলমান। আমার বয়স ৩৯ বছর। আমি আমার জীবনে এই সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ দেখলাম।

মহিলার কথা শুনে আমার ভেতরে এই ভেবে তোলপাড় সৃষ্টিট হলো যে, হে আল্লাহ! আমরা তোমার বিরাট নেয়ামতের মধ্যে আছি। কেননা, আমরা মসজিদে গেলেও কুরআন দেখতে পাই। মাদরাসায় গেলেও কুরআন দেখি। আমাদের ঘরেও কুরআন শরীফ বিদ্যমান। এমনকি দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও কুরআন থাকে। আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! সর্বত্র এই কুরআনের বরকত দ্বারা কেবল মুসলমানরাই উপকৃত হচ্ছে তা নয়; বরং পবিত্র কুরআন অমুসলিম পরিবারেও বিপ্লব সৃষ্টি করছে।

এক হিন্দু পরিবারের ইসলাম গ্রহণের আজব ঘটনা

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের এক হিন্দু যুবকের মুসলমান হওয়ার আজব ঘটনা শুনুন। হিন্দু যুবক এক সময়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। ডাক্তারগণ তাকে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত আখ্যা দিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। যুবকের বয়স ছিল ৪০ কি ৪২ বছর। হাসপাতাল থেকে ফেরৎ আসার পর যুবক উদাসভাবে সময় কাটাতে থাকে। ক্ষণে-ক্ষণে তার এই চিন্তাই হতো যে, আমি আর ক-দিনের মুসাফিরমাত্র। তারপর আমি মারা যাব।

একদিন তার স্ত্রী তার পাশে বসা ছিল। স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ভালোবাসাপূর্ণ কথাবার্তা বলছিল। কিন্তু স্ত্রীর ভালোবাসায় সে সিক্ত হয় না। সে নিরাশার কণ্ঠে জানাল, আমরা অচিরেই একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে যাব। কেননা, আমার সুস্থতার আর কোনোই সম্ভাবনা নেই।

স্ত্রী বলল, যদি আপনি আমাকে কথা দেন, আমি যা বলব, আপনি তা শুনবেন, তাহলে আমি আপনাকে একটি জিনিস খাওয়াব। আশা করি, আপনি তাতে পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

স্বামী বলল, আমার রোগের ঔষধ যখন হাসপাতালেও নেই, তখন তুমি আর কী-ইবা আমাকে খাওয়াবে?

স্ত্রী বলল, আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন?

স্বামী বলল, বাসি, অবশ্যই ভালোবাসি।

স্ত্রী বলল, সত্যিই যদি আপনি আমাকে ভালোবাসেন, তাহলে আপনি ওয়াদা দিন। আপনি পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন। তারপর আমরা একসঙ্গে সুখের দীর্ঘ জীবন পার করব। আপনি ওয়াদা করুন। আমি যা বলব, আপনি তা মেনে নিবেন। স্বামী বলল, আমি তো তোমার কথা এমনিতেই শুনি। আগের যুগে পশুর গলায় দড়ি লাগিয়ে তাকে পিছনে রেখে সামনে থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানের যুবকরা এমন স্ত্রীভক্ত হয় যে, স্ত্রী তাদেরকে সামনে থেকে টানে আর তারা স্ত্রীদের পেছনে-পেছনে চলে।

যাহোক, এক পর্যায়ে স্বামী ওয়াদা করল, সে সুস্থ হলে স্ত্রী যা বলবে, তা-ই মানবে। তারপর স্ত্রী স্বামীর সামনে একটি চেয়ার পেতে বসল। তার কাছে একটি জগে পানি ছিল। সে কী যেন পড়ে পানিতে বারবার ফুঁ দিচ্ছিল। ঝাড়-ফুঁক শেষ হলে স্ত্রী স্বামীকে জগ থেকে কিছু পানি পান করাল। তারপর যখনই স্বামীর পানির চাহিদা হতো, স্ত্রী ওই জগ থেকে পড়া পানি ঢেলে তাকে খাওয়াত।

আল্লাহর বিরাট শান যে, হিন্দু যুবক পড়া পানি কয়েকদিন পান করার পর নিজেকে সুস্থ বলে মনে হতে লাগল। সে ল্যাবরেটরীতে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখল, তার ব্লাডক্যান্সার আর নেই। এক পরীক্ষায় তার বিশ্বাস হলো না। যুবক স্ত্রীকে ঘটনা খুলে বললে স্ত্রী জানাল, তাহলে আরেক ক্লিনিকে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখুন। স্বামী আরেকটি ল্যাবরেটরীতে গেল এবং পরীক্ষা করাল। সেখান থেকেও একই ফল বের হলো যে, দেহে ব্লাডক্যান্সারের জীবাণু নেই। যুবক বিস্মিত হলো।

যুবক দ্বিতীয় রিপোর্ট নিয়ে ঘরে ফিরে স্ত্রীকে বলল, আমার রোগ সত্যই সেরে গেছে এবং আমিও দৈহিকভাবে আগের থেকে সুস্থতা অনুভব করছি। কিন্তু সত্য করে বলো তো, ঘটনাটা কী? কীভাবে এটা হলো?

স্ত্রী বলল, আগে আপনি আপনার ওয়াদা পূরণ করুন, যা আপনি ইতিপূর্বে আমার সঙ্গে করেছিলেন। তারপর সব খুলে বলব। স্বামী বলল, বলো, তুমি কী চাও বা তোমার দাবি কী? তুমি যা বলবে আমি তা পূরণ করব।

স্ত্রী বলল, আপনি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।

স্ত্রীর এই কথা শুনে যুবক আকাশ থেকে পড়ল। সে অনেক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি বলছ কী?

স্ত্রী বলল, আমি আপনার স্ত্রী। আপনি সুস্থ হয়ে গেছেন, আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন, আমি যা বলব, তা রাখবেন। অতএব, এখন আপনার ওয়াদা পূরণ করুন এবং কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।

স্বামী বলল, আমার কল্পনাতেও আসেনি, তুমি এমন প্রস্তাব দিবে!

স্ত্রী বলল, আপনার কথা সত্য। কিন্তু এখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ওয়াদা তাড়াতাড়ি পূরণ করুন।

স্বামী বলল, তবে তুমিও কি মুসলমান?

স্ত্রী বলল, হাঁ, আমি মুসলমান।

স্বামী বলল, তোমার পিতা তো এত কট্টর হিন্দু যে, তিনি অন্যদেরও হিন্দু বানান। এখন যদি তিনি জানতে পারেন, তুমি মুসলমান হয়ে গেছ, তাহলে তিনি তোমাকে কচুকাটা করবেন। তুমি এমন কট্টর হিন্দুর ঘরে জন্মে কীভাবে মুসলমান হলে?

স্ত্রী বলল, এ এক লম্বা কাহিনী। পরে এক সময় শোনাব। এখন আপনি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।

যুবক স্ত্রীর কথায় এমনভাবে কাবু হয়ে গেল যে, তাকে কালেমা পড়তেই হলো। আলহামদুলিল্লাহ! যুবক এক সময় কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। তারপর যুবক স্ত্রীকে বলল, এবার খুলে বলো, মূল ঘটনাটা কী? স্ত্রী তখন তার মুসলমান হওয়ার গোপন ঘটনা এমনভাবে বর্ণনা করল, যা সম্পূর্ণ বিস্ময়কর বটে।

স্ত্রী বলল, শৈশবে যখন আমি স্কুলে পড়তাম, তখন আমার ক্লাসে একটি মুসলিম মেয়ে পড়ত। ক্রমে সে আমার বান্ধবীতে পরিণত হলো। মেয়েটি আমাদেরই পল্লীতে থাকত। আমি বিকালবেলা বান্ধবীর বাড়ি খেলা করতে যেতাম। তার আম্মা মুসলিম মেয়েদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। আমার বান্ধবীও তার মায়ের কাছে কুরআন পড়ত। যেহেতু সে আমার ঘনিষ্ট বান্ধবী ছিল, তাই সে যখন তার সবক (পড়া) মুখস্থ করত, তখন আমিও তার পাশে বসতাম। আমার মেধাও ছিল ভালো। ফলে বান্ধবীর সবক মুখস্থ হতে-হতে আমারও মুখস্থ হয়ে যেত। যখন সে তার মাকে সবক শোনাত, তখন আমিও তাকে বলতাম, খালাম্মা! আমিও শোনাব। তখন তিনি আমার সবকও শুনতেন।

খালাম্মা কয়েকদিন আমার আগ্রহ দেখে আমাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি যখন প্রতিদিন খেলা করতে আস, তখন প্রতিদিনই মুখস্থ করার এই ধারা

অব্যাহত রাখো। যেহেতু সে ছিল আমার ক্লাসমেট, তাই আমি বললাম, ঠিক আছে; তা-ই হবে।

আমি সম্মতি জানালে খালাম্মা আমাকে বললেন, খবরদারবেটি! একথা কাউকে বলবে না কিন্তু। আমি বললাম, তা-ই হবে; আমি কাউকে বলব না। এভাবে আমি দীর্ঘ দুবছর পর্যন্ত বান্ধবীর বাড়ি আসা-যাওয়া করি এবং কুরআনও পড়তে থাকি। যেভাবে তার মেয়ে কুরআন নাজেরা পড়া পরিপূর্ণ করেছিল, তেমনি আমিও তার সঙ্গে পূর্ণ কুরআন পড়ি।

আমি পূর্ণ কুরআন পড়ে খালাম্মাকে বললাম, খালাম্মা! অন্য মেয়েরা তো নিজ-নিজ বাড়িতে কুরআন পড়ে, কিন্তু আমি তো আমাদের বাড়িতে পড়তে পারি না। তিনি বললেন, কুরআন শরীফে الم نشرح নামে একটি সূরা আছে। এই সূরা পড়ে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির উপর দম করলে অথবা পানিতে ফুঁ দিয়ে তাকে খাওয়ালে সে ভালো হয়ে যায়। আমলটির কথা আমাকে এক বুযুর্গ বলেছেন। আমি তোমাকে আমলটির কথা বলে দিলাম। এটা মনে রাখবে, জীবনে কখনো না কখনো তোমার কাজে আসবে। খালাম্মা আমাকে এ ধরনের অনেক কথা শোনাতেন।

এক সময় আমি বড় হলাম। আমার বিবাহের সময় ঘনিয়ে এল। এ সময় একদিন আমি খালার বাড়ি যাই এবং তার কাছে বসে খুব কান্নাকাটি করি। আমি বললাম, খালাম্মা! আপনার মেয়ে আমার বান্ধবী ছিল। এর সুবাদে আপনার এখানে আমি আসা-যাওয়া করতাম। এই বাহানায় আমি পবিত্র কুরআনও শিক্ষা করেছি। আপনি আমাকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমানও বানিয়েছেন। অন্তর থেকে তো আমি মুসলমান হয়ে গেছি। কিন্তু এখন যেখানে আমার বিবাহের কথা চলছে, সেখানে আমি আমার ঈমানের কথা না প্রকাশ করতে পারব, না আমার নিকট সেখানে কুরআন থাকবে। সেখানে গিয়ে আমার কী হবে?

খালাম্মা বললেন, বেটি! পেরেশান হয়ো না। আমি কোনো এক উপায়ে উপঢৌকনের সাথে তোমার কাছে এক কপি কুরআন পাঠিয়ে দেব। আমি বললাম, তাহলে তো বিষয়টি খুবই মজার হবে! তিনি আমার মায়ের কাছে সংবাদ পাঠালেন, আপনার মেয়ে আমার মেয়ের বান্ধবী। আমার মেয়ে তার বন্ধবীর বিয়েতে কিছু পোশাক হাদিয়া দিতে চায়। অনুমতি দিলে আমি এর ব্যবস্থা করব। আমার পিতামাতার কল্পনাতেও ছিল না, তিনি কৌশলে কী করতে চান। ফলে তারা চিন্তা করলেন, তারা দুজন প্রাইমারী হতে কলেজ

পর্যন্ত ঘনিষ্ট বান্ধবী এবং তারা দুজন খুব অন্তরঙ্গ, তাই তারা উপহার দেওয়ার অনুমতি প্রদান করে। খালাম্মা আমার জন্য সাত সেট পোশাক বানিয়ে দেওয়ার কথা তাদের জানালেন।

খালাম্মা আমার জন্য খুবই দামী পোশাক বানালেন। তিনি পোশাকগুলো অভিনব পন্থায় গিফটপ্যাকেটে মুড়িয়ে দিলেন এবং মধ্যখানে কুরআন শরীফও প্যাকিং করে আমাদের ঘরে পৌঁছিয়ে দিলেন। তিনি এও বলে দেন যে, আমরা পোশাকগুলো যত্নসহকারে গিফটপ্যাকেটে মুড়ে দিয়েছি। আপনারা প্যাকেটটি এখানে খুলবেন না; বরং আপনাদের মেয়ে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে পরে খুলবে, যাতে তার স্বামীও উপহারগুলো দেখে খুশি হয়।

খালাম্মার কথা আমার পিতামাতার খুব পছন্দ হলো। সুতরাং তারা গিফটপ্যাকেট দেখে বলল, সত্যই গিফটপ্যাকেটটি সুন্দর লাগছে। আমাদের মেয়ে শ্বশুর বাড়ি গিয়েই এটি খুলবে।

স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, আমি যখন সর্বপ্রথম আপনাদের বাড়িতে এলাম, তখন সর্বাগ্রে এই কাজ করি যে, যে রুমে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আমি সেখানে গোপনে কুরআন শরীফটি খুলে কোথাও লুকিয়ে ফেলি। প্রতিদিন আপনি অফিসে চলে গেলে আমি কুরআন শরীফ পড়তাম। যখন আপনার আসার সময় ঘনিয়ে আসত, তখন আমি সেটি ভালোভাবে লুকিয়ে রাখতাম, যাতে আপনার চোখে না পড়ে। জীবনের এতগুলো বছর আমি আপনার থেকে আমার ঈমান লুকিয়ে রেখেছি। তারপর আপনি অসুস্থ হলেন। কোনো ঔষধে কাজ হলো না। আমার অন্তরে স্থির বিশ্বাস ছিল যে, যেখানে ঔষধে কাজ হয় না, সেখানে আল্লাহর কালাম ফল দেয়। আল্লাহ তা'আলা নিজেও এই কুরআনের মধ্যে বলেছেন–

شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ

'পবিত্র কুরআন অন্তরের রোগের মহৌষধ।'[১]

স্ত্রী বলল, যখন আপনি স্বীয় জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং আপনি আমাকে বললেন, আমি মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেছি, তখন আমি আপনার থেকে ওয়াদা নিই, আপনি যদি আমার কথা মানেন, তাহলে আমি আপনাকে এক বিশেষ পানি পান করাব। আপনি আমার কথা মেনে নিন। ফলে আমি الم نشرح সূরা পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে আপনাকে পান করাই।

---

১. সূরা ইউনুস : আয়াত ৫৭

আল্লাহ তার কালামের উসিলায় আপনাকে সুস্থতা দান করেছেন। আমি আগেই কালেমা পড়ে মুসলমান ছিলাম আর এখন আপনিও মুসলমান হয়ে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নতুন জীবন দান করেছেন। এখন আপনি আল্লাহর দেওয়া এ জীবন দীনের জন্য ব্যয় করুন। আল্লাহু আকবার!

কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় মোজেযা

আমার বন্ধুগণ!

আমরা কুরআন শরীফের বরকত সম্পর্কে অবগত নই। আমরা যদি এর বরকতসমূহ জানতাম, তাহলে নিজেদের ধন্য মনে করতাম এই ভেবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই নেয়ামত দুনিয়াতেই প্রদান করেছেন। এটি এমন এক মহা নেয়ামত, যা সর্বক্ষণ আমাদের নিকট বিদ্যমান। পবিত্র কুরআন একটি বিরাট মোজেযা! এটি মুখস্থ করতে পারা বড়ই সৌভাগ্য ও রহমতের ব্যাপার। ছোট-ছোট বাচ্চারাও কুরআন মুখস্থ করে ফেলে। সারা বিশ্বে দ্বিতীয় আর কোনো গ্রন্থ এমন নেই, যার হাফেয দুনিয়াতে বিদ্যমান।

কুরআনের ফয়েজ বক্ষে-বক্ষে

আমার এক বন্ধু ছিলেন করাচির স্টীলমিলের ইঞ্জিনিয়ার। তিনি সচ্চরিত্রবান ও শরীয়তের পাবন্দ ছিলেন। যেহেতু স্টীলমিল রুশ সরকারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই তিনি ১৯৭৩ সনে ট্রেনিং নিতে মেহমান হিসেবে মস্কো যান। তখন কমিউনিজমের উত্থানের যুগ ছিল। এমনকি বিশ্ব এমনও বলত যে, এবার পূর্ণ এশিয়া লালে লাল হয়ে যাবে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজে আমাকে ঘটনা শুনেয়েছেন, কয়েকদিন পরেই সেখানে জুমুআর দিন আসে। আমি সফরসঙ্গীদের বলি, আমাকে মসজিদে যেতে হবে। আমি জুমুআর নামায মসজিদেই পড়ব। তারা বলল, এখানে মসজিদ কোথায় পাবে? মসজিদগুলোকে তো সব গুদামে পরিণত করা হয়েছে। দু-একটি মসজিদ পর্যটকদের জন্য খোলা রাখা হয়েছে। আর যেসব মসজিদ খোলা রাখা হয়, তাও সবসময় খোলা থাকে না। কখনো খোলা হয়, কখনো বন্ধ থাকে। আমি বললাম, আমাকে সেই মসজিদের ঠিকানা দিন।

যাহোক, আমি ঠিকানা জেনে এক মসজিদের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারি, মসজিদের নিকটে অবস্থানরত একব্যক্তির কাছে মসজিদের চাবি রয়েছে। সে-ই মসজিদ খোলে। আমি তার কাছে গেলাম এবং বললাম, মসজিদ খুলুন; আমি নামায পড়ব। তিনি বললেন, আমি

মসজিদ খুলে দিচ্ছি। পরে আপনি যা করবেন তার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনার। আপনাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে আমার কোনো দায়ত্ব থাকবে না। আমি বললাম, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এখানে পালিয়ে আসিনি; বরং আমি এ দেশের মেহমান। আমি আমার দেশে যেমন মুসলমান ছিলাম, এখানেও তেমন আছি। সেখানেও নামায পড়তাম, এখানেও পড়ব। আমাকে ঠেকাবে কে?

আমার কথা শুনে লোকটি ভীষণ তাজ্জব হলো এবং মসজিদ খুলে দিল। আমি ঢুকে মসজিদ পরিষ্কার করি। মসজিদে আর কেউ ছিল না, যার কারণে জুমুআর নামায না পড়তে পারলেও জোহরের নামায আদায় করার সুযোগ ছিল। ফলে জোহরের সময় হলে আমি খুব উচ্চ গলায় আযান দিলাম। আমার আযান শুনে মসজিদের আশপাশের বাড়ি-ঘর হতে পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চারা মসজিদে ছুটে এল। তারা আমার কাজকর্ম বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখছিল। আমি নামায পড়লাম আর তারা দূরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাকে এমনভাবে দেখছিল, যেন কোনো নতুন বিষয় দেখছে।

আমি নামায শেষ করে যখন চলে যেতে উদ্যত হই, তখন একটি ছিলে এসে বলল, আমাদের ঘরে এসে একটু চা পান করে যান। আমি ছেলেটির সরলতায় মুগ্ধ হয়ে তার দাওয়াত কবুল করলাম। ছেলেটি আমাকে তাদের মেহমানখানায় নিয়ে গেল। আমি দেখলাম, সেখানে দস্তারখান পাতা রয়েছে। তাতে বিভিন্ন ফল-ফলাদির সমাহার। মহিলারা খানা নিয়ে এল। সঙ্গে চা-ও। আমি সেখানে গেলে যেন তাদের ঘরে ঈদের আমেজ নেমে এল। শিশু থেকে নিয়ে বৃদ্ধরা পর্যন্ত সকলেই অনিন্দিত। আমি সামান্য কিছু খাই। বাড়ির পুরুষরাও আমার সঙ্গে খায়। তারপর আমরা সেখানে বসে বিভিন্ন আলাপ করি। ছোট বাচ্চারা আমার নিকটে এসে বসে পড়ে। তাদের পেছনে পুরুষরা ছিল। সবশেষে মহিলারা দাঁড়িয়ে ছিল।

একটি ছোট বাচ্চা আমার একেবারে নিকটে বসা ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কুরআন শরীফ পড়তে পার? বাচ্চাটি ইশারায় ইতিবাচক জবাব দিল। আমার পকেটে ছোট সাইজের এক কপি কুরআন ছিল। আমি সেটা খুলে বাচ্চার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম, এখান থেকে পড়ো। বাচ্চাটি একবার কুরআনের দিকে তাকায় আর একবার আমার চেহারার দিকে তাকায়। আমি ভেবে হয়রান হই যে, সে বলেছে, আমি কুরআন পড়তে পারি; অথচ পড়ছে না; ব্যাপার কী?

তৃতীয়বার আমি তাকে বললাম, পড়ো না এখান থেকে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

আমি আয়াতের শুরুটা পড়তেই বাচ্চাটি তৎক্ষণাৎ পড়া শুরু করে দিল এবং সে কুরআন শরীফের দিকে না তাকিয়েই পড়তে থাকল। এ ঘটনায় আমি আরও বেশি তাজ্জব হই। আমি বড়দের জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপার কী? উত্তরে ছেলেটির পিতা মুচকি হেসে বলল, আসল কথা হলো, আমাদের নিকট কুরআন শরীফ নেই। যদি কারো ঘরে এক কপিও কুরআন পাওয়া যায়, তাহলে সেই ঘরের ছোট-বড় সবাইকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। এ কারণে আমরা আমাদের নিকট কুরআন শরীফ রাখতে পারি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আপনারা কী করেন? লোকটি জবাব দিল, আমাদের মধ্যে যেসব লোক আগের থেকে হাফেয রয়েছেন, তাদের কেউ-কেউ দর্জির কাজও করে। কেউ অন্য কাজ করে। আমরা এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করি যে, বাচ্চাদের দর্জি ইত্যাদির কাজ শেখানোর জন্য হাফেযদের কাছে পাঠাই। তারা সেখানে কাজকর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন কিছু-কিছু করে কুরআন শরীফ মুখে-মুখে মুখস্থ করে। এভাবে বাচ্চারা অন্ধের মতো পড়ে। পরিশেষে এক সময় এমন হয় যে, বাচ্চারা পুরো কুরআন হেফয করে ফেলে। মুখে-মুখে পড়ার কারণে তারা কুরআন মাজীদ দেখে পড়তে পারে না।

বস্তুত এ কারণেই আপনি যখন বাচ্চাটিকে কুরআন খুলে দিয়ে পড়তে বললেন, তখন সে পড়তে পারেনি। কারণ, সে জানে না, কোথায় কোন আয়াত লেখা আছে। কখনো সে কুরআন শরীফই দেখেনি, তাহলে দেখে পড়বে কীভাবে? কিন্তু যখন আপনি আয়াতটি পড়লেন, তখন সে বুঝতে পারল, কোথা থেকে পড়তে হবে। আপনি শুনতে চাইলে বাচ্চাটি পুরো কুরআন আপনাকে মুখস্থ শুনিয়ে দিতে পারবে। সুবহানাল্লাহ!

হযরত বলেন, ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু আমাকে বললেন, কুরআন মাজীদ যে একটি পুরোপুরি মোজেযা, তা সেদিন আমি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি। আর তা এভাবে যে, সরকার কুরআন মাজীদের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে, যার ফলে মানুষ কুরআন শরীফ চোখে দেখার সুযোগ পায় না এবং সেখানে চোখ দিয়ে দেখে পড়ার মতো একজনও নেই; কিন্তু তারপরও সেখানে কুরআনের হাফেয বিদ্যমান। আল্লাহু আকবার! এই ভেবে আমি মনে-মনে বলি, হায়রে সরকার! তোমরা কুরআন মাজীদের উপর নিষেধাজ্ঞা

আরোপ করে মানুষের চোখ থেকে কুরআন শরীফ উঠিয়ে নিয়েছ; কিন্তু সেই কুরআন মানুষের অন্তরে-অন্তরে বিদ্যমান, সেখানে কীভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে?

বাস্তবেই কুরআন একটি জ্বলন্ত ও প্রকাশ্য মোজেযা। যেসব দেশে কুরআন শরীফ রাখার অনুমতি নেই, সেসব দেশেও মানুষ কুরআন শরীফ হিফজ করে-করে বক্ষ হতে বক্ষে নিয়ে ফিরছে। এভাবেই তারা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে কুরআন সরবরাহ করে চলেছে!

এ কেমন ইনসাফ?

আমরা অবশ্যই সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহপাক আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের মতো নেয়ামত ঘরে-ঘরে প্রদান করেছেন। যখনই চাই আমরা তা পড়তে পারি। আল্লাহপাকের এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত এবং পবিত্র কুরআন প্রতিদিন পড়াকে নিজেদের উপর আবশ্যক করে নেওয়া দরকার, যেন একটা দিনও তেলাওয়াত ব্যতীত না কাটে।

উদাহরণস্বরূপ আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি আপনার পীর ও শায়েখের ছেলে আপনার বাড়িতে মেহমান হয় আর আপনি যদি কোনোদিন তার ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা না করেন, তাহলে আপনার মনে প্রশ্ন জাগবে, শায়েখ একে কেমন মনে করবেন এবং শায়েখের সন্তানইবা কী ভাববে? যদি শায়েখের সন্তান আপনার ঘরে অনেক দিন থাকে আর আপনি তার খোঁজখবর না নেন, তাহলে আপনার মধ্যে এই অপরাধবোধ জাগ্রত হবে যে, শায়েখের সন্তানের সঙ্গে আমার এহেন আচরণ করা মোটেই ঠিক হয়নি। এর দ্বারা তার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। তাকে এক ধরনের অপমান করা হয়েছে।

যদি পীর-মুরশিদের সন্তান ঘরে এলে তার খোঁজখবর না নেওয়ায় নিজেকে লজ্জিত ও অপরাধী বলে মনে হয়, তাহলে যে কুরআন শরীফ আল্লাহর কালাম এবং তা আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের কাছে মেহমানস্বরূপ রয়েছে, সারাদিনে একবারও যদি তার খোঁজ না নিই, তেলাওয়াত না করি, তাহলে এ কেমন ইনসাফ হবে? নিশ্চয় এ কুরআনের প্রতি বিরাট অবিচারমূলক আচরণ হবে।

কেয়ামত ঘনিয়ে আসার একটি আলামত

এটি আল্লাহপাকের বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের মাঝে এখনও কুরআন রেখেছেন। কেয়ামত ঘনিয়ে আসার একটি আলামত হলো, কুরআন

শরীফ উঠিয়ে নেওয়া হবে। আমাদের কর্তব্য হলো এই চিহ্নিত সময় আসার আগেই কুরআন মাজীদের মূল্যায়ন করা।

আল্লাহপাকের মহা অনুগ্রহ যে, তিনি রমযান মাসে আমাদেরকে পবিত্র কুরআন শোনার তাওফীক দিয়েছেন। এর জন্য আমরা যত শুকরিয়া আদায় করি-না কেন, তা অবশ্যই কম হবে।

চিন্তার বিষয়!

সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলি! আজ ২৯ রমযানের রাত। হতে পারে এটিই এই রমযানের শেষ রাত। যদি বাস্তবিকই এটি শেষ রাত হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের ওই হাদীছের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করা দরকার, যাতে বলা হয়েছে, ধ্বংস হোক সেই লোক, যে রমযান পেল; অথচ নিজেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত বানাতে পারল না।

আমরা কি আল্লাহর নিকট সত্যিকারভাবে ক্ষমা চেয়েছি?

আমরা কি আমাদের গুনাহ মাফ করাতে পেরেছি?

যদি এখনও আমাদের গুনাহ না মাফ হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের জন্য বিপদঘণ্টা বাজছে। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। যেভাবে বিগত ২৮ দিন অতিক্রান্তের খবর আমাদের নেই, তেমনি সামনের ২৮ ঘণ্টার অতিবাহিত হওয়ার পরও খবর আমাদের থাকবে না। আজকের রাতটি চলতি রমযানের শেষ বেজোড় রাত। আমাদের কর্তব্য হলো এই রাতে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর সঙ্গে নয়াচুক্তি সম্পাদন করা। আমরা অতীতে আল্লাহর বহু অবাধ্যতা করেছি। ক্ষণে-ক্ষণে গুনাহ করেছি। সত্য কথা হলো, আমরা লাফিয়ে-লাফিয়ে গুনাহ করেছি আর আল্লাহপাক বিভিন্ন পেরেশানি দিয়ে আমাদেরকে মসজিদে টেনে এনেছেন। মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় মসজিদের কথা স্মরণ করে না; মসজিদে আসে না। কিন্তু-

আল্লাহ যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে লস করে দেন, তখন মসজিদে আসে।

স্ত্রীকে অসুস্থ করে দেন, তখন মসজিদে আসে।

বিভিন্ন বিপদাপদে ফেলেন, তখন মসজিদে আসে।

আল্লাহপাক অতি মহান, যিনি পেরেশানির রশিতে বেঁধে-বেঁধে আমাদের ঘর থেকে বের করে মসজিদে নিয়ে যান। পেরেশান করার দ্বারা উদ্দেশ্য শাস্তি দেওয়া নয়; বরং তাঁর ঘরের (মসজিদের) কথা স্মরণ করানোই উদ্দেশ্য।

মোটকথা, আল্লাহপাকের রহমতে আমরা পবিত্র রমযান মাসে তাঁর ঘরে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমরা তারাবীহর নামাযও পড়েছি এবং কুরআন তেলাওয়াতও শুনেছি। আজকের রাত শেষ রাত। এরাতে আল্লাহর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হোন এবং নিজেদের গুনাহ মাফ করিয়ে নিন। হয়ত আজকের রাতটি আমাদের জন্য 'গোল্ডেন চান্স' বা 'সুবর্ণ সুযোগ' হবে অথবা আমাদের জন্য 'লাস্ট চান্স' বা 'শেষ সুযোগ' হবে।

গুনাহ ও অপবিত্রতা

একটি কথা মনে রাখবেন, গুনাহ হলো নাপাকির মতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

'নিশ্চয় মুশরিকরা অপবিত্র।'[১]

মুশরিক যদি ৭০ বারও গোসল করে, তবুও সে নাপাকই থাকবে। অথচ তার শরীরে নাপাকের কোনো দুর্গন্ধ থাকে না। বরং সুগন্ধি ও সেন্টের সৌরভ বের হয়। তারপরও কুরআন তাকে নাপাক বলেছে। কিন্তু কেন? নাপাকের উৎস কী? আর তা হলো শিরকের নাপাকি। আয়াতে মুশরিকের শিরককেই চরম নাপাক বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ঠিক এমনিভাবে অন্য যতসব গুনাহ আমরা করি প্রত্যেকটি গুনাহই নাপাকির মতো। যে অঙ্গ দ্বারা গুনাহ হয়, সেই অঙ্গটি গুনাহের দরুন নাপাক হয়ে যায়। যেহেতু গুনাহ মানুষকে নাপাক করে দেয়, তাই গুনাহগার নাপাক মানুষের পক্ষে আল্লাহর মতো পূতঃপবিত্র সত্তার নৈকট্য হাসিল করা সম্ভব হয় না। তাই যদি আমরা সমস্ত গুনাহ হতে খাঁটি তাওবা করি, তাহলেই কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভে আমরা ধন্য হব; অন্যথায় নয়।

এটি কুরআন খতমের মজলিস ছিল। আমি পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই উপস্থিতভাবে কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করলাম। আমি বয়ান শুরুর আগে নিয়ত করেছিলাম, হে আল্লাহ! যেসব কথা মজলিসের লোকদের জন্য বেশি উপকারী হয়, তা-ই যেন আমার মুখ থেকে বের হয়। আল্লাহর তাওফীকে কিছু কথা বললাম। আল্লাহপাকের কাছে আমরা দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের–

---

১. সূরা তওবা : আয়াত ২৮

* পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াতকারী বানান।
* পবিত্র কুরআনের হাফেয বানান।
* পবিত্র কুরআনের আলেম বানান।
* পবিত্র কুরআনের আমেল (আমলকারী) বানান।
* পবিত্র কুরআনের দায়ী (প্রচারক) বানান।
* পবিত্র কুরআনের নাশের (প্রকাশক) বানান।
* পবিত্র কুরআনের আশেক (প্রেমিক) বানান।

শুধু তা-ই নয়; বরং পবিত্র কুরআনকে আমাদের সারা জীবনের পেশা ও নেশা বানিয়ে দিন। আমীন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ

'হে আল্লাহ! কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দিন।'

এই দু'আও আমরা করি। বিশেষত এই দু'আ করি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে খাঁটি তাওবা করে নিষ্পাপ হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

'মনে রেখো, কেবল আল্লাহর যিকিরই সেই জিনিস, যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।' –সূরা রা'দ : ২৮

শান্তির ঠিকানা

[১৪২২ হিজরীর ১ শাওয়াল মোতাবেক ২০০১ সনের ১৫ ডিসেম্বর (ঈদের রাতে) মসজিদে নূর লোসাকায় (জাম্বিয়ায়) হযরতওয়ালা দামাত বারাকাতুহুম এতেকাফ শেষে এই গুরুত্বপূর্ণ বয়ানটি পেশ করেন। মজলিসে বহু মুতাকিফ, ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।]

'আল্লাহর যিকিরের মধ্যে এক ধরনের আত্মসমর্পণ রয়েছে। এই আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মানুষের বিষাদ দূর হয়, যার ফলে মানুষের অন্তর শান্তিতে কানায়-কানায় ভরে যায় এবং মানুষ পর্যায়ক্রমে আল্লাহর মহব্বতের পানে এগিয়ে যেতে থাকে। এ কারণে বেশি-বেশি যিকির করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যদি আমরা অধিকহারে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আল্লাহর যিকির করি, তাহলে আমরা দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানে উপকৃত হব। বিষয়টি বর্তমানে বিজ্ঞানের আলোকেও সুপ্রমাণিত। নবীজিও বলে গেছেন–

ذِكْرُ اللّٰهِ شِفَاءُ الْقُلُوْبِ

'আল্লাহর স্মরণ অন্তরের নিরাময়।''

শান্তির ঠিকানা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا. وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَاَصِيْلًا.

وَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ: وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অন্তরের শান্তির অব্যর্থ প্রেসক্রিপশন

জনৈক কবি অতি উত্তম বলেছেন–

کتنی تسکین وابستہ ہے ترے نام کے ساتھ

نیند کانٹوں پہ بھی اجاتی ہے ارام کے ساتھ

কত শান্তি আছে জড়িয়ে তোমার নামের সাথে,

কাঁটার বিছানাতেও ঘুম আসে পরম আরামের সাথে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্মরণে এমন মজা ও স্বাদ রয়েছে, যাতে মানুষের সকল টেনশন দূর হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

'মনে রেখো, কেবল আল্লাহর যিকিরই সেই জিনিস, যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।'[১]

---

১. সূরা রা'দ : আয়াত ২৮

এক কবি বিষয়টি সুন্দরভাবে এভাবে চিত্রিত করেছেন-

نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے
تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

আল্লাহর স্মরণের মাঝেই রয়েছে হৃদয়ের সকল শান্তি,
টাকা-পয়সা, ঘর-বাড়ি আর দুনিয়া বাড়ায় শুধু ক্লান্তি।

দুটি অসীম বস্তু

কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন দ্বারা জানা যায়, দুটি বস্তু এমন রয়েছে, যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। (১) তাকওয়া ও (২) আল্লাহর যিকির।

তাকওয়ার কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। শুধু এটুকু বলা হয়েছে–

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

'সুতরাং তোমরা সামর্থানুযায়ী তাকওয়া অবলম্বন করো।'[১]

অর্থাৎ ময়দান খোলা। এই খোলা ময়দানে যত পার দৌড় লাগাও। মানুষ জীবনভর তাকওয়া বৃদ্ধি করতে পারে। এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এমনিভাবে আল্লাহর যিকির সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকহারে আল্লাহর যিকির করো।'[২]

এই আধিক্যের ব্যাখ্যা আরেক আয়াতে এভাবে এসেছে–

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

'তারা এমন বান্দা, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে।'[৩]

মানুষের তিন অবস্থা। হয় দাঁড়িয়ে থাকবে অথবা বসে অথবা শুয়ে থাকবে। তাই এ তিন অবস্থাতেই তাকে যিকির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্য কথায় এভাবে বলা যায়, এ আয়াতে সর্বাবস্থায় বান্দাকে যিকির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর কোনো সীমারেখা নেই। যত গুড় দিবে

---

১. সূরা তাগাবুন : আয়াত ১৬

২. সূরা আহযাব : আয়াত ৪১

৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯১

তত মিষ্টি হবে। এ দুটি বিষয় ছাড়া বাকি সব কিছুর সীমা-পরিসীমা রয়েছে। যেমন–

* নামাযের সীমা নির্দিষ্ট; মাত্র ৫ ওয়াক্ত নামায ফরজ।
* রোযার সীমা নির্দিষ্ট; এক মাস রোযা রাখা ফরজ।
* যাকাতের সীমা নির্দিষ্ট; যে, এত পরিমাণ দিতে হয়।
* হজের সীমা নির্দিষ্ট; জীবনে মাত্র একবার হজ ফরজ হয়।

ইমাম আবু ইউসুফকে ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর উপদেশ

আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব এত বেশি যে, ইমাম আজম আবুহানীফা (রহ.) যখন তাঁর ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)কে প্রধান বিচারপতি করে পাঠালেন, তখন তাকে কিছু বিশেষ নসিহত করলেন। 'ইমাম আজমের নসিহত' নামে বাজারে স্বতন্ত্র কিতাবও পাওয়া যায়।

এখানে দেখার বিষয় হলো, একলোক প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ পেয়েছেন আর তার ওস্তাদ তাকে নসিহত করছেন, তাকে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। হওয়ার দরকার ছিল তো এমন যে, তিনি তাকে এ সময় উপদেশ দিবেন, তুমি বিচার করতে উসূলে ফিক্হ সামনে রাখবে, কুরআন, হাদীছ, ইজমা, কিয়াস সামনে রাখবে। কিন্তু ইমাম আবুহানীফা (রহ.) তাকে এসব হিদায়েত দেননি; বরং বললেন–

'ইয়াকুব! তুমি মানুষের মধ্য হতে সবচেয়ে বেশি যিকির করবে, যাতে মানুষ তোমার থেকে যিকির করা শেখে।'

এর দ্বারা জানা গেল, উপকারী ইল্মের যেকোনো অঙ্গনই হোক-না কেন, যিকির ব্যতীত তা ফলপ্রসূ হয় না। যিকির করলে যেভাবে অন্তরে আল্লাহর মহব্বত আসে, এমনিভাবে যারা যিকির করে, তাদের সংস্পর্শে থাকলেও আল্লাহর মহব্বত জাগে।

পশ্চিমা বিশ্ব শান্তির অন্বেষায়

১৯৮৫ সনের কথা। ওয়াশিংটনের বন্ধুগণ সেখানে একটি মাহফিলের আয়োজন করেন। সেখানে কর্তৃপক্ষ বিশ্বের বড়-বড় পণ্ডিত ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে বিশেষভাবে দাওয়াত দেন। কয়েকজন রাষ্ট্রদূত, কয়েকজন ডক্টর ও কয়েকজন ডাক্তার উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আমাকেও সেখানে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। আমি তাদের সামনে ইংরেজিতে বয়ান করি।

তারপর নিয়ম অনুযায়ী তাদের মুরাকাবা করাই। তারপর দু'আ করে মাহফিল শেষ করি।

দু'আর পর একলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এল। তার দেখাদেখি আরও ৪/৫ জন তার সঙ্গে এল। আমাকে তাদের পরিচয় জানানো হলো, ইনি মুসলিম ডাক্তার, ইতি হার্টের একজন স্পেশালিস্ট। যাহোক, আমার যে কারণে খুশি লাগল, তা হলো, তারা মুসলমান এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একেক বিভাগে সম্মান দান করেছেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পরিচিতির পর লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে কী করালেন? আমি বললাম, এর নাম মুরাকাবা। তিনি বললেন, আপনি এটি শিখেছেন কোথা হতে? আমি বললাম, আমার বড়দের থেকে। লোকটি পুনরায় বলল, এশিয়া হতে শিখেছেন, নাকি ইউরোপ হতে? আমি বললাম, আমি তো এখানে এলাম মাত্র। আমি মুরাকাবা করা এশিয়া হতে শিখেছি। সে বলল, এর বর্ণনা কোথাও আছে কি? আমি বললাম, অবশ্যই। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে বলল, ইসলাম খুবই সত্য ধর্ম। আমি জানতে চাইলাম, আপনি কীভাবে বুঝলেন, ইসলাম সত্য ধর্ম। ঘটনা কী? এর উত্তরে সে একটি লম্বা ঘটনা শোনাল। আর তা হলো-

আমাদের এ দেশে ঘুমের বড়ি খেয়ে যারা ঘুমায়, তাদের সংখ্যা হু-হু করে বেড়ে চলছিল। ফলে এক সময় সরকারের সামনে প্রস্তাব গেল, হয়ত ঘুমের বড়ির প্রডাকশন বৃদ্ধি করার অনুমতি দেওয়া হোক অথবা এমন কোনো ব্যবস্থা করা হোক, যাতে কাউকে ঘুমের বড়ি খেতে না হয়। এই প্রস্তাব শুনে দেশের অভিভাবকগণ এটা ভেবে অস্থির হন যে, পুরো দেশবাসীকে ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হচ্ছে! বিষয়টি তাদের দৃষ্টি কাড়ল। তারা বিষয়টির আশু সমাধানের জন্য তৎক্ষণাৎ দেশের বড়-বড় হার্ট স্পেশালিস্টদের সমবেত করলেন। আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। কর্মকর্তাগণ ডাক্তারদের মধ্যে একটি কমিটি বানিয়ে দিলেন এবং বললেন, আপনারা গবেষণা করে বের করুন, মানুষ পেরেশান হয় কেন? অথচ আমাদের দেশে সবাই যা ইচ্ছে করতে পারে, যেমন ইচ্ছে খেতে পারে, যেখানে ইচ্ছো শুইতে পারে, ক্লাবে যায়, নাচ-গান করে, তারা কোনো আইনের অধীন নয়। তাহলে তাদের সব ইচ্ছা-ই যখন পূরণ হয়, তখন আবার পেরেশান ও উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ কী?

সরকার দেশের সকল বিভাগকে জানিয়ে দিল, এই কমিটি একটি বিশেষ কাজ করছে। তারা যে বিভাগের কাছেই সহযোগিতা চাইবে, সেই বিভাগ

যেন তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে। সরকারের এই ঘোষণায় আমাদের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কম্পিউটার জগত আমাদের অধীন ছিল। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ডকুমেন্ট চাইলে আমরা পেয়ে যেতাম। দেশের সমস্ত লাইব্রেরী আমাদের সামনে ছিল। সব ধরনের সুবিধাদি আমাদের ছিল।

আমরা পরস্পর এ বিষয়ে মতবিনিময় করি যে, মানুষ পেরেশান হয় কেন? এ প্রশ্নে একেক সদস্য একেক মন্তব্য করেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা-পর্যালোচনার পর আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে, মানুষের ব্রেনের ঐ অংশ কোন্‌টি, যার সঙ্গে মানুষের দুঃখ-আনন্দ জড়িত। নিশ্চয় মানুষের ব্রেনের সঙ্গে এই সুখ-দুঃখের কানেকশন আছে। অবশ্যই এই দুয়ের মাঝে বৈজ্ঞানিক পার্থক্য থাকবে। এ বিষয়টি রিসার্চ করে-করে বের করতে হবে।

আমরা রিসার্চের এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করি যে, আমরা পেরেশানিমুক্ত লোকদেরকে মেশিনে বসিয়ে তাদের ব্রেন স্ক্যানিং করি। তাদের ব্রেনের যত ডাটা ছিল, সেগুলোকে ডাইজেস্ট করে আমরা কম্পিউটারে চালান করি। পক্ষান্তরে যেসব মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাদেরও এভাবে স্ক্যান করি এবং ডাটা কম্পিউটারে চালান করি। তারপর আমরা কম্পিউটারে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করি। আমরা অপারেটারদের বলি, একদিকে দুশ্চিন্তামুক্ত লোক আর অপরদিকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোক, এদের পরস্পরের মাঝে তুলনা করে বলো, পার্থক্য কোথায়? কম্পিউটারকে এই মিশন দিলে কম্পিউটার কাজ শুরু করে দেয়। কম্পিউটার ব্রেনের এক-একটা সেলে গিয়ে দাঁড়ায় এবং পার্থক্য বর্ণনা করে।

বর্ণনাকারী ডাক্তার বলেন, আমরা কয়েক হাজার দুশ্চিন্তামুক্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকের টেস্ট গ্রহণ করি। লাগাতার দুই-তিন মাস রিসার্চের পর কম্পিউটার সুপার ব্রেনের একটা সেলকে চিহ্নিত করে। কম্পিউটার প্রধান বলে দেয়, এই সেলে পার্থক্য হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, যখন এই সেলে সার্চ হয়, তখন মানুষ টেনশন অনুভব করে। তখন তার মুড বেড়ে যায়। কথা বলতেও মন চায় না। মানুষের অবস্থা এমন হলে আমরা তাকে বলি, এর মাথা গরম হয়ে গেছে। যখন এই সেলের সার্চ শেষ হয়ে যায়, তখন মানুষ স্বাভাবিক থাকে, আনন্দে থাকে, নিজেও হাসে, অপরকেও হাসায়।

আমরা এ তথ্য পেয়ে চিন্তা করলাম, এ তো একটি বিরাট রিসার্চ হয়ে গেল যে, আমরা সে সেলটির সন্ধান পেয়েছি। তারপর আমরা চিন্তা করলাম,

এর কাউন্টার টেস্ট নিতে হবে। এর জন্য আমরা এমন লোককে মেশিনে বসাব, যে বাস্তবেই কোনো টেনশনে আছে এবং কৃত্রিমভাবে মেশিনের মাধ্যমে তার ওই সেলের সার্চকে ছিন্ন করে দিতে হবে। যখন তার ওই সেলটি ছিন্ন করা হবে, তখন লোকটি দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে যাবে।

এমন চিন্তা ও পরিকল্পনা করে আমরা এমন একলোককে মেশিনে বসালাম, যে বাস্তবেই দুশ্চিন্তগ্রস্ত ছিল। তারপর আমরা তার ব্রেনের ঐ নির্দিষ্ট টিস্যু হতে চার্জকে ছিন্ন করে দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি হাসতে লাগল এবং সে আমাদের সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলতে লাগল, যেন তাকে পেরেশানি কখনই স্পর্শ করেনি।

তারপর আমরা এক হাসি-খুশি দুশ্চিন্তামুক্ত লোককে মেশিনে বসাই এবং মেশিনের সাহায্যে তার ব্রেনের ওই টিস্যুর মধ্যে কৃত্রিমভাবে চার্জ দাখিল করি। চার্জ দাখিল করতেই লোকটির মাথা গরম হয়ে যায় এবং সে আমাদের সঙ্গেই ঝগড়া করতে শুরু করে।

আমরা এভাবে হাজার-পনেরশর উপর টেস্ট নিয়ে নিশ্চিত হই, যদি ব্রেনের এই সেলে চার্জ হয়, তাহলে মানুষ পেরেশান হয় আর যদি চার্জ না হয়, তাহলে মানুষ হাসিখুশি থাকে। এভাবে আমরা রিসার্চ করে মানুষের আনন্দ-বেদনার রহস্য উন্মোচন করি।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এক সময় সরকারকে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করি। যখন পাঠকবর্গ আমাদের রিপোর্ট পড়েন, তখন তারা আমাদের ধন্যবাদ দেন এবং বলেন, আপনারা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। কিন্তু কথা হলো, আমরা তো পুরো জগতকে মেশিনে বসাতে পারি না। আপনারা এ পর্যন্ত যা করেছেন, তাতে অর্ধেক কাজ হয়েছে, বাকি অর্ধেক কাজ হলো, এবার রিসার্চ করে বের করুন, এই চার্জটি মেশিনে বসানো ছাড়াই কীভাবে সম্পন্ন হতে পারে? বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমাদের উপর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটিও বর্তায়। আমরা আবার রিসার্চে মনোযোগী হই যে, এই চার্জটি মেশিনে বসানো ছাড়াই কীভাবে শেষ হতে পারে!

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রথম দিকে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। তারপর রিসার্চ শুরু হয়। একপর্যায়ে আমাদের চিন্তায় একথা আসে যে, যেলোক কঠিন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, যদি সে কয়েক ঘণ্টা ঘুমুতে পারে, তাহলে ঘুম থেকে উঠার পর তার দুশ্চিন্তা কিছুটা হলেও লাঘব হয় এবং তার অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে থাকে। এ চিন্তা হতে প্রশ্ন জাগে, মাত্র দু-চার ঘণ্টায় এমন

পার্থক্য হয় কেন? বিষয়টি বুঝতে একজন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোককে ঘুমের পূর্বে মেশিনে বাসানো হয় এবং দু-এক ঘণ্টা ঘুমের পর তাকেই আবার মেশিনে তোলা হয়। এতে আমরা দেখতে পাই, ঘুমের পরে তার চার্জ হ্রাস পেয়েছিল। ঘুমের পূর্বে তার চার্জ বেশি ছিল; কিন্তু ঘুমের পরে তা কমে গেছে। এ গবেষণা হতে আমরা বুঝতে পারি, এই চার্জ দ্রুত বিলুপ্ত হয়। মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার ব্রেনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ ব্রেন থেকে চাপ কমে যায়। চাপ না থাকার কারণে চার্জ দ্রুত ফুরিয়ে যায়।

বর্ণনাকারী বলেন, এ থেকে আমাদের মাথায় একটি বিষয় আসে যে, যখন এই চার্জ ঘুমানোর দ্বারা দ্রুত শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমরা এমন কোনো ফর্মুলা কেন বের করি না, যার দ্বারা জাগ্রত অবস্থাতেই তা দ্রুত শেষ হয়ে যায়? সুতরাং আমরা চিন্তা করি যে, ব্রেনকে চাপ ও ভার মুক্ত করতে হবে। এ চিন্তা হতে আমরা একলোককে মেশিনে বসিয়ে বলি, সে যেন এ সময় কোনো চিন্তা না করে। সে চিন্তা বাদ দিলে ব্রেনের উপর লোড কমবে। যখন আমরা এক পেরেশান লোককে মেশিনে বসালাম আর সে দুশ্চিন্তা ছেড়ে দিল, তখন আধা কিংবা পৌনে এক ঘণ্টার পর তার চার্জ বাস্তবেই লো পেল। এভাবে আমরা কয়েকটি টেস্ট করি। পরিশেষে আমরা সরকারি কর্মকর্তাদের জানাই, নির্দিষ্ট ব্যায়ামের দ্বারা মানুষের দুশ্চিন্তা ও অবসাদ দ্রুত শেষ হয়ে যায় এবং সে শীঘ্রই স্বাভাবিক ও প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

সরকার এই ব্যায়ামের নাম দিয়েছে Meditation (মেডিটেশন) তথা ধ্যানমগ্ন হওয়া। যাকে আরবী-উর্দুতে বলে মুরাকাবা। সরকার নির্দেশ দিয়েছে, দেশের সকল শহরের বিভিন্ন অংশে মেডিটেশন ক্লাব গড়ে তোলা হোক। সরকারি এ নির্দেশের আলোকে দেশের সর্বত্র মেডিটেশন ক্লাব রয়েছে। মানুষ সারা দিন কাজকর্ম করে যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন তারা এসব ক্লাবে আসে। ক্লাবে দায়িত্বশীল লোক থাকেন। তারা তাদের বলেন, এখানে বসুন। সব কিছু ভুলে যান। চিন্তা করা সম্পূর্ণ বাদ দিন। এ ধরনের কথাবার্তা তিনি বলতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর আগন্তুক বলে, এখন তো নিজেকে খুব হাল্কা মনে হচ্ছে। সমস্ত দুশ্চিন্তা ও টেনশন দূর হয়ে গেছে।

ডাক্তার সাহেব বলেন, এই মেডিটেশন আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। কিন্তু যে রিসার্চের ফসল এ দেশের সদ্য বের হয়েছে, তা পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে তো আরও ২০ বছর পরে যাওয়ার কথা। তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি এই মেডিটেশন কোথা হতে শিখেছেন?

আমি ডাক্তার সাহেবকে বোঝালাম, ভাই! এটি মেডিটেশন নয়; বরং এটি আল্লাহর যিকির। এর নির্দেশ পবিত্র কুরআনে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহপাক বলেন–

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ

'তুমি মনে-মনে তোমার প্রভুর যিকির করো।'[১]

আমরা মুরাকাবা করে কুরআন মাজীদের এই আয়াতের উপর আমল করেছি। যাহোক, আমার কথায় তিনি খুব প্রশান্তি লাভ করলেন এবং মন্তব্য করলেন, বস্তুত এ কারণেই আমি বলেছিলাম, ইসলাম পূর্ণ সত্যের ধর্ম। এই ধর্ম ১৪০০ বছর পূর্বেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছে, যদি আমরা যিকরে কলবী করি, তাহলে আল্লাহ আমাদের অন্তরের সমস্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করে দিবেন। বিশ্ব আজ রিসার্চ করার পর যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, ১৪০০ বছর পূর্বেই তা আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ!

সুইডেনে এক মনোবিজ্ঞানীর স্বীকারোক্তি

এই ঘটনার ৫ বছর পর আরেকটি ঘটনা ঘটল। আমি সেসময় দেশের দ্বিতীয় অন্যতম ইন্ডাস্ট্রির জেনারেল ম্যানেজারের ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল ছিলাম। সুইডেনে প্লানিংয়ের উপর একটি কোর্স হয়। কোর্সটির নাম ছিল Project Managemant (প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট)। কোর্সের ব্যবস্থাপকগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোকদের নির্বাচন করেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পুরো পাকিস্তানের মধ্য হতে তারা আমাকে নির্বাচন করেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমি উক্ত কনফারেন্সে আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করি। উক্ত কোর্সে বিশ্বের ২৭ দেশের লোক অংশ নিয়েছিল। সেখানে আমরা ৪০ দিন কম্পিউটারের উপর কাজ করি।

আল্লাহর শান দেখুন, যখন কোর্সশেষে পরীক্ষা হয়, তখন আমি ২৭ দেশের লোকদের ছাড়িয়ে যাই। অথচ আমার সহযোগী লোকেরা আমার থেকেও উচ্চশিক্ষিত এবং জ্ঞানী ছিলেন। তারপরও কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি এত সদয় ছিলেন যে, তারা কোর্সের প্রথম স্থানের অধিকারী হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করলেন।

শেষ দিন কর্তৃপক্ষ তাদের দেশের ৭ জন মনোবিজ্ঞানীকে দাওয়াত দেন। তাদের মধ্যে চারজন পুরুষ এবং তিনজন মহিলা। তারা সকলেই ছিলেন

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২০৫

দেশের নির্বাচিত ব্যক্তিত্ব। তাদের আনার উদ্দেশ্য ছিল লেকচার দেওয়া। মনোবিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন, আজকের আলোচ্য বিষয় হলো Human Stresses বা মানবিক টেনশন। তারা বললেন, যেভাবে গাড়ি চালাতে-চালাতে ক্লান্তি এসে যায় এবং তাদের বিশ্রাম নিতে হয়, ঠিক তেহমনি মিল-ফ্যাক্টরীতে যারা ম্যানেজার ও ডাইরেক্টর হন, তাদের ব্রেনেও সর্বক্ষণ টেনশন থাকে। অনেক সময় তারা চায়, এমন হোক, কিন্তু হয় তার বিপরীত। আবার অনেক সময় চায়, এমন না হোক; কিন্তু বাস্তবে তা হয়ে যায়। এসব কারণে তাদের ব্রেনে সব সময় এক ধরনের টেনশন কাজ করে। যদি তাদের টেনশন দূর না করা যায়, তাহলে এটা তাদের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ কারণে তারা এই লেকচারের নাম দেন Human Stresses তথা মানবিক পেরেশানি। আমি মনে-মনে বললাম, আমাদের দেশের লোক একেই তাদের সাধারণ ভাষায় এভাবে বলে থাকে, 'পেরেশানী (দুশ্চিন্তা) মানুষকে বুড়ো বানিয়ে দেয়।'

কিন্তু তারা জ্ঞানী হওয়ায় বিজ্ঞানের ভাষায় বিষয়টি এভাবে বোঝায় যে, প্রথমে মেডিক্যালি এই হয়, তারপর এমন হয়, তারপর মানুষের মাঝে প্রতিক্রিয়া পড়ে। পরে মানুষ ঠিক হয়ে যায়। সুস্থ হয়ে যায়।

যখন আলোচকগণ বিষয়টি মেডিক্যালীভাবে প্রমাণ করে দিল, তখন তারা বললেন, আপনারা এখানে ২৭ দেশের লোক রয়েছেন। আমরা আপনাদের একটি ব্যায়াম করাতে চাই। এতে আপনাদের টেনশন দূর হবে। একথা শুনে তারা খুব খুশি হলেন এবং বললেন, অবশ্যই! আপনারা আমাদের ব্যায়াম করান।

তারা আমাদের একটি কক্ষে নিয়ে গোল করে বসালেন। সামনে স্থাপিত স্টেজে বসে তারা লেকচার দিতে থাকলেন। তারা কম্পিউটার ও অন্যান্য শ্রবণ-দর্শনযন্ত্রের মাধ্যমে তাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও চিত্র দেখাতে থাকেন। সব কিছু দেখানো শেষ হলে তারা বললেন, এখন আমরা আপনাদেরকে সেই ব্যায়াম শিখাতে চাই, যাতে আপনারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে তা দূর করতে পারেন এবং অন্যদেরও শেখাতে পারেন। এতে সকলের টেনশন দূর হবে।

আমরা বলি, খুব ভালো। আমাদেরকে ব্যায়ামটি শেখান। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, তারা বলেন–

Shut the doors

'দরজা বন্ধ করে দিন।'

একলোক গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

Switch off the lights

'লাইট বন্ধ করে দিন।'

লাইটও বন্ধ করে দেওয়া হলো।

Cbse the eyes

'চোখ বন্ধ করুন।'

আমরা সকলে নিজ-নিজ চোখ বন্ধ করি।

Bend your heads

'সবাই নিজ-নিজ মাথা ঝোঁকান।'

আমরা মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলি। তারপর তারা বললেন–

Forget everything. Feel relaxe.

'সব কিছু ভুলে যান; প্রশান্তি অনুভব করুন।'

আমরা এভাবে বসে থাকি আর তারা এভাবে বারবার বলতে থাকে:

Forget everything. Feel relaxe.

Forget everything. Feel rdlaxe.

'সব কিছু ভুলে যান; প্রশান্তি অনুভব করুন।'

'সব কিছু ভুলে যান; প্রশান্তি অনুভব করুন।'

৫/৭ মিনিট পর তাদের চেয়ারম্যান বললেন–

The exereise is over

'ব্যায়াম শেষ।'

তারপর লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হলো এবং দরজা খুলে দেওয়া হলো।

তারপর তাদের মধ্যে একজন বললেন, এবার আমরা আপনাদের থেকে প্রতিক্রিয়া জানব। আপনারা পর্যায়ক্রমে এসে বলবেন, এই ব্যায়ামের অনুভূতি কী? তারা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন।

জ্যামাইকার এক মহিলা দাঁড়িয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে বললেন–

I am feeling elevated

'আমার নিজেকে হাল্কা মনে হচ্ছে।'

তারপর ইন্দোনেশিয়ার এক যুবক দাঁড়িয়ে বলল–

I am feeting satisfied, I am seeling satisfied

'আমি প্রশান্তি অনুভব করছি। আমি প্রশান্তি অনুভব করছি।'

এবার ছিল আমার পালা। আমি মধ্যখানে বসা ছিলাম। যখন তারা আমার কাছে অনুভূতি জানতে চাইল, তখন আমি বললাম, কথা হলো, আপনারা আমাদের যা কিছু করালেন, তাতে অর্ধেক হয়েছে; অথচ আমরা এমন কাজ প্রতিদিন করে থাকি। ভদ্রলোক বললেন, আপনার উদ্দেশ্য কী? আমি বললাম, আপনি আমাদের বলেছেন–

Forget everything. Forget everything.

'সব কিছু ভুলে যাও, সব কিছু ভুলে যাও।'

এ অর্ধেক হলো। আমরা এ ছাড়াও বাড়তি আরও কিছু করি। আমরা বলি–

ہر چیز کو بھول جاؤ اور اللہ کی یاد میں ڈوب جاؤ

'সব কিছু ভুলে যাও এবং আল্লাহর স্মরণে ডুব দাও।'

এই যে দ্বিতীয় অংশটি, তা আপনারা করাননি। অথচ আমরা এ অংশও করে থাকি।

আমার একথা শুনে ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন–

Are you Muslim?

'আপনি কি মুসলমান?'

আমি বুক টান করে বললাম, হাঁ আমি মুসলমান।

আমি একথা বললে তিনি ইংরেজিতে একটি কথা বললেন। আমি সেই কথাটি হুবহু মুখস্থ করে নিয়েছি। সেই কথাটি এখন আমি আপনাদের শোনাচ্ছি।

তিনি বললেন–

You learnt it by wisdom one thousand and five hundred (1500) years ago but we have just learnt it by science.

'আপনি এই কাজটি ওহীর মাধ্যমে ১৫০০ বছর পূর্বে শিখেছেন আর আমরা বিজ্ঞানের মাধ্যমে সদ্য জানলাম।'

ভদ্রলোক কথাটি ২৭টি দেশের লোকের সামনে বললেন এবং ইসলামের সত্যতা অকপটে স্বীকার করে নিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ! ইসলাম কত পূর্ণাঙ্গ ধর্ম যে, অন্য ধর্মের লোক রিসার্চ করে অবশেষে সেখানে পৌঁছেছে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা শিখিয়ে গেছেন। সুবহানাল্লাহ! যারা দীন সম্পর্কে জানে না,

তারাও যদি আল্লাহর স্মরণে সামান্য কিছু সময় কাটায়, তাহলে তারাও পূর্ণ উপকৃত হয়।

আমার বন্ধুগণ!

নেয়ামত আমাদের নিকট। অথচ মানুষ পশ্চিমা লোকদের থেকে দুনিয়াবি লাভ খুঁজে ফিরছে। কিন্তু যখন মুসলমানদের বলা হয়, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের টেনশন আর উদ্বেগের চিকিৎসা ঘুমের বড়ি খাওয়ার মধ্যে নয়; বরং আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই নিহিত, তাহলেও তারা সেদিকে কর্ণপাত করে না। বরং সত্য কথা হলো, তারা একে অবান্তর কথা মনে করে এবং বলে, এই যিকির-মুরাকাবা কোথা হতে এল? তারা নিজেরা তো সারা বিশ্বের যিকির করে বেড়ায়; কিন্তু আমরা যদি আল্লাহর যিকির করি, তাহলে এটা তাদের খুব খারাপ লাগে। বাস্তব কথা হলো, যে আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহর নাম জপলেই তার মজা লাগে। জনৈক কবি অতি সুন্দর বলেছেন–

ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو

ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے

তোমার নামের প্রেমিক মোরা তোমায় শুধু চাই,

জীবনভর ডেকে যাব তোমায় যদিও সাড়া না পাই।

যদি আল্লাহর মহব্বতের এই আবেগঘন অবস্থা কারো অন্তরে না থাকে এবং আল্লাহ তাকে তাঁর মারেফতের সুধা হতে বঞ্চিত রাখেন, তাহলে আমরা তার জন্য আর কী-ইবা করতে পারি।

আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভের কারণ

আল্লাহর যিকিরের মধ্যে এক ধরনের আত্মসমর্পণ রয়েছে। এই আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মানুষের বিষাদ দূর হয়, যার ফলে মানুষের অন্তর শান্তিতে কানায়-কানায় ভরে যায় এবং মানুষ পর্যায়ক্রমে আল্লাহর মহব্বতের পানে এগিয়ে যেতে থাকে। এ কারণে বেশি-বেশি যিকির করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যদি আমরা অধিকহারে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আল্লাহর যিকির করি, তাহলে আমরা দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানে উপকৃত হব। বিষয়টি বর্তমানে বিজ্ঞানের আলোকেও সুপ্রমাণিত। নবীজিও বলে গেছেন–

ذِكْرُ اللهِ شِفَاءُ الْقُلُوْبِ

'আল্লাহর স্মরণ অন্তরের নিরাময়।'

আপনি শুতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বক্ষণ দিলে-দিলে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত রাখুন; দেখবেন এর কত বরকত, কত লাভ! আমাদের শায়েখগণ যে যিকির করান, তা কেবল তাসবীহ পুরা করা নয় এবং সংখ্যাও শেষ করা হয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর পথের সাধকের দিল বদলে দেওয়া, যাতে সেও যিকিরের ফায়দা লাভ করে।

আমি আপনার মতো হতে চাই

একদিন আমি একটি বিমানবন্দরে ফ্লাইটের অপেক্ষায় বসা ছিলাম। এক যুবক সামনে দিয়ে অতিক্রম করল। সে মদপান করছিল। একবার সে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আবার ফিরে এল এবং আমার ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করে বলল–

I want to be like youy

'আমি আপনার মতো হতে চাই।'

যখন আমি দেখলাম, তার হাতে মদের বোতল; তারপরও সে একথা বলছে, তখন আমি মনে করলাম, আমার পাগড়ি-পোশাক তার ভালো লেগেছে।

বহির্বিশ্বের লোকজন যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি এই পোশাক কেন পরেছেন? তখন আমি বলি, এটি ইউনিফর্ম। আমি কাফেরদের কখনো বলি না, এমন পোশাক পরা সুন্নত। কেননা, হতে পারে সুন্নতের নাম শুনলে তারা কোনো বিরূপ মন্তব্য করে বসবে। পক্ষান্তরে ইউনিফর্ম এমন একটি শব্দ, এর কথা বললে, মানুষ আর সামনে কথা বাড়াতে পারে না।

যাহোক, যুবক যখন বলল, আমি আপনার মতো হতে চাই, তখন আমি তাকে বলি–

Do you like this turban and this white dress?

'আপনি কি এই পাগড়ি আর সাদা পোশাক পছন্দ করেন?'

যুবক বলল–

No, I want to be like you because I am seeinf same light on your face.

'না, আমি আপনার মতো এ জন্য হতে চাই যে, আপনার চেহারায় আমি আলো দেখতে পাচ্ছি।'

যুবক একথা বললে তৎক্ষণাৎ আমার মধ্যে এই অনুভূতি জাগল যে, হয়ত আল্লাহপাক তার পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তাই আমি বললাম–

O brather! then you can be better than me

'আরে ভাই! আপনি তো আমার থেকেও উত্তম হতে পারেন।'

যুবকটি বিস্মিত হয়ে বলল–

Are you sure?

'সত্যই কি এমন সম্ভব?'

yes

'অবশ্যই।'

যুবক বলল–

Ok, Iam just comming.

'ঠিক আছে, আমি এখনই আসছি।'

যুবক একথা বলে সামনে ওয়াশরুমে গেল এবং মদের বোতলটা ছুড়ে ফেলল। বেসিনে গিয়ে কুলি করল এবং মুখ ধৌত করল। তারপর সম্পূর্ণ তাজাদম হয়ে আবার আমার কাছে এল এবং পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

যুবক বসতে-বসতে বলল–

Let me to introduce myself?

'আমার পরিচয় দেব কি?'

আমি বললাম, হাঁ; দিন।

যুবক নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলল, আমার নাম এই এবং আমি টোকিও (জাপান) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস.সি. কম্পিউটার সাইন্স করেছি। বর্তমানে অমুক বড় কোম্পানীর ম্যানেজার পদে আছি। তারপর যুবক পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলল–

I want to be kike youy.

'আমি আপনার মতো হতে চাই।'

আমি বললাম–

you can be better than me.

'আপনি আমার চেয়েও ভালো হতে পারেন।'

যুবক বলল, এ কীভাবে সম্ভব? কেননা, আমি তো যুবক।

আমি বললাম, যুবকই তো ভালো হতে পারে।

যুবক বলল, এটা নয়। আমার কথার উদ্দেশ্য হলো, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমি কত সুদর্শন, আমি বড় পদে কর্মরত এবং বেতন-ভাতাও বড়

অংকের, যার ফলে প্রতিদিন দেশের কোনো-না-কোনো স্থান হতে পাপের ডাক আসে আর আমি সেই ডাকে সাড়া দেই। আজ এখানে, কাল ওখানে গিয়ে ফুর্তি করি। আমার খরিদ্দার নতুন-নতুন হয়। যখন ব্যাপারটি এত দূর গড়িয়ে গেছে, তখন আমি এ পাপের জগত হতে কিভাবে নিজেকে বাঁচাতে পারি! আমি বললাম, ভাই! আপনার পক্ষে গুনাহ থেকে বাঁচা কঠিন হলেও হতে পারে; কিন্তু আপনাকে গুনাহ থেকে বাঁচানো আল্লাহর জন্য সহজ।

যুবক বলল, হাঁ, এটা তো ঠিক কথা।

আমি বললাম, আমরা আমাদের বড়দের থেকে গুনাহ থেকে বাঁচার একটি উপায় শিখেছি। আমি আপনাকে সেটি শিখিয়ে দিচ্ছি। এর বরকত আপনি নিজ চোখে দেখবেন।

যুবক বলল, ঠিক আছে, বলুন সেই উপায়টি কী?

আমি তাকে সেখানেই বসিয়ে বাইয়াত করি এবং তাকে মুরাকাবার পদ্ধতি বলে দিই। যুবকের গন্তব্য ছিল এক আর আমার গন্তব্য ছিল আরেক। তাই আমরা এক সময় যার-যার গন্তব্যে চলে যাই। তবে বিদায়ের পূর্বে আমরা একে অপরের পরিচয় ও ঠিকানা নিয়ে নিই।

আল্লাহর অপূর্ব শান যে, তিন মাস পর সে আমার কাছে ইংরেজিতে একটি পত্র লিখল। পত্রটি আমি হেফাযত করি। যুবক পত্রে দুটি কথা লিখেছে–

(১) আমি বর্তমানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায তো পড়ছিই; কখনো কখনো তাহাজ্জুদ পড়ারও তাওফীক হয়ে যায়।

(২) আমি ভেবে অবাক হই যে, আমি গুনাহের পরিবেশে থেকেও গুনাহ হতে কীভাবে বেঁচে আছি? আমি জবাবে লিখি–

ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرہ دیا کرتی ہیں

'আমাদের বড়দের দু'আ আমাদের চারদিক পাহারা দিয়ে রাখে।'

এক কবি সুন্দরভাবে বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে–

دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے

میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے

বড়রা মোদের দু'আ দেন যদি থাকেন দূরে,

যাই যদি ডুবে কভু সমুদ্র ছুড়ে তীরে।

জনৈক এসপির বাতেনি ইসলাহ

একবার আমি মুলতানে বয়ান করি। কিছুলোক বাইয়াত হয়। একলোককে দেখি, সে আরেক লোককে বলছে, বাইয়াত হয়ে যাও, বাইয়াত হয়ে যাও। কিন্তু লোকটি বাইয়াত হতে চাচ্ছে না। আমি বিষয়টি দেখে তাকে বলি, আপনি তাকে বাইয়াত হতে বাধ্য করছেন কেন? যার মন চাবে সে বাইয়াত হবে। আমার কথা শুনে যাকে বাধ্য করা হচ্ছিল তিনি সামনে এগিয়ে এসে বললেন, হযরত! কথা হলো, আমি এই এলাকার পুলিশ সুপার। আর ইনি হচ্ছে আমার বড় ভাই। ইনি আপনার হাতে বাইয়াত হয়েছেন। এখন আমাকেও বাইয়াত হতে চাপ দিচ্ছেন। আমি পুলিশের সদর দফতরে থাকি। ফলে আমার খানাপিনা, পরিধেয় পোশাক হারাম। এমনকি যেসব গুনাহ কল্পনা করা যায় না তাও আমি করি। তাই ভাবছি, এমতাবস্থায় আমার বাইয়াত হয়ে লাভ কী? কীভাবে আমার ইসলাহ হবে?

আমি বলি, ভালো কথা। আপনার জীবন যেমনই হোক-না কেন, বাইয়াত হওয়ার মধ্যেই আলাদা বরকত আছে। আপনি বদ-আমলের অন্ধকার দেখেছেন আর আমি বাইয়াতের নূর দেখেছি। আপনি একটু পরীক্ষা করে দেখুন, পরিবর্তন হয় কি-না? তিনি বলেন, ঠিক আছে, তা-ই হবে। আমাকে বাইয়াত করে নিন। আমি তাকেও বাইয়াত করি এবং তার বুকে হাত রেখে আল্লাহুর যিকির শুরু করিয়ে দিই।

চার-পাঁচ মাস পরে পুনরায় ওই শহরে একটি প্রোগ্রামে আমাকে যেতে হয়। আল্লাহ্‌র কুদরত যে, আসরের নামাযের পরে যখন আমি উঠি, তখন একলোক পেছন থেকে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি ভেবে পাই না, এখানে তো কারো সঙ্গে আমার এমন ফ্রি সম্পর্ক নেই যে, সে এসে পেছন হতে ঝাপটে আমাকে ধরবে! তাহলে এ লোক কে? একটু পর লোকটি আমাকে ছেড়ে দিল। আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সেই পুলিশ সুপার! তার মুখে সুন্নতী দাড়ি। আমিও আবেগ নিয়ে বলি, এই যে পুলিশ সাহেব! কী অবস্থা? তখন বললেন–

'হযরত! পুলিশ সুপার তো সেদিনই মরে গেছে। এখন আপনার গোলাম জীবিত আছে।'

তারপর তিনি ভরমজলিসে বললেন–

'হযরত! আমার জীবন এত বদলে গেছে যে, এখন আমি তাহাজ্জুদ নামাযও পড়ি এবং এই মসজিদে এসে ফজরের আযান দেই।'

জনৈক এম.এন.আই.-এর উপর নেসবতের বরকত

জাহানিয়া মন্ডিতে জামিয়া রহমানিয়া নামে আমাদের একটি মাদরাসা আছে। মাদরাসার মুহতামিম, নাজেমসহ সব আসাতিযায়ে কেরাম আমাদের নকশবন্দী সিলসিলায় বাইয়াতপ্রাপ্ত। এ হিসেবে বলি, মাদরাসাটি আমাদের। ওই জামিয়ার বুখারী শরীফের উদ্বোধন বা সমাপণী অনুষ্ঠানে আমাকে অবশ্যই যেতে হয়। কেননা, সেটি ওলামায়ে কেরামের মজলিস হয়।

একবার মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বুখারী শরীফের সমাপণী অনুষ্ঠানে শরীক হওয়ার জন্য আমাকে দাওয়াত দেয়। আমি হুকুম পালনার্থে সেখানে যাই। বয়ান শেষে হাজী আযীযুর রহমান সাহেব আমার নিকটে এলেন এবং বললেন, হযরত! আমার একজন একান্ত সহপাঠী আছেন। তিনি এম.এন.আই. তথা পাকিস্তানের সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একজন। তিনি খুবই ভালো মানুষ। তিনি লন্ডন থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন এবং ওখানকার রংয়ে রঞ্জিত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে কোটিপতি। তিনি এ দেশেও যেভাবে জীবন যাপন করছেন, যেমনি সেখানে কাটাতেন। তার এত বেশি সহায়-সম্পত্তি যে, তার বিক্রয়কৃত জমিতেই এ শহর গড়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, লোকটি ৩৫ বছর ধরে লাগাতার এম.এন.আই. হয়ে আসছেন। নতুন সরকার এলে তিনিই এম.এন.আই হয়ে যান। সরকার পরিবর্তন হলেও তিনিই এম.এন.আই থাকেন। এর কারণ হলো, তিনি সারা বছর সরকারের কাজ করে দেন। যেহেতু তার পয়সার লোভ নেই, তাই তিনি নিঃস্বার্থভাবে গরীবের জন্য কাজ করেন এবং তাদের বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ান। সে কারণে ভোটাররা বলেন, আমরা তাকেই ভোট দেব। বরং তিনি নিজের অফিসের এতটা গ্রহণযোগ্য এবং এবং প্রিয়পাত্র যে, যদি তিনি স্বস্থানে কোনো খুঁটিও দাঁড় করিয়ে দেন, তবুও মানুষ ওই খুঁটিকেই ভোট দিয়ে এম.এন.আই বানাবে। শহরের ডেপুটি কমিশনার, এসিস্টেন্ট কমিশনার, এইস.এস.ও এবং অন্যান্য অফিসাররা তার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখেন। কেননা, তারা জানেন, তিনি আবারও এম.এন.আই হবেন। যদি আমরা তার সাথে অসৎ ব্যবহার করি, তাহলে তিনি আমাদের এখান থেকে অন্য কোনো প্রদেশে বদলি করে দিবেন। তখন আমরা অযথা সমস্যায় পড়ে যাব।

তার কাজ হলো, সারা দিন নিজের ড্রয়িং রুমে বসে থাকনে। কোনো গরীব দুঃখী এলে তার সমস্যা দূর করেন। কাউকে চাকরি দেন। কারো

বিবাহের সমস্যা দেখা দিলে তাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেন। এভাবে তিনি মানুষের উপকার করে দিন কাটান। এতে মানুষ তার প্রতি বেজায় খুশি। কিন্তু তার জীবনের একটি অন্ধকার দিক রয়েছে। আর তা হলো, দীন-ধর্মের প্রতি তার কোনো সম্পর্ক নেই। বরং সত্য কথা হলো, ঈদের নামায পড়াও তার পক্ষে কষ্টদায়ক হয়ে যায়। আমার মন চায়, তিনি যেন ধর্মমুখী হন।

আমি বললাম, আমার সামানাপত্র গাড়িতে চলে এসেছে আর আমিও এখন বিদায় নিচ্ছি। হাতে সময় তো নেই, তবে আপনি এতটুকু করুন যে, তার কাছে গিয়ে বলবেন, আমার পীর সাহেব আপনাকে সালাম দিয়েছেন। শুধু এটুকু করলেই চলবে।

আমি তো বিষয়টি ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহর শান দেখুন, যখন পরের বছর আমি আবার বুখারী শরীফের সমাপণী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ওই মাদরাসায় পৌঁছি, তখন হাজী আযীযুর রহমান সাহেব অত্যন্ত হাসি-খুশির সঙ্গে আমার কাছে এলেন এবং বললেন, হযরত! আমি আমার একান্ত সহপাঠীকে গত বছর আপনার সালাম পৌঁছে দিয়েছিলাম। আপনার সালাম পেয়ে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে পরে বললেন, আবার আপনার পীর সাহেব এলে আমার সঙ্গে তার সাক্ষাত করিয়ে দিবেন। তাই আমি তাকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করাতে চাই। আমি বললাম, ঠিক আছে, আপনি তার কাছে যান এবং তাকে বলুন, আমাদের বড়রা বলেছেন–

بِئْسَ الْفَقِيْرُ عَلٰى بَابِ الْاَمِيْرِ وِنِعْمَ الْاَمِيْرُ عَلٰى بَابِ الْفَقِيْرِ.

'সবচেয়ে খারাপ ফকীর সে, যে কোনো আমীরের কাছে যায়। পক্ষান্তরে সবচেয়ে উত্তম আমীর সে, যে কোনো ফকীরের কাছে যায়।'

এই নীতিবাক্য অনুযায়ী যদি আমি আপনার কাছে আসি, তাহলে আমি بئس الفقير (সবচেয়ে খারাপ ফকীর) হয়ে যাব। পক্ষান্তরে আপনি যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন, তবে আপনি نعم الامير (সবচেয়ে উত্তম আমীর) হয়ে যাবেন।

এখন আপনি কোন্‌টি বেছে নিবেন?

আমার বার্তা নিয়ে হাজী সাহেব চলে যান। তিনি গিয়ে এম.এন.আই সাহেবকে কথাটি বললেন। আল্লাহর শান দেখুন, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে তার পাজেরো গাড়িটা বের করলেন এবং যে মাদরাসায় আমি বসা ছিলাম, সোজা

সেখানে চলে এলেন। যখন তিনি আমার কাছে এসে চাটাইয়ের উপর বসে পড়লেন, তখন মানুষ এই ভেবে অবাক হলো যে, যিনি এ যাবৎ কখনো মাদরাসায় আসেননি, তিনিও এসে চাটাইয়ের উপর বসেছেন! সালাম দিয়ে তিনি বললেন, আমি আপনার সঙ্গে একাকি কিছু কথা বলতে চাই। সুতরাং আমি উপস্থিত অন্যদের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

দরজা বন্ধ হলে তিনি আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর আমি তাওবাশীর্ষক কিছু আয়াত ও হাদীছ তার সামনে তুলে ধরি, যা আল্লাহ তৎক্ষণাৎ আমার মাথায় এনে দেন। আমার কথা শোনার পরে তিনি বললেন, হযরত! তাওবা তো সে-ই করে, যার কিছু নেকী ও কিছু গুনাহ আছে। কিন্তু যার অর্জন শুধুই গুনাহ আর গুনাহ এবং সে কখনো নেকীর কাজ করেনি, তার তাওবা কীসের? আমার তো মনেই পড়ে না, আমি কোনো দিন নামায পড়েছি কি-না? ইউরোপে গিয়ে আমার মাথা এমন বিগড়ে গেছে যে, সেখানে থেকে তরল পদার্থ পানের অভ্যাস গড়ে উঠেছে, যার ফলে নিজেকে নিয়েই সর্বদা মেতে ছিলাম। আমি সেসব পুরনো অভ্যাস এখনও ছাড়তে পারিনি। তারপরও কি আমার মতো পাপীর জীবন বদলাতে পারে?

আমি বললাম, অবশ্যই পারে।

তিনি বললেন, আমার তো কোনো নেক আমল নেই। আমি বললাম, এমন বলবেন না; আপনার অনেক নেক আমল আছে। যখন আমি বললাম, আপনার নেক আমল অনেক, তখন তিনি অবাক হয়ে যান। আমি তাকে অবাক হতে দেখে বললাম, আপনি নামায পড়েন না তাই তো? তিনি বললেন, জি। আমি বললাম, মসজিদেও যান না। তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, এটা অবশ্যই গুনাহের ব্যাপার, যা আপনি করেন। কিন্তু এর পাশাপাশি আপনি কিছু নেক কাজও করেন। যেমন– কোনো অভাবী মানুষ এলে তার অভাব মেটান না? তিনি বললেন, জি, মেটাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি গরীবদের উপর দয়া করেন না? তিনি বললেন, অবশ্যই করি। আমি বললাম, যারা সমস্যায় পড়ে আপনার কাছে আসে আপনি তাদের সমস্যা দূর করতে হাত বাড়ান না? তিনি বললেন, হাঁ, এমন কাজ তো আমি অনেক করি। আমি বললাম, এগুলোর সবই কল্যাণের কাজ, নেকীর কাজ। অতএব বোঝা গেল, আপনার আমলনামায় অনেক নেকী লেখা আছে।

আমার কথা শুনে তিনিও আশ্বস্ত হলেন যে, আমি সারা দিন বসে-বসে জনকল্যাণমূলক যে কাজগুলো করি, তা নেকীরই কাজ।

তারপর আমি তাকে বোঝালাম, মানুষের সহযোগিতা করা একটি বিরাট ছাওয়াবের কাজ। তিনি একথা শুনে বললেন, এখন আমার করণীয় কী? আমি বললাম, আমি আপনাকে কিছু কথা পড়িয়ে দিচ্ছি। এর বরকতে আপনার অতীতের সকল গুনাহের ফাইল বন্ধ হয়ে যাবে এবং একটি নতুন ফাইল শুরু হবে।

বিষয়টি সহজে তার বুঝে এল। তাই তিনি বললেন, ঠিক আছে; আমি প্রস্তুত। আমি তাকে তৎক্ষণাৎ বাইয়াতের কথাগুলো পড়িয়ে দিই। তারপর মুরাকাবা করিয়ে বিদায় দিই।

পরে হাজী সাহেব পরবর্তী ঘটনা শোনালেন, এম.এন.আই সাহেব আমার থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, ঘরে মদের যতগুলো বোতল আছে সব ভেঙে ফেলো। স্ত্রী মদের বোতলগুলো ভেঙে ফেলল। প্রথম যুগে মদখোরকে মদপান থেকে তাওবা করানো উচ্চস্তরের বুযুর্গের দ্বারাই কেবল সম্ভব হতো। অথচ আল্লাহর রহমত দেখুন, এ যুগে আল্লাহপাক আমাদের মতো লোকের দ্বারা সেই কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আল্লাহর রহমত কত ব্যাপক!

যাহোক এম.এন.আই সাহেব তার স্ত্রীকে বললেন, আমার পূর্বের জীবনের সোসাইটির লোকজন আর আমাদের ঘরে আসবে না। এখন থেকে আমি নামাযও পড়ব এবং অন্যান্য নেকীর কাজও করব। স্ত্রী বললেন, আমি তো এটা-ই চাই। আপনার জীবন যদি বদলে যায়, তবে আমি খুবই খুশি হব। স্ত্রী ভেবে পান না, হঠাৎ এমন তোলপাড় কেন? কীভাবে এই বিরাট পরিবর্তন হলো?

এম.এন.আই সাহেব নামায পড়া শুরু করলেন। একদিন তিনি টিভিতে খবর শুনলেন, হাজীদের কাফেলা হজ করতে যাচ্ছে। এই খবর শুনে তিনি স্ত্রীকে বললেন, আমি বহুবার ইউরোপ-আমেরিকা সফর করেছি; কিন্তু আজ পর্যন্ত হজ বা ওমরার জন্য যাওয়ার তাওফীক হয়নি। অথচ হজ করা ফরজ। তাই আমার মন চায়, আমিও হজ করব। স্ত্রী বললেন, অবশ্যই করবেন। সুতরাং তিনি সেখানে বসেই ধর্মমন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর কাছে ফোন দিয়ে বললেন, আমি হজে যেতে চাই। জবাবে মন্ত্রী বললেন, জনাব এম.এন.আই সাহেব! আপনি কালই চলে আসুন। আমরা আপনাকে স্পেশাল সীটে পাঠিয়ে দেব। এ ব্যাপারে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আপনি তো অবিরত ৩৫ বছর যাবত এম.এন.আই হয়ে আছেন। এ হিসেবে আপনার একটি বিশেষ

মর্যাদা আছে। আপনি যখনই আসবেন, আমরা তখনই আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

এম.এন.আই সাহেব একটি স্যুটকেস হাতে নিয়ে ধর্মমন্ত্রণালয়ে পৌঁছে যান। পরে ঘটনা এই হয় যে, ধর্মমন্ত্রণালয় এখন হাজীদের গ্রুপ নির্ধারণ করে দেয়, তখন উপস্থিত কিছু সমস্যার কারণে কিছু সীট খালি হয়ে যায়। যেমন কেউ অসুস্থতার কারণে যেতে পারল না কিংবা কারো মৃত্যু হওয়ায় সীট খালি হয়ে গেল। ধর্ম মন্ত্রণালয় এমন একটি সীটের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাকে গ্রুপলিডার বানিয়ে পাঠিয়ে দিল।

আল্লাহর শান দেখুন! তিনি হজের দিনগুলোতে তার গ্রুপের লোকদের অনেক খেদমত করেন। তিনি নিজেই খানা আনতেন এবং দস্তারখানও নিজে মানুষের সামনে বিছিয়ে দিতেন। মানুষ বলত, আমরা এই ভেবে অবাক হই যে, যার দাপটে সবাই কাঁপে, তিনি কীভাবে এমন মাটির মানুষ হয়ে গেলেন!

হজ করার পর আল্লাহ তার মুখে সুন্নতী দাড়ি রাখারও তাওফীক দিলেন।

হজশেষে তিনি দেশে ফিরে এলে ওলামায়ে কেরাম চিন্তা করলেন, এম.এন.আই সাহেব ধর্ম-কর্মের কাছেই ভিড়তেন না। এখন যেহেতু তিনি ধার্মিক হয়েছেন, তাই আমাদের কর্তব্য হলো, আমরা তার বাড়িতে গিয়ে তাকে মুবারকবাদ জানাব। সুতরাং আলাপ-আলোচনা করে তারা স্থির করলেন, ২০/২৫জন আলেম আসরের পর গিয়ে তাকে মুবারকবাদ জানাবেন।

এদিকে এম.এন.আই সাহেব আসরের নামায পড়ে ঘরে এলেন। মাথায় টুপি ছিল। হাতে তাসবীহ ছিল, যা তিনি সদ্য মদীনা হতে এনেছিলেন। এ সময় তার বাসার কলিংবেল বেজে উঠল। তিনি লোক পাঠালেন, দেখো, কে বা কারা এসেছে? লোকটি এসে বলল, শহরের ওলামায়ে কেরাম এসেছেন। তিনি বললেন, তাদেরকে মেহমানখানায় বসতে দাও। ওলামায়ে কেরাম তাশরীফ রাখেন। তিনি ওলামায়ে কেরামের সামনে এসে সকলের সঙ্গে সালাম ও কুশল বিনিময় করলেন।

এটাই ছিল প্রথম ঘটনা যে, তিনি ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে মুআনাকা (কোলাকুলি) করলেন। কুশলপর্ব শেষ হলে তিনি ওলামায়ে কেরামকে বললেন, আপনারা তাশরীফ রাখুন। আমি এখনিই আপনাদের জন্য জমজমের পানি ও খেজুর আনছি। তারপর আমি আপনাদের হজের কারগুজারি শোনাব। ওলামায়ে কেরাম তার চেহারায় দাড়ি, মাথায় টুপি এবং

হাতে তাসবীহ দেখে খুবই খুশি হলেন যে, আল্লাহপাক তার জীবনের মোড় সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন। কী ছিলেন আর কী হয়ে গেছেন! আল্লাহ চাইলে সবকিছুই সম্ভব।

এম.এন.আই সাহেব ভেতরে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, শহরের ওলামায়ে কেরাম এসেছেন। তুমি তাদের জন্য জমজমের পানি আর খেজুর দাও। আমি এর মধ্যে তাসবীহ পড়া শেষ করে নিই। স্ত্রী জমজমের পানি ও খেজুরের ব্যবস্থা করতে গেল আর এম.এন.আই সাহেব তাসবীহ হাতে নিয়ে পড়তে থাকলেন। স্ত্রী ভেতর থেকে জমজমের পানি ও খেজুর নিয়ে স্বামীর কাছে এসে দেখলেন, তিনি ইন্তেকাল করে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। আল্লাহু আকবার! যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন তিনি-

* হজ করে আসেন।
* চেহারায় সুন্নতী দাড়ি ছিল।
* মাথায় টুপি ছিল।
* হাতে তাসবীহ ছিল।
* নামায পড়ে বসেছিলেন।
* ওজুর সঙ্গে ছিলেন এবং
* অন্তরে ওলামায়ে কেরামকে হাদিয়া দেওয়ার নিয়ত ছিল।

এসব কেন হয়েছিল? এগুলো ছিল নেসবতের বরকত। যারা বলে, যারা যিকির করে তারা করেটা কী? এই বেচারারা মূলত যিকিরের তাৎপর্য ও মাহাত্মই জানে না; তাই এভাবে যিকিরের বিরোধিতা করে। কেননা, প্রবাদ আছে–

اَلنَّاسُ اَعْدَاءٌ لِمَا جَهِلُوْا

'মানুষ যে সম্পর্কে জানে না, তার শত্রুতে পরিণত হয়।'

বস্তুত এ কারণেই যিকিরকারীদের উপর যতসব অভিযোগ করা হয়।

নকশবন্দী তরিকার নামকরণ

আমাদের শায়েখগণ বাইয়াত গ্রহণকারী সালেকের কলবে আঙুল রেখে আল্লাহ-আল্লাহ যিকির শুরু করিয়ে দেন। আমি একবার বুখারার ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করি, মাশায়েখগণ কলবের উপর আঙুল রেখে যে আল্লাহ-আল্লাহ যিকির জারি করিয়ে দেন; এটা কী? তারা বললেন, আপনি

হয়ত জেনে থাকবেন যে, খাযা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী বুখারী (রহ.)-এর আসল নাম বাহাউদ্দীন ছিল। কিন্তু তিনি নকশবন্দী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আমাদের সিলসিলা (নকশবন্দী তরিকা) সাইয়্যেদুনা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) হতে চলে আসছে। এ কারণে প্রথম দিকে এ ধারাকে সিদ্দীকিয়া সিলসিলা বলা হতো। পরে খাযা বায়েযিদ বোস্তামী (রহ.)-এর পরে কোথাও-কোথাও এ ধারার নাম হয় তয়ফূরিয়া সিলসিলা।

কিন্তু খাযা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী বুখারী (রহ.)-এর যুগ থেকে এ সিলসিলার নাম হয়ে যায় নকশবন্দী সিলসিলা। পরে এই নামটিই ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এমনকি আপনি যাকেই জিজ্ঞাসা করবেন, আপনার ইসলাহী সম্পর্ক কোন্ তরীকার সঙ্গে? আপনার একই জবাব মিলবে, নকশবন্দী তরীকার সঙ্গে। এভাবে এই তরিকাটি নকশবন্দী তরিকা নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

এর উদাহরণ এমন, যেন কোনো লোক নিজেকে عَلَوِی বলা শুরু করল। কিছু দিনের মধ্যে সে বংশগতভাবে عَلَوِی হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। এমনকি এক সময় এই নামটিই হয়ে যায় তার পরিচিতি। বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী (রহ.) রাবীদের নাম লিখেছেন এবং পাশাপাশি عَلَوِيًّا. عُثْمَانِيًّا-ও লিখেছেন। যখন বুখারী শরীফেও علوی এবং عثمانی এর নেসবতের প্রমাণ মেলে, তখন জানা গেল, পরিচিতির জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে আমরা যদি বলি, আমরা নকশবন্দী, তাহলে এই একটি শব্দই বলে দেয়, তার সম্পর্ক কোন বুযুর্গের সঙ্গে।

যাহোক, বুখারার ওলামায়ে কেরাম বলেন, আপনি আপনার হাতের আঙুল দেখান তো। হাতের আঙুলগুলো الله শব্দের রূপ ধারণ করে আছে। খাযা বাহাউদ্দীন (রহ.)ও আঙুল দ্বারা الله নামের রূপ বানাতেন এবং আল্লাহ তাকে যে রূহানী শক্তি দিয়েছিলেন, সেই রূহানী শক্তি দ্বারা মানুষের কলবে আঙুল রেখে الله শব্দ বলতেন। তিনি মূলত–

كان ينقش اسم الله على قلوب السالكين

'তিনি সালেকদের দিলে আল্লাহর নাম এঁকে দিতেন।'

বাস্তবিকই সালেকরা অনুভব করত, তাদের দিলে আল্লাহর নাম খোদাই করে দেওয়া হয়েছে। তিনি যেহেতু সালেকদের অন্তরে আল্লাহর নাম নকশা করে দিতেন, তাই তিনি নকশবন্দী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কলবে আঙুল লাগানোর ফায়দা প্রাণ ত্যাগের সময় প্রকাশ

আমার মুরশিদে আলম গোলাম হাবীব নকশবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) একবার একটি আজব কথা বললেন। তিনি বললেন, হযরত খাযা ফজলে আলী কুরাইশী (রহ.) বলতেন–

جس قلب پر یہ انگلی لگ گئی اسکو کلمے کے بغیر موت نہیں آسکتی

'যে কলবে এই আঙুল লাগে, সেই কলবের কালেমা ব্যতীত মৃত্যু হতে পারে না।'

মুরশিদে আলম (রহ.) এ সময় খুব খোশ মেজাজে ছিলেন। আমি তখন হযরতের খেদমতে ছিলাম। তাই সময়টিকে গনীমত মনে করে নিবেদন করলাম, হযরত! এ তো বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কথা! আমার এটুকু কথা শুনেই তিনি আমার কথার মতলব বুঝে ফেললেন। তাই তিনি বললেন, বিষয়টি আমি তোমাকে খুলে বলছি।

মুরশিদে আলম (রহ.) বলেন, শায়েখ যখন কলবের উপর আঙুল রেখে اللہ اللہ এর যিকির পাঠ করেন, তখন একটি নূর ওই লোকের কলবে চলে আসে। তারপর যদি তার সম্পর্ক শায়েখের সঙ্গে নাও থাকে, সে ঠিকমত মামুলাত আদায় নাও করে, বরং গাফলতের জীবন কাটায়, তারপরও মৃত্যুর সময় যখন একেবারে শেষ সময়ে উপনীত হয়, তখন একটি ক্ষণ এমনও হয়, যখন তার চোখের সামনে আখেরাতের দৃশ্য ভেসে উঠতে থাকে এবং দুনিয়াও তার সামনে থাকে। ধীরে-ধীরে দুনিয়ার চিত্র অপসারিত হতে থাকে এবং আখেরাতের দৃশ্যাবলী সামনে বেশি আসতে থাকে।

কিন্তু একটা সময় এমনও হয়, যখন আখেরাতের দৃশ্যও চলে আসে এবং দুনিয়ারও কিছু দৃশ্য বিদ্যমান থাকে। এটি এমন একটি সময়, যখন একদিকে মৃত্যুর চিত্র সামনে চলে আসে আর অপর দিকে দুনিয়ারও কিছু হুঁশ বাকি থাকে। ঠিক এই সময় যে বান্দা কোনো দিন তার শায়েখ থেকে اللہ اللہ এর যিকির ধারণ করেছিল কিন্তু পরে সে গাফেল অবস্থায় জীবন কাটিয়েছে, সে এ সময় এসে এই اللہ اللہ এর যিকিরের তাৎপর্য ও গুরুত্বের বিষয়টি তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে اللہ اللہ এর নূরের বরকতে আল্লাহ তাকে কালেমার উপর মৃত্যু দান করেন।

জীবন বদলের ধারা

এ কারণে আপনাদের যেসব মামুলাত দেওয়া হয়, তা নিয়মিত আদায় করতে থাকুন। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বরকত অচিরেই দেখতে পাবেন। যিনি

ডাক্তার, তার একথা বলার প্রয়োজন হয় না যে, তুমি সুস্থ হচ্ছ। এটা তো রোগী নিজেই বলে যে, আমার অবস্থা ভালো হচ্ছে। আমাদের শায়েখদেরও তরিকা এটা। তারা নিজেরা কিছু বলেন না; বরং সালেক (সাধক) নিজেই বলে, ক্রমে আমার জীবনে পরিবর্তন আসছে। আমি নিজেকে আগের তুলনায় ভালো মনে করছি। আমার মাঝে এখন নেকীর আগ্রহ বেশি এবং আমি অমুক অমুক মন্দ কাজ বর্জন করেছি।

অতএব খানকাতে শায়েখগণ যে الله الله এর যিকির করান, সে ব্যাপারে মাথায় একথা যেন না আসে যে, তারা শুধু তাসবীহ পড়ান আর জপ করান। না; কথা কেবল এতটুকুই নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে শুধু জপই মনে হয়; কিন্তু এর মধ্যেই জীবনের ধারা পরিবর্তনের বীজ নিহিত থাকে। আর যেসব খানকায় গতানুগতিক পীর-মুরিদী চলে, তার কথা ভিন্ন। সকল খানকাকে এক পাল্লায় মাপলে চলবে না। যেসব খানকায় সঠিক ইসলাহী কার্যক্রম চলে, সেখানকার রংই ভিন্ন। সেগুলো সত্যিকার মানব গড়ার কারখানা।

সকল ক্ষেত্রে কিছু না কিছু অপূর্ণতা ও ত্রুটি রয়েছে। যেমন– পূর্বের যুগে যেমন আলেম ছিল, এখন কি তেমন পর্যায়ের আলেম পাওয়া যায়? কোথাও কোথাও দু-একজন মিলে। এমনিভাবে আগের যুগে যারা মাশায়েখ ছিলেন, তেমন পর্যায়ের শায়েখ বর্তমানে কোথায় মিলবে? বর্তমান যুগ যোগ্য লোকের অভাবের যুগ। এমন বান্দার সংখ্যা খুবই কম, যারা শরীয়তকে সামনে রেখে জীবন পরিচালনা করেন। অতএব আমাদের কর্তব্য হলো, সুন্নত ও শরীয়তের অনুসারী মাশায়েখদের সঙ্গে নিজেরাও সম্পর্ক গড়ে তুলব এবং আমাদের সন্তানদেরও তাঁদের সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক গড়ে দিব।

ইসলাহী সম্পর্কের বরকত

আমি আপনাদেরকে একটি কথা বলতে চাই। আর তা হলো, আপনারা পরীক্ষা করে দেখুন, আপনার যে সন্তানটি সবচেয়ে বেশি খারাপ, তাকে কোনো আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের হাতে বাইয়াত করিয়ে দিন। যদি সম্পর্ক গভীর হয়, তাহলে তার জীবনে অবশ্যই পরিবর্তন আসবে। এটি কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। আলহামদুলিল্লাহ! এটি আমার পরীক্ষিত বিষয়। অনেক মানুষের ক্ষেত্রে আমি এটি পরীক্ষা করেছি। আমাদের মাশায়েখগণ যে তাওবানামা পড়ান, তার উদ্দেশ্য এটিই যে, মানুষের জীবন বদলে যাক এবং সে অলসতার জীবন ছেড়ে শরীয়ত ও সুন্নতী জীবন যাপন করুক।

তাই এমন বুযুর্গদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা, তাদের থেকে الله الله শেখা এবং নিজের জীবন একটি নিয়মে পরিচালনা করা মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতির বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই একে ইসলাহী সম্পর্ক বলে।

মনে রাখবেন, সালেকদের তাসবীহ জপার যে সবক আমরা দিয়ে থাকি, তার দ্বারা মৌলিক উদ্দেশ্য হলো ইসলাহ তথা সংশোধন, যাতে দিলের মধ্যে দীনের মহব্বত গেঁথে যায়। যেব্যক্তি সহীহ নিয়তে আমাদের কাছে আসে, আল্লাহ তা'আলা তার জীবনকে অবশ্যই বদলে দেন।

আজকের মাহফিলটি সমাপণী অনুষ্ঠান ছিল; তাই বাইয়াত সম্পর্কে এসব কথা বললাম। হতে পারে, কতক বন্ধু এমনও হবেন, যারা খানকার নাম জীবনেও শোনেননি। যখন নামটিই জানা নেই, তখন তাদের কর্ম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কীভাবে অবহিত হবেন?

মনে রাখবেন, আত্মশুদ্ধি দীনেরই অন্যতম শাখা ও অঙ্গ। এক কবি অতি সুন্দর বলেছেন–

خوشا مسجد ومدرسہ خانقاہ

کہ در وے بود قیل وقال محمد

পৃথিবীর উপর ভালো জায়গা মসজিদ মাদরাসা খানকা,
নবীজির বাণী করে আলোচনা তথায় সকল ফেরকা।

১০ দিন এতেকাফের সুফল

আপনি এখানে ১০ দিন এতেকাফ করুন। গুনলে তো ১০দিনই হবে; কিন্তু আপনি এর সুফল সারা বছর অনুভব করবেন ইনশাআল্লাহ। সামনের রমযান পর্যন্ত আপনার দিল সাক্ষ্য দিবে, আপনি এই ১০ দিনের প্রতিক্রিয়া অনুভব করছেন। এটি কোনো বাহ্যিক বিষয় নয়, যা আপনি বস্তা ভরে নিয়ে যাবেন; বরং এটি এমন একটি জিনিস, যা বক্ষ হতে বক্ষে স্থানান্তরিত হয়। এটি বলা-কওয়া ছাড়াই নিজের প্রভাব বিস্তার করে। একে 'ফয়েজ' ও 'নূর' বলে। আল্লাহপাক আমাদেকে এই নূর হেফাযত করার তাওফীক দিন। বিশেষ করে যারা এতেকাফে বসেছেন, তাদের কর্তব্য হলো নিজেদের জীবনের ধারা পাল্টে ফেলা। যেভাবে তারা অতীত গুনাহ হতে তাওবা করে পাক-সাফ হয়েছেন, সেভাবে তারা সারা বছর গুনাহ হতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবেন। আল্লাহপাক তাদের মদদদাতা ও সাহায্যকারী হবেন এবং আল্লাহর

উপর ভরসা করে বলা যায়, এ ব্যাপারে তারা আল্লাহর পক্ষ হতে গায়েবী মদদ পাবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও শুকরিয়া আদায়

স্থানীয় বন্ধুবর্গ! যারা আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং এত সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন, এতেকাফকারীদের পক্ষ হতে এবং আমার পক্ষ হতে তাদের সকলের শুকরিয়া আদায় করছি।

কেননা, হাদীছে এসেছে–

مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ.

'যেব্যক্তি মানুষের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহরও শুকরিয়া আদায় করে না।'

ব্যবস্থাপকগণ অত্যন্ত আবেগ, আগ্রহ ও মহব্বতের সাথে আমার মতো অধমকে এখানে আসার দাওয়াত দিয়েছেন। আমরা এখানে সব দিক দিয়ে ভালো ছিলাম এবং প্রফুল্লচিত্তে এখান থেকে বিদায় নেব ইনশাআল্লাহ। যাওয়ার সময় এই দু'আ দিতে চাই যে, হে আল্লাহ! আপনার এই বান্দাগণ আমার মতো অধমের দিল খুশি করেছেন, এর প্রতিদানে আপনি তাদের সকলের দিল খুশি করে দিন।

নেককার স্বামী তার স্ত্রীর মুরশিদ হতে পারেন

যেসব মহিলা বাইয়াত হয়েছেন, তাদের স্বামীদের নিকট বিনীত নিবেদন হলো, আপনারা তাদেরকে তাদের মামুলাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। বরং মনে রাখবেন, স্বামী যদি নেককার হন, তাহলে তিনিও তার স্ত্রীর মুরশিদ হতে পারেন। কিন্তু কষ্টের কথা হলো, বর্তমানে স্বামীরাই স্ত্রীদের দীনদার হতে বাধা সৃষ্টি করে। বাইয়াত গ্রহণকারী মহিলারা আগে পর্দা না করলেও এখন যদি পর্দা করতে চায়, তাহলে তাদের এ মহতি কাজে বাধা দিবেন না। তারা বয়ান শুনে যখন ইচ্ছা করেছেন যে, সামনের থেকে পর্দা মেনে চলবেন, তখন স্বামী হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব তার ইচ্ছাকে সমর্থন করা এবং এর জন্য তাকে সার্বিক সহযোগিতা করা। যদি তা না করে আপনি এড়িয়ে চলতে থাকেন এবং বিরূপ মন্তব্য করেন, তাহলে শয়তান তাদের উপরে মেহনত শুরু করে দিবে এবং তাদেরকে বিপদগামী করতে পূর্ণ এক বছর সময় পেয়ে যাবে। এক বছর মেহনত করে শয়তান তাদেরকে দীন থেকে পিছিয়ে দেবে।

মহিলাদের ধন্যবাদযোগ্য মেহনত

যেসব মহিলা খানা রান্না করেছেন, রাত জেগেছেন এবং দিনের বেলায় বয়ান শোনার জন্য সবকিছু ফেলে চলে এসেছেন, তাদেরকে আল্লাহপাক উত্তম প্রতিদান দান করুন। কেননা, এতগুলো মেহমানের রমযান মাসে সাহরী-ইফতারের ব্যবস্থা করা সত্যিই ধন্যবাদযোগ্য বিষয়। আমি তাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ প্রদান করছি। তারা শুধু এক ধরনের খানা নয়; বরং কয়েক আইটেমের খানার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা মেহমানরাই এসব খানা মজা করে খেয়েছি। স্থানীয় বন্ধুগণ তো শুধু চা দ্বারা ইফতার করেছেন। বাকি সকল খানা আমাদের জন্যই ছিল এবং আমরা সেগুলো বড়ই আনন্দের সঙ্গে খেয়েছি। এমন ভালো মেজবান খুব কমই মিলে।

যাহোক, আল্লাহ তা'আলা সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। যারা যে নিয়তে খেদমত করেছেন আল্লাহপাক তাদের সকলের নেক নিয়ত পূর্ণ করুন। যেসব পিতামাতা তাদের সন্তানদের ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্ত, আমরা তাদের জন্য দু'আ করি, আল্লাহপাক তাদের সন্তানদের নেককার বানিয়ে দিন এবং তাদের চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন। আমীন।

আগামী বছর এতেকাফের দাওয়াত

এ বছর আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম এক নিয়মে চলেছে। সাথীবৃন্দ ও উপস্থিত হযরতদের বলি, আপনারাও আগামী বছর আসবেন। আমিও নিয়ত করেছি, আল্লাহপাক যদি হায়াতে রাখেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আগামী বর্ষরও এখানে আসব। ইনশাআল্লাহ আগামী বছর বর্তমানের কার্যক্রমসহ অন্যান্য ইসলাহী কার্যক্রম চলবে। যা কিছু আপনারা এবার এখান থেকে শুনেছেন, সেগুলো মনে রাখবেন, প্রয়োজনে লিখে রাখবেন। সারা বছর মাঝেমধ্যে দেখবেন, যাতে করণীয় বিষয়গুলো তাজা থাকে, মনে থাকে।

স্থানীয় বন্ধুদের প্রতি আহ্বান

স্থানীয় বন্ধুগণ! যারা আগামী বছরের জন্য দাওয়াত দিচ্ছেন, তাদের খেদমতে আমার নিবেদন, তারা আগামী বছরের প্রোগ্রামের ব্যাপারে অন্য এলাকার বন্ধুদের অবশ্যই জানাবেন। কেননা, গতবছর এতেকাফের পর আমাকে বিভিন্ন এলাকার বন্ধুরা বলেছেন, আমরা তো হযরতের এতেকাফের বিষয়টি জানিই না। জানলে আমরাও শরীক হতাম। এবারও দেশের বাইরের কাউকে জানানো হয়নি। তাই সামনের বছর এটি অবশ্যই করবেন যে,

বছরের মাঝখানে আপনাদের সঙ্গে যেসব ওলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্টজনদের দেখা হবে, তাদের আগে থেকেই জানিয়ে দিবেন, আমাদের এখানে এতেকাফ হবে; যারা শরীক হতে চান শরীক হবেন। এতে ফায়দা হবে বেশি। যত বেশি মানুষ শরীক হবে, আপনাদের তত বেশি ফায়দা হবে।

বাস্তবতা স্বীকার

আমরা এখানে যা কিছু করেছি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছি। তারপরও আমাদের বেশি-বেশি ইস্তেগফার করতে হবে। কেননা, এতেকাফের সময় যেসব আদব পালন করা দরকার ছিল, অবশ্যই তাতে আমাদের ত্রুটি হয়েছে। আমরা এতেকাফের পুরো হক আদায় করতে পারিনি। এতেকাফের সুযোগকে আমাদের আরও বেশি কাজে লাগানোর দরকার ছিল।

ہرچہ گیرد علتی علت شود

'দোষী লোক কিছু করলে তাতে দোষই থাকে।'

যাহোক, আমরা নিজেদের অলসতা আর ত্রুটির কথা স্বীকার করত লজ্জা-অনুতাপের সঙ্গে আল্লাহর দরবারে ইস্তেগফার করছি। আমাদের কোনো কথার দ্বারা বা যদি কারও মনে কোনো কষ্ট গিয়ে থাকে, কিংবা যদি আমাদের থেকে কোনো গুনাহ হয়ে থাকে বা আমাদের কোনো কাজ আল্লাহর অপছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে সেসব থেকে আমরা তাওবা করছি। পাশাপাশি দু'আ করছি, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ত্রুটিগুলোর প্রতি না তাকিয়ে আপনার রহমতের খাযানার প্রতি তাকান এবং আমাদের খালি ঝোলাগুলো ভরে দিন। দুনিয়ারও রীতি হলো, কেউ যদি কারও চাকরি করে, তাহলে বাড়ি যাওয়ার সময় মালিক তাকে কিছু না কিছু দিয়েই তবে তাকে বিদায় করে। আমরা তো মহান আল্লাহর দরজায় এসে ধরণা দিয়েছি এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এখানে বসে রয়েছি। সেজন্য আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের ঝোলাগুলো ভরে দেন। এই মুহূর্তে আপনারা আল্লাহর প্রতি রুজু হয়ে দু'আ করুন। গোটা উম্মতের জন্য দু'আ করুন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের দু'আ কবুল করবেন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

'হে মানুষ! তোমাদের এই অবাধ্যতা তোমাদেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে।' –সূরা ইউনুস : ২৩

গুনাহের কুফল

[২০০২ সালের ২৬ জানুয়ারী করাচীর গুলশান ইকবালের স্কাউট কলোনীতে অবস্থিত মাদরাসা আরাবিয়া ইসলামিয়ায় হযরতওয়ালা দামাত বারাকাতুহুম এই গুরুত্বপূর্ণ বয়ানটি পেশ করেন।]

'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ.

'যে মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে।'[১]

এ আয়াত হতে যে মূলনীতিটি বের হয়, তাহলো, যেব্যক্তি গুনাহ করবে, তার দায়ভার অবশ্যই তার উপর বর্তাবে।

বরফ থাকবে; অথচ ঠাণ্ডা লাগবে না।

আগুন থাকবে; অথচ গরম লাগবে না।

গুনাহ হবে; অথচ তার কুফল বর্তাবে না।

এ কীভাবে সম্ভব?

মনে রাখবেন, গুনাহের শাস্তি অবশ্যই হয়, যদিও অনেক সময় আমাদের তা অনুভূত হয় না।'

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১২৩

গুনাহের কুফল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ.

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ: مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

গুনাহ ছাড়ার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ.

'তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ ছেড়ে দাও।'[১]

আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা ও রাসূলের সুন্নত থেকে বিমুখতাই হলো গুনাহ। গুনাহের কারণে প্রত্যেক মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই আল্লাহপাক মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন–

'তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের গুনাহ পরিহার কর।'

যদি গুনাহ কর, তাহলে এর শাস্তি অবশ্যই তোমাকে ভোগ করতে হবে। তবে তাওবা করলে আল্লাহপাক ক্ষমা করে দিবেন বলে ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহপাক কখনই ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

গুনাহের ক্ষতিসমূহ জানাও জরুরি

ইমাম গাযযালী (রহ.) احياء علوم الدين নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন–

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ১২০

'প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি তো সে, যে গুনাহের ক্ষতি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত।'

তিনি আরও বলেন–

'যে গুনাহের ক্ষতি সম্পর্কে যত বেশি জানে, সে তত বড় জ্ঞানী।'

কথাটি খুবই দামী। কারণ, মানুষ যখন কোনো বস্তুর ক্ষতি সম্পর্কে জানে, তখন সে তা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে। এটিই মানুষের স্বভাব। তাই গুনাহের ক্ষতি সম্পর্কে জানার গুরুত্ব অপরিসীম।

বিষয়টি ভালো করে বোঝার জন্য কয়েকটি উদারণ পেশ করছি।

(১) আপনি বিষক্রিয়া সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত। তাই তা থেকে বেঁচে থাকেন। আপনাকে যদি বলা হয়, এখানে একশ পিস বিস্কুট আছে, যার ৯৯টি ভালো, তবে একটিতে বিষ মিশ্রিত আছে, আপনি এর থেকে খান, তাহলে আপনি খাবেন? কখনোই না। কেন? ৯৯টি ভালো থাকলেও আপনি কেন খাবেন না? এজন্য খাবেন না যে, হতে পারে, যে বিস্কুটটি আপনি মুখে দিচ্ছেন, ঘটনাক্রমে সেটিই বিষমিশ্রিত। যেহেতু আপনার জানা আছে, বিষমিশ্রিত বিস্কুট খেলে আপনার মৃত্যু অবধারিত, তাই আপনি তা খেতে রাজি হবেন না।

পক্ষান্তরে একটি অবুঝ শিশু যে বিষক্রিয়া সম্পর্কে জানে না, বোঝে না, তার হাতে আপনি বিষমিশ্রিত একটি বিস্কুট তুলে দিয়ে বললেন, এতে বিষ মেশানো আছে, তুমি খেতে পার, আপনার বলতে দেরি হবে; কিন্তু তার খেতে দেরি হবে না। এর কারণ তো সুস্পষ্ট যে, এই ছোট বাচ্চা জানে না, বিষ খেলে কী হয়? এ উদাহরণ দ্বারা একথাই পরিষ্কার হয় যে, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ক্ষতিকর বস্তু সম্পর্কে অবগত হবে, তখন সে ওই বস্তুর কাছেও যাবে না এবং যথাসাধ্য তা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবে।

(২) এমনিভাবে আমরা সাপের ক্ষতি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত। ছোট বাচ্চাও ভালোভাবে জানে, সাপ কামড়ালে মানুষ মারা যায়। এমনকি প্লাস্টিকের সাপ দেখেও আমরা ভয় পেয়ে যাই। বড় সাপ তো দূরের কথা ছোট সাপও যদি দেখি, সাপ! সাপ!! বলে চিৎকার করতে থাকি। যতক্ষণ না সাপটা মারা হয়, ভয় কাটে না। আমরা যেহেতু সাপের ক্ষতি সম্পর্কে জানি, তাই না মারা পর্যন্ত স্থির হই না। আমাদের অস্থিরতা দূর হয় না।

(৩) আমরা আরও জানি, এক শ্রেণীর লোক মানুষের বাড়িতে রাতের আঁধারে ডাকাতি করে এবং ডাকাতি করতে গিয়ে বাড়ির মালিকের পক্ষ থেকে

বাধাপ্রাপ্ত হলে প্রয়োজনে তারা বাড়ির মালিককেও হত্যা করে। তাই রাতে বাড়ির মালিকরা একটু ভয়ে-ভয়ে থাকে। ধরুন, কোনো অপরিচিত লোক রাতের আঁধারে এসে আপনার দরজায় কড়া নাড়ল, অমনিই আপনি দরজা খুলে দিবেন, না-কি তাকে বলবেন, আগে তোমার পরিচয় দাও। তারপর দরজা খুলবেন। আপনি তার পরিচয় পাওয়ার আগে দরজা খুলবনে না। এমনকি যদি সে বলে, বাইরে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে; দয়া করে তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলুন! আপনি তাতেও দরজা খুলতে রাজি হবেন না। আপনি মনে করবেন, হতে পারে, সে একজন দস্যু বা ডাকাত। এত পীড়াপীড়ির পরও আপনি দরজা খোলেন না। এর কারণ আপনিও জানেন যে, সে ডাকাত হলে আপনার সর্বনাশ করে ছাড়বে। তাই আপনি অপরিচিত লোকের ডাকে গভীর রাতে সাড়া দিতে রাজি হন না।

উপরের উদাহরণগুলো বুঝে এসে থাকলে কিছু কথা স্মরণে রাখতে হবে-

(১) নফসের খাহেশাত বা রিপুর কামনা-বাসনা আমাদের জন্য বিষতুল্য। নফ্স আমাদের অন্তরে যে সকল খারাপ চিন্তার জন্ম দেয়, তা বিষের মতো। যেমনিভাবে মানুষ বিষ থেকে বেঁচে থাকে, ঠিক তেমনি নফসের কুচিন্তা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। কেননা, বিষের ক্ষতি জেনে বুঝে বিষ মাখানো বিস্কুট সে প্রত্যাখ্যান করেছিল, ঠিক তদ্রূপ নফ্স যতই খারাপের দিকে ডাকুক-না কেন, জেনে-বুঝে তার ডাকে সাড়া দিবে না। কারণ, তার অভিজ্ঞতা রয়েছে, নফ্স তাকে বিষের মতোই ধ্বংসের কোলে ঠেলে দেয়।

(২) এমনিভাবে খারাপ বন্ধু সাপের মতো ক্ষতিকর। তাই এক আল্লাহর ওলী বলেন–

یار بد مار بد سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے

'দুষ্ট বন্ধু সাপ থেকেও অধিক ক্ষতিকর।'

কেননা, বিষাক্ত সাপ কামড়ালে দেহের মৃত্যু অবধারিত আর খারাপ বন্ধুর কারণে অন্তরের মৃত্যু অনিবার্য হয়। দেহের মৃত্যু শুধু দুনিয়ার ক্ষতি। পক্ষান্তরে অন্তরের মৃত্যু দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতের ক্ষতির কারণ হয়।

আমি বলি, খারাপ বন্ধু শয়তানের চেয়েও অধিক খারাপ ও ক্ষতিকর। এর কারণ হলো, শয়তান তো মানুষকে শুধু গুনাহের দিকে ডাকে। পক্ষান্তরে খারাপ বন্ধু হাত ধরে গুনাহের কাজে লিপ্ত করে দেয়। সুতরাং খারাপ বন্ধু সাপ ও শয়তান থেকে অধিক ক্ষতিকর।

(৩) যেমনিভাবে আমরা ডাকাতের ভয়ে রাতের আঁধারে অপরিচিত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেই না, ঠিক তেমনি, শয়তানের দৃষ্টান্ত হলো- আমাদের ঈমান ডাকাতি করার মতো। ডাকাত চিন্তা করে আর সুযোগ খুঁজতে থাকে, এমন সময় ডাকাতি করতে হবে, যেন বাড়ির লোকজন টের না পায় এবং উদ্দেশ্যও যেন হাতছাড়া না হয়। এর বিপরীতে শয়তান মানুষের পিছনে ওঁৎ পেতে থাকে। মানুষ যখনই আল্লাহর ইবাদাত হতে গাফেল থাকে, তখনই শয়তান মানুষের মনে কুচিন্তা দিয়ে তাকে আল্লাহর নাফরমানির কাজে লিপ্ত রাখে। তাই আমরা যখন শয়তানের ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হব, তখন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমাদের অন্তরকে পাক-পবিত্র রাখতে পারব। ফলে অন্তরে সর্বদা আল্লাহর স্মরণ চালু থাকবে।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা একথা পরিষ্কার হলো যে, আমরা যখন গুনাহের ক্ষতি জানতে পারব, তখন তা থেকে বেঁচে থাকাও সম্ভব হবে।

আমরা দেখেছি, ডাক্তারকে তৈলাক্ত খাবার খেতে দিলে তিনি তা খেতে অসম্মতি জানান। কিন্তু তার তো কোনো রোগ নেই। এর কারণ কী? কেউ তাকে প্রশ্ন করল, ডাক্তার সাহেব! আপনি তৈলাক্ত খাবার খান না কেন? জবাববে বলেন, তৈলাক্ত খাবার খেলে গ্যাস্ট্রিক হয় (বুক জ্বলে)। পক্ষান্তরে যারা জানে না, তৈলাক্ত খাবার খেলে কী ক্ষতি হয়, তারা সকাল-সন্ধ্যা তৈলাক্ত খাবার খুব মজা করেই খেয়ে থাকে। কিন্তু এর ক্ষতিসমূহ তাদের জানা নেই। এ ছাড়াও ডাক্তার সফরে বের হলে মিনারেল ওয়াটার (বিশুদ্ধ পানি) ছাড়া অন্য কোনো পানি পান করেন না। কেউ তাকে প্রশ্ন করল, ডাক্তার সাহেব! আপনি পানিও বেছে পান করেন নাকি? এর কারণটা জানতে পারি কি? জবাবে তিনি বলেন, মিনারেল ওয়াটার (বিশুদ্ধ) ছাড়া অন্য পানিতে জীবাণু থাকতে পারে, যা পান করলে শরীরে রোগ-ব্যাধি ছড়াতে পারে; তাই বিশুদ্ধ পানি পান করি। এমনকি ডাক্তার যখন রোগীকে অপারেশন বা ট্রিটমেন করেন, তখন রাবারের হাতমোজা (হ্যান্ড গ্লাপস) এবং মুখে মাস্ক পরিধান করে থাকেন। কারণ, ডাক্তার সাহেব ভালো করেই জানেন, রোগীদের সাথে থাকতে-থাকতে কোনো-না-কোনো রোগজীবাণু তার শরীরে ছড়িয়ে যেতে পারে। তাই তিনি সর্বদা সবধরনের সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন।

আরেকটি বাস্তব উদাহরণ নিন। আমাদের রাস্তাগুলোর পাশে বিদ্যুতের খুঁটি দিয়ে তারের মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ সাপ্লাই হয়ে থাকে, আপনি যদি কোনো

ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারকে বলেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! এই তারে একটু স্পর্শ করুন তো। উত্তরে তিনি বলবেন, ভাই! আপনি কি আমাকে বোকা পেয়েছেন? যদি আপনি তাকে বলেন, সামান্য স্পর্শ করলে কী হবে? আপনি ধরুন তো! উত্তরে তিনি বলবেন, বিদ্যুৎ এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ছাড়বে না; বরং প্রথম ধাপেই আমাকে আঘাত করে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিবে। ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ভালো করেই জানে, এই তারে কী পরিমাণ ভোল্টেজ আছে, যা জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ যার এ ব্যাপারে সামান্যতম ধারণাও নেই, সে তো আপনার কথা শুনে ধোঁকা খেয়ে প্রাণ হারাবে। কেননা, সে এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। ঠিক একইভাবে সাধারণ মানুষ যেহেতু গুনাহের ক্ষতি সম্পর্কে জানে না তাই তারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে না। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম যেহেতু গুনাহের ক্ষতি সম্পর্কে জানেন এবং একথাও তাদের জানা আছে যে, গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহপাকের রহমত থেকে অনেক দূরে চলে যায়, তাই তারা গুনাহের কাছেও যান না।

জ্ঞানী হয়েও পথহারা

যেব্যক্তি গুনাহ আর নেকীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না; বরং একদিকে গুনাহ করে আর অন্যদিকে জায়নামাযে বসে তাসবীহ টিপে, এ ধরনের লোক জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও নির্বোধ। কেননা, তার জ্ঞান উপকারী না হয়ে অপকারী জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য হলো–

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ

'হে নবী! আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহপাক জেনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন।'[১]

'ইল্‌ম থাকা সত্ত্বেও পথহারা'-এর অর্থ কী?

আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ধূমপানে অভ্যস্ত। তারা ভালোভাবেই জানে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তারপরও তারা ধূমপান করেই যাচ্ছে। এমনকি সিগারেট কোম্পনীগুলোও প্রতিটি প্যাকেটের গায়ে লিখে দেয় 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'।

---

১. সূরা জাছিয়া : আয়াত ২৩

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যারা রীতিমত ধূমপান করেন, তারা অন্যকে উপদেশ দেন, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই তোমরা এর অভ্যাস করো না। একথা বাস্তব সত্য যে, তারা ধূমপান ক্ষতিকর জেনেও তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে না; বরং এত বেশি ধূমপান করে যে, খাবারের আগে একটা আর খাবারের পরে আরেকটা সিগারেট তাদের চাই-ই। একেই বলে ইল্‌ম থাকা সত্ত্বেও পথহারা। অর্থাৎ জেনেও অজ্ঞ ব্যক্তির মতো চলা।

এমনিভাবে আমরা জানি, পরনারীর দিকে তাকানো কবীরা গুনাহ। কিন্তু আমাদের চোখ কি আমাদের কন্ট্রোলে আছে, না-কি ব্রেক ছাড়াই এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়ায়?

যদি আমাদের চোখ কন্ট্রোলে না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, আমরা রোগী। যার ফলে চোখ আমাদের অধীনে থেকেও তা আমাদের আয়ত্বের বাইরে। যেব্যক্তির ইল্‌মে নাফে' (উপকারী জ্ঞান যা গুনাহ থেকে হেফাযত করে) আছে এবং গুনাহের ক্ষতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা আছে, সে কখনোই গুনাহের কাছে যাবে না; বরং যথাসম্ভব তা থেকে বেঁচে থাকবে।

নেকী ও গুনাহের মধ্যে পার্থক্য

আলো আর অন্ধকারের মধ্যে যেমন পার্থক্য, ঠিক তেমন পার্থক্য নেকী আর গুনাহের মধ্যে। যেমনিভাবে অন্ধকার ঘরে সাপ-বিচ্ছু থাকা না থাকা কিছুই চোখে দেখা যায় না এবং সাপ-বিচ্ছু থাকলেও তা থেকে বাঁচা সহজ হয় না। তাছাড়া অন্ধকারে মনে হবে পুরো ঘরটাই যেন সাপ-বিচ্ছুতে কিলবিল করছে। হ্যাঁ যদি ঘরে আলো থাকে, তাহলে দেখা যাবে সাপ-বিচ্ছু কোথায় লুকিয়ে আছে এবং কতগুলো আছে। ঠিক একইভাবে যার অন্তরে উপকারী ইল্‌মের নূর আছে, সে তার এই উপকারী ইল্‌মের নূর দ্বারা গুনাহের সাপ-বিচ্ছু দেখতে সক্ষম হবে এবং তার ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকাও তার জন্য সহজ হবে।

আলোকিত অন্তরের হেফাযত

আল্লাহর ওলী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এত পার্থক্য হওয়ার কারণ কী? কারণ একটাই। আর তা হলো গুনাহ। আল্লাহর ওলীগণ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে না। দেখা যায়, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ মাঝে-মধ্যে এমন বড় নেকীর কাজ করে, যা কি-না সর্বদা আল্লাহপাকের বিশেষ অলীরা করে থাকেন।

বাস্তবতা হলো, আমরা সাধারণ মুসলমানরা অন্তরে নূর পয়দা করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে আল্লাহপাকের দিকে একনিষ্ঠ হয়ে এবং খুব দিল লাগিয়ে নামায আদায় করে থাকি; কিন্তু মসজিদ থেকে নামায আদায় করে বাড়িতে ফেরার আগেই পথেই সব নেক আমলকে গুনাহের মাধ্যমে নষ্ট করে ফেলি। যার ফলে নেক আমলের দ্বারা যে নেকী হাসিল হয়েছিল, তা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদেরকে খালি হাতেই বাড়ি ফিরতে হয়।

এর দৃষ্টান্ত হলো কাঁচা মাটির তৈরী ঘরের মতো। যদি তা শুকানোর আগেই কেউ তাতে পানি ঢেলে দেয়, তাহলে ওই ঘরের কী অবস্থা হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঠিক এমন অবস্থা আমাদেরও। আমরা মসজিদে বসে-বসে নেক আমল করে অন্তরকে আলোকিত করি। কিন্তু মসজিদ থেকে বের হয়ে যখন পরস্পরে আলোচনা করতে থাকি, ঠিক তখনই একে অন্যের গীবত, পরনিন্দা, ও কুদৃষ্টি ইত্যাদি গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ি, যার ফলে আমাদের নেকীগুলোকে গুনাহে পরিণত করে ফেলি। আর এভাবেই আমরা আমাদের অন্তরের নূরকে নষ্ট করে ফেলি। অথচ তা হেফাযতের জন্য আমরা কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করি না।

আমার জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা। আমি একবার বাথরুমে দেখি, বন্ধ কলের নীচে একটি বালতি রাখা এবং কলটি হালকা লুজ করা, যার কারণে ফোঁটা-ফোঁটা পানি ওই বালতিতে পড়ছিল। এভাবে ফোঁটা-ফোঁটা পানিতে একপর্যায়ে বালতিটা ভরে গেছে। বালতির পাশেই একটা বদনা রাখা ছিল। আমি কল ছেড়ে বদনাটা পানি দিয়ে ভরতে অনেক চেষ্টা করার পরও তা ভরতে পারছিলাম না। আমি এ বিষয়টা নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করে অবাক হলাম। বালতির নিচে কোনো ছিদ্র নেই এবং উপরে কলও বন্ধ। কিন্তু কোনো কারণবশত ফোঁটা-ফোঁটা পানি পড়ছিল। বালতিতে যেহেতু পানি সংরক্ষিত হচ্ছিল, তাই একপর্যায়ে বালতিটা ভরে গেল। অন্যদিকে বদনার তলায় ছিদ্র থাকায় আমি কল ছেড়ে শত চেষ্টা করেও বদনাটা ভরতে পারছিলাম না।

ঠিক এমন পার্থক্য আমাদের মতো সাধারণ মানুষ আর আল্লাহর ওলীদের মধ্যে। আমরা ওই বদনার মতো যার তলায় ছিদ্র আছে। তাই আমাদের অন্তরে যতই নূর প্রবেশ করুক-না কেন তা বের হয়ে যায়।

আর আল্লাহর ওলীর দৃষ্টান্ত ওই বালতির মতো, যাদের অন্তরে অল্প-অল্প নূর জমা হয়ে তা সর্বদা সংরক্ষিত থাকে, যার ফলে তাদের অন্তর সর্বদা আলোকিত থাকে।

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার লাভ

বেশি-বেশি ইবাদাত করার চেয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অধিক জরুরি। এটি শরীয়তের দাবি ও কাম্য। যেমন– একলোক তাহাজ্জুদ পড়ে না, লম্বা-লম্বা যিকিরও করে না, বেশি-বেশি নফল রোযাও রাখে না। মোটকথা, ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত ছাড়া অতিরিক্ত নফল আমলও সে করে না। কিন্তু সর্বদা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি আল্লাহর ওলী হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কেননা, তার জীবন হলো গুনাহমুক্ত জীবন।

আমাদের হক্কানী ওলামায়ে কেরাম আমাদেরকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার নিয়মনীতি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। বিশেষভাবে তালেবে ইল্‌মদের এ বিষয়ে খুব লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন নিজেদের দ্বারা শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ না হয়। নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো গুনাহের কাজ না করা হয়। যদি নিজের জীবনকে গুনাহমুক্ত রাখা যায়, তাহলে আল্লাহর ওলী হওয়ার মর্যাদা লাভের আশা করা যায়। একথা ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, ওলী হওয়ার জন্য-

* বাতাসে উড়ে বেড়ানো শর্ত নয়।

* পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া শর্ত নয়।

* তার দ্বারা কোনো অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাওয়াও শর্ত নয়।

বরং ওলী তো তাকেই বলে, যে নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো–

إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ.

'আল্লাহর ওলী তো সে, যে মুত্তাকী তথা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।'[১]

একথাও স্মরণ রাখা চাই যে, কোনো কিছু করার নাম তাকওয়া নয়, বরং না করার নামই তাকওয়া। অর্থাৎ যেসব কাজ করলে আল্লাহ নারাজ হন, তা না করার নাম হলো তাকওয়া। আরেকটু সহজভাবে এভাবে বলা যায়,

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৪

তাকওয়া হলো প্রত্যেক ওই গুনাহের কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা, যা করলে আল্লাহ নারাজ হন এবং যার কারণে পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

এজন্যই বলি, বেশি-বেশি ইবাদাত ও যিকির করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। যেব্যক্তি একদিকে লম্বা-লম্বা নামায পড়ে ও যিকির করে আর অন্য দিকে অপরের গীবত ও দোষচর্চা করে বেড়ায় এবং মানুষকে কষ্ট দেয়, এমন লোক হাশরের ময়দানে হতভাগা পাপী হিসেবে আল্লাহপাকের সামনে দাঁড়াবে। পরকালে গীবতকারী ব্যক্তির সমস্ত আমল যার গীবত করেছিল তাকে দিয়ে দেওয়া হবে এবং তার সমস্ত গুনাহ গীবতকারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। হাদীছ শরীফে এসেছে-

اَلْوِقَايَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْعِلَاجِ

'সতর্ক থাকা চিকিৎসা করানো হতে উত্তম।'

একলোকের সর্দি লেগেছে। সে যদি নিয়মিত আইসক্রীম খায়, তাহলে তার এই রোগ কোনোদিন ভালো তো হবেই না; বরং রোগ আরও বাড়তে থাকবে। ডাক্তার সাহেব তাকে বলবেন, আপনি আগে ঠাণ্ডা জাতীয় জিনিস পরিহার করুন; তারপর ঔষধ খান। এ কারণেই মাশায়েখগণ তাদের মুরিদদের নসিহত করে থাকেন, আগে গুনাহ হতে বাঁচো, তাহলে যিকির-আযকারে বরকত হবে এবং তাতে মজাও লাগবে।

তাই আমরাও এখন থেকে আমাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব এবং খুব খেয়াল রাখব, আমাদের দ্বারা যেন আল্লাহপাকের কোনো নাফরমানি না হয়। আমরা একথা সর্বদা স্মরণ রাখব যে, আমাদের দ্বারা কোনো ধরনের গুনাহের কাজ যেন সংঘটিত না হয়। এর জন্য আমরা এই পন্থা অবলম্বন করতে পারি যে, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিয়ত করব 'আজ কোনো ধরনের গুনাহের কাজ করব না এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকব।'

আরও সচেষ্ট থাকব, যেন-

* চোখের দ্বারা কোনো গুনাহ না হয়।
* মুখের দ্বারা কোনো গুনাহ না হয়।
* কানের দ্বারা কোনো গুনাহ না হয়।
* লজ্জাস্থান দ্বারা কোনো গুনাহ না হয়।

* হাত-পা দ্বারা কোনো গুনাহ্ না হয়।

মোটকথা, পুরো শরীর যেন গুনাহমুক্ত থাকে।

খাজা আযীযুল হাসান মাজযুব (রহ.) আল্লাহর একজন বড় ওলী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন–

'যেব্যক্তি গুনাহ্ ছাড়া একটি দিন অতিবাহিত করল, সে যেন আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে তার দিন কাটাল।'

এজন্য আপনিও প্রতিদিন সকালে আল্লাহপাকের কাছে দু'আ করুন–

'হে আল্লাহ! আমি আজকের দিনটি এমনভাবে অতিবাহিত করতে চাই, যেন আমার দ্বারা আপনার কোনো নাফরমানি না হয়।'[৫]

সকালে এমন নিয়ত ও দু'আ করলে আশা করা যায়, আল্লাহ আপনাকে গুনাহ থেকে হেফাযত করবেন। এমন আশা নিয়ে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকুন। যদি জীবনের কোনো একটা দিন এভাবে গুনাহমুক্ত কাটাতে পারেন, তাহলে হতে পারে, কাল কেয়ামতের ময়দানে ওই দিনের উসিলায় আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন।

গুনাহ্ নাপাক বস্তুর মতো

আশা করি, উপরের আলোচনাগুলো বুঝে এসেছে। এতক্ষণ যা উল্লেখ করলাম, তা ছিল আমার কথার ভূমিকা মাত্র। এখন আমি মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করব। তাই খুব খেয়াল করে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করুন।

বাতেনি তথা অভ্যন্তরীণভাবেও গুনাহ নাপাক বস্তুর ন্যায়। তাই আমরা যদি আমাদের শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কোনো গুনাহ করে ফেলি, তাহলে তা অভ্যন্তরীণভাবে নাপাক হয়ে যায়। যেমন– কোনো ব্যক্তি যদি–

* চোখ দিয়ে হারাম দেখে, তাহলে তার চোখ নাপাক হয়ে যায়।

* যদি মুখ দিয়ে মিথ্যা বলে, তাহলে মুখ নাপাক হয়ে যায়।

* কান দিয়ে যদি কারো গীবত শোনে, তাহলে কান নাপাক হয়ে যায়।

* হাত দিয়ে যদি কারো মাল চুরি করে, তাহলে হাত নাপাক হয়ে যায়।

* পা দিয়ে যদি খারাপ কাজে অগ্রসর হয়, তাহলে পা নাপাক হয়ে যায়।

* লজ্জাস্থান দিয়ে যদি হারাম কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে লজ্জাস্থান নাপাক হয়ে যায়।

কিন্তু বান্দা যদি শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ দ্বারা গুনাহ করে তারপর খাঁটি দিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তাহলে আল্লাহ তার এই পাপী বান্দাকেও ক্ষমা করে দিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

গুনাহের দুর্গন্ধ

নাপাক বস্তুতে এমনিতেই দুর্গন্ধ থাকে। বান্দা যখন গুনাহ করে, তখন তার শরীর নাপাক হয়ে যায় এবং তা হতে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। যার বিবরণ হাদীছ শরীফে পাওয়া যায়।

১. হাদীছে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ

'মানুষ মিথ্যা কথা বললে ফেরেশতারা তার থেকে এক মাইল দূরে সরে যায় তার মিথ্যার দুর্গন্ধের কারণে।'[১]

২. আরেক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

'মানুষ যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়, তখন হযরত আজরাঈল (আ.)-এর সঙ্গে আরও দুজন ফেরেশতা আসে। তারা ওই মৃত ব্যক্তির পুরো শরীর শুঁকতে থাকে এবং যে-যে অঙ্গ দিয়ে গুনাহ করেছে, সেই অঙ্গগুলো থেকে দুর্গন্ধ পেতে থাকে।'

এর একটি বাস্তব উদাহরণ হলো, যেমনিভাবে কোনো মা তার বাচ্চাকে খানা খাওয়ানোর আগে খাবারকে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখে যে, খাবার ভালো আছে কি-না; একটু যদি বাসী হয়ে যায়, তাহলে ওই খাবার তার বাচ্চাকে খেতে দেয় না, ঠিক একইভাবে ফেরেশতারা মানুষের মৃত্যুর সময় মানুষের শরীর শুঁকতে থাকে। গুনাহের দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারলে সাথে-সাথেই গুনাহের শাস্তি দেওয়া শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি তাওবা করে নিজেকে পাক-সাফ করে মৃত্যুবরণ করবে, তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হবে না।

---

১. তিরমিযী

৩. একদিন হযরত উসমান (রাযি.) মসজিদের মিম্বরে বসে বয়ান করছিলেন। আলোচনা চলাকালে তাঁর নিকট একব্যক্তি এল। হযরত উসমান (রাযি.) তাকে দেখে বললেন–

'ওই সমস্ত লোকের কী হলো, যারা গুনাহ করে; অথচ তাদের কোনো অনুভূতি নেই? বেপরোয়াভাবে আমাদের মজলিসে আসে এবং তাদের চোখ দিয়ে অনবরত গুনাহের ফোঁটা ঝরতে থাকে?'

এর দ্বারা বোঝা গেল, আল্লাহপাকের খাঁটি বান্দারাও কখনো-কখনো দুনিয়াতেই গুনাহগারের গুনাহের দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারেন। একথা ভালো করে স্মরণ রাখা দরকার যে, গুনাহের দুর্গন্ধ শুধু দুনিয়ার জীবনে আল্লাহপাকের খাঁটি বান্দারা ও মৃত্যুর পূর্বে ফেরেশতারা অনুভব করতে পারবে ব্যাপারটি এমন নয়; বরং জাহান্নামে যাওয়ার পরেও গুনাহগার ব্যক্তির শরীর হতে দুর্গন্ধ বের হবে। এমনকি হাদীছের এক বর্ণনায় এসেছে-

'যেব্যক্তি দুনিয়াতে ব্যভিচার করেছে, তাকে জাহান্নামে দেওয়ার পর তার লজ্জাস্থান হতে এমন দুর্গন্ধ বের হবে, যা অন্যান্য জাহান্নামীদের পর্যন্ত অস্থির করে ফেলবে, যার ফলে তারা রাগান্বিত হয়ে সেই ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বলতে থাকবে, তোমার শরীর দিয়ে এ কেমন পচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, যা আমাদের কষ্টকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে?'

নেকীর সুঘ্রাণ

গুনাহের যেমন দুর্গন্ধ রয়েছে, ঠিক এর বিরপীতে নেকীরও সুঘ্রাণ রয়েছে। তাই তো আল্লাহপাকের নেক বান্দাদের শরীর থেকে নেকির সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। আমরা যদি নেককার বান্দা হতে পারি, তাহলে আমাদের শরীর থেকেও বাতেনিভাবে নেকীর সুঘ্রাণ আসতে থাকবে। আল্লাহপাক তার কিছু নেককার বান্দাকে নেকীর সুঘ্রাণ দুনিয়াতেই এত বাড়িয়ে দিয়েছেন, যার সুঘ্রাণ অন্যরাও বাস্তবে বাহ্যিকভাবে পেয়ে থাকে। এর কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করছি।

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ের ঘাম মুবারক হতে এত পরিমাণে সুঘ্রাণ বের হতো, যা সংগ্রহ করার জন্য উম্মে সুলাইম (রাযি.) বাচ্চাদেরকে শিশি দিয়ে রাসূলের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

হাদীছ শরীফে এসেছে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইম (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উম্মে সুলাইম! তুমি এমনটি

করছ কেন? জবাবে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই মুবারক ঘাম যখন আতরের সঙ্গে মিশ্রণ করি, তখন আতরের সুঘ্রাণ আরো বেড়ে যায়। সুবহানাল্লাহ!

এমনকি তৎকালে মদীনার বর-কনেরা রাসূলের ওই পবিত্র ঘামকে সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করত।

এক দরিদ্র সাহাবী তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিবেন। কিন্তু তাঁর কাছে টাকা-পয়সা ছিল না। তাই তিনি কিছু সহযোগিতা চাওয়ার উদ্দেশ্যে নবীজির কাছে এলেন। নবীজির কাছেও সেসময় তাকে দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। কিন্তু দয়ালু নবী কি তাঁর সাহাবীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে পারেন? কখনই না। তাই ওই অবস্থায় তিনি তাঁকে তাঁর শরীরের কিছু ঘাম মুবারক দিয়ে সহযোগিতা করলেন।

সাহাবী রাসূলের দেওয়া ঘাম মুবারক নিয়ে তাঁর মেয়েকে দিলেন। মেয়ে রাসূলের ঘাম থেকে কিছু তার নিজের শরীরে লাগাল আর কিছু নিজের ঘরে হেফাযত করে রেখে দিল, যার ফলে ওই সাহাবীর মেয়ের শরীর ও ঘর থেকে সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এমনকি একপর্যায়ে সাহাবায়ে কেরামের কাছে ওই ঘরটি 'সুগন্ধিওয়ালীর ঘর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করল।

(২) আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাস্তা দিয়ে যেতেন, ওই রাস্তা দিয়েও সুঘ্রাণ আসত।

(৩) হযরত আবুবকর (রাযি.)কে আল্লাহপাক গুনাহ হতে পবিত্র রেখছিলেন, যার ফলে তাঁর শরীর থেকেও সুঘ্রাণ বেরুত।

হযরত উমর (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত আবুবকর (রাযি.) সম্পর্কে বলেন–

كَانَ رِيْحُ اَبِىْ بَكْرٍ اَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ

'আবুবকরের শরীর হতে এমন সুঘ্রাণ বের হতো, যা মেশক থেকেও অধিক সুগন্ধিময়।'

(৪) ইমাম আসেম (রহ.) যখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করতেন, তখন খুব বেশি কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন এবং তাঁর মুখ থেকে সুঘ্রাণ বের হতো। একদিন কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি কি মুখে সুগন্ধিজাতীয় বস্তু রেখেছেন? আমরা ইতিপূর্বে কারো মুখ থেকে এ ধরনের সুঘ্রাণ পাইনি! এর কারণটা জানতে পারি কি?

উত্তরে হযরত আসেম (রহ.) বলেন, একবার স্বপ্নে আমার আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য নসিব হয়। দেখি, তিনি আমাকে বলছেন, আসেম! তুমি এত মহব্বতের সাথে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত কর, যা আমার খুব পছন্দনীয়। এসো আমি তোমার মুখে চুমু খাই। এই কথা বলে আল্লাহর রাসূল আমার মুখে চুমু খেলেন। তারপর থেকেই আমার মুখ থেকে সুগন্ধি বের হয়। সুবহানাল্লাহ!

(৫) শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন–

একব্যক্তি প্রত্যেক রাতে ঘুমানোর পূর্বে দুরূদ শরীফ পাঠ করত। সে একরাতে আল্লাহর রাসূলকে স্বপ্নে দেখল। আল্লাহর রাসূল তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি যে মুখে আমার উপর দুরূদ পাঠ কর, তোমার সেই মুখখানা আমার কাছে আনো; আমি তাতে চুমু দেব। সে তার চেহারা রাসূলের দিকে বাড়িয়ে দিলে নবীজি তাতে চুমু খেলেন। এই অবস্থায় তার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর দেখল, তার পুরো ঘর সুগন্ধিতে ভরে গেছে। দীর্ঘ আট দিন পর্যন্ত তার মুখ থেকে সুঘ্রাণ বের হয়।

(৬) খাজা মিশকী (রহ.) নামে ভারতে এক আল্লাহর ওলী ছিলেন। তার ব্যাপারেও এ ধরনের একটি ঘটনা পাওয়া যায়। তার শরীর থেকেও সুঘ্রাণ আসত, যার ফলে লোকেরা অবাক হতো আর তাকে জিজ্ঞেস করত, হযরত! আপনি কোন মূল্যবান সুগন্ধিটা মাখেন, যার সুঘ্রাণ সর্বদা আপনার পোশাকে লেগেই থাকে? একদিন কোনো একব্যক্তি বিষয়টি জানার জন্যে তাকে খুব পীড়াপীড়ি করলে উত্তরে তিনি বললেন, আমি কোনো আতর বা সুগন্ধি মাখাই না। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, তাহলে আপনার কাপড়ে এত সুঘ্রাণ আসে কোত্থেকে?

উত্তরে তিনি বললেন, রহস্য হলো, একবার আমি একটি রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তার পাশে একটি ঘরের দরজায় এক বৃদ্ধা আমাকে দেখে বলল, ঘরে একজন রোগী আছে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি একজন নেককার বান্দা। তাই তুমি যদি কিছু দু'আ পাঠ করে রোগীকে ফুঁক দিয়ে দাও, হতে পারে সে ভালো হয়ে উঠবে। আমি তার কথা বিশ্বাস করে রোগীর ঘরে প্রবেশ করতেই বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। তারপর ঘরের মেম সাহেবা আমার সামনে এল এবং বলতে লাগল, আমি প্রতিদিন তোমাকে এই রাস্তা দিয়ে যেতে দেখি। আমি তোমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছি। তোমার সাথে আমার যৌনবৃত্তি পুরা করার খুব আগ্রহ জন্মেছে

তাই আজ আমার চাহিদা পুরা করার জন্য ওই বৃদ্ধা মহিলার মাধ্যমে তোমাকে আমার কাছে ডেকে এনেছি। আমি এখন আমার যৌনদাবি পূরণ করতে প্রস্তুত।

মহিলা যখন নিজের যৌনলিপ্সা পূরণের কথা প্রকাশ করল, তখন আমি তা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম এবং তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। আর বের হওয়ার কৌশল খুঁজতে লাগলাম। সে বলতে লাগল, বাইরে দিয়ে দরজায় তালা লাগানো আছে। যদি তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি না হও, তাহলে আমি হৈচৈ শুরু করে দেব এবং তোমার উপর ব্যভিচারের অপবাদ লাগিয়ে জনসম্মুখে তোমাকে বেত্রাঘাত লাগাব। এখন তুমি দেখো, কোন প্রস্তাবে রাজি হবে – আমার যৌনলিপ্সা পূরণ করবে, নাকি বেত্রাঘাত খাবে? মহিলার একথা শুনে আমি আরো বেশি পেরেশানিতে পড়ে গেলাম।

পরিশেষে আল্লাহপাক আমার মাথায় একটি কৌশল দিয়ে দিলেন। আমি তাকে বললাম, আমার টয়লেটের প্রয়োজন হয়েছে; তাই আমাকে আগে টয়লেটে যেতে দাও। তারপর আমি তোমার প্রস্তাবের উত্তর দেব। মহিলা ভাবল, রাজি যেহেতু হয়েছে, টয়লেটে যেতে আর বাধা কোথায়! তাই সে আমাকে টয়লেটে যাওয়ার অনুমতি দিল। আমি টয়লেটে গিয়ে দুহাত দিয়ে সমস্ত শরীর ও জামায় টয়লেটের ময়লা ও পায়খানা লাগালাম। যখন টয়লেট থেকে বের হলাম, আমার শরীর ও জামা থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে মহিলার অন্তরে আমার প্রতি ঘৃণা জন্মাল এবং সে বলতে লাগল, কে আছ! এই পাগলটাকে এখান থেকে বের করে দাও।

এভাবেই আমি সেদিন আমার ঈমান বাঁচিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। তারপর পেরেশান ছিলাম যে, এই দুর্গন্ধ শরীর ও জামা নিয়ে মানুষের সামনে যাব কিভাবে? তাই তাড়াতাড়ি উত্তমরূপে গোসল করে পরিষ্কার জামা পরিধান করে নিলাম। তারপর থেকেই আমার শরীর হতে সুঘ্রাণ বের হতে থাকে। আল্লাহু আকবার!

এ হচ্ছে নেককার ব্যক্তির নেকীর সুঘ্রাণ। ওই আল্লাহর ওলীর অন্য নাম ছিল। কিন্তু তার শরীর থেকে যেহেতু মেশকে আম্বরের খোশবু বের হতো, তাই 'খাজা মেশকী' নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে যান।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হলো যে, নেকীর কারণে শরীর থেকে সুগন্ধ ছড়ায় আর গুনাহের কারণে দুর্গন্ধ ছড়ায়।

কবরে লাশ পচা আর না পচার কারণ

এখন আরেকটি কথা বুঝুন। এটিও আমাদের অনেক উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ! আল্লাহপাক দুনিয়াতে এমন কিছু বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যা গলে পচে যায়। যেমন– আপনি চাল পাকালেন; ভাত হলো। এই গরম ভাত যদি আপনি হটপটে না রেখে সাধারণ কোনো বক্সে দীর্ঘক্ষণ রেখে দেন এবং অনেকক্ষণ পর বক্সের মুখ খোলেন, তাহলে দেখবেন, ভাত দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। এর কারণ একটিই। আপনি গরম অবস্থাতেই তা আবদ্ধ করে ফেলেছেন, যার কারণে তা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। অনেকেই গরম খাবার নিয়ে সফর শুরু করেন পথিমধ্যে গরম খাবার খেয়ে নিবে এই আশায়। দীর্ঘক্ষণ চলার পর যখন খাবারের বাটি খোলা হয়, তখন তা থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। তখন সে বলে, আমার স্ত্রী তো খানা ঠিকই রান্না করেছে; কিন্তু খুব গরম করে বাটিতে দিয়ে দিয়েছে এবং বেশি সময় থাকার কারণে তা দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। ভালো খানা কেনইবা নষ্ট হয়ে যাবে?

এখানে বোঝার বিষয় হলো, ভাত এমন এক বস্তু, যার মধ্যে নষ্ট হওয়ার উপকরণ আছে, যার ফলে গরম ভাত দীর্ঘক্ষণ বাটিতে আটকে রাখার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। এর বিপরীতে আপনি যদি চিনি বা গুড় কোনো কৌটার মধ্যে আটকে রেখে দেন এবং এক বছর পর কৌটার মুখ খোলেন, দেখবেন চিনি বা গুড়ের মধ্যে কোনো দুর্গন্ধ হয়নি। ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছে। অর্থাৎ চিনি চিনিই থাকবে, গুড় গুড়ই থাকবে। কারণ, এতে দুর্গন্ধ হওয়ার কোনো উপকরণ পাওয়া যায়নি।

উপরোক্ত উদাহরণ দ্বারা একথা স্পষ্ট হলো যে, কিছু জিনিস এমন আছে, যাতে নষ্ট হওয়ার উপকরণ রয়েছে, যার কারণে কয়েক ঘণ্টা রাখার পর তা নষ্ট হয়ে যায়। আর কিছু বস্তু এমন আছে, যাতে নষ্ট হওয়ার কোনো উপকরণই নেই, যার ফলে বছরকে বছর রেখে দিলেও তা নষ্ট হয় না।

একথা যেহেতু বুঝে এসেছে, তাই এই অধমের মূল বক্তব্য ছিল, গুনাহ এমন একটি বস্তু, যার মধ্যে নষ্ট করার ক্রিয়া রয়েছে। গুনাহ এমনিতেই নাপাক আর নাপাক বস্তুতে যেহেতু দুর্গন্ধ রয়েছে, তাই গুনাহ নামক নাপাকি অন্যসব বস্তুকে নাপাক করে ফেলে।

আর এজন্যই গুনাহের খারাপ প্রতিক্রিয়ার কারণে কবরে মৃতদেহ পচে নষ্ট হয়ে তা পোকা-মাকড়ের খাবারে পরিণত হয়। অপরদিকে নেকীরও সুঘ্রাণ আছে। এমনকি আপনি আতর বা সুগন্ধিকে যত বছরই বোতলে আটকে

রাখুন-না কেন তা খোলার পরও আতরই থাকবে, সুগন্ধিই থাকবে; এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসবে না।

তাই যেব্যক্তি খালেস দিলে তাওবা করে মরতে পারবে, তাকে গুনাহের কোনো প্রভাবই ক্ষতি করতে পারবে না। আর ওই বান্দা সত্যিকারের তাওবাকারী হয়ে যদি কবরে চলে যায়, তাহলে তার শরীর-দেহ কিছুই পচবে না, গলবে না। কেননা, তার মধ্যে গুনাহের কোনো প্রভাব বাকি নেই। ইতিহাস সাক্ষী, অনেক আল্লাহর ওলীর ইন্তেকালের পর তাঁদের কবর খোঁড়ার পর দেখা গেছে, তাঁদের শরীরে কোনো ধরনের পচন ধরেনি। এমনকি কবর দেওয়ার সময় যেমনটি ছিল বহু বছর পরেও তা আগের মতোই রয়েছে।

একদা আমাদের শহরে এক কবরস্তানে একটি কবরের জন্য মাটি খনন করতেই অন্য একটি কবরের লাশ দেখা গেল। উপস্থিত লোকেরা এবং পরবর্তীতে এলাকার সকলেই লাশটি দেখে অবাক হয়ে গেল! এত পুরাতন কবর অথচ লাশ ও তার কাফন সব কিছু অক্ষত! এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটেনি। পরবর্তীতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এই লোক মৃত্যুর আগে নিষ্ঠার সাথে খালেস দিলে তাওবা করেছেন, যার ফলে আল্লাহপাক তাঁর জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, যেন তাঁর গুনাহই আর অবশিষ্ট নেই। এজন্যই তাঁর শরীরকে কবর গ্রাস করতে পারেনি।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

আজ থেকে প্রায় পনের-বিশ বছর আগের কথা। কোনো এক কাজে আমি লাহোর যাই। সেখানে আমার এক পরিচিত লোকের সাথে দেখা হলে তিনি আমাকে বললেন, হযরত! যদি আপনার হাতে একটু সময় থাকে, তাহলে আমি আপনাকে একটি আশ্চর্য জিনিস দেখাতে চাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী জিনিস? তিনি বললেন, হযরত! এমন জিনিস দেখাব, যা দেখে আপনি আনন্দ পাবেন এবং আপনার ভালো লাগবে। তাই আপনার হাতে সময় থাকলে চলুন। আমি বললাম, ঠিক আছে চলুন, যাওয়া যাক।

তিনি তার গাড়ির সামনের সীটে আমাকে বসালেন এবং নিজেই ড্রাইভ করলেন। আনুমানিক দশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর তিনি গাড়ি থামালেন এবং গাড়ি থেকে নেমে বললেন, হযরত! এখন আপনিও নামতে পারেন। তিনি আমাকে রাস্তার এক পাশে নিয়ে গিয়ে এমন একটি অদ্ভুত গাছ দেখালেন, যার গোড়ার দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। আমি বললাম, এই গাছের এমন কী বৈশিষ্ট রয়েছে, যা দেখানোর জন্য আপনি আমাকে এত দূর নিয়ে

এলেন? তিনি বললেন, হযরত! আপনি একটু কাছে এসে শিকড়ের দিকে ভালো করে দেখুন। যখন আমি একটু আগে বেড়ে গাছের শিকড়ের দিকে ভালো করে দেখলাম, তখন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম, গাছের শিকড়ের মাঝে নূরানী চেহারাওয়ালা দাড়িবিশিষ্ট একব্যক্তি মাটিতে দাফন করা। চার পাশ থেকে গাছের শিকড়গুলো তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। গাছটা উপড়ে ফেলার কারণে গাছের শিকড় থেকে মাটি সরে গেছে। তাই মৃত ব্যক্তির লাশ দেখা যাচ্ছিল। মজার ব্যাপার হলো, মৃত ব্যক্তির শরীর আর কাফনের কাপড়ে কোনো প্রকার পচন ধরেনি। সুবহানাল্লাহ!

পরে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখলাম, ওই গাছটি আজ থেকে একশ বছর আগে লাগানো হয়েছিল। গাছটি যতই বড় হচ্ছিল, সাথে-সাথে শিকড়গুলোও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং মৃত ব্যক্তিকে চারপাশ থেকে বেষ্টন করে নিয়েছিল। জানা নেই, গাছটা লাগানোর কত বছর আগে ওই ব্যক্তিকে এখানে দাফন করা হয়েছিল।

কবর মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কেমন আচরণ করে?

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) একদা জানাযার নামায আদায় করতে গেলেন। নামায আদায় শেষে কবরস্তানে একটি কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি একটানা কাঁদতে থাকলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি তো এই মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়। এ যাবৎ তো আপনি আগে-আগে ছিলেন; তবে এখন কেন এত পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন?

উত্তরে তিনি বললেন, এই কবর থেকে আমার কানে এমন একটি আওয়াজ ভেসে এল, যাতে আমার মনে হলো, কেমন যেন কবর আমার সঙ্গে কথা বলছে।

লোকেরা জানতে চাইল, হযরত! কবর আপনার সঙ্গে কী কথা বলল? উত্তরে তিনি বললেন, কবর আমাকে বলল, হে ওমর ইবনে আবদুল আযীয! তুমি আমাকে একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ না, আমি কবরবাসীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করি? আমি কবরকে বললাম, তাহলে বলো। কবর বলতে লাগল–

* আমি মৃত ব্যক্তির শরীরের সমস্ত গোশত খেয়ে ফেলি।
* আঙুলের করগুলোকে হাত থেকে পৃথক করে ফেলি।
* হাতকে বাহু থেকে পৃথক করে ফেলি।

* এমনকি তার হাড়গুলোকে শরীর থেকে আলাদা করে তাও খেয়ে ফেলি।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) বললেন, কবর যখন এই বেদনাদায়ক আযাবের কথা বলছিল, তখন আমার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।

কবরের আযাবের দৃশ্য

ঘটনাটি আমি বাইরের এক রাষ্ট্রে বয়ানের মধ্যে শুনিয়েছিলাম। ওই মাহফিলে পিএইচডি ডক্টর, এম.বি.বি.এস ডাক্তার, সাইনোটিস্ট অনেক বিজ্ঞানী এবং অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মাহফিল শেষে এক ডাক্তার আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! আপনি কি এ ঘটনা কোনো কিতাবে পড়েছেন? আমি বললাম, হাঁ, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) এর এই ঘটনাটি শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) তাঁর লিখিত কিতাব ফাযায়েলে সাদাকাতে উল্লেখ করেছেন। আমি আরো বললাম, এ ধরনের কোনো বুযুর্গ আলেম যদি কোনো ঘটনা বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে তা মিথ্যা হয় না।

তারপর ওই ডাক্তার সাহেব বললেন, হযরত! আপনি কি এসব অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে চান? আমি বললাম, ভাই আপনি কী বলতে চাচ্ছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার বললেন, হযরত! এখানে এমন একটি জায়গা আছে, যেখানে আপনি যা বর্ণনা করলেন তার নিজের চোখে সবই দেখতে পাবেন। আর আমি আপনাকে সেটাই দেখাতে চাচ্ছি। আমি তার কথা শুনে তো অবাক। তিনি আবার বললেন, হযরত! আপনার হাতে তিন-চার ঘণ্টা সময় হলে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।

আমি বললাম, ঠিক আছে; আগামী কাল চলুন; যাওয়া যাক। পরের দিন ঠিক সময়মতো ডাক্তার সাহেব আমার কাছে এলেন। তিনি আমাকে একটি জাদুঘরে নিয়ে গেলেন, যেখানে তারা লাশগুলোকে ক্যামিকেল দিয়ে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। যাদুঘরের ভেতরে এমন কিছু রুম আছে, যা পুরোটাই সিসা দ্বারা নির্মিত। প্রথম রুমের দিকে গিয়ে দেখতে পেলাম, দরজায় লেখা রয়েছে–

'যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার এই অবস্থা হয়।'

রুমে প্রবেশের পর আমরা এমন একটি লাশ দেখতে পেলাম, যাতে ক্যামিকেল দিয়ে সবধরনের নষ্ট (পচা, গলা, ফাটা ইত্যাদি) থেকে হেফাযত করা হয়েছে। এই ধরনের লাশকে 'ক্যামিকেলমিশ্রিত লাকষ্ট বলে। আর ইংরেজিতে বলে গঁসসু।

তারা বলল, কোনো মানুষ মরে গেলে তার অবস্থা এমন হয়ে থাকে। আর এতে আমরা ক্যামিকেল দিয়ে রেখে দিয়েছি। প্রথমে আমরা লাশের এ অবস্থা দেখে চমকে গেলাম।

তারপর কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে আরেকটি রুমে নিয়ে গেল এবং সেখানে একটি নেমপ্লেটে লেখা ছিল-

'এই ব্যক্তিকে মৃত্যুর পরে আমরা কবরে দাফন করি এবং কিছুদিন পরে কবর খুঁড়ে তাকে যে অবস্থায় পাই, সেই অবস্থাতেই ক্যামিকেল দিয়ে সংরক্ষণ করি।'

আমরা যখন এই লাশটি পর্যবেক্ষণ করলাম, তখন দেখতে পেলাম, তার সমস্ত শরীর ঠিক ছিল। শুধু চোখে পচন ধরেছে এবং তা খুলে মুখের উপর পড়ে আছে। আর তাতে ছোট পোকা-মাকড় পড়ে আছে। এর দ্বারা বোঝা গেল, কবরে সর্বপ্রথম লাশের মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তা হলো, চোখ এবং তা ঢিলেঢালা হয়ে বের হয়ে আসে। তারপর তাতে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ শুরু হয়।

আল্লাহপাকের দেওয়া চোখ দিয়ে যে গায়রুল্লাহর মহব্বতে অপাত্রে দৃষ্টিপাত করেছে অর্থাৎ পরনারী দেখে চোখের গুনাহ করেছে, সেই চোখের উপর সর্বপ্রথম পোকা-মাকড়ের আযাব দেওয়া হয়।

এমনকি আল্লাহপাক বলবেন, বান্দা! তুই আমার দেওয়া চোখ দিয়ে আমার নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে তাকিয়েছিস। বান্দা! তোর জন্য গায়রে মাহরামের দিকে তাকানো হারাম ছিল। তুই আমার আদেশ অমান্য করে কোনো মেয়েদের মহব্বতে তাদের দিকে তাকিয়েছিলি। দুনিয়ায় থাকতে যেচোখ দিয়ে আমি আল্লাহর নাফরমানি করেছিস, এখন কবরে এসে প্রথমে তোর সেই চোখকে আযাব ভোগ করতে হবে।

তারপর আল্লাহপাক গুনাহগার বান্দার চোখে পোকা-মাকড় লেলিয়ে দিবেন। আর পোকা-মাকড়গুলো গুনাহগার বান্দার চোখ খেতে থাকবে।

তারপর আমরা তৃতীয় আরেকটি কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখলাম, এখানে যে লাশটি রাখা আছে, তার চোখ দুটো পোকা-মাকড় খেয়ে

ফেলেছে। তার ঠোঁটও খেয়ে ফেলেছে। শুধু দাঁতের মাড়ী দেখা যাচ্ছে। এছাড়া পুরো লাশই স্বাভাবিক রয়েছে। এখানে দ্বিতীয় যে পরিবর্তনটি ঘটেছে, তা হলো, মুখের মধ্যে পোকা-মাকড় বাসা বেঁধেছে এবং ঠোঁট দুটো খেয়ে ফেলেছে, যার কারণে দূর থেকে দেখলে মাড়ীসহ দাঁত দেখা যায়। এর দ্বারা বোঝা গেল, যে মুখ দিয়ে বান্দা আল্লাহপাকের নাশোকরি করেছে এবং অবৈধ কথাবার্তায় তা ব্যবহার করেছে, তাই দ্বিতীয় নম্বর শাস্তি হিসেবে পোকা-মাকড় তার মুখটা খেয়ে ফেলেছে।

তারপর কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে চতুর্থ আরেকটি রুমে নিয়ে গেল। সেখানেও একটি লাশ পড়ে ছিল। তার চোখ ও ঠোঁট পোকা-মাকড় খেয়ে ফেলেছে। তবে তার পেটটা বাটির মতো হয়ে আছে। আর তাতে পোকা-মাকড় কিলবিল করছে। যে পেটে হারাম উপার্জনের হারাম খানা প্রবেশ করেছে, তার এই দশা! সে জীবিত থাকতে যে পেটে হারাম খানা দিয়েছে, আজ সেই পেটের মধ্যে পোকা-মাকড় বাসা বেধে পেটের সব কিছু খেয়ে ফেলেছে।

তারপর আমরা পঞ্চম আরেকটি কক্ষে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি, পুরো লাশের উপর পোকা-মাকড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

এপর আমরা আরেকটি কামরায় গিয়ে দেখলাম, পোকা-মাকড় পুরো লাশের গোশত খেয়ে ফেলেছে। শুধু হাঁড়গুলো পড়ে আছে।

পরিশেষে আমরা আরেকটি রুমে গিয়ে দেখলাম, সেখানে কিছু পুরোনো হাঁড় পড়ে আছে। আর সেখানে লেখা রয়েছে-

'আমরা যখন কবর খনন করি, তখন শুধু মেরুদণ্ডের হাড় পাই। বাকি অঙ্গের হাড়গুলো পোকা-মাকড় খেয়ে ফেলেছে।'

কবর মানুষের সাথে এসব বেদনাদায়ক ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যবহার করে থাকে।

যাহোক, মানুষের মৃত্যুর পর কবরের মধ্যে লাশের যে পরিবর্তন হয়, সেই অবস্থাগুলোকে এ দেশের অমুসলিমরা লাশের উপর ক্যামিকেল মিশ্রিত করে (Mummy করে) পরবর্তী মানুষের জন্য প্রদর্শনী (Display) হিসেবে রেখে দিয়েছে।

এগুলো মূলত ওই লোকদের লাশ, যারা গুনাহগার এবং মৃত্যুর পূর্বে খালেস দিলে তাওবা করেনি, যার ফলে শরীরে গুনাহের দাগ রয়ে গেছে। কবরের মাটি ও পোকা-মাকড় তাদের খেয়ে ফেলেছে।

আম্বিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে হাদীছ শরীফে এসেছে–

'আল্লাহপাক কবরের মাটির জন্য আম্বিয়ায়ে কেরামের শরীরকে হারাম করে দিয়েছেন। অর্থাৎ কবরের মাটি নবীদের শরীর খাবে না।'

এমনিভাবে যারা আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরসূরী এবং যারা গুনাহ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে, শরীরে গুনাহের কোনো দাগ-চিহ্ন নেই, তাদেরকে কবরে দাফন করার পর কবরের মাটি ও পোকা-মাকড় তাদের দেহ খেতে পারে না। আর এ কারণেই অনেক ওলীর কবর খুঁড়ে দেখা গেছে, তাদের লাশ অক্ষত রয়েছে। কেননা, তারা তো ছিলেন নিষ্পাপ। কেমন যেন তাদের দ্বারা কোনো গুনাহই হয়নি।

কবরের মাটিতে ফুল!

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিশেষ কিছু বান্দা আছেন, যাদেরকে কবরের মাটি ও পোকা-মাকড় খাবে তো দূরের কথা, তাদের শরীরের সুঘ্রাণে কবরের মাটি সুরক্ষিত হয়ে যায়।

আপনারা হয়ত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ঘটনা শুনেছেন। যখন তাকে কবরে দাফন করা হলো, তার কিছুক্ষণ পর হতে তাঁর কবর থেকে সৌরভ ছড়াতে শুরু করে। সমরকন্দ থেকে আনুমানিক বিশ মাইল দূরে অবস্থিত খারতাঙ্গ নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। এই অধমের সেখানে গিয়ে কিছু দিন থাকার সুযোগ হয়। তার কবরটি মেহমানখানা আর মসজিদের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। তাই আমরা যখন মেহমানখানা থেকে মসজিদে যেতাম, তখন আমাদেরকে তার কবরের পাশ দিয়ে যেতে হতো আর তখন এক ধরনের সুঘ্রাণ পেতাম।

আমি ওই মসজিদের ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকেরা এদিক থেকে যাওয়ার পথে কবরে কোনো ধরনের আতর বা সুগন্ধি দেয় কি-না?

তিনি বললেন, আপনি দেখুন, এর চারপাশে মারবেল পাথর লাগানো আছে। কেউ কিছু করতে পারে না।

ইমাম সাহেব আরো বললেন, আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, আমি এত বছর যাবৎ এই মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্বে আছি। যখনই আমি এই কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি, তখনই খুশবু পেতে থাকি।

আল্লাহু আকবার!

ইমাম সাহেব আরো বললেন, মানুষ এই খোশবুর সুবাসে সুবাসিত হয়ে হতবাক হয়ে যায়। তাঁর কথার প্রেক্ষিতে আমি বললাম, হযরত! আমার তো অবাক লাগে না। ইমাম সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কবর থেকে খুশবু বের হয় আর আপনি অবাক হন না? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, কেন? উত্তরে আমি বললাম–

گلے خشبوئے در حمام روزے
رسید از دست محبوبے بدستم
بدو گفتم تو مشکے یا عنبرے
کہ از بوئے دل اویز تو مستم
بگفتا من گل ناچیز بودم
ولکن مدتے باگل نشستم
جمال ہمنشیں در من اثر کرد
وگر نہ من ہما خاکم کہ ہستم

একদিন একটি সুগন্ধময় মাটি
তার প্রেমিকের হাত থেকে আমার হাতে আসে
আমি তাকে বললাম তুমি মেশক নাকি আম্বর?
আমি তো তোমার সুবাসে মুগ্ধ
সে বলল, আমি নীচু মানের মাটি
তবে কিছুদিন একটি ফুলের সাথে ছিলাম।
আমার প্রতিবেশীর ছোঁয়া আমায় লেগেছে
নয়তো আমি কেবলই মাটি।

একবার ভারতে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ল। তখন হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (রহ.)-এর অন্তরে একটি অনুভূতি জাগল, যদি আমি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাই, তাহলে আমার শহীদি মৃত্যু নসিব হবে। তাই তিনি আল্লাহর কাছে শহীদি মৃত্যুর দু'আ করলেন।

আল্লাহপাক তার দু'আ কবুল করলেন এবং তার শহীদি মৃত্যু নসিব হলো। কেননা, হাদীছ শরীফে এসেছে–

'যেব্যক্তি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে, কাল কেয়ামতের ময়দানে সে শহীদ হয়ে উঠবে।'

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর যখন তাঁকে কবরে রাখা হলো, তাঁর কবর থেকে সুগন্ধি ছড়াতে লাগল।

হযরত মাওলানা আহমাদ লাহোরী (রহ.)কে লাহোরে মিয়ানী শরীফের কবরস্তানে দাফন করা হয়েছিল। তাঁর কবরের মাটি থেকেও সুগন্ধি বের হতো। একপর্যায়ে লোকেরা তাঁর কবরের মাটিকে বরকত মনে করে ঘরে-ঘরে নিতে লাগল। তাঁর এক মুরীদ আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি তাঁর কবরের মাটির সুঘ্রাণ বন্ধ করে দিন। আল্লাহ তার দু'আ কবুল করলেন। যদিও বাহ্যিকভাবে এ সুঘ্রাণ মানুষের দৃষ্টিতে নেই, কিন্তু বাস্তবে এখনও তা বাকি আছে।

কবর থেকে এই ধরনের সুগন্ধি কেন ছড়ায়? এটি মূলত নেকীর সুঘ্রাণ। আর কবরে শায়িত ব্যক্তি যেহেতু নেককার বান্দা, তাই তার শরীর থেকে নেকীর সুবাস ছড়াতে থাকে।

একটি পরীক্ষিত বাস্তবতা

ইল্‌মেদীন পিপাসু ভাইয়েরা! আমাদের দ্বারা যদি কোনো প্রকার গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে একথা বুঝে নিতে হবে, আমরা আমাদের সমস্ত শরীরে নাপাকি লাগালাম। তাই আমরা যদি মৃত্যুর আগে-আগে তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে নাপাকির ওই দুর্গন্ধ আমাদের কবরে ছড়িয়ে পড়বে এবং সেখানে পোকা-মাকড় জন্ম নিবে।

তাছাড়া এমনিতেই নাপাকিতে পোকা-মাকড় জন্ম নেয়, যার ফলে আমাদের নাপাক শরীরে পোকা-মাকড় কামড়াতে শুরু করবে। তাই আমাদের কর্তব্য হলো, গুনাহ থেকে বেঁচে নেকীর সুঘ্রাণ অর্জন করা। তাহলে দেখবেন, দুনিয়াতেই আল্লাহপাক আমাদের নেকীর সুবাস দিয়ে দিবেন।

একথা বাস্তব সত্য যে, আমরা যদি আমাদের অন্তর থেকে গুনাহের দাগ তাওবার মাধ্যমে মুছে ফেলতে না পারি; তাহলে আল্লাহপাকের দীদার আমাদের নসিব হবে না।

একদা মিসকীনপুরে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে একটি মাদরাসা আছে। মাদরাসার একদিকে ইটের একটা নীচু দেওয়াল ছিল।

মাদরাসার ছাত্ররা নিজ উদ্যোগে ওই দেওয়ালটা উঁচু করার সিদ্ধান্ত নিল। তাই তারা ইট, বালু, সিমেন্ট জমা করে নিজেরা রাজমিস্ত্রী সেজে নীচু দেওয়ালটা উঁচু করে ফেলল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেওয়াল নির্মাণের স্থানটা ভেঙে গেল। কিন্তু তাদের চোখে নতুন নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলো না। কিছুদিন পর ছাত্ররা দেওয়ালটা আবার করার জন্য কিছু টাকা জমা করে ইট, বালু ও সিমেন্ট ক্রয় করে দেওয়াল পুনরায় উঁচু করল। কিন্তু এবারও দেওয়ালটা পড়ে গেল।

আমি সেখানে গেলে ছাত্ররা আমাকে বলল, হযরত! শুনেছি, আপনি নাকি আলেম হওয়ার পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারও। আমাদের এই সমস্যা। আমাদের ভুলটা যদি ধরিয়ে দিতেন!

আমি বললাম, তোমাদের ইট, বালু, সিমেন্ট ঠিক আছে। পানিও ঠিক আছে। ইটগুলোও ঠিকমত বাসিয়েছ। কিন্তু বারবার যে ভুলটা হচ্ছে, তা হলো, পুরানো দেওয়ালে যে মাটিগুলো জমে আছে, তা ভালোভাবে পরিষ্কার না করেই তাতে নতুন দেওয়াল নির্মাণ শুরু করেছ। তাই এ ঘষামাজা না করার কারণে নতুন দেওয়ালের গাঁথুনী পুরাতন দেওয়ালের সাথে মিলছে না।

তারপর ছাত্ররা ভালো করে ঘষে-ঘষে পুরাতন দেওয়ালের মাটি সাফ করে পুনরায় দেওয়ালটা উঁচু করতে থাকে। পরিশেষে উঁচু ও মজবুত একটি দেওয়ালে পরিণত হয়। ওই সময়কে উপযুক্ত সুযোগ মনে করে আমি ছাত্রদের নসীহতের মাধ্যমে বোঝালাম, এই ব্যাপারটি দ্বারা আল্লাহপাককে চেনার একটি সহজ পন্থা বুঝে আসে।

তোমরা বিষয়টা খুব লক্ষ্য করো, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরানো ইটে ময়লা ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত নতুন ইটের সাথে তার সংযোগ হচ্ছিল না। ঠিক এমনই আমাদের অন্তরের অবস্থা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অন্তরে গুনাহের কালো দাগ পড়ে থাকবে, ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অন্তরে আল্লাহপাকের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে না।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! এসো, আমরা গুনাহকে পরিহার করি এবং খালেস দিলে তাওবা করি। আমরা যদি গুনাহ না ছাড়ি, তাহলে পেরেশানি আর মসিবতও আমাদের ছাড়বে না।

গুনাহের ক্ষতিকর প্রভাব

আমরা যদি সবসময় গুনাহ করতে থাকি, তাহলে গুনাহের কুফল ও খারাবী থেকে আমরা রক্ষা পাব না।

কেননা, আল্লাহপাক ইরশাদ করেন–

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ.

'যে খারাপ কাজ করবে, তাকে সেই কাজের শাস্তি ভোগ করতে হবে।'[১]

এখানে আমাদেরকে কুরআনবর্ণিত আল্লাহপাকের নীতি বুঝতে হবে। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহপাক জানিয়ে দিচ্ছেন, যেব্যক্তি গুনাহ করবে, গুনাহের শাস্তি অবশ্যই তাকে ভোগ করতে হবে।

তাই এটা কি করে সম্ভব যে–

* বরফ থাকবে আর সেখানে ঠাণ্ডা লাগবে না।

* আগুন থাকবে আর সেখানে আগুনের তাপ লাগবে না।

* গুনাহ করা হবে আর তার কোনো খারাপ প্রভাব পড়বে না।

এ কি কখনও সম্ভব?

না। কস্মিনকালেও নয়।

মনে রাখতে হবে, গুনাহের শাস্তি অবশ্যই দেওয়া হবে। তা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। কতক সময় আমরা যদিও গুনাহের ক্ষতি বুঝতে পারি না, কিন্তু এর কারণে আমাদের জীবনের প্রতিটি পদে আল্লাহপ্রদত্ত কোনো-না-কোনো নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। অথচ সে বিষয়ে আমাদের ন্যূনতম ধারণাও নেই। তাই বিষয়গুলো আমাদের জানা খুব দরকার।

ফলে আমি এখন গুনাহের কিছু ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করছি, যাতে আমাদের জন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়।

গুনাহের ক্ষতি-১ : গুনাহের কারণে স্মরণশক্তি হ্রাস পায়। বেশিরভাগ তালেবে ইল্‌মের একই অভিযোগ, হযরত! আমার কিছুই মনে থাকে না। কিতাব পড়ি; কিন্তু ভুলে যাই। কিছুই মনে রাখতে পারি না। দরসের সবক মুখস্থ করি, কিন্তু ভুলে যাই।

একদিন ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর ওস্তাদ ওকী' (রহ.)-এর নিকট তার ভুলে যাওয়া সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। ওস্তাদ তাকে গুনাহ ছাড়ার পরামর্শ দিলেন। কাব্যের ভাষায় সেই ঘটনা নিম্নরূপ–

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১২৩

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ

فَأَوْصَانِيْ إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِيْ

فَإِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِّنْ إِلٰهِيْ

وَنُوْرُ اللهِ لَايُعْطٰى لِعَاصِيْ

অভিযোগ করলাম ওস্তাদের কাছে
কিছুই থাকে না মনে,
বললেন, বাবা! গুনাহ ছাড়ো
সব থাকবে মনে।
দ্বীনি ইল্‌ম আল্লাহর নূর
লাভ হয় না বলে,
আল্লাহর নূর পায় না তারা
যারা পাপে চলে।

পক্ষান্তরে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে স্মরণশক্তি বাড়ে। সুতরাং যেসব ছাত্র বলে, হযরত! স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য কোনো আমল বলে দিন, তোমরা ভালো করে শুনে নাও, স্মরণশক্তি বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় আমল হলো, গুনাহ ছেড়ে দেওয়া। গুনাহ বাদ দিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

খুব ভালো করে মনে রেখো, যেমনিভাবে মসজিদে এতেকাফকারীর জন্য সর্বদা ছাওয়াব লেখা হয়, ঠিক তেমনি মাদরাসার তালেবে ইল্‌মদের জন্যও সর্বদা ছাওয়াব লেখা হয়। পড়ালেখা করলে ছাওয়াব। খানা খেলে ছাওয়াব। ঘুমালে ছাওয়াব। বসে থাকলেও ছাওয়াব। মোটকথা, সব কাজেই তাদের জন্য ছাওয়াব লেখা হয়। কেননা, তারা তো এখন আল্লাহর রাস্তায় আছে। তাই ফেরেশতারাও তাদের জন্য নেকী লিখতে থাকেন। এজন্য মাদরাসার তালেবে ইল্‌মদের পুরোপুরি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে গুনাহের কারণে তাদের নামে নেকী লেখা বাদ না যায় এবং তাদের জীবনকে গুনাহের আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার না করে দেয়।

গুনাহের ক্ষতি-২ : গুনাহের কারণে শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়, যার ফলে সুস্থতার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। অনেকে আমার কাছে এসে বলে, হযরত! আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছি। চোখে ভালো দেখি না। খাবার

খেলে হজম হয় না। বেশিক্ষণ ওজু রাখতে পারি না ইত্যাদি সমস্যার কথা জানায়।

আমি এ ধরনের লোকদের বলি, আপনাদের উচিত নিজের মনগড়া পথে না চলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পথে চলা। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো, কোনো খাঁটি পীর-বুযুর্গের পরামর্শ মোতাবেক চলা। ইনশাআল্লাহ আল্লাহপাকের মেহেরবানিতে আপনার সমস্ত পেরেশানি দূর হয়ে যাবে।

গুনাহের ক্ষতি-৩ : গুনাহের কথা অপরে জানলে ইজ্জত নষ্ট হয় এবং গুনাহগারের বেইজ্জতি হয়। মানুষ তাকে অপমান করে। মহিলা গুনাহ করলে তার বোরকা খুলে নেওয়া হয়। পুরুষ গুনাহ করলে তার মাথার টুপি-পাগড়ি উড়ে যায়। বরং অনেক সময় মাথায় জুতার বাড়ি পড়ে। কেউ যদি অতি গোপনে গুনাহ করে যে, কেউ টের পায় না, তদুপরি সে জনতার হাত থেকে বেঁচে গেলেও গুনাহের মন্দ প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচতে পারে না। তদুপরি পাপ বেশি দিন লুকানোও যায় না। একদিন না একদিন ফাঁস হয়েই যায়। আর যখন ফাঁস হয়ে যায়, তখন মুখোশ খুলে গিয়ে সে চরম লজ্জিত ও অপদস্ত হয়।

গুনাহের ক্ষতি-৪ : গুনাহের কারণে লজ্জিত হতে হয়, তার পরিণাম ভোগ করতে হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

'যদি তোমরা অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে পরহেযগারী অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহপাকও তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে পরহেযগারী অবলম্বন করবেন।'

নবীজির এ হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়, অন্যের সম্মানহানী করলে নিজেরও সম্মানহানী হয়। এ ব্যাপারে একটি বাস্তব ঘটনা শুনুন, তাহলে নবীজির হাদীছটি সুন্দরভাবে বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ।

একলোক মহিলাদের হাতের চুড়ি বিক্রি করে আয়-রোজগার করত। ঘরে তার রূপসী স্ত্রী ছিল। একদিন চুড়ি বিক্রেতা দুপুরের খাবার খেতে ঘরে এল। এসে দেখল, তার স্ত্রী কাঁদছে। সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কাঁদছ কেন? স্ত্রী উত্তর দিল, এই এতিম বাচ্চাটা, যাকে আমরা এতদিন লালন-পালন করে আসছি এখন এর বয়স সতের হয়েছে। আজ আমি তাকে বাজারে শাক-সবজি আনতে পাঠাই। বাজার শেষে বাড়িতে এসে যখন সে আমাকে সবজিগুলো দিতে লাগল, তখন সে আমার হাত ধরে চাপ দিল। তখন আমি তার চোখে কুমতলবের চিহ্ন পাই, যার কারণে আমি অন্তরিকভাবে ব্যথিত

এবং আমার অন্তর ভারাক্রান্ত। অথচ আমি তার মায়ের সমতুল্য। আফসোস, কী করে সে আমাকে নিয়ে এমন খারাপ বাসনা করল? এই দুঃখে আমি কাঁদছি।

স্ত্রীর মুখে তার কান্নার কারণ শুনে স্বামীও কাঁদতে লাগল। স্ত্রী স্বামীকে বলল, আপনার আবার কী হলো? আপনি কাঁদছেন কেন? স্বামী বলল, এটা ওর দোষ নয়; বরং আমার দোষ ও দুর্বলতা। স্ত্রী জানতে চাইল, তা কিভাবে? স্বামী বলল, আজ আমার কাছে বেশ কয়েকজন মহিলা চুড়ি ক্রয় করতে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন মহিলা চুড়ি হাতে পরতে পারছিল না। সে আমাকে বলল, চুড়িটা পরিয়ে দিন। আমি যখন তার হাতে চুড়ি পরিয়ে দিতে থাকি, তার হাতের কোমলতা আমার খুব ভালো লাগে। ফলে চুড়ি পরাতে গিয়ে হাত আমি কামভাবের সাথে স্পর্শ করি। তারই কুফল হিসেবে আমার স্ত্রীর হাত অন্য আরেকজন খারাপ নিয়েতে ধরেছে।

এ ঘটনা দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যারা নিজেদের দীনদার মনে করি, অনেক ক্ষেত্রে আমরাও এমন ধারণা পোষণ করি যে, যদি আমরা আমাদের দৃষ্টি গাইরে মাহরাম নারীদের দিকে ফেরাই, তাহলেও আমাদের মা, বোন, স্ত্রী ও মেয়েরা অন্যের দৃষ্টি থেকে হেফাযত থাকবে। কিন্তু এটা কখনো হতে পারে না। প্রত্যেক স্বামী মনে করে, আমি পরনারীর দিকে তাকালে কোনো সমস্যা হবে না। আমার স্ত্রীর প্রতি কেউ কুদৃষ্টি করবে না। কিন্তু এটাও অসম্ভব। বরং আসল কথা হলো, আমরা কুদৃষ্টি করলে আমাদের স্ত্রীরাও কুদৃষ্টির শিকার হবেই। কেননা, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

'কুচক্র কুচক্রীদেরই ঘিরে ধরে।'[১]

গুনাহের ক্ষতি-৫ : গুনাহের কারণে অন্তর থেকে মুনাজাতের স্বাদ চয়ে যায়। বনী ইসরাঈলে একজন বড় আলেম ছিলেন। একবার তার দ্বারা কোনো গুনাহের কাজ হয়ে যায়। দু'আয় সে বলছিল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নাফরমানি করেছি। কিন্তু তুমি তারপরও তোমার নেয়ামতে আমাকে ডুবিয়ে রেখেছ। এ তোমার বিরাট অনুগ্রহ।

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ৪৩

আল্লাহপাক তার অন্তরে জাগিয়ে দিলেন, তুমি এর শাস্তি ভোগ করছ। যেহেতু তোমার চোখে গুনাহের কারণে পর্দা পড়ে গেছে, তাই তুমি তা দেখতে পাচ্ছ না। এর সাথে-সাথে দু'আ করল, হে আল্লাহ! আমাকে বলে দিন, আমি কি শাস্তি ভোগ করছি? আবার আল্লাহপাক তার অন্তরে একথা জাগিয়ে দিলেন, যেদিন তুমি গুনাহ করেছিলে, সেদিন থেকে আমি তোমার অন্তর হতে মুনাজাতের স্বাদ ছিনিয়ে নিয়েছি। আর এটাই তোমার উপযুক্ত শাস্তি।

গুনাহের ক্ষতি-৬ : গুনাহের কারণে তাহাজ্জুদের অভ্যাস ছুটে যায়। একব্যক্তি দু'আর মধ্যে খুব কাঁদছিল আর অপর ব্যক্তি তা দেখে ধারণা করল, সে লোক দেখানোর জন্য দু'হাত তুলে কাঁদছে। এই অসৎ চিন্তার কারণে তার ছয় মাস তাহাজ্জুদের নামায ছুটে যায়।

গুনাহের ক্ষতি-৭ : গুনাহের কারণে তাকবীরে উলা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আমাদের থেকে কত-কত সুন্নত ছুটে যায়, যার কোনো খবরই আমাদের নেই। অথচ এ কারণে আমরা অনেক বড় নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি! মাসনূন দু'আগুলো জানা সত্ত্বেও তা অনেক সময় ছেড়ে দিই, যার ফলে আমরা আমাদের জীবনের অনেক-অনেক ক্ষতি করে ফেলছি। অথচ এ ব্যাপারে আমাদের সামান্যও অনুশোচনা নেই।

গুনাহের ক্ষতি-৮ : বেশি গুনাহ করার দ্বারা অন্তরে অনুশোচনা, অনুতাপ ও গুনাহকে গুনাহ মনে করার অনুভূতি থাকে না। ফলে গুনাহকে হাল্কা মনে হয়। অথচ প্রত্যেক মুমনি বান্দার চিন্তা-চেতনা এমন হওয়া উচিত যে, গুনাহ মুমিনের জন্য এক বিশাল পাহাড়তুল্য। যে পাহাড় তার উপর যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। পক্ষান্তরে ফাসেকের কাছে গুনাহ একটি মাছির মতো। ফুঁ দিলাম আর উড়ে গেল। বর্তমান যুগে আমাদের অবস্থা ফাসেকের মতো। আমরা গুনাহকে মাছির মতো ছোট মনে করি। এটা খুবই দুর্ভাগ্য ও আক্ষেপের ব্যাপার।

গুনাহের ক্ষতি-৯ : গুনাহের কারণে ইল্‌ম ও আল্লাহর মারেফাত হাসিল হয় না। তালিবে ইল্‌ম তো অনেক ভর্তি হয়; কিন্তু গুনাহের কারণে বেশিরভাগ ঝরে যায়। সকলের পক্ষে ইল্‌ম অর্জন করা সম্ভব হয় না। ঠিক তেমনি গুনাহের কারণে আল্লাহর মারেফাত অর্জন ব্যাহত হয়। অধিক গুনাহের কারণে অন্তর মরে যায়। ফলে মরা অন্তরে আল্লাহর মারেফাত আসে না।

গুনাহের ক্ষতি-১০ : বেশি গুনাহের কারণে ইল্‌ম অনুযায়ী আমলের তাওফীক হয় না। একদা দাওরায়ে হাদীছ অদ্যায়নরত এক তালিবে ইল্‌মকে তার পিতা আমার কাছে এনে অভিযোগের সূরে বললেন, হযরত! আমার ছেলে বর্তমানে দাওরায়ে হাদীছ পড়ছে; কিন্তু সে নামাযে অনেক গাফলতি করে। আপনি দু'আ করে দিন, যেন সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করতে পারে। আমি ছাত্রকে উদ্দেশ করে বললাম, দু'আ তো করব, তবে তুমি গুনাহ ছেড়ে দাও; তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমার নেক আমালের তাওফীক হবে।

গুনাহের ক্ষতি-১১ : গুনাহের কারণে উপকারী ইল্‌মের ধারাবাহিকতা ঠিক থাকে না। কেননা, ইল্‌ম হলো নূর আর গুনাহ হলো অন্ধকার। অন্ধকার থাকলে সেখানে আলো থাকে না। অনেক সময় অন্ধকার বেশি গাঢ় হয়ে গেলে তা অল্প আলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে অন্ধকারের ভিড়ে আলো ম্লান হয়ে যায়।

গুনাহের ক্ষতি-১২ : গুনাহের একটি বড় ক্ষতি হলো, বক্তার বক্তব্যের দ্বারা শ্রোতাদের উপর কোনো সুপ্রভাব পড়ে না। বর্তমানে বক্তার অভাব নেই ঠিকই; কিন্তু প্রভাবের দারুন অভাব রয়েছে। এর একমাত্র কারণ হলো গুনাহ।

গুনাহের ক্ষতি-১৩ : গুনাহের কারণে আমাদের অধীনরা আমাদের কথামতো চলে না। হযরত মুজাহিদ ইবনে এওয়াজ (রহ.) বলেন, যখন আমার দ্বারা আল্লাহপাকের আদেশ পালনের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি হতো, তখন আমি আমার স্ত্রী বা বাঁদী অথবা আমার আরোহণের জন্তুর মধ্যে এর মন্দ প্রভাব দেখতে পেতাম। অর্থাৎ তখন তারা আমার আনুগত্য করত না; বরং অবাধ্যতা প্রদর্শন করত।

মোটকথা, যখন কোনো বান্দা আল্লাহপাকের আদেশ পালনে কোনো ধরনের কমতি করে, তখন তার অধীনরাও তার অবাধ্য হয়ে যায়। এ হলো আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণাম, যা বান্দা নগদই পেয়ে যায়।

গুনাহের ক্ষতি-১৪ : গুনাহের কারণে সর্বদা পেরেশানিতে (টেনশনে) ভুগতে হয়। বান্দা গুনাহের কাজ করবে এবং এর পাশাপাশি সে আরামেও থাকবে এটা কীভাবে সম্ভব? এমনটা হতেই পারে না; বরং তার পেরেশানি লেগেই থাকবে।

মানুষ যা ব্যাপকভাবে ভুল করে তা হলো, গুনাহের মধ্যেই সে শান্তি তালাশ করতে থাকে। অথচ শান্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যেই রয়েছে। অর্থাৎ শান্তি গুনাহ ছাড়ার মধ্যে – গুনাহ করার মধ্যে নয়। আল্লাহপাক যেসব কাজে খুশি হন, মানুষ সেসব কাজ করে জীবনে শান্তি অনুভব করে। পক্ষান্তরে আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কাজ করে কখনো শান্তির দেখা মেলে না।

গুনাহকে হাল্কা মনে না করা

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

কখনও গুনাহকে হাল্কা মনে করবে না। হাফেয ইবনুল কায়্যিম জাউযি (রহ.) বলেন–

'হে বন্ধু! গুনাহ করতে গিয়ে এটা দেখ না যে, কোনটা ছোট গুনাহ আর কোনটা বড় গুনাহ। বরং মনে করবে, তুমি আল্লাহপাকের নাফরমানি করছ।'

তাই, ছোট-বড় কোনো ধরনের গুনাহ করা যাবে না। এমন কি কেউ কখনো করে যে, সাপ বা বিচ্ছু ছোট হওয়ার কারণে তা মারে না; বরং সাহস করে ধরে ফেলে? এমন ভুল কেউ কখনো করে না। কেননা, সকলেই জানে, ধরলেই সাপ-বিচ্ছু তার জীবন ধ্বংস করে দিবে।

মনে রাখবেন, সাপ-বিচ্ছুর ক্ষতির তুলনায় গুনাহের ক্ষতির পরিমাণ অনেক-অনেক বেশি, যদিও তা দেখা যায় না। কেননা, সাপ-বিচ্ছু কামড়ালে দুনিয়ার জীবন নাশ হয় মাত্র; কিন্তু গুনাহের ছোবল এমন মারাত্মক যে, তার দ্বারা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জীবনই ধ্বংস হয়ে যায়। বরং দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের জীবন ধ্বংস করে বেশি।

বড়ই চিন্তার খোরাক

আমার কথাগুলো যদিও খুব সাদামাটা ও অতি সাধারণ। তবে শুনলে ছাওয়াব হবে ইনশাআল্লাহ! তাই খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন। আশা করি ফায়দাও হবে। বর্তমানে আমাদের কওমী মাদরাসার ছাত্ররা যেসব কিতাব পড়ছে হুবহু এসব কিতাব আমাদের আকাবিরগণ পড়েছেন। ধরুন, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) যে সিহাহ সিত্তাহ পড়েছেন, ঠিক এই কিতাবগুলোই বর্তমান যামানার তালেবে ইল্‌মরাও পড়ছে। এমন তো নয় যে, নানুতবী (রহ.)-এর সিহাহ সিত্তাহ এক ধরনের ছিল আর বর্তমানের সিহাহ সিত্তাহ আরেক ধরনের? এমনটিও নয় যে, তিনি এক ধরনের কুরআন

তেলাওয়াত করতেন আর বর্তমান যুগের ছাত্ররা আরেক ধরনের কুরআন তেলাওয়াত করছে। কখনো ব্যাপারটি এমন নয়। বরং বর্তমান যামানার তালেবে ইল্‌মরা যে কিতাব আর কুরআন তেলাওয়াত করছে, হুবহু একই কুরআন আর কিতাব আমাদের আকাবিরগণও পড়েছেন।

মোটকথা, সব কিছুই একই ধরনের ছিল এবং আছে। তারপরও বর্তমান যুগের প্রত্যেক তালেবে ইল্‌ম-

* হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর মতো হয় না কেন?

* হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর মতো হয় না কেন?

* হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.)-এর মতো হয় না কেন?

* শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহ.) এর মতো হয় না কেন?

এর সঠিক উত্তর হলো, আমাদের আকাবিররগণ কিতাবগুলো পড়ার পাশাপাশি গুনাহ থেকে বেঁচে তাকওয়াসমৃদ্ধ জীবন অবলম্বন করেছিলেন, যার ফলে তাদের অন্তর ছিল তাকওয়ার আলোয় আলোকিত। এরই ধারাবাহিকতায় তাদের অন্তর ছিল মারেফাতের ভাণ্ডার।

আমি যে বিষয়টি অত্যন্ত চিন্তার বলে মনে করি, তাহলো, আজ আমাদের তালিবে ইল্‌মদের অন্তর কেন তালাবদ্ধ হয়ে আছে? তাদের অন্তরে কেন আল্লাহর মহব্বত জাগে না?

অথচ তালিবে ইল্‌মরা তাদের ঘর-বাড়ি, দেশ-গ্রাম, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজন ছেড়ে এসেছে। মোটকথা, তারা ইল্‌মে দীন হাসিল করার জন্য সব ধরনের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেছে। তারা সারাটা দিন কুরআন-হাদীছ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তারপরও কেন তাদের অন্তরে আল্লাহর মারেফাতের স্বাদ অর্জিত হয় না?

এর কারণ একটাই। তারা সারা দিন নিজেদের অন্তরে কুরআন-হাদীছের আলো আহরণ করে ঠিকই, কিন্তু দিন শেষে যখন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়টা পড়াশোনা থেকে ফারেগ হয়ে মাদরাসার বাইরে বের হয়, তখন কুদৃষ্টি, বাজে কথা, গীবত, কুধারণা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ইত্যাদি করে সারা দিনের কষ্টার্জিত উপকারী ইল্‌মের সমস্ত নূরকে নষ্ট করে ফেলে।

শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব (রহ.) বলতেন–

'যে তালিবে ইল্‌মের বন্ধু বানানোর রোগ থাকবে, তার ইল্‌ম অর্জন নামক তরী কোনো একসময় সমুদ্রের মাঝপথে এসে ডুবে যাবে। চাই সে যতই স্মরণশক্তির অধিকারী হোক-না কেন?

পক্ষান্তরে যে তালিবে ইল্‌মের বন্ধু বানানোর রোগ থাকবে না, তার স্মরণশক্তি যতই দুর্বল হোক-না কেন, অবশ্যই কোনো এক সময় তার উপকারী ইল্‌মের নৌকা তীরে এসে ভিড়বে।'

তাই আমি বলি, আপনারা যেহেতু ইল্‌মেদীন শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে ওস্তাদদের নিকট এসেছেন, তাই এর যথাযথ মূল্যায়ন করে সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুন। ইনশাআল্লাহ আপনাদেরও ইল্‌মে দীনের নূর অর্জিত হবে।

দীন অর্জনের মাধ্যমে ঈমানের হেফাযত

আমার প্রিয় ইল্‌মপিপাসু ভাইয়েরা!

আপনারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আপনারা ইল্‌মে দীন শিক্ষা করে অনেক ভালো ও নেকীর কাজ করছেন। এ দীন অর্জনের মাধ্যমে যে বরকত হাসিল হবে সেই বরকতের দ্বারা আপনাদের ঈমানের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাবে এবং তার হেফাযতও হবে ইনশাআল্লাহ।

একবার আমি কোনো এক মাহফিলে বয়ান করছিলাম। উক্ত মাহফিলে ইউনিভার্সিটির এক মুসলমান ছাত্র ছিল। মুখে তার দাড়ি ছিল না। বয়ান শেষে সে আমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলল। একপর্যায়ে এমন একটি কথা বলে ফেলল, যার দরুন আমার সন্দেহ হলো, তার ঈমান আছে কি-না? ফার্সী ভাষার প্রবাদ আছে–

نقل کفر کفر باشد

'কুফরী বাক্য উচ্চারণ করাও কুফরী।'

তার কথার ধরন এমন ছিল যে, তার কথায় স্পষ্ট ফুটে ওঠে যে, সে আল্লাহর শানে কুফরী কথা বলে ফেলেছে।

তার কথার মর্মার্থ হলো, আল্লাহপাকের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের (Favouritism) অভ্যাস রয়েছে। অর্থাৎ তার অভিযোগ হলো, আল্লাহপাক পক্ষপাতিত্ব করেন। আস্তাগফিরুল্লাহ!

একবার আমি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েছিলাম। সেখানে এক ডাক্তারের সঙ্গে আমার সাক্ষাত ও পরিচয় হলো। তার চলাফেরা একেবারেই

ইংরেজদের মতো। সে আমাকে গর্বের সঙ্গে বলছিল, আমি একজন ডাক্তার। আমার তিন ছেলে ডাক্তার। তাদের স্ত্রীরাও ডাক্তার। আমার পরিবারের আট-নজন সদস্য সবাই ডাক্তার। কেউ থাকে ইংল্যান্ড, কেউ আমেরিকা, কেউ লন্ডন। সবাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে থাকে। আর এটাই তার কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয় ছিল।

বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলে আপনারা অবাক হবেন। ওই ভদ্রলোকের পরিবারের আট-নজন সদস্য প্রত্যেকেই ডাক্তার। তাই এ নিয়ে সে খুব গর্ব করছিল। অথচ কে দীনের উপর আছে আর কে দীনের উপর নেই এ নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা কিংবা মাথাব্যথা তার নেই। তারা তো এ ধরনের ব্যক্তি, যারা শুধু দুনিয়ার জীবন নিয়েই খুশি আছে। তাদের মতে তারা খুব ভালো কাজ করছে। অথচ আল্লাহপাকের ভাষ্যমতে তারাই প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত। এ ব্যাপারে আল্লাহপাকের ভাষ্য হলো-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

'হে নবী! আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেই লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হয়েছে; অথচ মনে করে, তারা সৎকর্ম করছে।'[১]

আল্লাহওয়ালাদের দু'আর বরকত

যখন কোনো সাধারণ ব্যক্তির উপর আল্লাহর ওলীদের চোখ পড়ে অর্থাৎ যখন নেককার ব্যক্তিদের নেক দৃষ্টি পড়ে, তখন ওই ব্যক্তির অন্তর থেকে গুনাহের উৎস বের হয়ে যায়, যার ফলে গুনাহ করার আগ্রহও তার অন্তরে থাকে না।

একটি ঘটনা। এক যুবক কোনো এক আল্লাহর ওলীর সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করে। ফলে কিছু দিনের মধ্যে তার জীবনের চলার পন্থা বা ধারা পাল্টে যায়। তার বক্তব্য হলো, আমি বেফাকুল মাদারিস পাকিস্তানের শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষায় তিনবারই প্রথম স্থান লাভ করি। অথচ অপরদিকে গুনাহের কাজ ছাড়তে পারছিলাম না। তারপর এক আল্লাহর ওলীর সাথে সম্পর্ক করার কারণে আল্লাহপাক আমাকে গুনাহ ছাড়ার তাওফীক দিয়েছেন।

---

১. সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ১০৩, ১০৪

হাঁ, বাস্তবেই এটি এমন এক নেসবতের নূর, যা সিনায় প্রবেশ করে। আর এটিই আল্লাহর ওলীর দু'আ। তাই কবি বলেছেন–

دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے

میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے

বড়রা মোদের দু'আ দেন যদি থাকেন দূরে,

যাই যদি ডুবে কভু সমদ্র ছোড়ে তীরে।

এভাবেই মূলত আল্লাহওয়ালারা তাদের মুরীদদের জন্য দু'আ করতে থাকেন, যার বদৌলতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য সম্ভব হয়। আল্লাহর ওলীগণ তাহাজ্জুদ নামায পড়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে নিজেদের মুরীদদের জন্য দু'আ করতে থাকেন। জানা নেই, কোথায় কোন আল্লাহর ওলীর দু'আর কারণে আল্লাহপাক আমাদেরকে গুনাহ হতে হেফাযত করছেন।

আল্লাহভীতি এমনই থাকা উচিত

গুনাহ করার সুযোগ না থাকার কারণে আমরা গুনাহ করতে চাইলেও গুনাহ করতে পারি না। তা না হলে আমরা গুনাহ করার সুযোগকে হাতছাড়া করতাম না।

মোটকথা, গুনাহ করার সুযোগ থাকলে আমাদের দ্বারা কোনো-না-কোনো গুনাহ হয়েই যেত। কিন্তু আমাদের আকাবির এমন পরহেযগার ছিলেন যে, তাদের গুনাহ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহপাকের ভয়ে তাঁরা গুনাহ করতেন না।

এক তাবেয়ী সম্পর্কে কিতাবে লেখা আছে, তৎকালীন এক খৃস্টান বাদশা তাকে বন্দী করলেন। একদা বাদশা তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করলেন। বাদশা মন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। কিন্তু মন্ত্রী আপত্তি জানাল এবং বাদশাকে পরামর্শ দিয়ে বলল, তাকে এখন হত্যা করা ঠিক হবে না। কেননা, তার মধ্যে অনেক বীরত্ব ও সাহস রয়েছে। তাকে যদি কোনোভাবে আমাদের ধর্মে আনা যায়, তাহলে আমাদের সৈন্যদলের সেনাপ্রধান বানালে খারাপ হবে না। এমন বীর-বাহাদুর লোক আপনি কোথায় পাবেন?

বাদশা বললেন, ঠিক আছে; আমি তাকে আমাদের ধর্মে আনার ব্যবস্থা করছি। বাদশার ইচ্ছা হলো তাকে লোভ-লালসা দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা

তাই বাদশা তাকে রাজত্বের লোভ-লালসা দেখিয়ে বললেন, তুমি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করো। কিন্তু তিনি বাদশার কথায় কর্ণপাত করলেন না। বাদশা দেখলেন, তার প্রস্তাবের প্রতি লোকটা কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ করছে না। এই অবস্থা দেখে বাদশা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বাদশাকে চিন্তিত দেখে বাদশার যুবতী মেয়ে পিতাকে লক্ষ্য করে বলল, আব্বাজান! আপনার কী হয়েছে? আপনি এত চিন্তিত কেন? বাদশা তাঁর মেয়েকে সবকিছু খুলে বললেন। পিতার বক্তব্য শুনে মেয়ে বলল, আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি তাকে আমাদের ধর্মে আনতে পারি।

বাদশা তাবেয়ীকে একটি রুমে বন্দী করে তার মেয়েকে বলল, তুমি দেখো লাইনে আনতে পার কি-না। তারপর থেকে রীতিমতো বাদশার মেয়ে খুব সাজগোজ করে তার জন্য খাবার নিয়ে এল। এ সবের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর ওলীকে তার দিকে আকৃষ্ট করা। এভাবে রাজকন্যা চল্লিশ দিন পর্যন্ত চেষ্টা করল। কিন্তু আল্লাহর ওলী রাজকন্যার দিকে একবারও চোখ তুলে তাকালেন না। চল্লিশ দিন পর রাজকন্যা তাকে লক্ষ্য করে বলল, আপনি কেমন মানুষ বলুন তো! দুনিয়াতে সব পুরুষই নারীর প্রতি দুর্বল থাকে এবং খুব সহজেই মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আমি এত সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও আপনি আমার দিকে একবারও চোখ তুলে তাকালেন না! আপনি পুরুষ, না অন্য কিছু?

আল্লাহর ওলী উত্তরে বললেন, আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে পরনারীর প্রতি তাকাতে নিষেধ করেছেন। তাই আমি কখনো তোমার দিকে তাকাইনি। আল্লাহর ওলীর বক্তব্য শুনে রাজকন্যা বলল, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আপনার এত মহব্বত কীভাবে হলো? আমাকেও তা শিক্ষা দিন। আল্লাহর ওলী রাজকন্যাকে ইসলামের অনেক বিষয় শিক্ষা দিলেন। এ হলো আল্লাহপাকের কুদরত! রাজকন্যা শিকার করতে এসে নিজেই শিকার হয়ে গেল। পরিশেষে বলল, আমি মুসলমান হতে চাই। তারপর তিনি রাজকন্যাকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে দিলেন। এ উপকারের বদলে রজকন্যা নিজেই তাবেয়ীকে একটি পন্থা বলে দিল, যার মাধ্যমে তিনি বন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করলেন। পরিশেষে রাজকন্যাও রাজ-পরিবার ছেড়ে মুসলমানদের এলাকায় চলে এল।

এখানে আশ্চর্যের বিষয় হলো, একটি যুবতী মেয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নির্জনে বসে একজন যুবক পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছে, অথচ যুবক একবারও সুন্দরী যুবতীর দিকে চোখে তুলে তাকাননি।

নিশ্চয় ঘটনটি শুনে আমরা অবাক হয়েছি। আমাদের সঙ্গে ফেরেশতারাও অবাক হয়েছেন। সবার মনে একটিই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা যে, এর কারণ কী? কারণ হলো, ওই আল্লাহওয়ালার অন্তরে আল্লাহপাকের ভয় ছিল, যার ফলে গুনাহের ইচ্ছাও তার অন্তরে জন্ম নেয়নি। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের যুব সমাজের অবস্থা দেখুন, গুনাহ করার সুযোগ না থাকার কারণেই কেবল তাদের দ্বারা বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে। অন্যথায় গুনাহ করার সুযোগ হাতে এলে সেই সুযোগ তারা হাতছাড়া করে না। এমনকি কেউ যদি গুনাহের কাজে ডাকে বা ইশারা করে, তাহলেও গুনাহের কাজে খুব সহজে লিপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন।

এমন চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব!

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) তাঁর মাকতুবাত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এই উম্মতের মধ্যে এমন কয়েকজন নেককার বীরপুরুষ গত হয়েছেন, যাদের গুনাহের ব্যাপারে ফেরেশতাদের বিশ বছরেও একটি গুনাহ লেখার সুযোগ হয়নি। আল্লাহু আকবার!

যখন তারা এই আমলনামা নিয়ে আল্লাহপাকের সামনে হাজিরা দিবেন এবং অন্যপ্রান্তে আমাদের মতো হতভাগা গুনাহগার বান্দারা গুনাহের বোঝা নিয়ে যখন আল্লাহপাকের সামনে হাজির হব, তখন আমাদের পরিণতি কী হবে আল্লাহপাকই এ ব্যাপারে ভালো জানেন! তাই আমাদের কর্তব্য হলো, গুনাহমুক্ত যিন্দেগী যাপন করা এবং সর্বদা আল্লাহপাকের নাফরমানি হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

তাওবার দুটি লাভ

এই মুবারক মজলিসে বসেই যদি আমরা দৃঢ় সংকল্প করি, হে আল্লাহ! আজ আমরা খালেস দিলে তাওবা করছি; আর কোনো গুনাহ করব না, তাহলে এই আশা করতে পারি যে, এই তাওবার দ্বারা আমাদের অন্তরের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং আমরা আল্লাহপাকের অতি নিকটে চলে যাব ইনশাআল্লাহ। কারণ, বান্দা যতক্ষণ গুনাহ পরিহার না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহপাকের সঙ্গে তার সম্পর্ক কায়েম হবে না।

এ কারণে আমাদের মাশায়েখগণ তাদের মুরীদদের সর্বপ্রথম গুনাহ ছাড়ার ওজিফা দিয়ে থাকেন। মুরীদ এস বলে, হযরত! আমাকে কিছু ওজিফা দিন। শায়েখ বলেন, গুনাহ থেকে তাওবা করো; এটিই তোমার ওজিফা। অনেক

সময় শয়তান অন্তরে এই বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, ওমুক গুনাহ আমার দ্বারা ছাড়া সম্ভব নয়। আরে ভাই! নিজেই নিজের অন্তরকে বোঝাতে হবে। ঠিক আছে, আমি তো গুনাহ থেকে বিরত থাকতে পারব না, কিন্তু আল্লাহপাক তো পারেন আমাকে এই গুনাহ থেকে বিরত রাখতে। কেননা, আমাদের অন্তর তাঁর অধীনে।

يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَآءُ

'আল্লাহপাক অন্তরকে তার ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করেন।'

তাই আল্লাহপাক যদি বান্দার অন্তরকে গুনাহবিমুখ করে দেন, তাহলে বান্দার পক্ষে গুনাহ থেকে বাঁচা আরো সহজ হয়ে যাবে। এজন্যই খালেস দিলে খাঁটি তাওবা করার সাথে-সাথে গুনাহ একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। তারপরও যদি ভুলে কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে সাথে-সাথে আবার তাওবা করে নিতে হবে।

এই তাওবার দ্বারা দুটি লাভ হবে। প্রথমত তাওবার দ্বারা পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত আল্লাহ আগামীতে সব ধরনের গুনাহ থেকে হেফাযত করবেন। আর তাওবা এমন একটি আমল, যা প্রতিদিন করা দরকার, যার কারণে আমাদের পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। অন্যথায় তাওবা না করা হলে শয়তান আমাদের বিভিন্ন ধরনের কথা বলে ধোঁকা দিতে থাকবে। প্রবাদ আছে– 'নয়শ ইঁদুর খেয়ে বিড়াল গেছে হজে।'

এ ধরনের কথা বলে শয়তান ধোঁকা দিতে থাকে। মাদরাসার ছাত্রদের শয়তান এই বলে ধোঁকা দেয় যে, আমি কিভাবে তাওবা করব? কারণ, আমি তো অনবরত গুনাহ করছি!

আরে ভাই! নয়শ ইঁদুর খেয়ে কেন; হাজারটা ইঁদুর খেয়েও যদি বিড়াল হজে যায় (অর্থাৎ এ উপমা অনুযায়ী মানুষ যদি হাজারটা গুনাহ করেও তাওবা করে), তাহলেও আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কেননা, আল্লাহপাক গুনাহগার বান্দাকে সম্বোধন করে ডাকতে থাকেন আর বলতে থাকেন, যা এক ওলী তার ভাষায় বলেছেন–

صد بار اگر توبہ شکستی باز آ باز آ

'হে আমার গুনাহগার বান্দা! তুমি শতবার তাওবা করে শতবারই ভঙ্গ করেছ; তারপরও আমার দরজায় এসো, তোমার জন্য আমার দরজা খোলা। তাই এসো, তওবা করো। আমি তোমার তাওবা কবুল করব।'

অন্যদিকে আমরা যদি ক্ষমাকারীর আসনে থাকতাম, তাহলে খুব চিন্তা-ভাবনায় পড়ে যেতাম যে, অপরাধীকে ক্ষমা করা যাবে কি-না? আর যদি কাউকে ক্ষমা করতামও, তাহলে বাস্তবিকপক্ষে তার এত ভুল-ত্রুটি মাফ করতাম না।

হিসাব গ্রহণের আগেই তাওবা করুন

প্রিয় ইল্‌মপিপাসু ভাইয়েরা!

আল্লাহপাক ক্ষমাশীল ও ক্ষমাকারী। তিনি এমন এক পবিত্র সত্তা, যিনি বান্দার প্রতি অতি দয়ালু ও মেহেরবান। তাই আপনার যখনই কোনো গুনাহ হয়ে যাবে, সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহপাকের নিকট মাফ চেয়ে নিবেন। তাহলে আল্লাহপাক নিজগুণে আপনাকে মাফ করে দিবেন। অন্যথায় এই ক্ষমার দায়িত্ব কোনো বান্দার কাছে হলে অনেক মুশকিল হতো।

শুকরিয়ার বিষয় হলো, আমাদের ক্ষমাকারী আল্লাহপাক নিজেই। তবে বান্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সমস্ত হক বা অধিকার রয়েছে, তা বান্দার কাছেই মাফ চেয়ে নিতে হবে। তাই যদি কাউকে আপনার কথা দ্বারা কষ্ট দিয়ে থাকনে বা কারো হক নষ্ট করে থাকেন, তাহলে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কেননা দুনিয়ার লজ্জা, শাস্তি সামান্য। অন্যদিকে আখেরাতের লজ্জা, শাস্তি অনেক কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক।

একব্যক্তি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে। ম্যানেজার সাহেব ভালো করেই জানে, নির্ধারিত সময় তার হিসাবগুলো যাচাই করতে একজন অডিটর আসবেন। আর এই অবস্থায় ম্যানেজার সাহেব যদি নিজের খাতায় হিসাব মিলিয়ে না রাখেন আর অডিটর এসে হিসাবে গড়মিল পায়, তাহলে আপনারাই বলুন, এ অবস্থায় ম্যানেজার সাহেবের অপমান-লাঞ্ছনা ছাড়া কোনো গতি থাকবে? বরং তার চাকরিই থাকবে না। তাই অডিটর আসার পূর্বেই ম্যানেজার সাহেবের উচিত হলো, তার হিসাবের খাতা মিলিয়ে নেওয়া।

আর এই বাস্তবতা যদি আমরা বুঝে থাকি, তাহলে আমাদের সবাইকে কবরে যাওয়ার পূর্বে হিসাব-নিকাশ ঠিক করে নিতে হবে। এটি তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়; বরং খুব সহজ কাজ। কারণ, তাওবার দ্বারা বান্দা তার হিসাব খুব সহজেই গুছিয়ে নিতে পারে। আর তাওবা করতে কোনো অনুশীলনীর প্রয়োজন পড়ে না।

'তাওবা' অনুতপ্ত হওয়ার নাম

আরে ভাই! এত ভাবছেন কেন? তাওবা করা খুবই সহজ। তাওবার সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। তাওবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

اَلنَّدَامَةُ تَوْبَةٌ

'আন্তরিক অনুতাপ-অনুশোচনাই হলো তাওবা।'

তাই যদি কোনো বান্দা লজ্জিত আর অনুতপ্ত হয়ে ভারাক্রান্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা চায় এবং ভবিষ্যতে কোনো গুনাহ করবে না বলে আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয়, তাহলে এটি-ই তার তাওবা হয়ে যাবে। এই তাওবার উসিলায় আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

এই আলোচনার দ্বারা বোঝা গেল, তাওবা মূলত ৩টি বিষয়ের সমষ্টির নাম। যথা–

(১) কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

(২) গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(৩) ভবিষ্যতে এ গুনাহটি আর না করার ব্যাপারে ওয়াদা করা।

যে তাওবার মধ্যে এই তিনটি বিষয় থাকে, সেটিই মূলত তাওবা। এমন তাওবায় আল্লাহপাক খুশি হন। এভাবে তাওবা করলে আল্লাহ সেই তাওবা কবুল করেন এবং তাওবাকারী গুনাহমুক্ত হয়ে যায়।

লজ্জার আগুনে জ্বলাও অনেক উত্তম

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন–

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ.

'যে খারাপ কাজ করবে তাকে সে কাজের শাস্তি ভোগ করতে হবে।'[১]

হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো–

'গুনাহগারকে তার গুনাহের শাস্তি দুনিয়াতে নতুবা আখেরাতে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।'

দুনিয়ার শাস্তি হলো, আল্লাহপাক গুনাহগার বান্দাকে তার গুনাহের কারণে অস্থিরতার মুসিবতে ফেলবেন। আর এই মুসিবতের মাধ্যমে তার গুনাহসমূহ

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১২৩

ক্ষমা করে দিবেন। বান্দাকে মুসিবতে লিপ্ত করার আগেই যদি বান্দা নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহপাকের কাছে তাওবা করে, তাহলে আল্লাহপাক ওই বান্দাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর এটাও এক প্রকার শাস্তি যে, বান্দা নিজের গুনাহের কারণে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে।

মুফতী শফী (রহ.) বলেন, গুনাহগার ব্যক্তিকে গুনাহের কারণে দুই আগুনের এক আগুনে তো অবশ্যই জ্বলতে হবে। প্রথমত তাকে দুনিয়াতে লজ্জিত হতে হবে। সে আক্ষেপের আগুনে জ্বলবে, নিজে কষ্টভোগ করবে, অপদস্থ হবে, আল্লাহপাকের কাছে নিজের গুনাহের কারণে মাফ চাইতে থাকবে এবং তাওবা করতে থাকবে। নতুবা তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। তাই বান্দা যদি দুনিয়ায় লজ্জা ও আক্ষেপের আগুনে জ্বলে, তাহলে তাকে আল্লাহপাক জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করবেন ইনশাআল্লাহ।

বান্দা যদি অনুতপ্ত বা লজ্জিত না হয়, তাহলে তার গুনাহের কারণে তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। এখন আপনারাই বলুন, সহজ পন্থা কোনটি? দুনিয়ার জীবনে অনুতপ্ত আর লজ্জিত হয়ে আল্লাহপাকের নিকট হতে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া, নাকি জাহান্নামের আগুনে জ্বলা? আমাদের এই পরিমাণ শক্তি নেই যে, আমরা জাহান্নামের আগুনকে সহ্য করতে পারব। কেননা, দুনিয়াতে আমরা আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে লালিত-পালিত হচ্ছি। তাছাড়া আমরা ছোট কোনো চুলার আগুনই সহ্য করতে পারি না, তাহলে কিভাবে জাহান্নামের আগুন সহ্য করব? তাই আমাদের উচিত এখনই খালেস দিলে তাওবা করে নেওয়া এবং নিজের গুনাহের কারণে লজ্জিত হওয়া। আর এভাবে আল্লাহপাকের কাছে দু'আ করা-

'হে আমার মালিক! আমি এতক্ষণ গুনাহে ডুবে ছিলাম। আমার এখন বুঝ এসেছে, গুনাহ নাপাক, যা আমার শরীরকে নাপাক করে ফেলছে, আপনি আমাকে এ থেকে পবিত্র করুন।'

বাস্তবে আল্লাহ যদি আমাদের গুনাহের দুর্গন্ধকে দুনিয়ার মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতেন, তাহলে এই দুর্গন্ধের কারণে কেউ আমাদের আশপাশে আসতে পারত না, সাথে বসতে পারত না বা একসঙ্গে চলাফেরাও করতে পারত না। এটিও আল্লাহপাকের খাস মেহেরবানি। তিনি আমাদের গুনাহের দুর্গন্ধকে ঢেকে দিয়েছেন।

তাই এভাবেও দু'আ করা উচিত–

'হে আল্লাহ! যেভাবে আপনি আমাদের প্রকাশ্য নাপাকিকে ঢেকে দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে আমাদের অপ্রকাশ্য নাপাকিকেও ঢেকে দিন।'

জাহান্নাম থেকে মুক্তির একটি বিস্ময়কর উপায়

খুব ভালো করে স্মরণ রাখুন, যদি আল্লাহপাকের ভয়ে বান্দার চোখ থেকে সামান্য পরিমাণও অশ্রু প্রবাহিত হয়, তাহলে কোনো এক সময় এ সামান্য পরিমাণ অশ্রুই জাহান্নাম থেকে তার মুক্তির পাথেয় হবে।

একব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে আর তার ডানে-বামে তাকিয়ে দেখবে, যারাই তার সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করেছিল, সবাই তাদের কোনো-না-কোনো আত্মীয়ের সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। সে শুধু একা-ই জাহান্নামের অধিবাসী এবং এমন কোনো ব্যক্তিও নেই, যে তার জন্য সুপারিশ করবে। নিজের এ দুরবস্থায় সে খুব অস্থির থাকবে।

হাদীছ শরীফে এসেছে, যখন তার কোনো সুপারিশকারী থাকবে না, তখন তার চোখের পলকে একটা পশম আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করে বলতে থাকবে– 'হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনার এই বান্দা আপনার বড়ত্বের কাছে মাথা নত করে নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে একবার হলেও দুনিয়াতে আপনার ভয়ে ক্রন্দন করেছিল, যার ফলে তার চোখ থেকে সামান্য অশ্রু বের হয়েছিল। ফলে আমি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ি। তাই হে আল্লাহ! আপনি আমার সুপারিশকে কবুল করুন। সে তো আপনার এমন এক বান্দা, যে আপনাকে ভয় করে।'

তারপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের ডেকে বলবেন, 'হে ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো এবং সবাইকে জানিয়ে দাও, আমি এই চোখের সাক্ষ্য গ্রহণ করে আমার এই বান্দাকে জাহান্নাম থকে মুক্তি দিলাম।' সুবহানাল্লাহ!

গুনাহ থেকে বাঁচার দু'আ

আল্লাহর রাসূল নিজে দু'আ করতেন এভাবে–

'হে আল্লাহ! আমাকে গুনাহের অবস্থা থেকে বাঁচান।'

এক আল্লাহর ওলী রাসূলের দু'আকে উর্দু ভাষায় কবিতা আকারে ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا
کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا
میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا
مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

করো না খোদা বেষ্টিত কারো দুঃখের মধ্যে জীবনকে,
অন্তরের গরীব করো খোদা কোনো গরীব বান্দাকে।
পরীক্ষার নই উপযুক্ত আমি হে আমার মালিক!
দিয়ো না মোরে গুনাহের সুযোগ রক্ষা করো খালিক!

আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। যেমনিট কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ

'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দকর্মপ্রবণ। কিন্তু সে নয়, আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'[১]

আল্লাহপাকের রহমত বান্দার উপর তখনই আসে, যখন বান্দা নিজে গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। যখন বান্দা এমন পরিস্থিতির শিকার হয়, যে অবস্থায় বান্দার গুনাহ থেকে বাঁচার কোনো উপায় থাকে না, ঠিক তখনই আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে আনেন।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যখন গুনাহের দিকে আহ্বান করা হলো, তিনি সব ধরনের চেষ্টা করে যখন নিরুপায় হয়ে আল্লাহপাকের কাছে সাহায্য চাইলেন, ঠিক তখনই আল্লাহপাক তাকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

দুটি অপূর্ব দু'আ

আমরা এখনি আল্লাহপাকের কাছে দু'আ করি–

'হে আল্লাহ! বিতাড়িত শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে রাখুন।'

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৫৩

আল্লাহর ওলীরাও গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহপাকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। কিতাবে লেখা আছে, হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) যখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে জাগ্রত হতেন, তখন এভাবে দু'আ করতেন-

(১) 'হে আল্লাহ! রাত হয়ে গেছে। তারাগুলো মিটমিটি জ্বলছে। দুনিয়ার বাদশারা তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। হে আল্লাহ! আপনার দরজা এখনও খোলা। আমি গুনাহগার! আপনার দুয়ারে মাগফিরাত চাচ্ছি; আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

(২) 'হে আল্লাহ! যেভাবে আপনি আসমানকে জমিনে পড়ে যাওয়া থেকে হেফাযত করেছেন, ঠিক সেভাবে শয়তানকে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করা থেকে বিরত রাখুন।'

যখন বান্দা এভাবে নিজেকে পুরোপুরিভাবে আল্লাহপাকের কাছে সোপর্দ করে দিবে, তখন আল্লাহপাক তাকে সব ধরনের গুনাহ থেকে হেফাযত করবেন। আসলে বান্দা নিজের মনের ভাব তার রবের কাছে যত বিনয় আর আবেগের সাথে প্রকাশ করবে, সেটাই তার দু'আ হবে এবং আল্লাহপাক তা কবুলও করবেন। ইনশাআল্লাহ!

তাওবার সময় কান্নার ফযিলত

খুব স্মরণ রাখা দরকার, দু'আ ও তাওবার সময় কান্নাকে সামান্য বিষয় মনে করা যাবে না। তবে চেষ্টা করতে হবে, যেন কান্নার সময় চোখ দিয়ে মুক্তার মতো অশ্রু প্রবাহিত হয়।

হাদীছে এসেছে, একবার সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান শুনছিলেন। এমতাবস্থায় এক সাহাবী এত কাঁদতে লাগলেন, যার দরুন তাঁর শরীরও কাঁপছিল। এত বেশি কাঁদার কারণে তিনি নিজেকে সামলাতে পারছিলনে না।

এই অবস্থা দেখে আল্লাহর নবী সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার এই সাহাবী আল্লাহপাকের কাছে এমনভাবে কেঁদেছে, যাকে উসিলা করে উপস্থিত সবাইকে আল্লাহপাক মাফ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

বাস্তবতা হলো, যদি নেককারদের নেকীর উপরে গুনাহগারদের তাওবার ছাওয়াবের বিষয়টি প্রকাশ করা হতো, তাহলে নেককাররা তা দেখে ঈর্ষা করত আর বলত, তারা এত বড়-বড় গুনাহ করেছিল; কিন্তু এমন খালেস

তাওবা করেছে, যার ফলে আল্লাহপাক তাদের গুনাহকে নেকী দ্বারা বদলে দিয়েছেন। তাছাড়া কয়েকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যদি ইখলাসের সঙ্গে তাওবা করে আর তাদের তাওবার সময়কে পুরো শহরের গুনাহগারদের ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে আল্লাহপাক সকলকে মাফ করে দেন।

এক মহিলার তাওবা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এক মহিলা কবীরা গুনাহ করে ফেলল, যার খবর শহরবাসী জানত না। গুনাহের বিষয়টি শুধু আল্লাহপাক জানতেন। তাই আল্লাহপাক তার অন্তরে একথা জাগ্রত করে দিলেন-

'দুনিয়ার কষ্ট সামান্য, আখেরাতের কষ্ট অনেক বেশি, যার কোনো শেষ নেই। দুনিয়ার লাঞ্ছনা অল্প দিনের, আখেরাতের লাঞ্ছনা অনন্ত কালের। তাই দুনিয়াতেই গুনাহ হতে পবিত্র হতে হবে।'

একথা চিন্তা করে মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমার দ্বারা কবীরা গুনাহ হয়ে গেছে।'

একথা শুনতেই আল্লাহর রাসূল চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। মহিলা অন্য দিক হতে সামনে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার দ্বারা গুনাহ হয়ে গেছে।'

এবারও আল্লাহর রাসূল চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। মহিলা অন্য দিক হতে সামনে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার দ্বারা গুনাহ হয়ে গেছে।'

আবারও আল্লাহর রাসূল চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। মহিলা অন্যদিক হতে সামনে এসে চতুর্থবার বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার দ্বারা গুনাহ হয়ে গেছে।'

এবারও আল্লাহর রাসূল চেহারাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার চার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মহিলাও চারবার চার দিক দিয়ে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দ্বারা গুনাহ হয়ে গেছে। মূলত এর কারণ কী ছিল? এর কারণ হলো, যেহেতু এ যাবত আল্লাহপাকের পক্ষ হতে ব্যভিচারের শাস্তি বিধান নাযিল হয়নি, তাই আল্লাহর রাসূল চাচ্ছিলেন, যেন বারবার চার দিকে বলার দ্বারা সাক্ষী হয়ে যায়।

মহিলা নিজের গুনাহের কথা স্বীকার করার সময় বলছিলেন–

'আমি গুনাহ করেছি এবং তা আমার পেটে লালিত হচ্ছে। এখন আমি চাচ্ছি, আপনি আমার উপর 'হদ' (যিনার শাস্তি) প্রদান করে আমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করুন।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

'এখন চলে যাও; বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এসো।'

রাসূলের বক্তব্য শুনে মহিলা চলে গেলেন।

বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মহিলা বাচ্চাকে নিয়ে রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এবার আমার উপর 'হদ' লাগাতে পারেন।

আল্লাহর নবী বললেন, যাও; এখন বাচ্চাকে দুধপান করাতে থাকো। রাসূলের বক্তব্য শুনে এবারও মহিলা ফিরে গেলেন।

দীর্ঘ দুবছর বাচ্চাকে দুধ পান করানোর পর মহিলা এবারও বাচ্চাকে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের নিকট এলেন। তখন বাচ্চার হাতে একটি রুটির টুকরা ছিল এবং সে তা খাচ্ছিল। মহিলা এই অবস্থা দেখিয়ে বলতে চাচ্ছিলেন, এখন সে আমার দুধের উপর নির্ভরশীল নয়। অতএব, হুজুর! আপনি আমার উপর 'হদ' লাগাতে পারেন।

চিন্তার বিষয় যে, বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে যেমনিভাবে মহিলা নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করেছে, ঠিক দুবছর অবিবাহিত হওয়ার পরও তার মধ্যে এমন অবিচলতা ও দৃঢ়তা ছিল, যার দরুন সে নিজের গুনাহের প্রায়শ্চিত্ব করার উদ্দেশ্যে রাসূলের দরবারে বারবার উপস্থিত হয়েছেন। আর এর মধ্যে আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে যিনার শাস্তির বিধান অবতীর্ণ হয়ে গেছে।

পরিশেষে মহিলার উপর যিনার শাস্তি কার্যকর করা হলো। পাথর মেরে তাকে হত্যা করা হলো। 'হদ' চলাকালে হযরত উমর (রাযি.) তার ব্যাপারে একটি শক্ত কথা বলে ফেলেছিলেন, যার ফলে আল্লাহর নবী ইরশাদ করলেন– 'উমর! সে এমন খাঁটি তাওবা করেছে, যদি তার তাওবার ছাওয়াব সকল মানুষের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে সবার গুনাহের জন্য তা মাগফিরাত হয়ে যাবে।' সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহর আনুগত্যের পুরস্কার

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! যখন আমরাও নিজেদের গুনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহপাকের দরবারে ক্ষমা চাইতে থাকব, আল্লাহপাক আমাদের গুনাহসমূহ

ক্ষমা করে দিবেন। ভবিষ্যতেও গুনাহ হতে হেফাযত করবেন। তখন দেখবে, আল্লাহপাক আমাদের অন্তরে এই পরিমাণ ইল্‌ম ও মারেফাতের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিবেন, যার দ্বারা দুনিয়ার সব কিছুই আলোকিত হয়ে যাবে। বাস্তবতা এই যে, যখন কোনো কারিগর কোনো জিনিস তৈরি করে, তখন সে তার তৈরী বস্তুটি জনসম্মুখে দেখানোর উদ্দেশ্যে তার কাছে একটি নমুনা (Sympol) রেখে দেয়।

আমার শায়েখ হযরত গোলাম হাবীব নকশবন্দী (রহ.) বলতেন, আল্লাহপাকের কিছু বান্দা এমন আছে, যে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিজের অন্তরে আল্লাহর মহব্বতের বন্যা বইয়ে দেয়। ফলে আল্লাহর সেই বান্দা এমন আদর্শবান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে যায় যে, আল্লাহপাক তাকে সকল মানুষের কাছে আদর্শ হিসেবে কবুল করে নেন। এমনকি আল্লাহপাক তার জন্য দুনিয়ার দেশসমূহকে মহল্লা বানিয়ে দেন, যাতে সে খুব সহজে পুরো দুনিয়াতে সফর করতে পারে। এমনকি আল্লাহপাক দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ করে বলতে থাকেন, দেখো! দেখো!

* আমার এই বান্দা নিজেকে কেমন আদর্শ বানিয়েছে!

* আমার এই বান্দা আমার কেমন অনুগত হয়েছে!

* আমার এই বান্দা কেমন করে নিজের দিল থেকে গায়রুল্লাহর মহব্বত বের করে দিয়েছে!

বর্তমান যুগে গুনাহ থেকে একশতে একশ ভাগ বেঁচে থাকে এমন বীরপুরুষ খুব কমই রয়েছে। আল্লাহপাক আমাদের গুনাহ থেকে পরিপূর্ণভাবে বাঁচার তাওফীক দান করুন। এক আল্লাহর ওলী বলেন–

حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا

بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا

দিলের অবস্থা বলব কাকে শোনার কেউ নেই,

মূর্তির পূজারী পেয়েছি শত আল্লাহর বান্দা নেই।

আল্লাহপাক আমাদের অন্তরকে গুনাহ থেকে একশত ভাগ পবিত্র রাখার তাওফীক দান করুন। এর পাশাপাশি

اُدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

'তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।'

এই আয়াতের মর্ম ও বাস্তবতাকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صَالِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا

'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে কী আছে, তা ভালো জানেন। তোমরা যদি নেককার হয়ে যাও, তবে যারা বেশি-বেশি তাঁর দিকে রুজু হয়, তিনি তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করেন।' –সূরা বনী ইসরাঈল : ২৫

রাগ ও তার চিকিৎসা

[১৪২৩ হিজরীর ১৫ শাবান মোতাবেক ২০০২ সনের ২০ অক্টোবর নকশবন্দী সিলসিলার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে জং শহরের জামে মসজিদে শবে বরাতে ঈশার নামাযের পর হযরতওয়ালা দামাত বারাকাতুহুম এই গুরুত্বপূর্ণ বয়ানটি পেশ করেন। মজলিসে সালেকীন ও আমজনতা ব্যাপকহারে উপস্থিত ছিলেন।]

'ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, দ্রুত রেগে যাওয়া দুর্বলতার পরিচয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–

* সুস্থ ব্যক্তির তুলনায় অসুস্থ ব্যক্তি দ্রুত রেগে যায়।
* যুবকের তুলনায় বৃদ্ধ ব্যক্তি দ্রুত রেগে যায়।
* পুরুষের তুলনায় মহিলা দ্রুত রেগে যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো বীর কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, বীর সেই ব্যক্তি, যে কুস্তিতে অন্যকে ধরাশায়ী করে দেয়। নবীজি বললেন, হলো না–

اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ

'যেব্যক্তি রাগের সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে, সে-ই হলো বীর।"

রাগ ও তার চিকিৎসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

তরবিয়তের প্রয়োজনীয়তা

তালীম ও তরবিয়ত দুটি শব্দ। শব্দদুটি শুরু থেকেই একসঙ্গে ও পাশাপাশি অবস্থান করে আসছে। মানুষ তালীম তথা শিক্ষা মাদারাসা, স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি থেকে অর্জন করে আসছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে 'তরবিয়ত' তথা আমলী প্রশিক্ষণ নেই। অতীতে শৈশবেই পিতামাতা সন্তানদের তরবিয়ত করতেন এবং বালেগ হওয়ার পর পীর বা ওস্তাদ তরবিয়ত করতেন। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা ভিন্ন। বর্তমানে সন্তান পিতামাতার কোনো ইসলামী কথা শুনতেই চায় না। পিতার কথা তাদের ভালো লাগে না। কেননা, তিনি শাসন করেন। তবে মাকে খুব পছন্দ করে, ভালোবাসে। কেননা, মা সন্তানের সকল কথায় সায় দেয়। বরং কতক যুবক পিতার প্রতি এমন ঘৃণা পোষণ করে, যেমন মানুষ পাপকে ঘৃণা করে। শাসন-কৈফিয়ত তাদের পছন্দ হয় না। তারা স্বাধীনভাবে চলতে চায়। কারো বাধা তোয়াক্কা করতে চায় না। কেউ শাসন করলে তাদের খারাপ লাগে। যদি কোনো মুরুব্বী বোঝায়, তাহলে তার কাছে যাওয়া এবং তার সাথে কথা বলাই ছেড়ে দেয়। বড় ভাই বোঝালে ছোট ভাই তাকে এড়িয়ে চলে। পিতা বোঝালে যুবক সন্তান পিতার ছায়া মাড়ায় না। রক্ত এতই সাদা হয়ে গেছে যে, যে তাকে প্রবৃত্তির পথে টানে, তাকে একান্ত বন্ধু মনে করে। পক্ষান্তরে যে তাকে নফসের ফাঁদ সম্পর্কে অবিহত করে, তাকে শত্রু মনে করে। এটা কেয়ামত ঘনিয়ে আসারই একটি লক্ষণ।

মানুষের তিনটি পাত্র

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে তিনটি পাত্র দান করেছেন। যথা–

১. প্রেরণার পাত্র

২. চিন্তার পাত্র ও

৩. প্রবৃত্তির পাত্র।

নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

প্রেরণার পাত্র

আল্লাহপাক মানুষকে সর্বপ্রথম যে পাত্রটি দিয়েছেন, তা হলো মানুষের দিল। এই দিলই হলো সমস্ত প্রেরণার উৎস। মানুষের মাঝে যে সমস্ত প্রেরণা থাকে, তার মূল সম্পর্ক থাকে দিলের সঙ্গে। মহব্বতের প্রেরণা, ঘৃণার প্রেরণা, বীরত্বের প্রেরণ, কাপুরুষতার প্রেরণা, দানশীলতার প্রেরণা, কৃপণতার প্রেরণা ইত্যাদি সকল প্রেরণার সম্পর্ক থাকে দিলের সঙ্গে। এ ছাড়াও ঈমান ও কুফরেরও সম্পর্ক থাকে মানুষর দিলের সঙ্গে।

চিন্তার পাত্র

আল্লাহপাক মানুষকে দ্বিতীয় যে পাত্রটি দিয়েছেন, তা হলো তার আকল তথা বিবেক। এটি হলো চিন্তার পাত্র। বিবেক মানুষের দেহে আগত ভালো-মন্দ সব ধরনের চিন্তার পাত্র। সমস্ত চিন্তা-ভাবনার সূত্র এবং কেন্দ্র হলো বিবেক। যেভাবে কম্পিউটারের মধ্যে একটি Math Co-processor হয়। প্রোগ্রামে যেখানেই কোনো Mathematicaloly equation এসে যায়, তখনই সে সোজা Math Co-processor এর দিকে স্থানান্তর করে দেয়, এমনিভাবে মানুষের মাথায় যত ধরনের চিন্তা-ভাবনা আসতে থাকে, তা মানুষের ব্রেনের মধ্যে থাকে।

বিষয়টি এভাবেও বলা যেতে পারে যে, মানুষের ব্রেন হলো চিন্তা-ভাবনার মেইন সড়ক। যেমনিভাবে সড়ক পথে কার, বাস চলে এবং বড়-বড় ট্রাকও চলে, তেমনিভাবে মানুষের ব্রেনের সড়কের উপরেও বিভিন্ন চিন্তাধারা গমনাগমন করতে থাকে। কখনো দুনিয়াবিষয়ক, কখনো দীনবিষয়ক, কখনো ব্যক্তিগত, কখনো পরবিষয়ক। এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনা বারবার আসা-যাওয়া করতে থাকে। চিন্তা-ভাবনা বারবার আসা-যাওয়া করাও আল্লাহপাকের রহমত। যদি চিন্তা-ভাবনা এভাবে হরদম না আসত, তাহলে আমাদের বাঁচা-ই কঠিন হয়ে যেত।

মনে করুন, এক সূফী সাহেবকে তার স্ত্রী বলল, দুপুরে মেহমান আসবেন, অতএব, আপনি সব্জি নিয়ে আসবেন। আপনি সব্জি নিয়ে এলেই খানা রান্না হবে। সূফী সাহেব ঘর থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে স্কুল জামানার এক বন্ধুর সাথে দেখা হলো। ফলে তার সঙ্গে আলাপে লিপ্ত হয়ে গেলেন। যদিও তিনি পুরাতন দোস্তের সঙ্গে আলাপ করছেন, কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণে তার মাথায় এ চিন্তা আসছে যে, আমাকে বাড়িতে সব্জি দিতে হবে। এটি আল্লাহ তা'আলার বানানো অটোমেটিক সিস্টেম। এখন ধরুন, যদি এই একান্ত আলাপচারিতার সময় তার মনেই না পড়ে যে, ঘরে সব্জি পৌঁছাতে হবে এবং ওদিকে দুপুরে ঘরে মেহমান চলে আসে আর ওদিকে সূফী সাহেব দোস্তের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করে বিকালে বাড়ি ফেরেন, তাহলে ঘরের ভেতরগত অবস্থা কেমন গরম হয়ে উঠবে বলে আপনি মনে করেন?

এমনিভাবে মানুষ এক সময়ে দুটি চিন্তা ব্রেনে এক সাথে নিয়ে চলতে পারে। একটি কাজ করা অবস্থায় আরেকটির চিন্তা তার মাথায় এসে আকুলি-বিকুলি করতে পারে। যেমন– ইমাম সাহেব নামায পড়ানোর পাশাপাশি আয়াত তালাশ করতে থাকেন। তিনি আয়াতও খোঁজেন এবং ক্ষণে-ক্ষণে ঘড়ির দিকেও তাকান।

ভাবনার ট্রাফিক

যদি সড়কে যানবাহন চলাচল করতে থাকে, তাহলে সেটা কোনো চিন্তার বিষয় হয় না। চিন্তার বিষয় তখন হয়, যখন ট্রাফিক ব্লক তথা যানজট লেগে যায়। এমনিভাবে যদি মাথায় চিন্তা-ভাবনা আসতে-যেতে থাকে, তবে সেটা কোনো চিন্তার বিষয় নয়। তবে কোনো চিন্তা আসার পর যদি সেটা থেকে যায়, তাহলে তা ট্রাফিককে ব্লক করে দেয় তথা যানবাহনকে আটকে দেয়। তখন তা পেরেশানির কারণ হয়ে যায়। যেমন– ট্রাফিক পুলিশ চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ডান দিকের যানবাহনকে বাম দিকে, বাম দিকের যানবাহনকে ডান দিকে, সামনের যানবাহনকে পিছনে এবং পিছনের যানবাহনকে সামনের দিকে এগিয়ে দিতে থাকে। এমনিভাবে মানুষও তার বিবেকের চৌরাস্তায় আগত চিন্তাধারার যানবাহনকে চালু রাখে। যেমনভিবে যানজট সৃষ্টি হলে এবং বাজারে ভিড় লেগে গেলে ট্রাফিক পুলিশের ইউনিফর্ম খুলে নেওয়া হয়, ঠিক তেমনিভাবে যেব্যক্তির ব্রেনের বাজারে যৌনবৃত্তিমূলক চিন্তা-চেতনার যানজট সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহপাকও সে বান্দার মনুষ্যত্বের ইউনিফর্ম খুলে দেন।

কোন ধরনের চিন্তার জন্য ধরপাকড় হয়?

একটি মূলনীতি মনে রাখবেন। তা হলো, মনে বিভিন্ন চিন্তা উদয় হওয়া খারাপ নয়; বরং চিন্তা মনে সৃষ্টি করা এবং সেই চিন্তা মনে স্থায়ীভাবে জমা রাখাই হলো খারাপ। মনে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট চিন্তাও আসতে পারে। কিন্তু সেটি যদি এসেই চলে যায়, তবে তাতে কিছু যায় আসে না। আল্লাহর ওলীদেরও এমনটা হয়।অনেক সময় যুবকরা মজা লাভের জন্য মনে-মনে অনেক কিছু ভাবে ও চিন্তা করে।

মনে রাখবেন, ইচ্ছার পাশাপাশি যদি তাকে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তবেই তার জন্য জবাবদিহিতা রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি কোনো চিন্তা হঠাৎ এসে হাজির হয় এবং তাকে কদর না করায় দ্রুত সে উধাও হয়ে যায়, তবে তাতে রূহের কোনো ক্ষতি হয় না।

ঈমানের আলামত

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিবেদন করেন, হে আল্লাহর নবী! আমাদের মনে কখনো এমন-এমন খেয়াল আসে, যার দরুন আমাদের মনে হয় যে, এমন চিন্তা আসার চেয়ে আগুনে লাফিয়ে পড়াই ভালো। নবীজি জবাবে বললেন, বলো তো, এসব চিন্তা এলে তোমাদের খুশি লাগে, না খারাপ লাগে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর নবী! এমন চিন্তার উদয় হলে মন খুবই বিষণ্ন হয়, খুবই খারাপ লাগে। একথা শুনে নবীজি বললেন–

ذٰلِكَ عَلَامَةُ الْإِيْمَانِ

'এটি ঈমানের আলামত।'

অর্থাৎ কুচিন্তা মাথায় এলে যদি তাতে মন খারাপ হয় এবং ভালো না লাগে, তবে এই ভালো না লাগা-ই প্রমাণ যে, তোমাদের দিলে ঈমান আছে।

এই হাদীছ প্রমাণ করে, বিভিন্ন বাজে চিন্তা মনে আসতেই পারে। তবে আল্লাহর পথের পথিক যারা, তাদের কর্তব্য হলো, বাজে চিন্তা আমলে না আনা এবং অন্তরে তাকে জায়গা না দেওয়া, এমন বাজে চিন্তা মনে আসতেই তা ঝেড়ে-মুছে ফেলা, এ ব্যাপারে চিন্তা না করা। যখন কোনো বিষয়ে চিন্তা শুরু হয়ে যায়, তাহলে বুঝবেন, তার একটি অন্ধকার আপনার দিলকে অবশ্যই আচ্ছন্ন করবে, গ্রাস করবে।

প্রবৃত্তির পাত্র

আল্লাহর দেওয়া তৃতীয় পাত্রটি হলো নফ্স। এটি প্রবৃত্তির পাত্র। প্রবৃত্তির সম্পর্ক হলো নফসের সঙ্গে। প্রবৃত্তি ভালোমন্দ উভয়ই হয়। যেমন– ইচ্ছা হলো, আমি তাহাজ্জুদগুজার হব। এমন প্রবৃত্তি তো ভালো। পক্ষান্তরে এমন ইচ্ছা যে, দুনিয়ায় আমার সুনাম-সুখ্যাতি বেশি হোক এটা মন্দ প্রবৃত্তি।

বাতেনি ইসলাহের দুটি তরিকা

সংশোধনের পন্থা দুটি। একটি পন্থা হলো, মানুষ নফসের উপর মেহনত করবে এবং তার কুপ্রবৃত্তি দমন করবে। ফলে একসময় তার প্রবৃত্তি শরীয়তের অনুগামী হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পন্থা হলো, দিলের উপর মেহনত করে-করে অন্তরের চাওয়া-পাওয়াকে বদলে ফেলবে। একপর্যায়ে দিলে আল্লাহর মহব্বত প্রবল হবে। যখন মানুষের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত প্রবল হবে, তখন তার সমস্ত চিন্তা চেতনা এবং প্রবৃত্তিও আল্লাহর মানশা মোতাবেক হয়ে যাবে। দিলের উপর মেহনত করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অধিকহারে যিকির ও মুরাকাবা করা।

চিশতিয়া ও নকশবন্দী তরিকার মৌলিক পার্থক্য

চিশতিয়া তরিকার শায়েখগণ নফসের মুজাহাদার মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক দীক্ষা তথা তরবিয়ত শুরু করেন। পক্ষান্তরে নকশবন্দী সিলসিলার শায়েখগণ কলবী যিকির দ্বারা তরবিয়তের খাতা খোলেন। উভয় পথের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। কিন্তু প্রত্যেক ফুলের রং ও খোশবু আলাদা। নফসের উপর যে কাজ করতে হয়, তার উপর মুজাহাদার প্রয়োজন বেশি। প্রথম যুগের সুফিয়ায়ে কেরামের তরিকা এটিই ছিল। কেননা, এটি ছিল তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে একে 'পূর্বসূরীদের সিলসিলা' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা এর ফয়েজ প্রথম থেকেই চালু করে দেন। পক্ষান্তরে সিলসিলায়ে নকশবন্দীকে 'পরবর্তীদের সিলসিলা' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বর্তমানে তাঁর বান্দাদের দুর্বলতা সামনে রেখে একটি সহজ পন্থার নির্দেশনা দান করেছেন যে, দিলের উপর মেহনত করো, যিকির ও মুরাকাবা করো, তাহলে দিলে আল্লাহর মহব্বত এসে যাবে। তখন ইবাদাত করা এবং গুনাহ ছাড়া সহজ হয়ে যাবে। মানুষ আল্লাহর মহব্বতের টানেই গুনাহ ছেড়ে দিবে এবং ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করবে। এটিই হলো মূলত চিশতিয়া ও নকশবন্দী দুই সিলসিলার মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য।

আম্বিয়ায়ে কেরামের মেহনতের ময়দান

আম্বিয়ায়ে কেরামও মানুষের কলবকে তাদের মেহনতের ময়দান বানান। তাঁরা মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উপর মেহনত করেননি; বরং তারা মানুষের দিল বদলে দিয়েছেন। কেননা, দিল বদলে গেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পাওয়া আমলও আমূল বদলে যায়। এমনিভাবে দিল বিগড়ে গেলে, নষ্ট হলে সমস্ত আমলও নষ্ট হয়ে যায়। জনৈক কবির কথায় এ সত্যাটিই প্রকাশ পেয়েছে অতি সুন্দরভাবে। তিনি বলেন–

دل کے بگڑ ہی سے بگاڑتا ہے آدمی

جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا

মানুষ তখন খারাপ হয় দিল যখন বদলায়,
দিল যখন হয় ভালো মানুষ সুন্দর হয়।

এই বাস্তবতার বিষয়টিই নবীজি ব্যক্ত করেছেন তাঁর এক হাদীছে। তিনি বলেন–

اِنَّ فِيْ جَسَدِ بَنِيْ اٰدَمَ لَمُضْغَةٌ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

'মানুষের শরীরে গোশতের একটি টুকরা আছে। সেটি নষ্ট হলে পুরো শরীর বিনষ্ট হয়, আর সেটি ঠিক থাকলে পুরো শরীর ভালো থাকে। মনে রেখো, সেই গোশতের টুকরাটি হলো কলব।'

এই হাদীছ প্রমাণ করে, দিল বা কলব হলো মানুষের দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা। এমনকি মানুষের মেধা ও বিবেকও তার কলবের প্রজা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ.

'তবে কি তারা ভূমিতে চলাফেরা করেনি, যা দ্বারা তাদের এমন অন্তকরণ লাভ হতো, যার দ্বারা তারা বুঝত কিংবা এমন কান, যা দ্বারা তারা শুনতে পেত। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ হয় না; বরং অন্ধ হয় সেই কলব, যা বক্ষদেশে বিরাজ করে।'[১]

---

১. সূরা হজ : আয়াত ৪৬

তিন পাত্র এবং তিন নেয়ামত

জীবন যাপনের জন্য মানুষকে উপকারী বস্তুসমূহ অর্জন করতে হয় এবং ক্ষতিকর বিষয়সমূহ হতে বাঁচতে হয়। উপকারী বিষয় অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একটি শক্তি দান করেছেন, যার নাম কামনা-বাসনা। অর্থাৎ কোনো জিনিস পেতে চাওয়া এবং তা লাভের জন্য হৃদয়ের উতলা হওয়া। এটি জান্নাতী নেয়ামতসমূহের মধ্য হতে একটি নেয়ামত, যা নমুনাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে দান করেছেন, যাতে মানুষ জান্নাতের নেয়ামতসমূহ হতে একটি ঝলক দুনিয়াতেও অনুভব করে।

এমনিভাবে আল্লাহপাক ক্ষতিকর বিষয়সমূহ হতে বাঁচতেও মানুষকে একটি শক্তি দান করেছেন। এর নাম রাগ। এর অর্থ হলো, ক্ষতিকর বিষয়সমূহ থেকে বাঁচার জন্য 'রাগ' মানুষের কাজে আসে। যদি মানুষের মধ্যে রাগ মোটেই না থাকত, তাহলে তার মধ্যে লজ্জা-শরমও থাকত না। রাগ থাকার কারণে মানুষ অনেক ক্ষতিকর বিষয় থেকে বেঁচে যায়। যেমন– কেউ একটি মেয়েকে তার বাড়ির গলিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তার চোখে-মুখে কামনা দেখতে পেল, যার ফলে তার মনে হলো, মেয়েটির এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। তারপরও তার এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাতে সে অবশ্যই ক্ষুব্ধ হবে। ফলে তাকে ডেকে যদি বুঝিয়ে বলে, তোমার এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়; তাই আর কখনো তুমি এখানে এসে দাঁড়াবে না।

এই ঈমানি রাগের কারণে বান্দা গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। প্রবৃত্তি ও রাগের মাঝে সমন্বয় করার জন্য আল্লাহপাক বিবেককে কৌশলী শক্তি দান করেছেন। তাই মানুষ স্বীয় বিবেক ব্যবহার করে প্রবৃত্তি ও রাগ উভয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অতএব, পাত্রও তিনটি, নেয়ামতও তিনটি। তিন পাত্রকে তিনটি নেয়ামত দেওয়া হয়েছে। একেকটি পাত্রের সঙ্গে একেকটি নেয়ামতের সম্পর্ক।

* প্রবৃত্তির সম্পর্ক নফসের সঙ্গে।

* রাগের সম্পর্ক কলবের সঙ্গে।

* হেকমতের সম্পর্ক ব্রেনের সঙ্গে।

এই তিনটি জিনিসই মানুষের কাজে আসে।

প্রবৃত্তি ও রাগ নিয়ন্ত্রণে মাশায়েখদের অবদান

মনে রাখবেন, কয়েকটি জিনিস যদি সীমার মধ্যে থাকে, তাহলে তা অনেক ফায়দা দেয়। কিন্তু যদি তা সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন তাতে অনিষ্ট সাধন হয়। যেমন মনে করুন, পানি। পানি একেবারে না মিললে তাও ক্ষতিকর। আবার যদি এই পানিই এত বেশি হয় যে, বাঁধ ভেঙে শহরে ঢুকে পড়ে, তাহলে তাও ক্ষতিকর।

ঠিক এমনিভাবে যৌনাবেগ যদি মানুষের মাঝে একেবারেই না থাকে, তাহলে তাও ক্ষতিকর। এমন পুরুষত্বহীন মানুষের দ্বারা বংশধারাই রক্ষা পাবে না। অতএব, যৌনশক্তিও জরুরি। কিন্তু যদি ওই যৌনাবেগ এত বেড়ে যায় যে, বৈধাবৈধ দেখে না, মানে না, তাহলে এটাও হবে ক্ষতিকর।

অতএব জানা গেল, যৌনশক্তি নেয়ামতের একটি সীমা থাকা দরকার। তবেই এটি মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে।

ঠিক একই কথা রাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি কারো মধ্যে একেবারেই রাগ না থাকে, তাহলে সে আত্মমর্যাদাবোধহীন হয়ে যায়। তার সামনে তারই সম্মান ক্ষুণ্ন করা হলে অথবা তার সামনে দীনের অপমান করা হলে তার কিছুই মনে হবে না, যেন তার মাঝে সহমর্মিতার গুণ বলতে নেই। এমন আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তি সম্পর্কে নবীজি ইরশাদ করেছেন–

'আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না।'

এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন–

اَنَا اَغْيَرُ وُلْدِ اٰدَمَ وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّيْ

'মানুষের মধ্যে আমার আত্মমর্যাদাবোধ সবেচেয় বেশি। তবে আমার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদবোধের অধিকারী হলেন আল্লাহ।'

যদি কেউ রাগমুক্ত হয়, তাহলে তার মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ থাকে না। অধুনা সাম্যবাদীরা আত্মমর্যাদাহীনতার যে অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে, তার দৃষ্টান্ত বিরল। আধুনিক জগতের অবস্থা হলো, স্বামী তার বন্ধুদেরকে তার স্ত্রীকে দেখায়, বন্ধুদের সামনে নিজের স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দেয়, এক সাথে বসে গল্পগুজব করে। এখন তো বন্ধুদের সঙ্গে করমর্দনের রেওয়াজও ধুমধামের সাথে চলছে। পরপুরুষের সঙ্গে হাত মেলাতে স্বামীর না রাগ হয়, না আত্মমর্যাদায় বাধে।

পক্ষান্তরে রাগ যদি সীমা অতিক্রম করে, তবে তাও ক্ষতিকর হয়। তখন মানুষ সামান্য কথাতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কথা একদমই সহ্য করতে পারে না। অতএব, বোঝা গেল, রাগ যদি অধিক বেড়ে যায়, তবে তাও ভালো নয়।

জ্বর হলে তিন বেলা একটি করে বড়ি খেতে হয়। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম এবং এতেই উপকার হয়। এখন যদি কেউ প্রতি বেলায় তথা সকালে তিনটি, দুপুরে তিনটি এবং রাতে তিনটি করে বড়ি খায়, তাহলে যে ঔষধে উপকার হত, সেটিই এখন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এমনিভাবে রাগও উপকারী জিনিস। কিন্তু তা অবশ্যই সীমার মধ্যে থাকতে হবে। যদি সীমা অতিক্রম করে যায়, তবে এই রাগই তখন ক্ষতি ডেকে আনবে।

এখন প্রশ্ন হলো, যৌনাবেগ ও রাগ উভয়টি কীভাবে ভারসাম্যপূর্ণ হবে?

এর উত্তর হলো, এর জন্য কোনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। এ সমস্ত রোগের ডাক্তারকে বলে শায়েখ। মাশায়েখগণ যে মেহনত করেন, তাতে মানুষের যৌনাবেগ ও রাগ কন্ট্রোলে চলে আসে। যিকির ও মুরাকাবার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই এটি। যতক্ষণ কোনো শায়েখের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে না উঠবে, ততক্ষণ মানুষের ওই দুই শক্তির মাঝে ভারসাম্য সৃষ্টি হতে পারে না। ফলে কোনো-না-কোনো শায়েখের সঙ্গে ইসলাহী ও তরবিয়তী সম্পর্ক স্থাপন করা অতীব জরুরি।

যৌনাবেগ নিয়ন্ত্রিত না হলে চোখ আপনার কাবুতে থাকবে না। মানুষ তার দিলের মধ্যে উঁকি মেরে দেখুক, চোখ তার নিজের নিয়ন্ত্রণে আছে কি-না। যদি অন্তর থেকে আওয়াজ আসে, না; নিয়ন্ত্রণে নেই, তাহলে এর অর্থ হলো, তার মাঝে যৌনাবেগ মাত্রাতিরিক্ত।

এমনিভাবে পরনারী দেখে যদি মন তার পানে ধাবিত হয়, তাহলে এটাও এমন যে, তার মধ্যে যৌনাবেগের মাত্রা বেশি এবং এখনই তার চিকিৎসা করা জরুরি। এমন রোগীর জন্য শায়েখ ডাক্তারের প্রয়োজন তীব্র, যাতে শায়েখ তাকে গাইড করেন, তাকে কিছু পড়তে দেন, তাকে জীবন-যাপন করা শেখান এবং তার জন্য জীবনসূচী নির্ধারণ করে দেন, যাতে তার যৌনাবেগ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। যৌনাবেগ যদি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, তাহলে যে পূত-পবিত্র মানুষ হয়ে যায় আর পবিত্র মানুষ আল্লাহর অতি প্রিয় ও পছন্দনীয়।

জনৈক সাহাবীর বাতেনি ইসলাহের ঘটনা

আল্লাহর রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের দরবারে এক যুবক এল। যুবক কারো ভায়া ছাড়াই স্বয়ং নিজেই এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে যিনা করার অনুমতি প্রদান করুন।

যুবকের উত্তরের একটি পন্থা তো এই হতে পারত যে, আল্লাহর নবী তার নোংরা ও জঘন্য আবেদন শুনেই রেগে ফেটে পড়বেন এবং ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলবেন, তুমি হারামকে হালাল করতে এসেছে? এমন কথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা লাগল না?

কিন্তু না! নবীজি দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। উদারতা ও সহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

নবীজি : তুমি কি চাইবে, তোমার মায়ের সঙ্গে কেউ এমন কাজ করুক?

যুবক : কখনো না।

নবীজি : তোমার স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করা তুমি মেনে নেবে কি?

যুবক : মরে গেলেও না।

নবীজি : যদি কেউ তোমার বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করে, তবে সহ্য করবে কি?

যুবক : মোটেও না।

নবীজি : তোমার কন্যাকে কেউ ধর্ষণ করুক এটা মানতে পারবে কি?

যুবক : জীবন থাকতে আমি এমনটি হতে দেব না।

নবীজি : তুমি যার সঙ্গে যিনা করতে চাও, সে মহিলাটি হয়ত কারো মা হবে অথবা স্ত্রী অথবা কারো বোন অথবা কারো মেয়ে হবে। যদি তুমি তোমার এসব ঘনিষ্ঠজনের বেলায় ব্যভিচার পছন্দ না কর, তাহলে তোমার মতো অন্যরাও তো তা পছন্দ করবে না।

নবীজি যুক্তি দিয়ে বোঝালে যুবক ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। সে বিষয়টির নাজুকতা ও জঘন্যতা টের পেল।

কিন্তু অনেক সময় শুধু বোঝালেই হয় না। কেননা, দিলের মধ্যে আবেগ ও প্রেরণার তুফান বইতে থাকে। বিবেক সাড়া দিলেও ততক্ষণ কোনো ফায়দা হয় না, যতক্ষণ ভেতরের তোলপাড় ও অদম্য বাসনা নিয়ন্ত্রণে না আসে। ফলে নবীজি এরপরে তাকে একটি ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। তা এই যে, নবীজি যুবকের বক্ষে হাত রাখলেন এবং দু'আ করলেন–

'হে আল্লাহ! এই যুবকের দিল পাক করে দিন।'

এই যুবক সাহাবী পরে মন্তব্য করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে হাত রাখা এবং আমার জন্য দু'আ করার বরকতে আমার দিলে এই প্রভাব পড়ল যে, এরপর যিনার ব্যাপারে আমার মনে এত বেশি ঘৃণা জাগল, যেমনটি অন্য কোনো গুনাহের ব্যাপারে ছিল না।

এটি কী ছিল? এটি ছিল ফয়েজ, যা নবীজির বক্ষ হতে ওই সাহাবীর বক্ষে স্থানান্তরিত হয়েছে। আল্লাহওয়ালাগণ মানুষকে এই যে বুকের সাথে লাগান, এটিও এক বক্ষ হতে অন্য বক্ষে ফয়েজ স্থানান্তরের একটি পন্থা।

ফয়েজ স্থানান্তর

হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে এলেন এবং বললেন–

জিবরাঈল : اقرأ 'হে আল্লাহর নবী! পড়ুন।'

নবীজি : ماانابقارئ 'আমি পড়তে পারি না।'

বুখারী শরীফে ঘটনা এসেছে, নবীজি বলেন, আমি পড়ার ব্যাপারে নিজের অপারগতা জাহির করলে জিবরাঈল আমাকে তার বুকের সঙ্গে এত জোরে ঝাঁপটে ধরলেন যে, আমার প্রাণনাশের উপক্রম হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন–

জিবরাঈল : اقرأ 'এবার পড়ুন।'

নবীজি : ماانابقارئ 'আমি পড়া জানি না।'

নবীজি অপারগতা প্রকাশ করলে জিবরাঈল (আ.) আবারও তাঁকে নিজের বুকের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁপটে ধরলেন। এবারও কোনো ফলোদয় হলো না। যখন তৃতীয়বার হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিলেন এবং পড়তে বললেন, তখন নবীজির বক্ষ উন্মোচিত হয়ে গেল এবং জবান খুলে গেল। তিনি পড়তে শুরু করলেন–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ.

পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দ্বারা।

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ.

পড়ো এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব।

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ.

যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।[১]

এখানে চিন্তার বিষয় হলো, নবীজি পড়ার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করলে হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজিকে এভাবে নিজের বুকের সঙ্গে কেন জোরে চেপে ধরেছিলেন? এটি কি কোনো খেল-তামাশা ছিল? মোটেই না; বরং এর মধ্যে হেকমত ও রহস্য নিহিত ছিল। এটি ছিল সম্পূর্ণ ফয়েজ, যা বক্ষ হতে বক্ষে স্থানান্তরিত হচ্ছিল। এর অপর নাম তাওয়াজ্জুহ তথা দেলী লেনদেন।

হাদীছ শারীফে এসেছে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন। ইত্যবসরে হযরত জিবরাঈল (আ.) সাহাবী হযরত দিহইয়া কাল্‌বী (রাযি.)-এর সুরতে আগমন করলেন এবং নবীজির সামনে এভাবে বসে পড়লেন যে-

رُكْبَتَهُ اِلٰى رُكْبَتِهٖ

'তিনি নবীজির হাঁটুর সঙ্গে নিজের হাঁটু মিলিয়ে দিলেন।'

তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রশ্ন করার জন্য তো ছাত্রকে আদবের সঙ্গে পিছনে গিয়ে বসতে হয়। কিন্তু এর কী কারণ ছিল যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) এত কাছে এসে বসলেন যে, তাঁর হাঁটু নবীজির হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন?

এর জবাব হলো, হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর পক্ষ হতে যে বরকত ও তাজাল্লি নিয়ে এসেছিলেন, তা নবীজির কাছে পৌঁছানোর ছিল এবং সে সময় এটাই ছিল তার তরিকা। অন্য ভাষায় বললে এভাবে বলতে হয় যে, হযরত জিবরাঈলের এভাবে কাছে এসে বসা ছিল মূলত আসমানী ফয়েজের স্থানান্তর প্রক্রিয়া ছিল।

---

১. সূরা আলাক : আয়াত ১-৫

নফসের 'ধোপি-আছাড়' (নিষ্ঠুর আচরণ) থেকে বাঁচুন

আলোচনা চলছিল এ প্রসঙ্গে যে, যৌনাচার ও রাগ কন্ট্রোল করার জন্য শায়েখের প্রয়োজন পড়ে। অবশ্য যদি আপনি বলেন, আমি নিজেই আমার রিপু দমন ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, তবে তো ভালো কথা। যদি বাস্তবিকই আপনি এই দুটি শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য শায়েখ ধরার কোনোই প্রয়োজন নেই। কে বলে, পীর ধরা, শায়েখ ধরা ফরজ? দু'আ তো আল্লাহর কাছে এটিই করি যে, এই ফেরেশতাসুলভ গুণ যেন ওস্তাদ ছাড়াই আপনার হাসিল হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখবেন, নফ্স আপনাকে এমন ধোপি-আছাড় দিবে যে, আপনি ভাববেন, আমি নিজের ইসলাহ করছি অথচ বাস্তবে সে আপনাকে নিয়ে মনের মতো খেলতে থাকবে। তখন কোথাকার পানি কোথায় যে নিয়ে যাবে তা আপনি ভাবতেও পারবেন না। নফ্স মানুষের চোখে এমন পট্টি বেঁধে দেয় যে, তখন মানুষের কোনো হুঁশ-জ্ঞান থাকে না। মানুষ অনায়াসে মনের গোলামি করে যায়; অথচ ভেবে খুশি হয় যে, আমি সৎকর্ম করছি!

শায়েখদের মূলনীতি

শায়েখদের মূলনীতি এটি নয় যে, প্রত্যেক সালেককে একই ঔষধ দিয়ে য়াবেন। বরং প্রত্যেকের অবস্থা বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন করা হয়। ফলে শায়েখের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পায়।

বাদশা আওরঙ্গজেব আলমগীর (রহ.)-এর ঈমানি দূরদর্শিতা

বাদশা আওরঙ্গজেব আলমগীর (রহ.)-এর কাছে দুই ব্যক্তিকে আনা হয়। দুজনই এক ধরনের অপরাধ করেছিল, বাদশা তাদের একজনের ব্যাপারে বলেন যে, তাকে দশটি জুতার বাড়ি দাও। যথারীতি আদেশ কার্যকর করা হয়। এপর দ্বিতীয় লোককে ডেকে তার দিকে রাগতদৃষ্টিতে তাকান এবং বলেন, আপনিও এমনটি করেছেন? তারপর বলেন, এখান থেকে চলে যান। লোকটি চলে গেল।

পরে লোকেরা বাদশাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সুবিচারের কথা তো সুবিদিত; তাহলে দুজনের একই অপরাধ সত্ত্বেও একজনের বিচার করলেন না কেন? একজনকে জুতাপেটা করলেন আর একজনকে শুধু মৌখিকভাবে সতর্ক করেই ছেড়ে দিলেন এটা কেমন হলো? বাহ্যিকভাবে এটা তো সুবিচারের

সুস্পষ্ট খেলাফ হলো! বাদশা বললেন, ঠিক আছে; তোমরা দুজনেরই বাড়ি গিয়ে তাদের অবস্থা জেনে আসো।

যাকে দশবার জুতা মারা হয়েছিল, তার বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, সে ঘরে বসে অট্টহাসি হাসছে। শাস্তির প্রভাব তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না। পক্ষান্তরে যাকে শুধু মৌখিক সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, এটাই তার মধ্যে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। সে জ্বরাক্রান্ত হয়ে লাশের মতো শয্যায় পড়ে আছে।

মাশায়েখগণও মানুষের অবস্থা দেখে চিকিৎসা করেন। কারো জন্য চোখ রাঙানি-ই যথেষ্ট হয় আবার কাউকে কঠিন ধমকও দিতে হয়।

'রাগ'শীর্ষক আলোচনা

কয়েক দিন ধরে আপনারা রিপু সম্পর্কে আলোচনা শুনে আসছেন যে, নফ্স ও শয়তান রিপুকে উস্কে দেয় এবং মানুষকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করে। আজকের আলোচ্যবিষয় হলো রাগ। রিপুর মতো রাগও কঠিন রোগ। বেশিরভাগ মানুষের অভিযোগ হলো, আমার মাথা খুব গরম থাকে। তাই মাথা ঠাণ্ডা রাখে এমন স্পেশাল ঔষধ দিন। ঔষধ সেটিই ভালো হয়, যা রোগ অনুপাতে হয়। এটি তো ঠিক নয় যে, মানুষ ঠাণ্ডার রোগে আক্রান্ত হবে আর ডাক্তার তাকে ডায়রিয়ার ঔষধ দেবেন!

রাগ একটি ভয়ঙ্কর বাতেনি রোগ। রোগটা ব্যাপকতর হতে চলেছে। বন্ধুরা এ ব্যাপারে বেশি চিঠি লেখেন, ফোন করেন। এমনকি সামনা-সামনি আলোচনার সময়ও রাগ সম্পর্কে অভিযোগ করেন যে, হযরত! আমি জলদি রেগে যাই এবং একবার রেগে গেলে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা সকলেরই এই একই অবস্থা। সকলেই 'রাগ' রোগে আক্রান্ত।

রাগ করার কুফল বনাম রাগ দমনের সুফল

এক হাদীছে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ.

'রাগ ঈমানকে এভাবে বিনষ্ট করে, যেমন সাবির (তিক্ত ফল বিশেষ) মধুকে বিনষ্ট করে দেয়।'[১]

---

১. বায়হাকী

এর বিপরীতে রাগ দমন করা বড়ই পুণ্যের কাজ। রাগ হলে তা বাইরে না এনে গিলে ফেলাই উত্তম। এ প্রসঙ্গে এক হাদীছে এসেছে-

مَاتَجَرَّعَ عَبْدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى

'আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দার সেই ঢোকটি সর্বোত্তম, যা সে রাগের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গলাধঃকরণ করে।'[১]

রাগ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে রাগ সংবরণ করে, সে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে-

قَالَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَارَبِّ مَنْ أَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ.

'হযরত মূসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ! আপনার নিকট কোন বান্দা সর্বাপেক্ষা প্রিয়? আল্লাহপাক বললেন, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে মাফ করে দেয়।'

রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা বিরাট গুণ। হাদীছে এমন ব্যক্তিকেই সর্বোচ্চ বীর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নবীজি বলেন–

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

'সেই ব্যক্তি বীর নয়, যে মানুষকে আছাড় দেয়; বরং প্রকৃত বীর সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'[২]

এক হাদীছে আল্লাহর রাসূল বলেছেন–

'রাগ জাহির করার শক্তি রাখা সত্ত্বেও যেব্যক্তি রাগ হজম করবে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে।'

অর্থাৎ যে লোকের মধ্যে রাগও আছে প্রবল এবং সে রাগ প্রকাশ করার সামর্থও রাখে কিন্তু তারপরও রাগ জাহির করে না; বরং রাগ অবদমিত রাখে, তাহলে আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন তার প্রতি নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, নবীজি বলেছেন–

'যেব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখা সত্ত্বেও রাগ হজম করবে, আল্লাহ তা'আলা তার বুকটা শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা ভরে দিবেন।'

---

১. মুসনাদে আহমদ

২. বুখারী, মুসলিম

রাগের সময় নবীজির অবস্থা

রাগ নবীদের মধ্যেও ছিল। আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রসঙ্গে বলেন–

اَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ.

'আমারও তেমন রাগ হয়, যেমন অন্য মানুষ রেগে যায়।'

তবে নবীজির রাগ হতো আল্লাহর জন্য। তিনি ব্যক্তিগত কারণে কখনো রাগ করতেন না।

হাদীছে ঘটনা এসেছে। হযরত উমর (রাযি.) একবার তাওরাতের একটি কপি পান। তিনি সেটি নবীজির দরবারে নিয়ে এসে তা খুলে নবীজির সামনে পড়তে থাকেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আবুবকর (রাযি.) তাকে বললেন–

'উমর! তোমার পিতামাতা ধ্বংস হোক। তুমি নবীজির চেহারার প্রতি নজর করছ না কেন?'

হযরত উমর (রাযি.) যখন নবীজির চেহারার দিকে তাকালেন, দেখলেন, নবীজির চেহারা রাগে-ক্ষোভে লাল হয়ে গেছে।

আল্লাহর নবী কখনো রাগান্বিত হলে তা তাঁর চেহারায় ভেসে উঠত। তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে যেত।

হযরত উমর (রাযি.) নবীজিকে রাগে অগ্নিশর্মা হতে দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ নবীজির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। নবীজি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–

'আজ স্বয়ং নবী মূসা জীবিত থাকলেও আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁর নাজাত হতো না।'

আল্লাহর ওলীদের রাগ

আল্লাহর ওলীদেরও রাগ হয়। কেননা, তারাও স্বীয় সন্তানদের শাসন করেন। যদি তারা শাসন না করতেন, তবে তারা বেপর্দা হয়ে বাইরে যেত; বরং তাদের সঙ্গেই বাইরে বের হতো, কিন্তু তারা কিছু বলতেন না। যেমন– বর্তমানে খারাপ সমাজে গাফেল মুসলমানরা নিজেরাই করে থাকে। কতক ক্ষেত্রে তো এমনও ঘটে যে, স্ত্রী-মেয়েরা পর্দা করতে চায়; কিন্তু স্বামী-পিতা তাদের পর্দা করতে দেয় না। আমার জানামতে একটি দুঃখজনক ঘটনা আছে। আর তা হলো, একটি আলেমা মেয়ে তালাকপ্রাপ্তা হয় শুধু এ কারণে যে, তার স্বামী তাকে বলেছে, তুমি বেপর্দা হয়ে আমার সঙ্গে সবখানে ঘুরবে।

মেয়েটি স্বামীর এই নির্দেশে সাড়া দিতে না পারায় সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যায়। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন–

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ.

'কাফের ও মুনাফিকদের সঙ্গে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করুন।'[১]

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের বার্তা হলো, যেখানে ঈমানি ব্যাপার আসবে, সেখানে মানুষের রাগান্বিত হওয়া একটি রহমত। আল্লাহর ওলীগণ এ কারণেই শরীয়তের খেলাফ বিষয়ে রাগ প্রকাশ করেন।

দোজখে যাওয়ার কারণ

এক হাদীছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

'বেশিরভাগ মানুষের দোযখে যাওয়ার কারণ হবে তাদের রাগ।'

এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন–

রাগের কারণে মানুষের দিল ভাঙে, দিলে চোট লাগে। অর্থাৎ রাগের বেলায় অনেক সময় এমন কথা বলা হয়, যা অন্যের দিলে ব্যথা দেয়; কষ্ট পৌঁছায়। আর কাউকে কষ্ট দেওয়ার থেকে বড় গুনাহ আর নেই।

অনেক সময় এমনও হয় যে, রাগের মাথায় তালাক দিয়ে দেয়। পরে যখন মাথা ঠাণ্ডা হয়, তখন স্ত্রীকে বলে, বিষয়টা কাউকে বলো না। এরপরে স্বামী-স্ত্রী বিবাহ ছাড়াই সারা জীবন ঘর-সংসার করে যায় এবং সন্তানও হতে থাকে। এটা কেয়ামত ঘনিয়ে আসার একটা আলামত। হাদীছে এসেছে, কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত হলো, স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পুনরায় কোনো বিবাহ ছাড়াই তার সঙ্গে বাকি জীবন কাটাবে। সুতরাং কেমন যেন রাগ এমন গুনাহ করায় যে, পরবর্তী সারাটা জীবন গুনাহের মধ্যেই কাটাতে হয়। গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়েই দুনিয়া ত্যাগ করতে হয়। এসব কারণে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরি।

দুর্বলতার লক্ষণ

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, দ্রুত রেগে যাওয়া দুর্বলতার অন্যতম লক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–

---

১. সূরা তাহরীম : আয়াত ৯

* সুস্থ ব্যক্তির তুলনায় অসুস্থ ব্যক্তি দ্রুত রেগে যায়।

* যুবকের তুলনায় বৃদ্ধ ব্যক্তি দ্রুত রেগে যায়।

* পুরুষের তুলনায় মহিলা দ্রুত রেগে যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, বীর কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর নবী! বীর তো তাকেই বুঝি, কুস্তিতে যে অন্যকে পরাস্ত করে। নবীজি বললেন, হলো না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তবে আপনিই বলে দিন, বীর কে? জবাবে নবীজি বললেন–

إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

'প্রকৃত বীর সে, যে রাগের সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে।'

মনে রাখবেন, রাগ দমন করা কঠিন হিম্মতের ব্যাপার। বর্তমানে এই হিম্মত বলতে গেলে নেই। ফলে রাগ দমন করতে না পারায় ছোট-ছোট বিষয়ও মারাত্মক আকার ধারণ করে।

পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদের একটি বড় কারণই হলো রাগ। একলোক এসে বলল, হযরত! আমি রাগের মাথায় স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি। আমি বললাম, বলো তো, কেউ কি খুশি হয়ে কখনো স্ত্রীকে তালাক দেয়? এমন কথা কাউকে বলতে শুনেছ যে, স্বামী স্ত্রীকে একথা বলেছে, 'আমি তোমার খেদমতে খুব খুশি। তাই পুরষ্কার হিসেবে তোমাকে তালাক দিলাম?'

উত্তম মানুষ কে?

আমার শায়েখ বলেন, উত্তম মানুষ সে, যে দেরিতে রাগ হয় এবং সাথে সাথেই তার রাগ পড়ে যায়। পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট সে, যে জলদি রেগে যায় এবং অনেক দেরিতে স্বাভাবিক হয়।

বর্তমানে আমাদের রাগের ধরন হলো, আমরা দ্রুত রেগে যাই এবং একবার রাগ উঠলে তা পড়তে চায় না। দীর্ঘক্ষণ বা দীর্ঘদিন রাগ রয়েই যায়। ফলে আমাদের করণীয় হলো, কোনো কারণে রাগ এলেও যদি অপর পক্ষ ক্ষমা করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ দিল থেকে রাগ ঝেড়ে ফেলা।

হযরত মুরশিদে আলম ও আল্লাহভীতি

আমার মুরশিদে আলম হযরত গোলাম হাবীব নকশবন্দী মুজাদ্দেদী (রহ.) যে বছর ইন্তেকাল করেন, সে বছরেরই একটি ঘটনা। হযরত মুরশিদে আলম

(রহ.) বলেন, আমি ওজু করছিলাম আর আমার স্ত্রী গরম পানি দ্বারা আমাকে ওজু করাচ্ছিল। ওজু করানোর সময় সে একটি জিনিস দেখতে গিয়ে তার মনোযোগ আমার থেকে সরে যায়। এতে আমি তাকে ধমক দিয়ে বলি, আগে আমাকে ওজু করাও। যখন আমি কথাটি রাগস্বরে বলি, তখন সে নীরব থাকে এবং আমার রাগ সহ্য করে। একসময় আমার ওজু শেষ হয়। ওজু শেষে মসজিদে নামায পড়াতে যাচ্ছিলাম। এ সময় আমার মনে একথা জাগল যে, একটি কথা বলে স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে এখন নামায পড়াতে যাচ্ছি, তাই এই নামায কীভাবে কবুল হবে? শায়েখ বলেন, আমার মনে একথা আসতেই আমি বাড়ি ফিরে আসি। ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে মাফ চাই। স্ত্রী হাসিমুখে বলল, আমি তখনই বিষয়টি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি। আমি তখনই মাফ করে দিয়েছিলাম। শায়েখ বলেন, মাফ চেয়ে তারপর আমি মসজিদে আসি এবং নামায পড়ি। মনে-মনে আশা রাখি যে, এবার আমার মাওলা আমার ইবাদাত কবুল করবেন।

প্রতিশোধস্পৃহা

রাগের কারণেই মানুষের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগে। অথচ শরীয়তের নির্দেশ হলো, অন্যের থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে বরং তাকে ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা করাটা আল্লাহপাক খুবই পছন্দ করেন। কিন্তু আফসোসের কথা হলো, বর্তমানে মানুষ বলে, আমরা ইটের জবাব পাটকেল দ্বারা দেব। পাটকেলের জবাব পাথর দ্বারা দেব। অর্থাৎ যদি কেউ একটুখানি বাড়াবাড়ি করে, তবে আমরা তার প্রতি কয়েকগুণ বেশি বাড়াবাড়ি করিয়ে তাকে দেখিয়ে দেব। এমন মনোভাবকেই প্রতিশোধস্পৃহা বলে। এই প্রতিশোধস্পৃহাই মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এর বিপরীতে ক্ষমা মানুষকে মহৎ করে। আগে বাড়িয়ে দেয়।

নবীজির ক্ষমা ও দয়া

নবীজি ছিলেন ক্ষমার মূর্তপ্রতীক। তাঁর ক্ষমা ও দয়া ছিল নজিরবিহীন। তাঁর ক্ষমাসুন্দর গুণই মানুষকে কাছে টানত বেশি। শত্রুকে কত আপন। নবীজির ক্ষমা ও দয়ার ভুরি-ভুরি ঘটনা ও প্রমাণ রয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এর মধ্যে স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য।

(১) নবীজি জীবনভর কখনো কারো থেকে ব্যক্তিগত কারণে প্রতিশোধ নেননি। এমনকি যখন মক্কা মুকাররমা বিজয় হলো এবং আল্লাহর নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন, তখন তিনি স্বীয় বাহনের কেশর ধরে বলছিলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ.

'সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দাকে বিশেষ সাহায্যদানে ভূষিত করেছেন এবং একই সমস্ত শত্রুদলকে পরাস্ত করেছেন।'

তখন নবীজির মাঝে গর্বের লেশ ছিল না। বরং তিনি বিনয়ের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত মাথা নুইয়ে-নুইয়ে চলছিলেন। এত নুইয়ে চলছিলেন যে, যে বাহনে চড়ে যাচ্ছিলেন, নবীজির কপাল তার সাথে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। তাঁর মুখ দিয়ে তখন শুধু আল্লাহর প্রশংসাই উচ্চারিত হচ্ছিল। সাহাবায়ে কেরাম যখন মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে যান, তখন সাহাবী হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাযি.) বললেন–

اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ, اَلْيَوْمَ نَسْتَحِلُّ الْكَعْبَةَ.

'আজ যুদ্ধের দিন। আজ আমরা কাবা ঘরের মধ্যে হত্যা-খুন হালাল মনে করব।'

কারণ, আল্লাহ তা'আলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য শুধু বিজয়ের দিন পবিত্র মক্কায় হত্যা করাকে হালাল করেছিলেন এবং পরে কিয়ামতের পর্যন্ত সময়ের জন্য হুরমত (হারাম হওয়া) বহাল করে দিয়েছিলেন।

সাহাবাগণ যখন একথাটি বললেন, তখন আবু সুফিয়ান – যিনি তখনও ঈমান আনয়ন করেননি – আপত্তি উত্থাপন করলেন, আপনার সৈন্যরা এ কী বলছে? উত্তরে নবীজি সা'দ ইবনে উবাদ (রাযি.) থেকে পতাকাটা নিয়ে তাঁর ছেলের হাতে দিয়ে দিলেন এবং বললেন–

اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ.

'আজ ক্ষমার দিন, পুরোটা দিনই রহমতের দিন।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম শরীফে প্রবেশ করলে সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) সোজা বায়তুল্লাহ শরীফে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে তওয়াফ, নামায ইত্যাদিতে মশগুল হয়ে যান।

কিতাবে লেখা আছে, মক্কা মুকাররমার প্রত্যেক যুবতীর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, আজ আমার ইজ্জত বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের জানা ছিল,

আমরা মুসলমানদের অনেক অনেক কষ্ট দিয়েছি। যার ফলে আজ তারা যখন বিজয়ীবেশে এখানে এসেছে, তখন তারা আমাদের প্রত্যেকের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে।

কিন্তু যখন এশার সময় হয়ে গেল অথচ কেউ একজনের কাছে তো দূরে থাক, কারো ঘরের দরজাতেও কেউ এল না, তখন মহিলারা বড়ই অবাক হলো। তারা ঘরের পুরুষদের বলল, দেখো তো একটু, মুসলমানরা কোথায়? হতে পারে তারা আমাদেরকে ভোগ করার কোনো প্লান করছে। অথবা একটি বিশেষ সময়ের অপেক্ষায় আছে। পুরুষরা বলল, ঠিক আছে, আমরা গিয়ে বিষয়টি জেনে আসছি। তারপর পুরুষরা হিম্মত করে ঘর থেকে বের হলো। তারা হারাম শরীফের কাছে এসে দেখল, সমস্ত মুসলমান ইবাদাতে লিপ্ত। কেউ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করছেন। কেউ মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ছেন, কেউ বায়তুল্লাহ শরীফ আঁকড়ে ধরে দু'আ করছেন। কেউ গেলাফ ধরে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছেন।

মক্কার লোকজন এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল। তারা ভেবে পেল না, এসব লোক বিজয়ীবেশে এখানে এসেছেন অথচ প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত, নিমগ্ন। তারা দেখলেন, আল্লাহর নবীকে তারা এত কষ্ট দিয়েছিল যে, স্বয়ং নবীজি বলেন–

'আমাকে দীন ইসলামের কারণে এত কষ্ট দেওয়া হয়েছে, যা অন্য নবীকে দেওয়া হয়নি।'

পরের দিন নবীজি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন এবং বললেন, যারা এখনই এসে কালেমা পড়বে, তারা ক্ষমা পেয়ে যাবে। এমনকি তিনি কয়েকটি বাড়ির নাম নিয়ে বললেন, যারা এসব ঘরে গিয়ে অবস্থান করবে, তারাও ক্ষমা পেয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ!

(২) আরেকটি মজার কথা শুনুন। কেউ কারো উপর প্রবল হলে সে সাধারণত দুটি কাজ করে। প্রথম কাজ এই করে যে, বিরোধীদের মূলোৎপাটন করে। আর দ্বিতীয় কাজ হলো, সে ঘনিষ্ঠ ও নিকটস্থ লোকদের খুব মর্যাদা দেয় এবং খাতির-যত্ন করে।

বর্তমানে দুনিয়ার সাধারণ রীতি এটিই। যখন কেউ ক্ষমতা লাভ করে, তখন তার প্রথম কাজ হয়, বিরোধীদের প্রতি নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে তাদের মাজা ভেঙে দেওয়া। আর দ্বিতীয় টার্গেট হয়, নিজের ও ঘনিষ্ট লোকদের বিপুলভাবে পুরস্কৃত করা।

কিন্তু আল্লাহর নবী মক্কা জয় করে এর কোনোটিই করেননি। নবীজি মক্কা বিজয় করে চাইলে ইচ্ছামতো প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি মোটেও প্রতিশোধ নিলেন না। তিনি বিরোধীদের কোণঠাসা করতেও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না এবং নিজের লোকদেরও পুরস্কৃত করলেন না।

(৩) হাদীছ শরীফে এসেছে, যখন নবীজি হিজরত করে মদীনা যাচ্ছিলেন, তখন বায়তুল্লাহর চাবি বাহকের দায়িত্বে নিয়োজিত উসমান ইবনে তালহাকে বলেছিলেন, বায়তুল্লাহর দরজা খুলে দাও। আমার মন চায়, আমি ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণ মনভরে আল্লাহর ইবাদাত করব। কিন্তু তিনি সেদিন সোজা জানিয়ে দিলেন, দরজা খোলা হবে না। তখন নবীজি খুবই আক্ষেপের সঙ্গে বললেন–

'আপনি কি সত্যই খুলবেন না? তবে সেদিন কেমন হবে, যেদিন আমি যেস্থানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে আমি চাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব?'

সেদিন নবীজির একথা শুনে চাবিবাহক উসমান বকাবকি শুরু করেছিল এবং বলেছিল, আপনার হাতে বায়তুল্লাহর চাবি কখনোই যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

যখন নবীজি বিজয়ীবেশে মক্কা যান, তখন বনু শায়বার উপরোক্ত লোকই বায়তুল্লাহর চাবিবাহক ছিল। নবীজি তাকে ডেকে পাঠালেন। লোকটি এলে নবীজি বললেন, চাবি দাও। লোকটি চাবি দিয়ে দিল। নবীজি চাবি হাতে নিয়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন–

'তুমি সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে তুমি একদিন দাঁড়াবে আর যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, সেখানে একদিন চাবি নিয়ে আমি দাঁড়াব। আল্লাহ তা'আলা আমার সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন কি-না?'

লোকটি বলল, অবশ্যই আল্লাহর নবীর ওয়াদা পূরণ হয়েছে। তারপর নবীজি চাবি নিয়ে নিজহাতে বায়তুল্লাহর তালা খুললেন। নবীজি ভেতরে গিয়ে আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করলেন। তারপর নবীজি বাইরে বের হয়ে নিজ হাতে বায়তুল্লাহ শরীফে তালা লাগালেন। এ সময় কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রের লোক নবীজির কাছে এসে জমা হলো। তাদের প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমাকে চাবিবাহক বানানো হোক, যার ফলে সকলের দৃষ্টি নবীজির প্রতি নিবদ্ধ ছিল এই আশায় যে, হয়ত নবীজি আমার হাতেই চাবি তুলে দিবেন।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে অবাক করে দিয়ে কাবার চাবি তার হাতেই অর্পণ করলেন, যে কাফেরের হাতে এতদিন ধরে ছিল এবং যেব্যক্তির কাছে একদিন তিনি চাবি চাইলে যে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল ও গালমন্দ করেছিল, যা শুনে তাকে চোখের পানি ফেলতে - ফেলতে ফিরে যেতে হয়েছিল। সেই কাফেরের হাতে নবীজি শুধু চাবিই তুলে দেননি; বরং বললেন–

'চাবিটি তোমার কাছেই রেখে দাও। এই চাবি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশের লোকের কাছেই থাকবে।'

নবীজি চাইলে সেদিন চরম প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু ক্ষমার নবী কোনো অভদ্র আচরণ তার সঙ্গে করেননি; বরং অত্যন্ত অমায়িক ও সুন্দর আচরণ করলেন। নবীজি যখন তাকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি দয়ার আচরণ করলেন, তখন ওই কাফেরের চোখে পানি চলে এর। তিনি অশ্রুভেজা কণ্ঠে নবীজিকে সম্বোধন করে বললেন–

'হে আল্লাহর নবী! কালেমা পড়িয়ে আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন।'

মাফ করার মাঝেই সম্মান নিহিত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে একটি গুণ বর্ণনা করেছেন যে-

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

'মুমিন লোকেরা রাগ হজমকারী হয়, মানুষকে ক্ষমকারী হয়। আর আল্লাহ এমন নেককারদের মহব্বত করেন।'[১]

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

'ক্ষমা করে দিলে মানুষের ইজ্জত বাড়ে।'

এ হাদীছ প্রমাণ করে, প্রতিশোধ নেওয়ার দ্বারা সম্মান কখনো বাড়ে না।

এক হাদীছে এসেছে, কেয়ামতের দিন এক ঘোষক ঘোষণা দিবে, আল্লাহর নিকট কারো কোনো পাওনা থাকলে সে যেন উঠে দাঁড়ায় এবং বিনা হিসেবে জান্নাতে চলে যায়। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কারা হবে? জবাবে নবীজি বললেন–

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩৪

'যারা দুনিয়াতে আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষকে ক্ষমা করবে, তাদের জন্য আল্লাহপাকের উপর জিম্মাদারী এসে যাবে। ফলে তারা দাঁড়িয়ে যাবে এবং তাদেরকে কোনো হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।'

অতএব, যদি কেউ ভুল করে এসে বলে, ভাই! আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দিন, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে। কেননা, এমন লোককে ক্ষমা করার ফায়দাই আলাদা। যারা এমন লোককে ক্ষমা করে আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা অনেক।

এক হাদীছে এসেছে, যেব্যক্তি দুনিয়াতে কারো ভুল ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার ভুল ক্ষমা করে দিবেন।

আরেক হাদীছে এসেছে, যেব্যক্তি দুনিয়াতে অন্যের অপরাধ যত দ্রুত মাফ করে দিবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার গুনাহ তত দ্রুত ক্ষমা করে দিবেন। ফলে কেউ ভুল করে ক্ষমা চাইলে জলদি-জলদি তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত, যাতে এই উসিলায় কেয়ামতের দিন আল্লাহর ক্ষমা মিলে।

সবচেয়ে জঘন্য লোক

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদের বলব না, কোন লোক সবচেয়ে জঘন্য? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর নবী! অবশ্যই বলুন। নবীজি বললেন, সেই লোক সবচেয়ে খারাপ, যে একা খায়, নিজের গোলামকে মারে এবং দয়া ও ক্ষমার আচরণ করে না।

তারপর নবীজি আরও বললেন, এর চেয়েও জঘন্য ব্যক্তির কথা তোমাদের বলব কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, জি হুজুর! বলুন। নবীজি বললেন, উক্ত লোক থেকেও মন্দ সে, যে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ রাখে আর অন্যরাও তার প্রতি বিদ্বেষ রাখে।

তারপর নবীজি বললেন, এর চেয়েও জঘন্য ব্যক্তির কথা বলব কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর নবী! বলুন সে কে? জবাবে নবীজি বললেন–

مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ.

'যার থেকে কোনো কল্যাণের আশা করা যায় না এবং যার অনিষ্ট হতে মানুষ নিরাপদ থাকে না।'[১]

---

১. তিরমিযী ২ : আয়াত ৫২

তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে নবীজি আবার বললেন, আমি কি তোমাদের এর চেয়েও খারাপ লোকের কথা বলে দেব? সাহাবায়ে কেরাম বরাবরের মতো এবারও বললেন, হে আল্লাহর নবী! বলে দিন। নবীজি বললেন–

'মানুষের মধ্যে তার মতো নিকৃষ্ট লোক আর কেউ নেই, যে মানুষের ভুল ক্ষমা করে না এবং কারো ওজর কবুল করে না।'

একটু ভেবে বলুন তো, আমরা কি মানুষের ওজর-আপত্তি মেনে নেই? যদি স্ত্রী থেকে কখনো ভুল হয়ে যায়, অন্যায় হয়ে যায় আর সে যতই হাত জোড় করে ক্ষমা চায়, আমরা কি তাকে মাফ করি? করি না; বরং আরো কঠোরপ্রাণ হয়ে গিয়ে বলি, তোমাকে শাস্তি দিয়েই ছাড়ব। এমনিভাবে অন্য কারো হতে ভুল হলে তাকেও মাফ করি না; বরং শত কান্নাকাটি করলেও তাকে শাস্তি দিই। নাজেহাল করি। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে দিই।

হযরত ইমাম হুসাইন (রাযি.)-এর ক্ষমা

একবার হযরত হুসাইন (রাযি.) বলেন, যদি কেউ আমার এক কানে গালি দেয় আর অপর কানে মাফের কথা বলে, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে আমি তাকে মাফ করে দেব। وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ এর উপর তাঁর এমনই আমল ছিল।

ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ.)-এর ক্ষমা

একবার হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ.) একব্যক্তিকে দেখলেন, তিনি তার গীবত করছেন। ইমাম সাহেব তাকে ডেকে বললেন–

'বন্ধু! তুমি সত্যবাদী হলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আর তুমি মিথ্যুক হলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।'

সুবহানাল্লাহ! কেমন সহজ জবাব! এক কথাই সব শেষ।

আরেক ব্যক্তির ঘটনা। তিনিও ইমাম সাহেবের গীবত করেন। ইমাম সাহেব তাকে ডেকে বললেন–

'বন্ধু! তুমি আমার যতটুকু দোষ জান, তার থেকে অনেক বেশি দোষ আমার মধ্যে রয়েছে, যা তুমি জান না।'

তারপর ইমাম সাহেব তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। লোকটি যখন ইমাম সাহেবের এই সুন্দর ও মার্জিত ব্যবহার দেখলেন, তখন সে খুবই লজ্জিত হলো। লোকটি তৎক্ষণাৎ নিজের ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করল এবং বলল–

میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نواسۂ رسول کے بیٹے ہیں.

'আমি স্বীকার করছি, আপনি অবশ্যই নবীজির নাতির পুত্র।'

ইমাম আজম আবুহানিফা (রহ.)-এর হিংসুকরা

ইমাম আজম আবুহানীফা (রহ.)-এর হিংসুক ছিল অনেক। মানুষ যখন মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করে, তখন তার হিংসুকের সংখ্যা বেড়ে যায়। এ যুগেও এমন লোক আছে, যারা কোনো-না-কোনোভাবে ইমাম আবুহানীফা (রহ.)কে সমালোচনার পাত্র বানায়। দুশমন দু-ধরনের হয়। (১) অপরিচিত ও (২) হিংসুক। অপরিচিত লোক না জেনে মানুষের গুণ অস্বীকার করে। এমন লোক প্রথমে শত্রু থাকলেও আলাপ-পরিচয়ের পর বন্ধু হয়ে যায়। তবে হিংসুকের কথা ভিন্ন।

ইমাম আওযায়ী (রহ.) একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)কে বললেন, হে খোরাসানী! এই আবুহানীফা লোকটা কে, যে দীনের ব্যাপারে নিত্য-নতুন বিষয়ের অবতারণা করছে? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) 'কিতাবুর রাহ্ন' গ্রন্থটি তাঁর সামনে এগিয়ে দেন। ইমাম আওযায়ী (রহ.) কিতাবটি পড়ে বললেন, আবদুল্লাহ! এই নোমান কে? তিনি তো উঁচু পর্যায়ের আলেম। যদি তুমি ইল্‌ম হাসিল করতে চাও, তাহলে তাঁর সান্নিধ্য অবলম্বন করো।

ইমাম আওযায়ী (রহ.) ইমাম আবুহানীফা (রহ.)কে চিনতেন না। ইবনে মুবারক (রহ.) বললেন, হযরত! ইনিই সেই আবুহানীফা, যাকে আপনি বিদ'আতী বলছিলেন।

ইমাম আজম (রহ.)-এর ধৈর্য

একবার একলোক ইমাম আজম (রহ.)কে মানসিকভাবে পেরেশান করার জন্য ভরমজলিসে বলল, আপনার মা তো বিধবা। তাই আপনি তাকে আমার কাছে বিয়ে দিয়ে দিন।

চিন্তা করুন তো, এটা কত বড় রাগের কথা! বৃদ্ধা মায়ের ব্যাপারে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে! কিন্তু ইমাম সাহেব রাগ করলেন না; বরং অত্যন্ত নম্র ভাষায় জবাব দিলে, আমার মাতা বিবেকবান ও বালেগা। তাঁর কাছে জেনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রস্তাবক লোকটি সেখান থেকে সামনে এগিয়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে তার ঘাড়টা ভেঙে গেল এবং সেখানেই মারা

গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আজম আবুহানীফা (রহ.) বলেন, আবু হানীফার ধৈর্য এক লোকের জান হরণ করে নিল। সুবহানাল্লাহ!

হযরত থানবী (রহ.)-এর ধৈর্য

হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) একস্থানে বয়ান করার জন্য তাশরীফ নিয়ে যান। স্টেজে উঠলেই তার মনে আঘাত লাগল। কেননা, তিনি স্টেজে উঠেই একটি লেখা দেখতে পান–

اشرف علی! اپ کافر ہیں. ولدالزنا ہیں اور ذرا سنبھل کر بات کرنا.

'আশরাফ আলী! আপনি কাফের। আপনি জারজ সন্তান। সাবধানে কথা বলবেন।'

তিনি কথাটি পড়ে হৃদয়ে আঘাত পান। কারণ, তিনি এ অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তিনি বিচলিত হলেন না, ধৈর্য হারালেন না; বরং বড়ই সহনশীলতার পরিচয় দিলেন। তিনি বড়ই ভদ্র ভাষায়, নম্রভাবে জবাব দিলেন। তিনি বলেন– 'ভাই! একটি চিরকুট এসেছে। তারপর তিনি তা পড়ে সবাইকে শুনিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আমি যদি কাফের হয়ে থাকি, তাহলে এখন কালেমা পড়ে নিচ্ছি–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

দ্বিতীয় অভিযোগের জবাব হলো, সৌভাগ্যক্রমে এই মজলিসে আমার পিতার বিবাহের সাক্ষী উপস্থিত আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করুন। তৃতীয় অভিযোগ হলো, আমি যেন সাবধানে কথা বলি। এ ব্যাপারে আমার কথা হলো, আমি এখানে চাঁদা তোলার জন্য আসিনি, আত্মীয়তা করার জন্যও আসিনি। আমি সাবধান হয়ে কথা বলব কেন? আমি হক কথা বলেই যাব।'

আল্লাহর ওয়াস্তে ছাত্রকে শাস্তি প্রদান

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (রহ.) একছাত্রকে প্রহার করছিলেন। ছাত্রটি জোরে বলে উঠল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মাফ করে দিন। তিনি আরও একটি আঘাত করে বললেন–

'আল্লাহর বান্দা! আমি তো তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তেই মারছি।'

যাহোক, প্রকৃতপক্ষে রাগ হলো একটি আগুন। আর তা আগুন বলেই তো যে রেগে যায়, তার চেহারা ও চোখ লাল হয়ে যায়।

ছাত্রকে মারার শরয়ী হুকুম

কতক সময় রাগ মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। ছাত্রের মাঝে বোধ সৃষ্টি করতে শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে যে, ওস্তাদ তাকে তিনটা চড় বা ঘুষি দিতে পারেন । তাও মুখে নয়; বরং পিঠে। কিন্তু আমরা দেখি, ওস্তাদ রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। মাদরাসায় লাঠি থাকে আর বাচ্চাকে কসাইয়ের মতো মারা হয় শুধু প্রতিশোধ নিতে। এ ধরনের মারধর শিক্ষার জন্য হয় না। ওস্তাদ ছাত্রকে এভাবে মারার একমাত্র কারণ হলো, ওস্তাদ নিজের রাগ দমন করতে পারেন না। ছাত্র সবক শোনাতে ভুল করলে তার দোষ কোথায়? যে সবক দিতে গিয়ে ছাত্র একটা ভুল করেছে, সেটিই যদি ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে হয়ত তার ভুল যাবে দুটা।

যদি দেখেন, বাচ্চা জেনে-বুঝে সময় নষ্ট করছে অথবা অন্যায় করছে, তাহলে আপনি তাকে সংশোধনের জন্য শাস্তি দিতে পারেন। শরীয়ত এর অনুমতি দিয়েছে। তবে এর সীমারেখা রয়েছে। শরীয়তের নির্ধারিত সীমা ছেড়ে শাস্তি দিলে কেয়ামতের দিন আপনি হয়ে যাবেন জালেম। তখন আপনাকে শরীয়তের সীমালংঘনের কারণে কৈফিয়ত দিতে হবে।

এক কারী সাহেব বলেন, হযরত! আগেকার ছেলেরা ভালো ছিল। চোখ রাঙালেই তাদের শাসন হয়ে যেত। পরে এক সময় এমন হয় যে, চড় দিলে তারপর শোনে। এখন লাঠি দ্বারা মারি, তারপরও কথা শোনে না। হযরত! এখন করণীয় কী? আমি বললাম, কারী সাহেব! এখন উপায় একটি। আর তা হলো, কেউ উল্টা-পাল্টা বা অন্যায় করলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলবেন।

হযরত থানবী (রহ.) বলেন, কোনো ছাত্রর উপর যদি ওস্তাদের রাগ হয়, তাহলে ওস্তাদের করণীয় হলো তৎক্ষণাৎ রাগ হজম করা। রাগ পড়ে গেলে তারপর কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে মারা। কেননা, যখন কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে মারবে, তখন অবশ্যই বেশি মারবে না; বরং অল্প মারবে।

মনে রাখবেন, মানুষ যখন রেগে যায়, তখন তার মধ্যে মানবতাবোধ থাকে না; বরং পশুত্ব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে তখন সে আর মানুষের মতো আচরণ করে না; বরং হিংস্র পশুর মতো বাজে ব্যবহার করে।

ইউরোপের কোনো স্কুল-কলেজে কোনো শিক্ষক কোনো ছাত্রের গায়ে হাত তুলতে পারে না। এমনকি পিতামাতাও সন্তানকে মারার অনুমতি নেই। এখন প্রশ্ন হলো, সেখানে বাচ্চারা পড়ে কীভাবে? উত্তর হলো, সেখানের নিয়ম হলো, বোঝানো। অর্থাৎ ওস্তাদ ছাত্রকে নম্রতার সঙ্গে বোঝান।

একটি মূলনীতি মনে রাখবেন যে, ওস্তাদ যখন মারার জন্য হাত তোলেন, তখন সেটা এরই প্রমাণ বহন করে যে, তিনি নিজের পরাজয় মেনে নিয়েছেন যে, আমি বাচ্চাকে মৌখিকভাবে বোঝাতে অক্ষম।

রাগ হজম করার একটি উত্তম উপায় হলো, মানুষ রাগের সময় ভাববে, আমার যতখানি ক্ষমতা রয়েছে এর উপর, আমার উপর আল্লাহর ক্ষমতা এর চেয়েও বেশি। যদি আমি তার প্রতি অযথা রাগ করি, তাহলে এর প্রত্যুত্তরে আল্লাহ যদি আমার উপর রাগান্বিত হন, তাহলে আমার অবস্থা কেমন হবে?

ক্ষমার ফযিলত

(১) এক বর্ণনায় এসেছে, 'যেব্যক্তি রাগ দেখাতে পারে; কিন্তু তারপরও রাগ দমিয়ে রাখে, তাহলে আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে তাকে ডেকে বলবেন, তুমি আজ যত হুর চাইবে তোমাকে তা দেওয়া হবে।'[১]

(২) একবার মূসা (আ.) ও আল্লাহর মাঝে এরূপ কথাবার্তায় হয়–

আল্লাহ : হে মূসা! আমি তোমাকে এমন আমলের কথা বলব, যা করলে তোমার জন্য দুনিয়ার সবকিছু ক্ষমা প্রার্থনা করবে?

মূসা : হে আল্লাহ! সেটি কোন আমল, আপনি অবশ্যই তা বলে দিন।

আল্লাহ : মানুষ থেকে কোনো কষ্ট পেয়ে যদি তুমি সবর কর, তাহলে দুনিয়ার সবকিছু তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ক্ষমা

মুফাসসিরীনে কেরাম একটি তত্ত্বকথা লিখেছেন। আর তা হলো–

হযরত ইউসুফ (আ.) যখন ভাইদের সঙ্গে মিলিত হন, তখন কয়েদখানা থেকে বের হওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন কিন্তু কূপ থেকে বের হওয়ায় শুকরিয়া আদায় করেননি। এর কারণ কী ছিল?

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এর কারণ এই ছিল যে, তাকে কূপে ফেলেছিল তার ভাইয়েরা আর তিনি অন্তর থেকে তার ভাইদের মাফ করে দিয়েছিলেন। যেহেতু মাফ করা মানে হলো ইশারা-ইঙ্গিতেও সে সম্পর্কে অভিযোগ না করা, তাই যদি তিনি কূপ হতে বের হওয়ার সময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন, তাহলে একদিকে শুকরিয়া আদায়ের পাশাপাশি

---

১. আবুদাউদ, তিরমিযী

অন্যদিকে ভাইদের প্রতি অভিযোগ আরোপ হতো। তাই তিনি কূপ হতে বের হওয়ার কারণে শুকরিয়া আদায় করেননি।

হাউজে কাউছার থেকে বঞ্চিত

এক হাদীছে এসেছে, কারো কাছে কেউ যদি ওজর-আপত্তি করে চাই সে হকবাদী হোক কিংবা নাহকবাদী আর সে যদি তার ওজর কবুল না করে, তাহলে হাউজে কাউছারের কাছে যাওয়ার সৌভাগ্য তার লাভ হবে না।

বিশ্বের চারদিকে উত্তম চরিত্রের ঘোষণা

একলোক নবীজির সামনের দিক হতে এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! সব থেকে উত্তম আমল কোন্‌টি? নবীজি জবাবে বললেন, উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা। লোকটি ডান দিক হতে এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর নবী! সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? জবাবে নবীজি বললেন, উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা। লোকটি বাম দিক হতে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর নবী! সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? জবাবে নবীজি বললেন, উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা। লোকটি এবার পিঠের দিক থেকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর নবী! সবচেয়ে উত্তম আমল কী? এবার নবীজি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন–

'তোমার হলোটা কী? কেন বুঝছ না, সবচেয়ে উত্তম আমল হলো উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা। আর উত্তম চরিত্র বলা হয়, কারো প্রতি রাগ না করা।'

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ওই সাহাবী চারদিক হতে এসে নবীজিকে প্রশ্ন করলেন। আর আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার দিক হতে জবাব দিয়েছেন। এর মধ্যে এই রহস্য নিহিত ছিল যে, যেন আল্লাহর রাসূলের এই পয়গাম বিশ্বের চারদিকে পৌঁছে যায় যে, সবচেয়ে উত্তম আমল হলো, উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা। আর উত্তম চরিত্র বলে রাগ না করাকে।

হযরত আয়েশা (রাযি.)কে নবীজির দরদমাখা উপদেশ

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বর্ণনা করেন, যখন নবীজির কোনো স্ত্রীর কথায় আমার সন্দেহ লাগত এবং রাগ হতো, তখন নবীজি আমার কান ধরে আস্তে করে মলতেন আবার কখনো নাকে আঙুল রেখে বলতেন–

'আমার প্রিয়তমা আয়েশা! তুমি এভাবে দু'আ কর যে, হে মুহাম্মদের রব! আমার গুনাহ মাফ করে দিন, আমার মনের রাগ দূর করে দিন এবং বিপথগামী ফেতনা হতে আমাকে রক্ষা করুন।'

জান্নাতে যাওয়ার আমল

তবরানী শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি হলো, এক সাহাবী নবীজির খেদমতে এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। জবাবে নবীজি বললেন,, 'রাগ করবে না। তুমি এর উপর আমল করলে আল্লাহপাক তোমাকে জান্নাত দান করবেন।'

এক অফিসারের শিক্ষণীয় ঘটনা

এক ভদ্রলোক সরকারের কোনো এক বিভাগের অফিসার ছিলেন। তিনি নিজের জীবনীতে একটি ঘটনা লিখেছেন। ঘটনাটি বড়ই শিক্ষণীয়। আমি সেই ঘটনাটি আপনাদের শুনাচ্ছি।

তিনি একটি রেস্টহাউসে অবস্থান করছিলেন। সরকারি এক প্রয়োজনে তাকে এক শহর হতে অন্য শহরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ল। ট্রেনের সফর ছিল। তিনি স্টেশনে গিয়ে একটা টিকিট কাটলেন। তিনি সামানাপত্র বয়ে নেওয়ার জন্য এক কুলিকে ডাকলেন এবং বললেন, ভাই! আমার জিনিসপত্র অমুক প্লাটফর্মে পৌঁছে দাও। কুলি বলল, ঠিক আছে, তা-ই হবে। কুলি সামানা মাথায় তুলে নিল। যেহেতু সময় ছিল কম, তাই সরকারি অফিসার দ্রুত হেঁটে প্লাটফর্মে গিয়ে পৌঁছান। পেছনে কুলিও সামান নিয়ে রওয়া হলো। কিন্তু ভিড় এত বেশি ছিল যে, কুলি সময়মতো প্লাটকর্মে পৌঁছতে পারল না। এতে অফিসারের প্রচণ্ড রাগ হলো। একপর্যায়ে ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার হুইসেল বেজে উঠল। ট্রেন চলা শুরু করল। অফিসার সামানা ছাড়া ট্রেনে উঠতেও পারেন না। পরিশেষে তাকে ট্রেন ছেড়ে দিতে হলো।

ট্রেন চলে গেলে অফিসারের প্রচুর আফসোস হলো। তার প্রোগ্রাম মিস হয়ে গেল। যখন ট্রেন চলে গেল তখন কুলি মালমাল নিয়ে ঘামে নেয়ে অফিসারের কাছে এল। কুলির চেহারায় লজ্জা আর অনুতাপের ছাপ ছিল। সে এসেই বলল, জনাব! আমাকে মাফ করে দিন। আমি এখানে সময়মতো আসতে খুব চেষ্টা করেছি; কিন্তু ভিড় ঠেলে আসতে পারিনি। মানুষের এত জটলা ছিল যে, রাস্তাও চেনা যাচ্ছিল না।

কুলির কথায় অফিসার চিন্তা করলেন, ট্রেন তো চলে গেছে। এখন বেচারাকে রাগ করে লাভ কী? সুতরাং তিনি এটা ভেবে মহব্বতের সঙ্গে তাকে বললেন, না; রাগ করব কেন? আল্লাহপাকের ফয়সালা এমনই ছিল। চলো, কালই যাব। অফিসারের এই নরম ভাষা শুনে কুলির চিহারায় হাসি

ফুটে উঠল। সে বলল, ঠিক আছে, আমি আপনার মালামাল আপনার গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি। তারপর কুলি অফিসারের মাল তার গাড়ি পর্যন্ত দিয়ে এল। অফিসার সে রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দিলেন।

পরের দিন অফিসার নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই স্টেশনে চলে এলেন। এসে দেখলেন, ওই কুলিও তার অপেক্ষায় রয়েছে। অফিসারকে দেখেই কুলি এমনভাবে তার সঙ্গে কুশলবিনিময় করল, যেন অফিসার একান্ত কোনো আপনজন। পরে কুলি তার সমস্ত মাল মাথায় তুলে নিল এবং বলল, জনাব! আজ তেমন ভিড় নেই। আজ আপনাকে সময়মতো পৌঁছিয়ে দেবই। কুলি সামানপত্র প্লাটফর্মে পৌঁছিয়ে দিলে অফিসার তাকে পারিশ্রমিক দিতে চাইলেন। কিন্তু কুলি বলল, না জনাব! আমি পয়সা নেব না। কেননা, আমার ভুলের কারণেই গতকাল আপনার ট্রেন মিস হয়েছে। অফিসার তাকে পয়সা দেওয়ার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করলেন; কিন্তু কুলি বারবার প্রত্যাখ্যান করে বলল, আপনি পয়সা না দিলেই আমি বেশি খুশি হব। যাহোক, শেষ পর্যন্ত কুলি এক পয়সাও নিল না।

কুলি অফিসারের মাল-সামানা ট্রেনে উঠিয়ে দিল এবং বগি থেকে বের হয়ে এসে অফিসারের সীট বরাবর দাঁড়িয়ে থাকল। ট্রেন না যাওয়া পর্যন্ত কুলি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অফিসারের দিকে চেয়ে থাকল। ট্রেন চলতে শুরু করলে কুলি অফিসারকে এমন দরদের সঙ্গে বিদায় জানাল যে, সারা জীবনেও কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাকে ওই দরদের সঙ্গে বিদায় দেয়নি।

অফিসার তার জীবনীতে এই ঘটনা বর্ণনা করে লিখেন যে, ট্রেন মিস হওয়ার কষ্ট আমার রাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই কুলির মহব্বতমাখা বিদায় জানানোর দৃশ্য আজ বিশ বছর পরও আমার চোখে ভাসছে এবং সেকথা মনে পড়লে হৃদয়টা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

এই ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষার বার্তা হলো, অফিসার কুলিকে দুটি গালি দিয়ে তার মনের রাগ ঠাণ্ডা করতে পারতেন এবং সে গালি খেয়ে কুলি বেচারা তার বাড়ি চলে যেত। কিন্তু অফিসার তাকে মাফ করে দিলেন। এর ফল এই হয় যে, একে কুলি তার উপর বিরাট করুণা মনে করল। ফলে কুলি সেদিন যেমন তার সামানা বহন করে দিল, তেমনি পরের দিনও পৌঁছিয়ে দিল। এমনকি যতক্ষণ-না ট্রেন চলে যায়, ততক্ষণ সে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে তার জন্য দু'আ করতে থাকে এবং দরদের সঙ্গে তার এক ঘনিষ্ঠজনের মতো অফিসারকে বিদায় জানাল।

এটিই হলো ক্ষমার নগদ লাভ। মানুষ যখন অন্যের ভুল মাফ করে দেয়, তখন তার ওই ভুলের কষ্টের কথা তো মনে থাকে না; কিন্তু মাফ করার স্বাদ জীবনভর উপভোগ করতে থাকে। তাই যখনই কেউ মাফ চাইবে, তখনই নিজের আখেরাতের কথা চিন্তা করবে যে, আজ যদি আমি মাফ না করি, তাহলে কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মাফ চাইব কোন মুখে!

হযরত যুননূন মিসরী (রহ.)-এর মায়াভরা দু'আ

হযরত যুননূন মিসরী (রহ.) একদিন জাহাজে সফর করছিলেন। নদীতে আরেকটি জাহাজও চলছিল। তাতে যুবক, যুবতী এবং তরুণীরাও সফর করছিল। তারা খানাপিনা করছিল আর হাসাহাসি করছিল। তাদেরকে মন্দ প্রকৃতির মনে হচ্ছিল এবং মন্দ জগতে থেকেই তারা এমন আমোদ-প্রমোদে মেতে উঠেছিল।

হযরত যুননূন মিসরী (রহ.)-এর জাহাজের লোকজন অপর জাহাজের নারী-পুরুষের মন্দ আচরণ দেখে খুবই রাগান্বিত হলো। একলোক সহ্য করতে না পেরে হযরত যুননূন মিসরী (রহ.)-এর কাছে এসে বলল, হযরত! দেখুন, তাদের আল্লাহর কোনো ভয় নেই। তারা পানির উপরও আমোদ-ফুর্তিতে লিপ্ত। মদ খাচ্ছে আর অট্টহাসি দিচ্ছে। অতএব, আপনি বদদু'আ করুন, যেন আল্লাহ তাদের জাহাজটা ডুবিয়ে দেন।

অগন্তুকের আবেদন শুনে হযরত প্রথমে চুপ থাকলেন। কিন্তু মানুষ যখন তাকে এ ব্যাপারে চাপ দিতে থাকল, তখন তিনি অপর জাহাজের লোকদের দিকে তাকালেন এবং হাত তুলে এভাবে দু'আ করলেন-

'হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে দুনিয়ায় আনন্দে রেখেছেন, তেমনি আখেরাতেও তাদের আনন্দে রাখুন।'

তাঁর দু'আর প্রভাব এই হলো যে, আল্লাহ তা'আলা হযরতের দু'আর বরকতে তাদের তাওবা করার তাওফীক দিলেন। তারা ভালো হয়ে গেল এবং সমস্ত অন্যায়-অপরাধ বর্জন করল। আল্লাহু আকবার!

হযরত ইবরাহীম আদহামের ক্ষমা

একবার হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) মাথা মুন্ডন করালেন। তিনি জাহাজে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সে যুগে জাহাজ এত বড় হতো যে, তাতে দু-তিনশ মানুষ অনায়াসে আরোহণ করতে পারত। হযরত জাহাজে যিকির ও দু'আ-দুরূদে লিপ্ত হয়ে যান। জাহাজের ছোট বাচ্চারা হযরতের

সদ্য টাক মাথার চমক দেখে মুগ্ধ হয়। ছোটদের কথা কী বলব, বড়দেরও এমন তেলতেলে টাক মুগ্ধ করে। মাথা মুড়িয়ে তাতে হাত বুলানোর মজাই আলাদা। এক বাচ্চা তার নিকট এগিয়ে এসে তার টাক মাথায় হাত বুলিয়ে খুব মজা পেল। তার দেখাদেখি আরেক বাচ্চা এসেও হাত বুলিয়ে মজা নিল। সে তৃতীয় আরেক বাচ্চাকে তার মজার কথা জানালে সেও এসে বুড়োর টাকে হাত বুলিয়ে মজা গ্রহণ করল। এভাবে বাচ্চারা পালাক্রমে এসে এসে তাঁর টাক মাথায় মজা করে হাত বুলাতে থাকল।

তাদের মধ্যে একটি বাচ্চা ছিল বেশি দুষ্টু। সে হযরতের কাছে এলে তার মাথায় দুষ্টুমি চাপল। সে প্রথমে টাকে হাত বোলাল। তারপর তাতে একটা থাপ্পরও মারল। তার দেখাদেখি অন্য একটি বাচ্চাও থাপ্পর দিল। এভাবে হযরতের টাকে থাপ্পরের পর থাপ্পর চলতে থাকল। পাশে-দূরে বড়রা দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখে মুখ চেপে হাসছিল। জাহাজের লোকেরা হযরতকে ঘিরে মজাক-উপহাস করতে থাকল। একপর্যায়ে হাসি-মজাক বেয়াদবির দিকেও মোড় নিল।

মানুষ যখন আল্লাহর এক ওলীকে এভাবে কষ্ট দিতে থাকে, তখন তা আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত করে। তখনই আল্লাহপাক হযরতকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন–

'হে ইবরাহীম ইবনে আদহাম! জাহাজের যাত্রীরা তোমার সঙ্গে বেয়াদবির সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তুমি দু'আ করলে আমি এখনই জাহাজটা উল্টে দেব, যাতে জাহাজের যাত্রীরা ডুবে মরে।'

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর দিলে এই ইলহাম আসতেই তিনি তৎক্ষণাৎ হাত তুললেন এবং এভাবে দু'আ করলেন– 'হে আল্লাহ! আপনি যদি জাহাজটা উল্টিয়েই দিতে চান, তাহলে এখানে যত লোক আছে, তাদের সকলের দিল উল্টিয়ে দিয়ে তাদেরকে নেককার বানিয়ে দিন।'

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর দু'আ কবুল হয়ে গেল। কথিত আছে, তাঁর দু'আর বরকতে জাহাজে যত লোক ছিল তারা সকলেই মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর ওলী হয়ে গিয়েছিল।

দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ

এক হাদীছে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَآءِ

'তোমরা যমিনের মানুষের উপর দয়া করো, তাহলে আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন।'

আমরা যদি দুনিয়াতে রাগ প্রয়োগ করি, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহপাকের রাগ সহ্য করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আর এটি বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহপাক কারো প্রতি চটে গেলে তার কোনোই উপায় থাকবে না। তাই সেদিন আল্লাহর ক্ষমা পেতে চাইলে দুনিয়াতে মানুষকে বেশি-বেশি ক্ষমা করুন। আল্লাহপাক আমাদের তাওফীক দিন। আমীন।

নকশবন্দী সিলসিলার বরকতে রাগ খতম

আমাদের বড়রা বলে গেছেন, আমাদের নকশবন্দী ধারার দ্বিতীয় সবক হলো লতীফায়ে রূহ। সালেক যখন এই সবক পুরোপুরি আয়ত্ত করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে রাগের ব্যাধি থেকে মুক্তি দান করেন। বিষয়টি বহু পরীক্ষিত সত্য।

ভারতে এক আলেম ছিলেন। তিনি একটি বড় মাদরাসায় ২০ বছর ধরে মুসলিম শরীফ পড়ান। উচ্চ পর্যায়ের ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাগও ছিল প্রচণ্ড। তার রাগের কথা ছিল সকলের মুখে-মুখে। যখন ওই আলেম নকশবন্দী ধারায় আগমন করেন, তখন বলেন, হযরত! আমার অবস্থা হলো, আমি অল্পতেই রেগে যাই এবং রাগ আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। মানুষ আমার উপকারী ইল্‌মের কারণে বড়ই সম্মান করে; কিন্তু আমি আমার এই বাতেনি রোগের কারণে খুবই অস্থিরতা ও কষ্টের মধ্যে আছি। তাকে বলা হলো, আপনি এই সবক পালন করুন; আশা করি, আপনার সমস্যা দূর হয়ে যাবে। ওই আলেম প্রায় ছয় মাস সবকটি পালন করলেন। আল্লাহপাক তার তবিয়ত এমন বদলে দিলেন যে, একদিন তিনি নিজে এসে বললেন, আমার স্ত্রী বার্তা পাঠিয়েছেন, তিনিও আপনার হাতে পর্দার অন্তরাল হতে বাইয়াত হতে চান।

তারপর আলেম বললেন, হযরত! জানেন, তিনি কেন বাইয়াত হতে আগ্রহী? আমি বললাম, বলুন। আলেম বললেন, স্ত্রী আমার সঙ্গে জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছে। সে বলছিল, আপনি চার-পাঁচ মাস যাবত কেমন যেন বদলে গেছেন। এর রহস্য কী? আমি তাকে জানাইনি, আমি বাইয়াত হয়েছি। কিন্তু সেও নাছোড়বান্দা; বারবার জানতে চায়। শেষমেষ আমি বলি, আমি বাইয়াত হয়েছি। বর্তমানে আমার মাঝে ওই রাগ নেই, যা

পূর্বে ছিল। একথা শুনে আমার স্ত্রী বলল, এই তরিকাটি আমার কাছে সত্য বলে মনে হচ্ছে। তাই আমিও এই তরিকা থেকে উপকৃত হতে চাই।

সালেক যদি নকশবন্দী তরিকার সবক ঠিকমতো পালন করে, তাহলে তার জীবনও বদলে যাবে এবং সাথে-সাথে ঘরেও দীন যিন্দা হয়ে যাবে। বর্তমানের অবস্থা হলো, মানুষ নিজে সূফী হয়ে যায়; কিন্তু ঘরে বদদীনের পরিবেশ রয়েই যায়। তারা ব্যক্তিগতভাবে ঠিক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে। ফলে ঘরোয়া পরিবেশ দীনমুখী করতে চেষ্টা করে না। এমন লোকদের ক্ষেত্রেই বলা হয়ে থাকে–

'উপরে উপরে লা-ইলাহা আর তলে-তলে মা কালী!'

রাগ দমনের টিপ্‌স

রাগ দমনের কয়েকটি টিপ্‌স নিম্নরূপ-

(১) সর্বপ্রথম করণীয় হলো, রাগ হলেই لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়বে। এর বরকতে রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা শয়তান, যে মানুষের রাগ বাড়ায় এবং রাগী মানুষের সঙ্গে ফুটবলের মতো খেলা করে, সে পালিয়ে যাবে এবং সহসা রাগ পড়ে যাবে।

(২) যদি এ প্রক্রিয়ায় রাগ না যায়, তাহলে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে। এর বরকতে আল্লাহপাক তাকে রাগের কবল থেকে রক্ষা করবেন।

(৩) যদি এতেও রাগ না যায়, তাহলে সে অবস্থান বদলে ফেলবে। যেমন– শোওয়া থাকলে উঠে বসবে। বসা থাকলে দাঁড়িয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে থাকলে একটু হাঁটাহাঁটি করবে। স্থান বদলালে আল্লাহপাক রাগ ঠাণ্ডা করে দিবেন।

(৪) যদি কারো রাগ এতেও না দমে, তাহলে সে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ওজু করবে। ওজুর বরকতে আল্লাহ তার রাগ ঠাণ্ডা করে দিবেন।

(৫) যদি ওজু করেও রাগ না যায়, তাহলে সে দুই রাকাত নামায পড়বে এবং সেজদায় গিয়ে চিন্তা করবে, আমি সেজদারত এবং আল্লাহপাকের এক অক্ষম বান্দা। আজ যদি আমি মানুষের ভুল ক্ষমা না করি, তাহলে আল্লাহপাক কাল কেয়ামতের দিন আমার গুনাহ কীভাবে ক্ষমা করবেন। শায়েখগণ বলেন, সেজদায় গিয়ে নিজের অক্ষমতা এভাবে অনুধাবন করলে রাগ অবশ্যই পানি হয়ে যাবে।

(৬) রাগ যদি এতেও ঠাণ্ডা না হয়, তাহলে ওই দু'আটি করবে, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযি.)কে শিক্ষা দিয়েছিলেন–

'হে মুহাম্মদের রব! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আমার মনের রাগ মিটিয়ে দিন এবং আগত ফেতনা থেকে আমাকে বাঁচান।'

(৭) যদি রাগ এতেও না যায়, তাহলে সর্বশেষ উপায় হলো, কয়েকবার নবীজির প্রতি দুরূদ পাঠ করবে। এটি পরীক্ষিত আমল যে, কয়েকবার দুরূদ পড়লে আল্লাহপাক রাগকে পানি করে দেন। এ কারণেই আরবে দুজন লোকের মাঝে ঝগড়া বাঁধলে আরবরা সঙ্গে-সঙ্গে বলে ওঠেন–

صَلُّوْا عَلٰى مُحَمَّدٍ, صَلُّوْا عَلٰى مُحَمَّدٍ

আপনি এসব পন্থায় রাগ দমন করুন এবং যার উপর রাগ হয়, তাকে ক্ষমা করে দিন, যাতে কেয়ামতের দিন আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

مَنْ لَمْ يَسْئَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

'যে আল্লাহর কাছে দু'আ করে না, আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হন।'

দু'আ কবুলের রাতসমূহ

[১৪২৩ হিজরীর ১৫ শাবান মোতাবেক ২০০২ সনের ২০ অক্টোবর নকশবন্দী সিলসিলার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে জং শহরের জামে মসজিদে শবে বরাতে ঈশার আমাযের পর হযরতওয়ালা দামাত বারাকাতুহুম এই গুরুত্বপূর্ণ বয়ানটি পেশ করেন। মজলিসে সালেকীন ও আম জনতা ব্যাপকহারে উপস্থিত ছিলেন।]

'ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, চার রাতে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের দরিয়া বইয়ে দেন। যথা–

(১) লাইলাতুল কদরে।

(২) লাইলাতুল আরাফাহ তথা আরাফার রাতে।

(৩) লাইলাতুল বারাআত তথা শবে বরাতে।

(৪) লাইলাতুল জায়িযাহ তথা ঈদুল ফিতরের রাতে।

শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) লিখেছেন, যেভাবে মানুষের ঈদ হয়, তেমনি শবে বরাতে ফেরেশতাদের ঈদ হয়।'

দু'আ কবুলের রাতসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صَالِحِيْنَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

রজব, শাবান ও রমযানের ফযিলত

কতক সময়, কিছু স্থান এবং কতিপয় ব্যক্তিত্ব এমন হন, যাদের উপস্থিতিতে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তা কবুল হয়। এর মধ্য হতে আজকের রাতও (শবে বরাত) কবুলের একটি রাত। হাদীছে এ রাতের অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। রজব, শাবান ও রমযান মাস পরপর আসে। আল্লাহপাকের নিকট এ তিন মাসের গুরুত্ব অনেক।

(১) আল্লাহপাক রজব মাসকে শবে মেরাজের মাধ্যমে ফযিলত দান করেছেন। রমযান মাসকে লাইলাতুল কদর দ্বারা সম্মানিত করেছেন। এ দুই মাসের মধ্যকার মাস শাবান। এ কারণে এ মাসকে كريم الطرفين এর মাস বলা হয়। হাদীছে এসেছে, নবীজি যখন রজব মাসের চাঁদ দেখতেন, তখন এই দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য রজব এবং শাবান মাসে বরকত দিন এবং আমাদেরকে রমযান মাসে পৌঁছিয়ে দিন।'

(২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রজব মাস হলো আল্লাহপাকের মাস। কেন? কারণ হলো, সাধারণত ধনীরা এ মাসে তাদের যাকাতের মাল হিসাব করে এবং গরীবদের প্রতি লক্ষ্য রাখে। তারপর নবীজি ইরশাদ করেন, শাবান মাস আমার মাস। তারপর বলেন, রমযান মাস আমার গুনাহগার উম্মতের (কল্যাণের) মাস।

(৩) কতক বুযুর্গ লিখেছেন, রজব মাস বীজ ফেলার মাস। শাবান মাস পানি ও সেচদানের মাস। আর রমযান হলো ফসল কাটার মাস।

(৪) যদি রজব মাসকে বাতাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে শাবান মাস হবে মেঘের মতো। আর রমযান মাস হবে রহমতের বৃষ্টির মতো।

(৫) রজব মাসে মানুষের আমল ৭ গুণ বৃদ্ধি পায়। শাবান মাসে বৃদ্ধি পায় ৭০০ গুণ। আর রমযান মাসে বৃদ্ধি পায় ১০০০ গুণ।

(৬) রজব মাসের ফযিলত অন্য মাসের উপর তেমন, যেমন কুরআন শরীফের ফযিলত অন্যান্য আসমানী কিতাবের উপর। শাবান মাসের ফযিলত অন্য মাসের উপর তেমন, নবীজির ফযিলত যেমন অন্যান্য নবীদের উপর। রমযান মাসের ফযিলত অন্যান্য মাসের উপর তেমন, আল্লাহর ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব যেমন অন্যান্য সকল মাখলুকের উপর।

(৭) রজব মাস গুনাহগারদের ক্ষমার মাস। শাবান মাস শাফা'আতের মাস আর রমযান মাস নেকী বৃদ্ধির মাস।

রহমতের সূচনা

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, আল্লাহপাকের কালামের সঙ্গে রমযান মাসের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণেই দেখা গেছে, যত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে সবগুলোই রমযান মাসে নাযিল হয়েছে। এই বরকতময় মাসের বরকত ১৫ শাবান রাত থেকেই শুরু হয়ে যায়।

তিনি এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, সূর্যোদয় তো অনেক সময় পরে হয়। কিন্তু সূর্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব হতেই ভোরের সূচনা ঘটে। যতই সময় এগিয়ে যায়, ভোরের আলো ততই বাড়তে থাকে। এমনকি সূর্যোদয়ের কয়েক মিনিট পূর্বে এমন আলোকিত হয়ে যায় যে, যেন সূর্যোদয় হয়ে গেছে। এ সময় অনেকে ধাঁধাঁয় পড়ে যায় যে, সূর্য উঠে গেল কি-না!

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, ১৫ শাবানের ভরপুর রহমতের রাতটি হলো রমযান মাসের সূর্যোদয়ের পূর্বাভাষের মতো। তারপর থেকে প্রতিদিন আলো বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে রমযান মাসের কয়েকদিন

পূর্বে এমন এমন বরকত নাযিল হওয়া শুরু হয়, যেন রমযান মাসেই বরকত নাযিল হচ্ছে। তারপর রমযান মাসের প্রথম তারিখে রহমতের সূর্য উদিত হয়। সুতরাং কেমন যেন আজ রাত (শবেবরাত) হতে বরকত বিশিষ্ট মাসের বরকতের ধারার সূচনা ঘটে গেছে।

বাজেট পেশের রাত

ওলামায়ে কেরাম আজকের রাতকে 'বাজেটের রাত' বলে অভিহিত করেছেন। যেমনিভাবে আমাদের দেশে বাজেট পেশ হয় এবং সে বাজেটে পরবর্তী বছরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয় যে, কত অর্থ কোথায় ব্যয় করা হবে এবং আগামী বছর কী-কী কাজ করা হবে, এমনিভাবে আল্লাহপাক ১৫ শাবান রাতে ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন, আগামী বছর যা-যা ঘটবে তার লিস্ট তৈরি করো। কারা সুস্থতা লাভ করবে। কারা অসুস্থ হবে। কারা জীবিত থাকবে। কারা মারা যাবে। কাদের রিযিক কমবে। কাদের রিযিক বাড়বে। কারা সম্মানের অধিকারী হবে। কারা অপমানিত হবে। কারা আনন্দিত হবে। কারা দুঃখ পাবে। কারা ঈমান আনবে। কারা ঈমানহারা হবে। এ সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা আজ রাতেই সম্পন্ন হয়। ২৭ রমযানে এই তালিকা আল্লাহপাকের নির্দেশক্রমে ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কেমন যেন সুপরিকল্পিত ও সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য উক্ত তালিকা প্রতি দফতরে ও বিভাগে বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৫ শাবানের দিন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এ রাতে ভাগ্যের ফয়সালা হয়। আমার মন চায়, ফয়সালার সময় আমি রোযার হালাতে থাকব। এ কারণে নবীজি ১৫ শাবনে রোযা রাখতেন।

এ হাদীছ প্রমাণ করে, ১৫ শাবান রোযা রাখা সুন্নত।

একটি হাদীছের রাবী হলেন হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাযি.)। তিনি স্বীয় কওমের সর্দার ছিলেন। তিনি ইসলাম কবুল করতে রওনা হলে আল্লাহপাক তাঁর নবীর দিলে একথা সৃষ্টি করে দেন যে, আপনার কাছে একটি সম্প্রদায়ের নেতা ও গুণীজন আসছে। তার প্রতি সম্মান দেখাবেন। ফলে নবীজি তাঁকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে যান। তাঁর সম্মানার্থে নিজের চাদর মুবারক বিছিয়ে দেন এবং বললেন, চাদরের উপর দিয়ে হেঁটে চলুন। কিন্তু হযরত আবু উমামা (রাযি.) এত ভদ্র ছিলেন যে, তিনি নিজহাতে চাদরটি তুলে নিয়ে বললেন, আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি আপনার চাদরের উপর দিয়ে হেঁটে যাব। তিনি চাদরটি উঠালে নবীজি বলেন–

اَبُوْ اُمَامَةَ كَنْزُ الْاَدَبِ وَالصِّيَانَةِ

'আবু উমামা শিষ্টাচার ও ভদ্রতার খনি।'

এই মহান সাহাবী হযরত আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ صَامَ يَوْمًا مِّنْ شَعْبَانَ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجِنَانِ وَغُلِّقَتْ عَلَيْهِ اَبْوَابُ النِّيْرَانِ.

'যেব্যক্তি শাবান মাসে একটি রোযা রাখে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেন এবং জাহান্নামের আগুনের দরজাসমূহ তার জন্য বন্ধ করে দেন।'

হযরত আলী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, ১৫ শাবানের রাতে ইবাদাত করো এবং দিনে রোযা রাখো।

এদিন সুর্যাস্তের পরেই অর্থাৎ বরাতের রাতে আল্লাহপাক দুনিয়ার আসমানে আগমন করেন এবং থেকে-থেকে এই ঘোষণা দিতে থাকেন–

* আছে কোনো ক্ষমাপ্রার্থী? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।

* আছে কোনো রিযিকপ্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দিব।

* আছে কোনো বিপদগ্রস্ত? আমি তার বিপদ দূর করব।

* আছে কোনো হাজতপ্রার্থী? আমি তার হাজত পূর্ণ করব।

যখন আল্লাহপাকের পক্ষ হতে এভাবে বখশিশের ঘোষণা হতে থাকে, তখন আমাদের কর্তব্য হলো, এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগানো এবং আল্লাহপাকের পক্ষ হতে প্রদত্ত এসব উপহার গ্রহণ করা।

দু'আ কবুল হওয়ার কারণ

আজকের রাত দু'আ কবুলের রাত। প্রশ্ন হলো, আজ রাতে বিশেষভাবে দু'আ কবুল হবে কেন? উত্তর হলো, এ রাতের মধ্যে দু'আ কবুলের সমস্ত কারণ বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো–

(১) সময়টি দু'আ কবুলের অন্যতম মুহূর্ত। কেননা, হাদীছে এসেছে, শবে বরাতে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়।

(২) মাহফিলও মকবুল। কেননা, এ মাহফিলে এমন বহু আলেমে দীন এবং নেককার লোক রয়েছেন, যারা হাদীছ-তাফসীর পাঠদান করেন। মানুষকে আল্লাহ-আল্লাহ বলা শেখান। আল্লাহর রাস্তায় জীবন কাটান। আজকের মাহফিল যাকেরীনদের মাহফিল। জানা নেই, তারা কত দূর হতে এখানে এসেছেন। এই নেয়ামতও আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে দান করেছেন।

(৩) স্থানটিও কবুলযোগ্য। অর্থাৎ আমরা আল্লাহর ঘর মসজিদে বসে আছি। যদি কেউ দুনিয়াদার কোনো লোকের বাড়িতে ঢুকে পড়ে, তবে সেও তার দিকে খেয়াল রাখে। আমরা তো মহান আল্লাহর বাড়িতে এসে জমা হয়েছি; তাহলে কি তিনি আমাদের প্রতি সদয় হবেন না? অবশ্যই হবেন।

আমরা সারা বছর মানুষের কাছে অভিযোগ করে বেড়াই এবং নিজেদের পেরেশানির কাহিনী শোনাতে থাকি। কিছু লোক সরকারি কর্মকর্তাদের পেছনে ছোটে। অনেকে ধনীদের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ায়। কিন্তু পরে যখন ধমক ছাড়া ভাগ্যে কিছু জোটে না, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, আল্লাহ আমাদের শোনেন না, দেখেন না! নাউযুবিল্লাহ!

আজ মনের কথা শোনানোর সুবর্ণ সুযোগ। আজ যখন ফয়সালা হচ্ছে এবং কলম চলছে, তখন আজই কেন আমরা আল্লাহর নিকট কাঁদি না, যাতে আল্লাহ আমাদের জন্য কল্যাণের ফয়সালা করেন?

আপাদমস্তক ভিক্ষুকবেশে দু'আ চাওয়া

আমাদের কর্তব্য হলো, চাওয়ার মতো চাওয়া। এমনভাবে চাওয়া, যেভাবে চাইলে পাওয়া যায়। অনেক সময় মানুষ দু'আ পড়ে; দু'আ করে না।

মনে রাখবেন, দু'আর শব্দ ও বাক্য পড়া এক জিনিস আর চাওয়া আরেক জিনিস। দু'আ পড়ার অর্থ হলো, হাত তুলেই তোতা পাখির মতো মুখস্থ বাক্য বলতে থাকা–

(١) رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

(٢) رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

(٣) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا

এভাবে দু'আ পড়ার পর আপনি যদি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভাই! কী-কী দু'আ করলেন? তখন বলে, জানি না কী দু'আ করেছি। একেই বলে দু'আ পড়া। একে দু'আ করা বা দু'আ চাওয়া বলে না।

মনে রাখবেন, দু'আ পড়লে তা কবুল হয় না; বরং দু'আ চাইলে ও করলে তবেই কবুল হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, দু'আ করা বা দু'আ চাওয়া কাকে বলে?

উত্তর হলো, দু'আ করা বা দু'আ চাওয়া বলা হয়, এমনভাবে দু'আ করা যে, দু'আকারী মাথার তালু হতে পায়ের নখ পর্যন্ত তথা পুরো আপাদমস্তক ভিক্ষুক হয়ে যাবে। মুখের কথা, চোখের ভাষা, হাত পাতা, পোশাক-পরিচ্ছদ,

দেহ-মন সকল কিছু হতে ভিক্ষা ঝরতে থাকবে। একটু মনের চোখে দেখুন, যে ভিক্ষুক এক টাকার জন্য মানুষের দ্বারে-দ্বারে হাত পাতে, তার পরিধেয় কাপড়ও থাকে ফকীরের মতো। সে হাঁটেও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির মতো। সে হাতও পাতে ফরিয়াদকারীর মতো। যখন ভিক্ষা চায়, কাতর কণ্ঠে চায়। একটা টাকার জন্য যদি এভাবে মলিন বেশ, কাতরতা ও ফরিয়াদী সাজতে হয়, তাহলে যিনি মহান আল্লাহর কাছে চাইবেন – অনেক কিছু চাইবেন – তাকে কত বেশি ফরিয়াদী ও ভিক্ষুকবেশে চাইতে হবে! আমরা কি কখনো এভাবে দু'আ করি? অবশ্যই না। বস্তুত এ কারণেই আমার দু'আ কবুল হতে বেশি সময় লাগে। যদি সঠিক পন্থায় দু'আ করতাম, তাহলে চাইতেই পেয়ে যেতাম। চাইতে দেরি হতো; কিন্তু পাইতে দেরি হত না। আল্লাহপাক সঙ্গে-সঙ্গে দিয়ে দিতেন।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝাই। মনে করুন, কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি তার বন্ধুদের মাঝে বসা আছেন। আর ঠিক তখনই কোনো ফকীর এসে বন্ধুদের সামনেই বলল, আমি তার কাছে একটি টাকা চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে দেননি। বলুন তো ফকীরের এই কথাটি তার কতখানি খারাপ লাগবে। সে ভাববে, ফকীরের কথায় আমার ইজ্জত চলে গেছে। কেননা, সে আমার বন্ধুদের মজলিসে দাবি করছে, আমি তার কাছে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে দেয়নি। অথচ সকলেই জানে, আমি কত বড় দানশীল!

যখন দুনিয়ার কোনো ধনী লোক তার বন্ধুদের সামনে এমন অভিযোগ সহ্য করেন না, তখন আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অন্যান্য নবীগণের উপস্থিতিতে এটা কীভাবে পছন্দ করবেন যে, কেউ বলবে, হে আল্লাহ! আমি চাওয়ার মতো চেয়েছিলাম, তারপরও আমাকে দেওয়া হয়েছিল না। এমন কথা আল্লাহর শানের বিরোধী যে, কেউ একথা বলবে, হে আল্লাহ! আমি চেয়েছিলাম; কিন্তু পাইনি।

চাইলে আল্লাহ খুশি হন

দুনিয়াদাররা কোনো কিছু প্রদান করলে মনে কষ্ট রেখে দেয়। এর বিপরীত অবস্থা আল্লাহর। তিনি দিতে পারলে খুশি হন। হাদীছে এসেছে–

مَنْ لَمْ يَسْئَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

'যেব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হন।'

এর মর্মার্থ হলো, আল্লাহর কাছে যে যত বেশি চাইবে আল্লাহ তার উপর তত বেশি খুশি হবেন। আজকের রাত চেয়ে নেওয়ার রাত। তাই মন খুলে

চাইবেন। এটা দুনিয়াদারের কাছে চাওয়ার মতো নয়। দুনিয়াদারের কাছে একবার চাইলে সে দেয়। কিন্তু পরেরবার চাইলে আর দেয় না। পীড়াপীড়ি করলে রেগে যায়। তারপরও চাইলে দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে। তারপরও নাছোড়বান্দা হলে মুখের উপর বলে দিবে, আমাকে জ্বালাতন করো না। মোটকথা, দুনিয়াদারদের কাছে বারবার চাইলে তারা রেগে যায়।

কিন্তু আল্লাহপাকের শান ভিন্ন। বান্দা তার কাছে একবার চাইলে আল্লাহ তা প্রদান করেন। দ্বিতীয়বার চাইলেও দেন। শুধু তা-ই নয়; যে বান্দা সর্বক্ষণ আল্লাহর কাছে চায় এবং সব কিছু চায়, আল্লাহ তাকে তার ওলীদের মধ্যে শামিল করে নেন। আল্লাহপাক ঘোষণা দেন, এই লোক আমার ওলী। আমার কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে সে হাত পাতে না। সর্বক্ষণ আমার কাছে চায় এবং সব কিছু চায়। বোঝা গেল, আল্লাহর কাছে যে বেশি-বেশি চায়, সে আল্লাহর প্রিয়পাত্র। পক্ষান্তরে দুনিয়াদারদের কাছে প্রিয় সে, যে তার কাছে চায় না; বরং তাকে আরও দেয়।

কল্যাণের ইচ্ছা

আমরা সৌভাগ্যবান। কেননা, দয়ালু আল্লাহ আমাদেরকে আরেকবার এমন মাহফিল দান করেছেন। আল্লাহ যদি আমাদের অসুস্থ করতেন, তাহলে আমরা হাসপাতালে পড়ে থাকতাম। আমাদের কোনো আত্মীয় অসুস্থ হয়ে পড়লে মাহফিল রেখে তার পেছনেই দৌড়াদৌড়ি করতে হতো। আল্লাহপাক সব কিছু ভালো রেখেছেন এবং আমাদেরকে সুস্থতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে এখানে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। এর থেকে অনুমিত হয়, আল্লাহ আমাদেরকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন। কেননা, ধনী যদি তার দরজায় ভিক্ষুকদের ডাকে, তাহলে সে দিবে বলেই ডাকে। খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে ডাকে না। যদি খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়াই ইচ্ছা হতো, তাহলে ডাকার দরকার কী ছিল? ডাকাটাই প্রমাণ যে, লক্ষণ শুভ। এখন আমাদেরকে চাওয়ার মতো চাইতে হবে।

যদি কোনো লোক কারো সামনে কিছু পেতে হাত পাতে, কিন্তু তার চেহারা থাকে অন্য দিকে, তাহলে দাতা তাকে কিছুই দিবে না। বরং সে তার প্রতি আরও নারাজ হয়ে যাবে। কেননা, সে এমন আচরণকে তার জন্য বেইজ্জতি মনে করবে যে, তুমি হাত পেতেছ তো আমার দিকে; কিন্তু তাকিয়ে আছ আরেক দিকে! যেভাবে ফকির ভিন্ন দিকে চেহারা ঘুরিয়ে হাত পাতলে দাতা নারাজ হয়, ঠিক তেমনি কোনো বান্দা যদি আল্লাহর দরবারে হাত

শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তুমি অন্তরে ভাবো, যদি আমি একাকী চাইতাম, তাহলে জানা যেত না, কবুল হবে কি-না। কিন্তু যদি আমি নিজেকে দলের একজন মনে করে দু'আ করি, তাহলে আল্লাহপাক জামাতের বরকতে আমার দু'আ কবুল করে নিবেন।

তিন বস্তু অপর তিন বস্তুর মধ্যে

আল্লাহপাক তিনটি বস্তুকে অপর তিনটি বস্তুর মাঝে নিহিত রেখেছেন। যদি কোনো বাচ্চাকে কোনো জিনিস এমনিই দেওয়া হয়, তাহলে সে তার মূল্যায়ন করে না। তাই তার মা বস্তুটি দেওয়ার আগে তা কোথাও লুকিয়ে রাখে। তারপর বাচ্চাকে বলে, বস্তুটি খোঁজো। মা জানে, যদি বাচ্চা খোঁজা শুরু করে এবং এদিক-ওদিক খুঁজে ফেরে, তাহলে বস্তুটির প্রতি তার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং অনেক খুঁজে যখন পাবে, তখন তার বদর করবে। ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বস্তু অপর তিনটি বস্তুর মধ্যে নিহিত রেখেছেন। তা হলো–

(১) আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টি নিহিত রেখেছেন তাঁর আনুগত্যের মধ্যে। তাই মুমিন বান্দার কর্তব্য হলো সব ধরনের নেকীর কাজ করা। কেননা জানা নেই, আল্লাহ তা'আলা আমার কোন আমলের কারণে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

(২) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসন্তুষ্টি তার অবাধ্যতার মাঝে নিহিত রেখেছেন। তাই মুমিন বান্দার কর্তব্য হলো প্রত্যেক ছোট-বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, জানা নেই, আমার রব কোন গুনাহের দরুন অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

(৩) আল্লাহপাক তাঁর ওলীদেরকে তাঁর মাখলুকের মধ্যে নিহিত রেখেছেন। তাই প্রত্যেক ঈমানদারকে সম্মান দেখাতে হবে। কেননা, আমার জানা নেই, আল্লাহর কাছে কোন বান্দার মর্তবা কেমন।

দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু করে, কেয়ামতের দিন জানা যাবে, এর কোনটি ভালো আর কোনটা অচল। একবার হযরত সাইয়্যেদ সুলাইমান নদবী (রহ.) সফর থেকে ফিরে এলেন। একজন জিজ্ঞাসা করল, হযরত! কেমন আছেন? তিনি জবাবে একটি চরণ পাঠ করলেন। আর তা হলো–

یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے

কেমন আছি হেথা আমি বড় কথা নয়,
ওখানের অবস্থা কেমন হবে সেটাই দেখার বিষয়।

এত মানুষের ক্ষমা!

ইবনে মাজাহ শরীফে একটি বর্ণনা আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, আমি একরাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিছানায় পেলাম না। আমি তাকে খুঁজতে বাইরে বেরিয়ে দেখি, জান্নাতুল বাকী' হতে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। আমি ওই আওয়াজ অনুসরণ করে এগিয়ে যাই। দেখি, নবীজি সেজাদয় পড়ে কেঁদে-কেঁদে নিজের উম্মতের গুনাহগারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। নবীজি হযরত আয়েশা (রাযি.)কে বলেন, আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা এরাতে দুনিয়ার আসমানে আসেন এবং বনু কাল্‌বের গোত্রের বকরির পশমের সমসংখ্যক জাহান্নমীদের জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন।

বনু কাল্‌ব মদীনা তায়্যেবার নিকটবর্তী একটি প্রখ্যাত গোত্র ছিল। তারা বকরি পালনে প্রসিদ্ধ ছিল। ওই গোত্রের প্রতিটি ঘরে অনেক-অনেক বকরি থাকত। এক-একটা বকরির গায়েই থাকে হাজার-হাজার পশম আর ওই গোত্রের নিকট এমন পশু ছিল হাজার-হাজার। এখন চিন্তা করে দেখুন, কত সংখ্যা হবে? এতসংখ্যক মানুষ শবে বরাতে নাজাত পেয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ!

ক্ষমার ঘোষণা

হযরত আবুবকর (রাযি.) বর্ণনা করেন–

قُمْ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ لَيْلَةٌ مُّبَارَكَةٌ فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ فِيْهَا هَلْ مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَلَهُ.

'তুমি ১৫ শাবান রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি মুবারক রাত। এ রাতে আল্লাহপাক বলেন, আছে কোনো ক্ষমাপ্রার্থী; আমি তাকে ক্ষমা করে দেব?'

আমরা সকলেই ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহর ক্ষমা খুঁজে ফিরছিলাম। ভাগ্যক্রমে আজকের রাত পেয়ে গেছি। এ রাতে আল্লাহ নিজেই ক্ষমাপ্রার্থীদের খুঁজতে থাকেন যে, কোনো ক্ষমাপ্রার্থী থাকলে ক্ষমা চাও, আজ যে-ই ক্ষমা চাইবে তাকেই ক্ষমা করে দেব। এটি সূবর্ণ সুযোগ। এমন সুযোগ বারবার আসে না। তাই এ সুযোগটি লুফে নেওয়া দরকার। কেঁদে-কেঁদে ক্ষমা চেয়ে জীবনের সকল পাপ-তাপ মুছে নিতে হবে।

এত মানুষের ক্ষমা!

ইবনে মাজাহ শরীফে একটি বর্ণনা আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, আমি একরাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিছানায় পেলাম না। আমি তাকে খুঁজতে বাইরে বেরিয়ে দেখি, জান্নাতুল বাকী' হতে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। আমি ওই আওয়াজ অনুসরণ করে এগিয়ে যাই। দেখি, নবীজি সেজাদয় পড়ে কেঁদে-কেঁদে নিজের উম্মতের গুনাহগারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। নবীজি হযরত আয়েশা (রাযি.)কে বলেন, আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা এরাতে দুনিয়ার আসমানে আসেন এবং বনু কাল্‌বের গোত্রের বকরির পশমের সমসংখ্যক জাহান্নমীদের জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন।

বনু কাল্‌ব মদীনা তায়্যেবার নিকটবর্তী একটি প্রখ্যাত গোত্র ছিল। তারা বকরি পালনে প্রসিদ্ধ ছিল। ওই গোত্রের প্রতিটি ঘরে অনেক-অনেক বকরি থাকত। এক-একটা বকরির গায়েই থাকে হাজার-হাজার পশম আর ওই গোত্রের নিকট এমন পশু ছিল হাজার-হাজার। এখন চিন্তা করে দেখুন, কত সংখ্যা হবে? এতসংখ্যক মানুষ শবে বরাতে নাজাত পেয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ!

ক্ষমার ঘোষণা

হযরত আবুবকর (রাযি.) বর্ণনা করেন–

قُمْ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ لَيْلَةٌ مُّبَارَكَةٌ فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ فِيْهَا هَلْ مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَلَهُ.

'তুমি ১৫ শাবান রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি মুবারক রাত। এ রাতে আল্লাহপাক বলেন, আছে কোনো ক্ষমাপ্রার্থী; আমি তাকে ক্ষমা করে দেব?'

আমরা সকলেই ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহর ক্ষমা খুঁজে ফিরছিলাম। ভাগ্যক্রমে আজকের রাত পেয়ে গেছি। এ রাতে আল্লাহ নিজেই ক্ষমাপ্রার্থীদের খুঁজতে থাকেন যে, কোনো ক্ষমাপ্রার্থী থাকলে ক্ষমা চাও, আজ যে-ই ক্ষমা চাইবে তাকেই ক্ষমা করে দেব। এটি সূবর্ণ সুযোগ। এমন সুযোগ বারবার আসে না। তাই এ সুযোগটি লুফে নেওয়া দরকার। কেঁদে-কেঁদে ক্ষমা চেয়ে জীবনের সকল পাপ-তাপ মুছে নিতে হবে।

শবে বরাতে নবুওয়াত প্রদান

কোনো-কোনো কিতাবে লেখা আছে, হযরত মূসা (আ.) শবে বরাতেই নবুওয়াত লাভ করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.) তাঁর স্ত্রী হযরত সফূরাকে নিয়ে সফর করছিলেন। তাঁর শরীর ভালো ছিল না। হযরত মূসা (আ.) আগুন সংগ্রহ করতে তূর পাহাড়ে যান। এসময় আল্লাহ হযরত মূসা (সা.)কে নবুওয়াত প্রদান করেন। জনৈক কবি বিষয়টি অতি চমৎকারভাবে বলেছেন–

خدا کی دین کا موسی سے پوچھئے احوال

کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے

খোদার দীনের পরিচয় শোনো কাছে নবী মূসার,

আগুনের সন্ধানে গিয়ে তিনি নবী হন খোদার।

এক শ্রেণীর লোক বলে, দু'আ করতে মনে চায় না। তাদের কথা শুনলে আমার দিল কেঁপে ওঠে। কেননা, কিতাবে লেখা আছে, আল্লাহ যার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, সর্বাগ্রে যা হয় তা হলো, তার থেকে আল্লাহ তা'আলা দু'আর স্বাদ ছিনিয়ে নেন। তাই যখন কোনো লোক একথা বলে যে, দু'আ করতে আমার মন চায় না, তখন তার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ তার থেকে দু'আর স্বাদ ছিনিয়ে নিয়েছেন।

আজ রাতে মন হাজির রেখে দু'আ করুন। দিল পাথর হলেও আল্লাহর সামনে পেশ করে দিন এবং বলুন, হে আমার মালিক! এই পাষাণ দিল আপনার সকাশে উপস্থিত। এই দিলে একটি নজর দিয়ে তা মোম বানিয়ে দিন।

ঝুলন্ত ভাগ্য ও চূড়ান্ত ভাগ্য

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ.

'আল্লাহপাক যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা স্থির রাখেন আর তার কাছেই লাওহে মাহফুজ।'[১]

ওলামায়ে কেরাম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, তাকদীর দু-ধরনের হয়। যথা–

---

১. সূরা রা'দ : আয়াত ৩৯

(১) تقدير معلق তথা ঝুলন্ত ভাগ্য।

(২) تقدير مبرم তথা চূড়ান্ত ভাগ্য, যার কোনো পরিবর্তন নেই।

যে ভাগ্য বদলে যেতে পারে, তাকে تقدير معلق বা ঝুলন্ত ভাগ্য বলে। আল্লাহপাকের ইচ্ছায় এমন ভাগ্যে রদবদল হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহপাক প্রতিদিন ৩৩০ বার লাওহে মাহফুজের দিকে তাকান। তখন তিনি তা হতে যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন।

তাকদীরের কিছু বিষয় শর্তযুক্ত হয়। যেমন–

১। দান-সদকা করা হলে বিপদ-মুসিবত হটে যাবে।

২। পিতামাতার খেদমত ও আনুগত্য করলে হায়াত বৃদ্ধি পাবে।

৩। স্বজনের সাথে সদাচার করলে হায়াত বৃদ্ধি পাবে।

৪। গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করলে রিযিকে বরকত হবে।

৫। অসুস্থ লোকের সেবা করলে রোগ হবে না।

৬। কপালে বিপদ ছিল; কিন্তু কেঁদে-কেঁদে দু'আ করলে বিপদ চলে যায়।

৭। যিনা-ব্যভিচার করলে জীবনের বরকত হ্রাস পায়।

৮। দু'আর দ্বারা ভাগ্য বদলে যায়।

এ কারণেই হযরত উমর (রাযি.) বায়তুল্লাহ তওয়াফ করা অবস্থায় কেঁদে-কেঁদে এভাবে দু'আ করতেন–

'হে আল্লাহ! আপনি যদি আমার নামটি সৌভাগ্যশীলদের তালিকায় লিখে থাকেন, তাহলে তা বহাল রাখুন। আমার নামটি সেখান থেকে মুছে ফেলবেন না। আর যদি আমার নামটি হতভাগাদের তালিকায় লিখে থাকেন, তাহলে আমার নামটি হতভাগাদের তালিকা হতে মুছে ফেলে সৌভাগ্যশালীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দিন। কেননা, আপনি যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন। আপনার নিকটই লাওহে মাহফুজ।'

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, কোনো আমল বা দু'আর দ্বারা যে তাকদীর বদলে যায়, তার দ্বারা উদ্দেশ্য সেই তাকদীর, যা সম্পর্কে ফেরেশতাদের জানা থাকে। এতে কোনো বিষয় শর্তযুক্ত থাকে। শর্ত পাওয়া গেলে হুকুমও পাল্টে যায়। আর শর্ত পাওয়া না গেলে হুকুম পূর্ববৎই থাকে। অনেক সময় ফেরেশতাদের এই শর্ত জানা থাকে আবার অনেক সময় জানা থাকে না। শুধু

আল্লাহপাক জানেন। তাই কখনো কোনো হুকুম আল্লাহপাক বদলে দিলে ফেরেশতারা অবাক হয়ে যায়।

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর দুই পুত্রের ওস্তাদ ছিলেন মোল্লা তাহের লাহোরী (রহ.)। পুত্র দুজনের নাম ছিল হযরত মুহাম্মদ সাঈদ (রহ.) ও হযরত মুহাম্মদ মাসুম (রহ.)। একবার হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) কাশ্‌ফমারফৎ জানতে পারলেন, মোল্লা তাহেরের কপালে 'মোল্লা তাহের লাহোরী শাকী (হতভাগা)' লেখা। বিষয়টি হযরত তার দুই পুত্রকে জানালেন। যেহেতু হযরতের দুই ছেলে মোল্লা তাহেরের ছাত্র ছিলেন, তাই তাঁরা তাঁদের আব্বাজানের কাছে দরখাস্ত করলেন, আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন আল্লাহপাক তাঁর কপালের 'দুর্ভাগ্যবান' মুছে দিয়ে সেখানে 'সৌভাগ্যবান' লিখে দেন। পুত্রদ্বয়ের অনুরোধে মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! মোল্লা তাহের লাহোরীর কপাল হতে شقی (হতভাগা) শব্দ মুছে ফেলে সেখানে سعید (সৌভাগ্যবান) লিখে দিন। আল্লাহ তা'আলা হযরতের দু'আ কবুল করলেন এবং মোল্লা তাহের লাহোরীর কপাল থেকে شقی শব্দ মুছে ফেলে সেখানে سعید শব্দ লিখে দেওয়া হলো।

যে তাকদীর পরিবর্তন হয় না, তাকে تقدیر مبرم বা অলঙ্ঘনীয় ভাগ্য তথা চূড়ান্ত ভাগ্য বলে। এটি আল্লাহ তা'আলার অটল সিদ্ধান্ত হয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত কোনো আমল বা দু'আর সঙ্গে শর্তযুক্ত হয় না। ফলে তা কখনো বদলে যায় না।

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, মানুষের তাকদীরের বেশিরভাগ অংশ শর্তযুক্ত হয়। খুব কমই অংশ হয় অটল-অপরিবর্তনীয়। সেগুলো সংঘটিত হয়েই থাকে। কোনো কিছুই তা ঠেকাতে পারে না।

আমার বন্ধুগণ! তাকদীরের বেশির ভাগ অংশ যখন শর্তযুক্ত, তখন বোঝা গেল, এখনও সময় আছে। আমল করে, দু'আ করে আমরা তা এখনও পরিবর্তন করিয়ে নিতে পারি। তাই আর দেরি না করে অঝোর ধারায় চোখের পানি ফেলুন। ছোট বাচ্চার মতো কাঁদতে থাকুন। কেঁদে-কেঁদে আল্লাহর মন ভোলান এবং যা চাওয়ার আছে, পাওয়ার আছে সবই অর্জন করে নিন।

দুই শ্রেণীর লোক বঞ্চিত

হাদীছে এসেছে, আজ রাতে বড়-বড় পাপীকেও ক্ষমা করা হয়। তবে দুই ধরনের লোক এই ক্ষমার রাতেও বঞ্চিত থাকে; তারা ক্ষমা পায় না। যথা–

(১) মুশরিক, যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করে।

(২) হিংসুক বা বিদ্বেষী, যারা মনে মানুষের প্রতি হিংসা-দ্বেষ রাখে।

শির্ক দুই প্রকার।

(১) শির্কে জলী বা প্রকাশ্য শির্ক।

(২) শির্কে খফী বা গোপন শির্ক। শির্কে জলী বলে, গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করা। যেমন– মূর্তির সামনে মাথা নোয়ানো ইত্যাদি। আর শির্কে খফী হলো, নফ্সের সামনে নত হওয়া এবং নফ্সের গোলাম হয়ে তার সকল চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা।

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, হাকীকী ঈমানের স্বাদ ততক্ষণ নসিব হয় না, যতক্ষণ মানুষ শির্কে জলী এবং শির্কে খফী- উভয় থেকে তাওবা না করে।

আপনি চিন্তা করলে দেখবেন, মানুষের অন্তরে

(১) কুপ্রবৃত্তিক

(২) যৌনবৃত্তিক ও

(৩) শয়তানিক টান ও কামনা-বাসনা ভরপুর রয়েছে। এগুলোর সবই নফ্সের নষ্টামি।

আল্লাহপাক এ বিষয়ে বলেন–

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

'আপনি তাকে দেখেছেন, যে তার মনোবৃত্তিকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে?'[১]

এ আয়াতে আল্লাহপাক সেই লোকের কঠিন সমালোচনা করেছেন, যে স্বীয় রবকে মাবুদ মানা বাদ দিয়ে নফ্সকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এর দ্বারা জানা যায়, মনোবৃত্তির গোলামি করা এবং তার পূজা করা শির্ক। তাই আমাদের অন্তরে–

* নফ্সের প্রতি টান
* যৌন লালসার চাহিদা এবং
* শয়তানের সঙ্গে সখ্য

---

১. সূরা জাছিয়া : আয়াত ২৩

ইত্যাদি থাকলে সাচ্চা ও পাক্কা তাওবা করতে হবে। এমন না হয় যে, অন্তরে এসব থেকে যাওয়ার কারণে আজ রাতের বরকত থেকে মাহরূম হয়ে গেলাম!

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো হিংসা-বিদ্বেষ। কোনো মানুষের অন্তরে কারো প্রতি ক্ষোভ ও শত্রুতা থাকাকে হিংসা-বিদ্বেষ বলে। কারো প্রতি অন্তরে রাগ-ক্ষোভ ও হিংসা থাকলে মানুষ তার সঙ্গে তিন ধরনের কবীরা গুনাহ করে। যথা–

(১) প্রতিশোধ গ্রহণ।

(২) জিদ করা এবং

(৩) শত্রুতা করা।

আপনি চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, সমাজে শাশুড়ীরা পুত্রবধূর ব্যাপারে হিংসা-বিদ্বেষ রাখে। এমনিভাবে পুত্রবধূরাও অন্তরে শাশুড়ীর ব্যাপারে হিংসা-বিদ্বেষ রাখে। কোনো-কোনো সংসারে হিংসা-বিদ্বেষের আগুন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও লাগে। বন্ধু অপর বন্ধুর প্রতি হিংসা রাখে। অনেক ঘরে বোনদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা থাকে। ভাইয়ে-ভাইয়ে হিংসা পোষণ করে। বোন-ভাইয়ের প্রতি, ভাই বোনের উপর হিংসা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই হিংসা-বিদ্বেষ অন্তর থেকে বের না হবে, ততক্ষণ আজকের দু'আও কবুল হবে না। দু'আর জন্য হাত তোলার পূর্বে এই দুটা গুনাহ হতে খাঁটি মনে তাওবা করুন। এমন যেন না হয় যে, এ দুটা গুনাহের কারণে আমরা ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থেকে গেলাম।

সুধারণা রেখে দু'আ করা

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন–

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ.

'বান্দার সঙ্গে আমি তেমনই আচরণ করি, বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা রাখে।'

ফলে আজ যদি আমরা এ ধারণা পোষণ করি যে, জানি না, আমার দু'আ কবুল হবে কি-না, তাহলে নিশ্চিত করেই বলা যায়, আমাদের দু'আ অবশ্যই কবুল হবে না। যদি এই নেতিবাচক মনোভাব রেখে দু'আ করি যে, তিনি তো আমাদের কথা শোনেনই না, তাহলে এটাই নিশ্চিত যে, আমরা যতই দু'আ করি না কেন, তিনি শুনবেন না। কারণ বিশ্বাসের অভাব, অনাস্থা।

পক্ষান্তরে যদি এমন মনোভাব নিয়ে দু'আ করি যে, অবশ্যই আল্লাহ দয়া করবেন, তাহলে আমাদের দু'আ অবশ্যই কবুল হয়ে যাবে। দু'আ কবুল হওয়ার পাক্কা বিশ্বাস রেখে দু'আ করলে সেই দু'আ ব্যর্থ হয় না। আল্লাহপাক আমাদেরকে এভাবে খাঁটি মনে দু'আ করার তাওফীক দান করুন।

দু'আ কবুলের ঘটনাসমূহ

কে বলে দু'আ কবুল হয় না? দু'আ অবশ্যই কবুল হয়, তবে তার জন্য মনে-প্রাণে বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। বিশ্বাস করুন, আমি আমার এ জীবনে দু'আ কবুল হওয়ার অসংখ্য ঘটনা দেখেছি। দুটি ঘটনা নিম্নরূপ-

(১) আমাদের এক বন্ধু ছিলেন চীফ ইঞ্জিনিয়ার। আল্লাহর শান যে, একবার তিনি পাগল হয়ে যান। এমনকি ডাক্তাররা পর্যন্ত তাকে নিরাময়-অযোগ্য ঘোষণা করলেন। কয়েক মাস পর খবরটি আমি জানতে পারি। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে তার বাড়ি যাই। আমি দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না যে, তার পরিবারের লোকেরা তাকে বেঁধে রেখেছিল। কেননা, তার মাথা বিকল হয়ে গিয়েছিল এবং তার ভালোমন্দের জ্ঞানটুকুও ছিল না। তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কেঁদে-কেঁদে বেহাল হয়ে গিয়েছিল। চিন্তা-ভাবনা করার জন্য কিছু লোক সেখানে এসেছিলেন। আমিও তাদের সঙ্গে সেখানে ছিলাম। আল্লাহর নেক বান্দাগণ প্রথমে খুব তাওবা-ইস্তেগফার করেন। তারপর তার জন্য দু'আ করেন। আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করেন। কোনো চিকিৎসা ছাড়াই আল্লাহ আবার তাকে জ্ঞান ফিরিয়ে দেন। বর্তমানে তিনি সউদী আরবে চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবেই কর্মরত আছে।

(২) আমার এক বন্ধু ছিলেন ডাক্তার। একদিন তিনি তার ক্লিনিকে এলেন। গাড়ি থেকে নামতেই তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। যখন তিনি এক লোকের হাত ধরে-ধরে বাসায় পৌছান, তখন সেখানে হুলস্থুল পড়ে যায়। পরিবারের লোকজন কেঁদে-কেঁদে অস্থির হয়ে যায়। তারা দেশের প্রধান আই স্পেশালিস্ট ডেকে এনে চেক করান। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসা অসম্ভব। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ডাক্তার সাহেব সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যান। আল্লাহর শান দেখুন, তিনি নকশবন্দী ধারার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার ব্যাপারে নকশবন্দী ভাইয়েরা জানতে পেরে তাদের কতিপয় চিন্তাশীল বন্ধু ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে যান। আমিও সেখানে গেলাম। সকলে মিলে আল্লাহর দরবারে তাওবা করলাম এবং ডাক্তার সাহেবের জন্য দু'আ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার

জীবনেই ওই ডাক্তারের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসতে দেখেছি। আল্লাহপাক চিকিৎসা ছাড়াই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।

দয়ার আপীল

অন্তর থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত মহব্বত ও কামনা-বাসনা বের করুন এবং অন্তর ধুয়ে-মুছে পাক করে ফেলুন। গায়রুল্লাহর প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকলে তা হতে ১০০ পার্সেন্ট তাওবা করুন। অন্তরে গুনাহের কোনো খেয়াল থাকলে তাও বের করে দিন। অন্তরে যদি কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ থাকে, তাও ঝেড়ে-মুছে ফেলুন। তারপর দেখুন, অন্তরে আল্লাহর রহমতের দরিয়া কীভাবে প্রবাহিত হয়।

একটি কথা মনে রাখবেন, যদি আমাদের বিরুদ্ধে গুনাহের মকদ্দমা দায়ের হয়, তাহলে আমরা নিশ্চিত হেরে যাব। কারণ, আমাদের সারা দেহ গুনাহে ভরপুর। এমন কোনো দিন নেই, আমরা গুনাহ করি না। মকদ্দমা দায়ের হওয়ার পরে শুধু একটি উপায় থাকে। তা হলো 'দয়ার আপীল'। এখন আমাদের অবস্থা হলো ওই লোকের মতো, যে অপরাধী এবং সে জীবন বাঁচাতে শীর্ষ মহলে দয়ার আপীল করছে। আমরাও কেমন যেন আমাদের প্রভুর কাছে দয়ার আপীল করছি। তিনি দয়া না করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তিনি বড়ই দাতা ও দয়ালু। তিনি তো এমন দয়ালু যে, ইবলীসেরও দু'আ কবুল করেছিলেন। ইবলীস আবেদন জানিয়েছিল–

رَبِّ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ.

'হে আল্লাহ! আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন।'

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, ফেরাউনের যুগে একবার নীল দরিয়া শুকিয়ে যায়। এতে ফেরাউন খুবই চিন্তিত ছিল। ফলে ফেরাউন একাকি দু'আ করল, হে আল্লাহ! আমি মানুষের সামনে যতই খোদায়ী দাবি করি না কেন, তুমি তো জান, আমি কিছুই করতে পারি না। আর এখন তো আমি আরও পেরেশান। আমার তো কোনো ক্ষমতা নেই, কিন্তু তুমি যদি সত্যই থেকে থাক এবং তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহলে নীল দরিয়া আবার চালু করে দাও। আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের মতো জঘন্য বিদ্রোহীর দু'আ কবুল করে নীল দরিয়া চালু করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহপাক যদি যুগে-যুগে এমন অত্যাচারী-অবাধ্যদের দু'আ কবুল করেন, তাহলে ঈমানদারদের দু'আ কেন কবুল করবেন না?

ইস্তেগফার ও রবওয়ালা গুণ

তালেবে ইল্‌মদের জন্য একটি ইল্‌মি তথ্য পেশ করছি। পবিত্র কুরআনের যেখানেই ইস্তেগফার শব্দ এসেছে, সেখানে আল্লাহপাক বেশিরভাগ স্থানে তাঁর 'রব' গুণবাচক নামটি ব্যবহার করেছেন। যেমন–

(১) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ.

(২) فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ.

(৩) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ.

আল্লাহপাক খালিকও, মালিকও। তিনি চাইলে ইস্তেগফার শব্দ ব্যবহারের পরে খালিক বা মালিকজাতীয় গুণবাচক নামও ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু শুধু 'রব' গুণবাচক শব্দই ব্যবহার করেছেন। তাই প্রশ্ন হয়, আল্লাহপাক শুধু এই 'রব' জাতীয় গুণবাচক নাম ব্যবহার করলেন কেন?

এর উত্তর হলো, 'রব' সেই সত্তা, যিনি মানুষসহ সমস্ত প্রাণীসমৃদ্ধ বস্তুর প্রতিপালন করেন। ফলে আল্লাহ এখানে 'রব' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেহেতু পিতামাতাও রূপকভাবে সন্তানের প্রতিপালন করেন, তাই এই 'রব' ও 'তারবিয়ত' জাতীয় শব্দ তাদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছেন। كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا এটি কুরআন শরীফের শব্দ, যা পিতামাতার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

পিতামাতা যেহেতু বাচ্চার লালন-পালন করেন, তাই বাচ্চার সঙ্গে তাদের একটি অকৃত্রিম সেতুবন্ধন থাকে। মা যেহেতু বাচ্চাকে বেশি সময় দেয়, তাই পিতার তুলনায় সন্তানের প্রতি মায়ের দরদ, মমতা ও মহব্বত বেশি থাকে। মা তার সন্তানকে কেমন মহব্বত করেন? বাচ্চা যদি পাশের রুমে কাঁদে, তাহলে মা একটুও স্থির হয়ে বসতে পারেন না। তিনি পানাহার ছেড়ে, সব কাজ ফেলে রেখে এবং রাস্তার প্রতিবন্ধকতা দু'পায়ে দলে-পিষে সন্তানের কাছে পৌঁছে যান। কেউ বাঁধা দিলে তার চোখ অশ্রুতে ভরে যাবেই এবং সে সন্তানের কাছে যেতে মাছের মতো ছটফট করতে থাকবে। কারণ হলো, সন্তানের সঙ্গে মায়ের নাড়ীর টান থাকে। এমনকি কান্নারত বাচ্চাটি যদি নিজেরও না হয়; বরং ভাইয়ের পক্ষ হতে পালতে দেওয়া সন্তান হয়, তবুও প্রতিপালনের কারণে ওই বাচ্চার সঙ্গেও তার মজ্জাগত সম্পর্ক হয়ে যায়। তার কাছে তাকে নিজের সন্তানের চেয়েও প্রিয় বলে মনে হয়।

আল্লাহপাক যেখানে যেখানে استغفار শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেখানে নিজের 'রব'গুণবাচক শব্দও ব্যবহার করেছেন। এতে বোঝা যায়, যেন আল্লাহপাক বলতে চান–

'হে আমার বান্দা! যেমনিভাবে মা তোমাকে প্রতিপালন করেছে এবং এ কারণে তোমার প্রতি তোমার মায়ের মহব্বতও অনেক, ঠিক তেমনি আমিও তোমার প্রতিপালক। আমিও তোমাকে অনেক-অনেক ভালোবাসি। তুমি শৈশবে মায়ের সামনে কাঁদলে সে তোমার প্রয়োজন মেটাত। এখন যদি তুমি আমার সামনে কাঁদ, তাহলে আমি তোমার রোনাজারি কবুল করব। যদি তুমি কিছু চাও, তাহলে আমি তোমার চাওয়া অপূর্ণ রাখব না। আমার কাছে অবনত মস্তকে এলে আমি তোমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেব না, আমি তোমাকে ভাসিয়ে দেব না। আমি তোমাকে অন্যের হাতে সোপর্দ করব না। আমি তোমার প্রতিপালক। আমিই তোমাকে লালন-পালন করেছি। এখন তুমি ইস্তেগফার করো ওই প্রতিপালকের কাছে, যিনি তোমাকে শৈশব থেকে প্রতিপালন করে জোয়ান করেছেন এবং যৌবন বয়স থেকে প্রতিপালন করে বৃদ্ধ বয়সে নিয়ে এসেছেন।'

গুনাহ্ মাফ করানোর সূবর্ণ সুযোগ

আমার বন্ধুগণ!

আমরা এত বেশি গুনাহ করেছি যে, আমাদের মাথার উপর যেন গুনাহের পাহাড় চেপে আছে। যদি এই পাহাড় কেমামতের দিন আল্লাহপাক সকলের সামনে খুলে দেন, তাহলে কেমন লজ্জার বিষয় হবে! আজ সমস্ত গুনাহ ক্ষমার সময়। আল্লাহপাক সেই মহান সত্তা, তিনি আমাদের সমস্ত গুনাহকে নেকী বানিয়ে দিলে তার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করার কেউ নেই। তিনি চাইলে আমাদের পক্ষে ফয়সালা দান করবেন এবং তিনি আমাদেরকে তার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নিবেন। আমরা যে চিন্তা করি, আমাদের দিল পাথর, আজ সেই পাথুরে দিলকে মোম বানানোর প্রয়োজন। অতএব আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন, যেন আল্লাহপাক আমাদের উপর দয়া করেন এবং আমাদের সমস্ত দু'আ কবুল করে নেন। আমীন! ছুম্মা আমীন!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

– দশম খণ্ড সমাপ্ত –